নাটক সমগ্র

দ্বিতীয় খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

সূচিপত্র

বিচিত্রানুষ্ঠান	...	১
বাকি ইতিহাস	...	৩৯
বাঘ	...	৯৯
পরে কোনোদিন	...	১২১
যদি আর একবার	...	১৭৫
প্রলাপ	...	২২৯
ত্রিংশ শতাব্দী	...	২৯৫
বিবর	...	৩৩৫
পাগলা ঘোড়া	...	৩৭৭
সার্কাস	...	৪৩৯

বিচিত্রানুষ্ঠান

বিচিত্রানুষ্ঠান

চরিত্রলিপি

সুধীন	মুকুল
মানিক	অঞ্জলি
অরুণা	বীণা
ভারতী	শ্যামল
পরিতোষ	প্রতীপ
সুবীর	বেণু
সত্য	অভি
অজয়	বিজয়
মনোরঞ্জন	বিশু
চুনীবাবু	ভবেশ

জনৈক দর্শক

প্রথম দৃশ্য

[ক্লাবের ঘর। টেবিল, বেঞ্চি, চেয়ার, মোড়া ইত্যাদি। উদ্দাম তর্ক চলছে।]

সুধীন : হ্যাঁ হবে!
মুকুল : না হবে না!
সুধীন : হ্যাঁ হবে!
মুকুল : না হবে না!
সুধীন : হবে!
মুকুল : হবে না!
সুধীন : হবে!
মুকুল : হবে না!
সুধীন : কেন হবে না?
মুকুল : হবে না!—অ্যাঁ? হবে না!
মানিক : (উঠে, আস্তিন গুটিয়ে) কেন হবে না?
মুকুল : (সঙ্গে সঙ্গে) কেন হবে না?
অঞ্জলি : কিন্তু আমরা তো এর আগে থিয়েটার ছাড়া কিছু করিনি?
মুকুল : তবে?
মানিক : তাতে কী?
মুকুল : তাতে কী।
অঞ্জলি : বিচিত্রানুষ্ঠান কী করে করবো?
সুধীন : কেন করবো না?
মুকুল : কী করে করবো?
মানিক : কেন করবো না?
মুকুল : কেন করবো না?
অঞ্জলি : আমাদের লোক কোথায়?
সুধীন : এতো লোক আছে, লোক কোথায়?
অঞ্জলি : আমরা কী পারি?
মুকুল : কী পারি?
মানিক : কে বলে পারি না?
মুকুল : কে বলে?
সুধীন : এই তো চাই! কে বলে পারি না? বিচিত্রানুষ্ঠানে কী থাকে? গান, নাচ
অঞ্জলি : গান কে গাইবে?
সুধীন : কেন, মুকুল আছে—
মুকুল : আমি!

মানিক : নিশ্চয়ই। কেন নয়?

মুকুল : হ্যাঁ আমি।

সুধীন : অরুণা আছে।

অরুণা : আমি গাইতে পারবো না।

সুধীন : আচ্ছা থাক তাহলে, বীণা গাইবে।

অরুণা : (তাড়াতাড়ি) যদি না হলে একেবারেই না চলে, তবে না হয় গাইবো।

সুধীন : এই তো হয়ে গেলো। মানিক লিখে ফেলো। গান, একক—মুকুল, অরুণা, বীণা। কোরাস সবাই।

মুকুল : আমি নই।

মানিক : কে নয়?

মুকুল : না না কেউ না।

মানিক : কেউ না মানে?

মুকুল : মানে—সবাই।

সুধীন : কোরাস সবাই। আচ্ছা, নাচ, নাচ—ভারতী।

ভারতী : কোন্‌টা নাচবো? মণিপুরী না কথাকলি না ভরতনাট্যম না সাপুড়ে না—

সুধীন : পরে ভাবা যাবে। মানিক লিখছো?

মানিক : নাচ— ভারতী।

ভারতী : ঘুঙুর দরকার সালোয়ার দরকার ওড়না দরকার সাতনরি হার—

সুধীন : হবে হবে সব হবে। আবৃত্তি—

ভারতী : আলো—লাল চাই আসমানি চাই বেগুনি চাই সবুজ চাই—

সুধীন : হবে হবে, লাল নীল সাদা কালো সব হবে। আবৃত্তি—

শ্যামল : (উঠে) একথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শাজাহান / কালস্রোতে ভেসে যায়—

সুধীন : আবৃত্তি শ্যামলদা।

মানিক : আবৃত্তি শ্যামলদা।

মুকুল : আবৃত্তি বরং আমি একটা—

সুধীন : না তুমি গান।

মুকুল : কিন্তু গানের চেয়ে আবৃত্তি আমি—

মানিক : না তুমি গান।

মুকুল : হ্যাঁ আমি গান।

সুধীন : আর কী থাকে?

অঞ্জলি : কমিক থাকে!

মুকুল-শ্যামল পরিতোষ-প্রতীপ : (একসঙ্গে) কমিক আমি!

সুধীন : না। কমিক আমি।

মানিক : (লিখে) কমিক সুধীন।

মুকুল : কমিক সুধীন। কী যে হবে?

সুধীন : কী?

মুকুল : দারুণ হবে!

সুধীন : এই তো হয়ে গেলো।
অঞ্জলি : বা বা, ম্যাজিক? ম্যাজিক না হলে হয়?
সুধীন : ম্যাজিক কে জানে?
প্রতীপ : (লাফিয়ে উঠে) আমি জানি!
সবাই : (একসঙ্গে) তুমি!
প্রতীপ : আলবাত! (তাসের প্যাকেট নিয়ে) তুলে নাও, একটা করে বেছে নাও, যে কোনো একটা—

[সুধীন, অঞ্জলি, অরুণা নিলো।]

দেখে নাও, ভালো করে দেখে নাও। রাখো এখানে— রেখে দাও।

[প্রতীপের নির্দেশে সবাই প্যাকেটের ওপরে তাস রাখলো।]

আচ্ছা—মন্তর তন্তর বম্ ছুছুন্দার, সুন্দর বান্দর খাস-কিস্ কিন্ধার, মারকে গণ্ডার লুঠকে ভাণ্ডার—ছুঃ! মন্তর ছুঃ! মন্তর ছুঃ! মন্তর ছুঃ! দেখো এইবার—

[একটা করে তাস তুলে নিজে দেখে নিয়ে]

চিড়িতনের তিন। হরতনের টেক্কা, ইস্কাবনের দশ।

সুধীন : ব্যস্ ব্যস্। ম্যাজিক প্রতীপ।
অঞ্জলি : কিন্তু ও তো—
সুধীন : ওতেই হবে।
মুকুল : কী করে হবে? বা বা বা, ও তো—
মানিক : কে বলে হবে না?
মুকুল : কে বলে?
মানিক : (লিখে) ম্যাজিক প্রতীপ।
মুকুল : ম্যাজিক প্রতীপ। যদিও জানে না।
মানিক : কী বললে?
মুকুল : (পরিতোষকে) কী বললে?
পরিতোষ : আমি আবার কী বললাম?
মুকুল : (মানিককে) কিছু বলে নি তো?
সুধীন : আর কী?
অঞ্জলি : যন্ত্রসংগীত একটা না হলে—
সুধীন : হারমোনিয়াম মুকুল।
মুকুল : আমি? আমি হারমোনিয়ামের হা—
মানিক : (লিখে) হারমোনিয়াম মুকুল।
মুকুল : মুকুল।
সুধীন : হারমোনিয়াম অরুণা।
অরুণা : আমার প্র্যাকটিস নেই অনেকদিন—
সুধীন : বীণা পারো বাজাতে?
অরুণা : (তাড়াতাড়ি) তবে খাটলে হয়ে যাবে।
সুধীন : মানিক লেখো।

মানিক : হারমোনিয়াম অরুণা।
সুধীন : সত্য বেহালা।
মুকুল : সত্য রাঁচি গেছে।
সুধীন : তাই নাকি?
মানিক : না না আজ ফিরেছে, আমি জানি।
মুকুল : মানিক জানে। রাঁচি তো?
সুধীন : আর কে কী জানো?
অঞ্জলি : সুবীরের বাঁশি।
সুধীন : ঠিক।
সুবীর : বাঁশি ভেঙে গেছে।
সুধীন : কিনে নিলেই হবে।
মুকুল : পয়সা কে দেবে?
মানিক : (ধমকে) তুমি দেবে।
মুকুল : হ্যাঁ আমি দেবো। (বুঝে, চিৎকার করে) না!
সুধীন : পয়সা ক্লাব দেবে।
মুকুল : তাই বলো।
সুধীন : মানিক লিখছো?
মানিক : (লিখে) সুবীর— বাঁশি। পয়সা— ক্লাব।
মুকুল : হ্যাঁ— পয়সা ক্লাব।
সুধীন : আর কী আছে?
পরিতোষ : হাঁড়ি।
অঞ্জলি : হাঁড়ি?
পরিতোষ : হাঁড়ি খুব ভালো বাজাই আমি।
সুধীন : ঠিক আছে, হাঁড়ি হোক।
মুকুল : হাঁড়ি হবে?
মানিক : (লিখে) পরিতোষ হাঁড়ি।
মুকুল : পরিতোষ হাঁড়ি।
সুধীন : এই তো হয়ে গেলো প্রোগ্রাম।
পরিতোষ : আর একটা কমিকের দরকার হবে না?
শ্যামল . হ্যাঁ, তাহলে আমি—
মুকুল : একটা ছোট্ট আমার জানা আছে—
সুধীন : পরে দেখা যাবে।
মুকুল : পরে কেন? এখনই—

[মানিক তাকালো, মুকুল তাড়াতাড়ি আর সবাইকে]

পরে হবে, পরে হবে, এখন না।
অঞ্জলি : থিয়েটার একেবারেই হবে না?
সুধীন : থিয়েটার এর মধ্যে কী করে ঢোকাবো?

অঞ্জলি : একটা ছোটখাটো কিছু, এতোদিন করলাম—

শ্যামল : 'বিশ বছর আগে'-র শেষ দৃশ্য। আমি দীপক।

মানিক : আমি প্রদীপ।

শ্যামল : 'তুমি তন্বীকে— তন্বীকে তুমি হত্যা করেছো। তৈরি হও! আমি তোমাকে গুলি করবো!'

মানিক : (উঠে) 'ক্ষমা— দীপক— ক্ষমা!'

শ্যামল : গড়াম্!

[মানিক লুটিয়ে পড়লো। আবার উঠতে উঠতে—]

মানিক : পতন ও মৃত্যু।

সুধীন : হোক।

মুকুল : পতন ও মৃত্যু হবে?

সুধীন : হবে।

মুকুল : মানিকের?

মানিক : (রুখে) কেন, কী হয়েছে?

মুকুল : না না হোক। মানিকের পতন ও মৃত্যু হোক।

মানিক : (লিখে) বিশ বছর আগে— শেষ দৃশ্য। প্রতীপ— মানিক, দীপক— শ্যামলদা।

অঞ্জলি : আমরা মেয়েরা একটা দেবো।

অরুণা-বীণা-ভারতী : (একসঙ্গে) হ্যাঁ হ্যাঁ মেয়েরা একটা দেবো!

মুকুল : ভগবান!

অঞ্জলি : কী?

মুকুল : না না— ভগবতী!

অঞ্জলি : ভগবতী মানে?

মুকুল : ভগবতী মানে, ঐ— মা-ভগবতী আর কী? মানে—কিছু না। হঠাৎ মনে পড়লো, তাই—

সুধীন : মেয়েরা কী দেবে?

অঞ্জলি : ট্যাবলো।

অরুণা-বীণা-ভারতী : (একসঙ্গে) হ্যাঁ হ্যাঁ ট্যাবলো।

মুকুল : ট্যাবলেট?

সুধীন : ঠিক আছে।

ভারতী : সীন্ চাই পোশাক চাই মেক আপ চাই—

সুধীন : সব হবে। মানিক লেখো।

মানিক : (লিখে) মেয়েরা ট্যাবলো।

সুধীন : ব্যস, প্রোগ্রাম কমপ্লিট। কবে হবে?

অঞ্জলি : অন্তত সপ্তাতিনেক চাই তৈরি হতে।

সুধীন : বারো তারিখ রবিবার?

অঞ্জলি : হতে পারে।

সুধীন : মানিস, হল বুক করে ফেলো আজকেই। চলে যাও এখুনি।

মুকুল : হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলে যাও এক্ষুনি!

[মানিক চলে গেলো]

সুধীন : নাও, রিহার্সাল শুরু করে দাও।

মুকুল : (চেঁচিয়ে) কিন্তু এ হয় না! এরকম করে হয় না!

[মানিকের প্রবেশ]

নাও নাও রিহার্সাল শুরু করো!

মানিক : কোন্ হল্?

সুধীন : রবীন্দ্র সরোবর, যেখানে থিয়েটার করেছি আমরা।

মুকুল : (মানিককে) রবীন্দ্র সরোবর।

[মানিক প্রস্থানোদ্যত]

সুধীন : মুকুল বলছে— হয় না।

মানিক : (ফিরে) কে বলছে?

মুকুল : (অন্যদের) কে বলছে হয় না? (মানিককে) কেউ বলেনি।

মানিক : (সুধীনকে) আবার বললে আমাকে বোলো। আমি ফিরে এসে দেখছি।

মুকুল : (অন্যদের) এই কেউ বোলো না আর। মানিক ফিরে এসে দেখবে।

[মানিক চলে গেলো]

সুধীন : নাও শুরু করো। রেডি ওয়ান টু—

অঞ্জলি : কী শুরু করবো?

ভারতী : কী আবার? নাচ।

[নাচতে শুরু করলো]

শ্যামল : এ কথা জানিতে তুমি—

সুধীন : না না কোরাস গানটা আগে। রেডি ওয়ান—

অঞ্জলি : কোন্ গান?

সুধীন : অ্যাঁ? যে কোনো একটা ধরো না ভালো দেখে।

[সঙ্গে সঙ্গে এক একজন এক একটা গান গাইতে শুরু করলো।]

অঞ্জলি : সঙ্কোচের বিহ্বলতা...

অরুণা : এবার তোর মরাগাঙে...

বীণা : ধনধান্যপুষ্প ভরা...

শ্যামল : বাঁধ ভেঙে দাও...

প্রতীপ : চল্ চল্ চল্ রে চল্...

পরিতোষ : মুক্তির মন্দির সোপানতলে...

[মুকুল কানে হাত চাপা দিয়েছে]

সুধীন : (চেঁচিয়ে) আঃ, থামো! থামো!

[আকস্মিক নীরবতা]

সবাই একসঙ্গে গাইলে চলবে?

পরিতোষ : কোরাস তো সবাই একসঙ্গেই গায়?

সুধীন : হ্যাঁ গায়, কিন্তু সে একটা গান।

প্রতীপ : বাঃ, তুমিই তো বললে যে কোনো একটা করতে?

সুধীন : একটা গান ঠিক করো আগে সবাই মিলে, তারপর ধোরো।

[সবাই যে যার গানের প্রথম লাইন ভাষায় বলতে লাগলো।]

কী হচ্ছে কী ওটা?

পরিতোষ : কেন? সবাই মিলে ঠিক করছি?

সুধীন : তোমাদের দিয়ে কিস্যু হবে না। মুকুল বলো।

[মুকুলের কানে হাত, শুনতে পেলো না।]

অ্যাই মুকুল!

মুকুল : (চমকে, হাত নামিয়ে) অ্যাঁ? কী?

সুধীন : বলো।

মুকুল : কী বলবো?

সুধীন : কোরাস।

মুকুল : কোরাস।

সুধীন : আরে বলবে তো?

মুকুল : বললাম তো 'কোরাস'।

সুধীন : কোরাস কে বলতে বলেছে তোমাকে?

মুকুল : তুমি।

সুধীন : আমি?

মুকুল : তুমিই তো বললে— বলো 'কোরাস'।

সুধীন : আহা তা নয়—

মুকুল : তবে?

সুধীন : কী কোরাস বলো।

মুকুল : 'কী কোরাস'।

সুধীন : ধুত্তোরি! একটা কোরাস গান ঠিক করতে বলা হয়েছে তোমাকে!

মুকুল : (অল্পক্ষণ তাকিয়ে থেকে) কোরাস?

সুধীন : হ্যাঁ, কোরাস।

মুকুল : কোরাস— গান?

সুধীন : হ্যাঁ হ্যাঁ কোরাস গান!

মুকুল : কোরাস গান— ঠিক করবো?

সুধীন : আরে বাবা হ্যাঁ! কোরাস গান ঠিক করবে।

মুকুল : ও। (একটু থেমে) আমি?

সুধীন : না তো কে?

মুকুল : ও। (একটু থেমে) তা বেশ তো।

সুধীন : 'বেশ তো'— কী?

মুকুল : ঠিক করে দেবো এখন।

সুধীন : কবে? বলি কবে ঠিক করবে?

মুকুল : তা ধরো— আজ কত্তারিখ?

সুধীন : ওঃ ভগবান!
অঞ্জলি : বাজে কথা ছাড়ো মুকুল। এক্ষুনি ঠিক করো।
মুকুল : এক্ষুনি কী করে হবে? কোরাস বলে কথা, তার ওপর গান, ভাবতে হবে, ইয়ে করতে হবে—
সুধীন : ভাবাচ্ছি দাঁড়াও! মানিক আসুক একবার।
মুকুল : না না করছি করছি—
সুধীন : করো।
মুকুল : (চিৎকার করে গেয়ে) আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল, ভবের পদ্মপত্রে—
শ্যামল-প্রতীপ-পরিতোষ : (একসঙ্গে) হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো, এটাই হোক—
অঞ্জলি-অরুণা-বীণা : (একসঙ্গে) না না ওটা হবে না, কে লক্ষ্মীছাড়া?
সুধীন : আঃ!

[সবাই চুপ]

নতুন গান ঠিক করো মুকুল।
মুকুল : নতুন গান? (একটু ভেবে) সূর্যবন্দনা।
অঞ্জলি : সে আবার কী?
সুধীন : এটা আবার কোথায় পেলে?
মুকুল : আমি লিখেছি।
সুধীন : তা বেশ করেছো। সূর্যবন্দনা— খুব ভালো কোরাস হবে। ঐটাই লাগাও। রেডি ওয়ান টু—
মুকুল : কিন্তু স্কেল?
সুধীন : (অন্যদের) স্কেল?
পরিতোষ : (টেব্‌ল্ থেকে স্কেল নিয়ে) এই যে স্কেল।
সুধীন : (স্কেলটা মুকুলকে দিয়ে) এই যে।
মুকুল : আরে এ স্কেল না।
সুধীন : ওতেই হবে। রেডি ওয়ান—
মুকুল : গানের স্কেল এতে কী করে হবে?
সুধীন : ও। তবে না হয় মানিক এলে—
মুকুল : রেডি রেডি, ওয়ান টু থ্রি!

[সবাই চুপ।]

সুধীন : কী হোলো?
মুকুল : একজন কেউ লীড্ করবে তো?
সুধীন : তুমি করো না।
মুকুল : আমি গাইতেই পারি না তা লীড করবো কী?
সুধীন : আঃ মানিকটা যে কতো দেরি করবে ফিরতে—
মুকুল : রেডি রেডি! লাইন দাও! রেডি, ওয়ান টু থ্রী ফোর হঁ হঁ হঁ হঁ—

[সূর্যবন্দনা গানের সুর ভেঁজে লীড্ করলো। পর্দা পড়ে গেলো।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[একই ঘর, পেছনে বেণু গান প্র্যাকটিস করছে, পরিতোষ হাঁড়ি বাজাচ্ছে, অভি মাউথ অরগ্যান, ভারতী নাচছে ইত্যাদি। মাঝখানে একদিকে অঞ্জলি, অরুণা, বীণা ট্যাবলোর পোজ দিচ্ছে, আলোচনা করছে। অন্যদিকে সামনে প্রতীপ একটা প্রকাণ্ড ডালা বিশিষ্ট বাক্স তৈরি করছে। মুকুল এলো, এক এক করে সবাইকে নিরীক্ষণ করলো, বিভিন্ন মুখভঙ্গী সহকারে। অবশেষে এলো প্রতীপের কাছে।]

মুকুল : এটা কী হচ্ছে?
প্রতীপ : বাক্স। দেখে বুঝতে পারো না?
মুকুল : বাক্স কী হবে?
প্রতীপ : ম্যাজিক হবে।
মুকুল : কী ম্যাজিক?
প্রতীপ : হ্যাঁ, তাই বলে দিই আর কী?
মুকুল : কচু হবে।
প্রতীপ : কচু হবে মানে?
মুকুল : যেমন বাক্স হয়েছে তেমনি ম্যাজিক হবে।
প্রতীপ : কেন, বাক্সটার কী দোষ হয়েছে শুনি?
মুকুল : ও কি একটা বাক্স না কি?
প্রতীপ : কেন?
মুকুল : ডালা নেই কিচ্ছু নেই— বাক্স।
প্রতীপ : ডালা নেই? এটা কী তাহলে?

[ডালা খুলে দেখালো।]

মুকুল : ওটাকে ডালা বলে?
প্রতীপ : তবে কী বলে শুনি?
মুকুল : এখানে এতোগুলো পেরেক দেবার কী দরকার ছিল?
প্রতীপ : তুমি পেরেকের কী বোঝো?
মুকুল : আমি হলে এর আদ্দেকও দিতাম না।
প্রতীপ : দেখো, তুমি হলে কী করতে না করতে, তাতে আমার—
মুকুল : আমি হলে বাক্সটাকে এমন ত্যাড়াবাঁকা করতাম না।
প্রতীপ : কোথায়? কোথায় ত্যাড়াবাঁকা হয়েছে?
মুকুল : আমি হলে ডালাটাকে ডালার মতো করে বানাতাম।
প্রতীপ : কোনখানটা ডালার মতো নয়? কোনখানটা?
মুকুল : এমন ডালা বানাতাম, যা বন্ধ হয়।
প্রতীপ : কেন, এটা বন্ধ হয় না? এই তো! এই তো!
মুকুল : এমন ডালা বানাতাম, যা বন্ধ করলে ফাঁক দিয়ে হাতি গলে যায় না।

প্রতীপ : (চিৎকার করে) হাতি! একটা ইঁদুরও যদি—
মুকুল : হ্যাঃ!
প্রতীপ : একটা আরশুলাও যদি—
মুকুল : হ্যাঃ!
প্রতীপ : একটা পিঁপড়েও যদি—
মুকুল : হাতি। হাতি গলে যায়।
প্রতীপ : হাতি?
মুকুল : সপরিবারে।
প্রতীপ : সপরিবারে?
মুকুল : একান্নবর্তী পরিবার।
প্রতীপ : তুমি—তুমি নিজে ঢুকে দেখো না, বেরোতে পারো কি না?
মুকুল : আমি?
প্রতীপ : হ্যাঁ! তুমি!
মুকুল : একা?
প্রতীপ : হ্যাঁ হ্যাঁ, একাই বেরোও না?

[মুকুল বাক্সের মধ্যে এক পা রাখলো।]

মুকুল : আমি হলে ছিটকিনিটা আরো মজবুত দিতাম।

[প্রতীপ কথা বললো না। ডালা ধরে দাঁড়িয়ে রইলো হিংস্র প্রতীক্ষায়। মুকুল অন্য পা'টাও ভিতরে রাখলো।]

আমি হলে এমন জঘন্য কাঠ লাগাতাম না।

[প্রতীপ নিরুত্তর। মুকুল বাক্সের মধ্যে বসলো।]

আমি হলে বাক্সটার—

[আর শোনা গেলো না। প্রতীপ ডালা বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটেছে সশব্দে। দু'হাত ঝেড়ে আনন্দে কিঞ্চিৎ নৃত্য করবার তালে আছে— বাক্সশুদ্ধু মুকুল উঠে দাঁড়ালো। বাক্সটা নামিয়ে রাখলো ধীরে সুস্থে।]

আমি হলে বাক্সটার তলাটাও বানাতাম।

[মুকুল চলে গেলো। প্রতীপ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। গানের 'ককটেল' আবার সরব হোলো। শ্যামল সাজাহান আবৃত্তি করতে করতে ঢুকলো। সুধীন ছুটে এলো স্কেল হাতে।]

সুধীন : কী কী কদ্দুর হোলো? অঞ্জলি তোমার ট্যাবলো কদ্দুর?
অঞ্জলি : চারটে সীন হয়েছে। সখীসহ শকুন্তলার পুষ্পতরুতে বারিসিঞ্চন, মৃগয়াকালে দুষ্মন্তের আকস্মিক শকুন্তলাদর্শন, বিরহকাতরা শকুন্তলার—
সুধীন : হয়েছে হয়েছে, ওতেই হবে।
অঞ্জলি : ওতেই হবে মানে? এখনো কতো বাকি! দুর্বাসার অভিশাপ, তারপর—
সুধীন : আহা আমি বলছি— ঐটুকু বললেই হবে। অরুণা তুমি কোন্ গানটা গাইছো?
অরুণা : আমি? ঐ যে ঐটা--ঐ কী বলে—
সুধীন : হ্যাঁ হ্যাঁ ঐটাই বেশ হবে। তোমাদের সব রেডি তো। পরিতোষ হাঁড়ি এনেছো?

ভারতী তুমি—

ভারতী : কিচ্ছু পাইনি এখনো। মালা চাই বালা চাই মুকুট চাই—

শ্যামল : 'এক হাটে লয়ে বোঝা শূন্য করে দাও অন্য হাটে?'

সুধীন : হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই চাই বইকি। শ্যামলদা, বিসর্জনটা করছেন? বেশ বেশ।

শ্যামল : বিসর্জন কোথায়?

সুধীন : দেবতার গ্রাস? ওটাও ভালো। (প্রতীপের কাছে গেলো) প্রতীপ তুমি কী করছো ওটা?

প্রতীপ : (কাঁদো কাঁদো) আমার বাক্স—

সুধীন : বাক্স?

প্রতীপ : হ্যাঁ, ঐ মুকুলটা—

সুধীন : এটা কীরকম বাক্স হোলো? আমি হলে এর তলাটাও বানাতাম।

[সুধীন অন্যদিকে গেলো। প্রতীপ দু'হাতে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলো।]

বেণু তুমি কী দিচ্ছো?

বেণু : গান।

সুধীন : কী গান?

বেণু : (গেয়ে) রাম গেলা গুজারিয়া ভাইয়া গেলা দেশমে
মেরা লোটা হারল্ বা হো, রামা হো।

[প্রতীপ এর মধ্যে বাক্স নিয়ে চলে গেছে]

সুধীন : এটা কী? আধুনিক?

বেণু : আধুনিক কোথায়? এটা তো—

সুধীন : রাগপ্রধান? তা বেশ। রাগপ্রধান একটা দরকার ছিল।

[বেহালা হাতে সত্য এলো]

এই যে সত্য, বেহালা এনেছো? বাঃ কী বাজাবে?

সত্য : দেবুচোভ্স্কির থান্ডার সোনাটা ইন জি মেজর।

সুধীন : চমৎকার হবে। ঐ সঙ্গে 'জুতা হ্যায় জাপানি'-টাও দিও। ওটা খুব ভালো বাজাও তুমি। কী রে অভি? তোর হাতে ওটা কী?

অভি : মাউথ অরগ্যান।

সুধীন : তা হাতে কেন? মাউথে লাগা। কোরাসের সঙ্গেও বাজাস। হ্যাঁ কোরাসটা ভুলে যেও না কিন্তু। মুকুল কোথায়? মুকুল! ডাকো ডাকো, মুকুলকে ডাকো!

সবাই : মুকুল! মুকুল!

[মুকুল এলো]

মুকুল : কী হোলো, চেঁচাচ্ছো কেন?

সুধীন : তোমার কোরাসের কী হোলো। সূর্যবন্দনা?

মুকুল : ওদের পাচ্ছি কোথায়? সবাই ব্যস্ত।

সুধীন : আচ্ছা ঠিক আছে, ওদের শেষ হলেই ওটা করে নিও। নাও নাও, থেমো না, চালিয়ে যাও সবাই।

[সবাই চালিয়ে যেতে লাগলো। গোলমাল চরমে উঠলো। মুকুল কানে হাত চাপা

দিয়ে একপাশে বসে রইলো চোখ বুজে। সুধীন স্কেল হাতে ঘুরে ঘুরে পরিচালনা করতে লাগলো। মানিকের প্রবেশ।]

মানিক : হল্ হোলো না।

[কেউ শুনতে পেলো না। মানিক গলা চড়ালো।]

হল্ হোলো না! (আরও জোরে) হল্ হোলো না!

সুধীন : কে মানিক? এসে গেছো? গুড। তুমি আর শ্যামলদা 'বিশ বছর আগে'-টা করে ফেলো।

মানিক : কিন্তু এদিকে যে—

সুধীন : এদিকে একরকম দাঁড়িয়ে গেছে।

মানিক : কিন্তু—

সুধীন : দারুণ হবে। কিচ্ছু ভেবো না।

মানিক : (চিৎকার করে) কিন্তু হল পাওয়া যাবে না!

[হঠাৎ সবাই চুপ একসঙ্গে।]

সুধীন : পাওয়া যাবে না?

[মুকুল এতোক্ষণে কান থেকে আঙুল নামালো]

মুকুল : কী হয়েছে?

সুধীন : পাওয়া যাবে না।

মুকুল : কী পাওয়া যাবে না?

মানিক : (খিঁচিয়ে) তোমার মাথা।

মুকুল : (মাথায় হাত দিয়ে) কেন?

[মানিক দু'পা এগোলো মুকুলের দিকে। অঞ্জলি বাধা দিলো।]

অঞ্জলি : আ হাঃ!

সুধীন : তা বারো তারিখে না পাওয়া যায়, দু'দিন পরেই না হয়—

মানিক : বছরের শেষ পর্যন্ত বুক্‌ড্।

সুধীন : বলো কী?

মানিক : এক কালকের দিকটা খালি আছে। এক পার্টি ক্যানসেল করেছে ডেট।

সুধীন : কাল?

অঞ্জলি : কাল খালি থাকলে লাভ কী?

মুকুল : বলেছিলাম।

মানিক : কী বলেছিলে?

মুকুল : ঐ—বলছিলাম, কাল খালি থাকলে লাভ কী?

সুধীন : আছে লাভ! কালই করবো!

সবাই : (একসঙ্গে) কাল!

সুধীন : কেন নয়?

অঞ্জলি : কিন্তু কিছুই তো হোলো না এখনো?

সুধীন : চব্বিশ ঘণ্টা সময় আছে।

মুকুল : চব্বিশ ঘণ্টায় কী হয়?

মানিক : খাটলে কেন হবে না?

মুকুল : না না, মাথা খারাপ না কি?
[মানিক এগোলো, কিন্তু মুকুলও সড়ে গেলো, অন্যদের আড়ালে ঘুরতে ঘুরতে।]
না, তুমি বললে কী হবে? এতোগুলো জিনিস, চব্বিশ ঘণ্টায় কী হবে? আর চব্বিশ ঘণ্টাই বা কোথায়? খাওয়া আছে, চান করা আছে, দাঁত মাজা, দাড়ি কামানো—

ভারতী : হ্যাঁ, আলো আছে, সীন আছে, মেকআপ আছে—

মুকুল : একটা আজগুবি কথা বললেই তো হয় না? চব্বিশ ঘণ্টায়—

সুধীন : হবে! হবে! হবে!

মুকুল : কক্ষনো হবে না! হতে পারে না!
[সুধীন হঠাৎ একটা চেয়ারের উপর লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো।
মানিকও সেই সুযোগে মুকুলের গলা টিপে ধরলো।]

সুধীন : যদি সবাই আমরা একসঙ্গে জোর দিয়ে বলি, হবে—

শ্যামল : (আবৃত্তি করে) বলো বীর, চির উন্নত মম শির!

সুধীন : বলো তোমরা। হবে না?

সবাই : (একসঙ্গে) হবে।

মানিক : (মুকুলকে) কী? হবে না?

মুকুল : (সরু গলায়) হবে।

মানিক : (মুকুলকে ছেড়ে) আমি হল্ বুক্ করতে গেলাম।
[মানিকের প্রস্থান]

সুধীন : (নেমে এসে) নাও, শুরু করো সবাই—

মুকুল : (চিৎকার করে) কিন্তু তোমরা সবাই কি একেবারে খেপে—
[মানিকের প্রবেশ]
(গলা নেমে এলো) গেছো নাকি?

মানিক : (সুধীনকে) মুকুল কি আবার গোলমাল করছে?
[মুকুল চিৎকার করে গেয়ে উঠলো]
মনে থাকে যেন।
[মানিক চলে গেলো। গান ইত্যাদি চলতে লাগলো। মুকুল মানিকের প্রস্থান পথ লক্ষ করে গাইতে গাইতে সামনে একপাশে এসে বসলো। অঞ্জলি, অরুণা, বীণার প্রস্থান।]

মুকুল : (গেয়ে) খুব যে তড়পানি, ভাঙবো মাথা খানি / কেটে নেবো মোটা আঙুল! / যাও তো তেড়ে কেটে, নাও তো মেরে কেটে, / দাও তো ছিঁড়ে কেটে চুল!
[অজয় আর বিজয় ঢুকেছে। এদিক ওদিক দেখে মুকুলের কাছে এলো। মুকুল তার গানের দ্বিতীয় পংক্তিটা গাইলো। অজয়দের মানিকের পেছনে লেলিয়ে দেবার ভঙ্গিতে।]

অজয় : ওটা কী গান মুকুলদা?

মুকুল : খুব ভালো গান।

বিজয় : এটা গাইবেন বুঝি বিচিত্রানুষ্ঠানে?

মুকুল : নাঃ! এটা গাওয়া যাবে না বোধ হয়।
অজয় : কেন?
মুকুল : একটু অসুবিধে আছে। তোরা কী করছিস?
অজয় : আমাদের কিছু দিচ্ছে না।
বিজয় : সুধীনদা বলেছিলো দেবে, মানিকদা দিতে দিলো না।
মুকুল : বটে? আমি তোদের পার্ট দেবো, করবি?
অজয়-বিজয় : (একসঙ্গে) হ্যাঁ হ্যাঁ, কী পার্ট?
মুকুল : তোরা হল্-এ বসে থাকবি। যেই মানিক স্টেজে উঠবে, তোরা বু-উ-উ করে চেঁচাবি।
বিজয় : যদি টের পায়?
মুকুল : লুকিয়ে থাকবি, অন্ধকার তো? আমি বলে দেবো—জনগণ।
অজয় : জনগণ মানে?
মুকুল : জনগণের স্বতস্ফূর্ত বিক্ষোভ। অত্যাচারের বিরুদ্ধে।
বিজয় : ঠিক আছে ঠিক আছে—
অজয় : এই চল্ চল্—

[ওরা চলে গেলো, মুকুলও গানটা গাইতে গাইতে বেরিয়ে গেলো। প্রতীপ ছুটে এলো সুধীনের কাছে।]

প্রতীপ : এই সুধীন, এই!
সুধীন : কী?
প্রতীপ : আমি বারো তারিখে ম্যাজিক দেখাতে পারছি না, বারো তারিখে আমার—
সুধীন : আচ্ছা।
প্রতীপ : (হকচকিয়ে) আচ্ছা মানে?
সুধীন : বারো তারিখে তোমাকে ম্যাজিক দেখাতে হবে না।
প্রতীপ : দেখাতে হবে না?
সুধীন : না।
প্রতীপ : বা বা বা, আমি যে প্র্যাকটিস করলাম এতো করে?
সুধীন : তা তুমিই তো বলছো পারবে না।
প্রতীপ : না না তা কেন? বলছিলাম—অন্য কোনো দিন ঠিক করলে হয় না?
সুধীন : আচ্ছা।
প্রতীপ : আচ্ছা মানে?
সুধীন : অন্য দিন ঠিক করলাম।
প্রতীপ : করলে?
সুধীন : করলাম।
প্রতীপ : কবে?
সুধীন : কাল।
প্রতীপ : কাল?
সুধীন : হ্যাঁ, কাল। কী হয়েছে তাতে?

প্রতীপ : মানে এই—আগামীকাল?
সুধীন : না তো কি—গতকাল?
প্রতীপ : কাল হলে আমি জীবন্ত মানুষ করাত দিয়ে কাটতে পারবো না।
সুধীন : বাঁচা গেলো। মানে—বেঁচে গেলো।
প্রতীপ : কাটা মুণ্ডু সিগারেটও খাবে না কাল।
সুধীন : ভালোই। ক্যান্‌সার হবে না।
প্রতীপ : আচ্ছা, যদি শুধু পেটের মধ্যে তলোয়ার ঢোকাবার খেলাটা—
সুধীন : উঃ! তোমার কি অহিংস খেলা একটাও নেই?
প্রতীপ : থাকবে না কেন? হাতি অদৃশ্য করে দিতে পারি।
সুধীন : তাই দিও।
প্রতীপ : কিন্তু কালকের মধ্যে হাতি জোগাড় করবো কী করে?
সুধীন : বাইরে থেকে অদৃশ্য করে এনো, ঝামেলা থাকবে না।
প্রতীপ : বাঃ! তাহলে আর ম্যাজিক কী হোলো?
সুধীন : প্রতীপ, তুমি থামবে? আমার অনেক কাজ।
প্রতীপ : আচ্ছা তাহলে আমিই অদৃশ্য হবো না হয়—
সুধীন : খুব ভালো প্রস্তাব। এখনই হও না?
প্রতীপ : এখন কী করে হবো? সে অনেক তোড়জোড় লাগে।
সুধীন : বেশি তোড়জোড় লাগে না, দেখবে?
[প্রতীপের আগে ফেলে যাওয়া প্রকাণ্ড হাতুড়িটা তুলে তাড়া করলো]
প্রতীপ : আচ্ছা আচ্ছা, পরে কথা হবে—
[প্রতীপ অদৃশ্য হোলো। সুবীর এর মধ্যে ঢুকে এদিক ওদিক খুঁজছিলো]
সুবীর . এই যে! এতোক্ষণ ধরে সারাবিশ্ব খুঁজে বেড়াচ্ছি—
[সুধীনের হাত থেকে হাতুড়িটা কেড়ে নিয়ে চলে গেলো।
প্রতীপ সঙ্গে সঙ্গে গলা বাড়িয়ে—]
প্রতীপ : আচ্ছা, আমি অদৃশ্য না হয়ে যদি আর কাউকে—
[সুধীন একটা চেয়ার তুলে তাড়া করলো।]
আচ্ছা থাক, আমিই না হয়—
[দ্রুত প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[পর্দা বন্ধ। আড়াল থেকে বাদ্যযন্ত্র, গান, হাতুড়ি ইত্যাদির মিলিত ধ্বনি আসছে। সুধীন বেরিয়ে এলো।]

সুধীন : মুকুল কোথায় গেলো? মানিক! এই মানিক!
[মানিক বেরিয়ে এলো]

মুকুলকে দেখেছো?

মানিক : না তো?

সুধীন : ডাকো ডাকো, কোরাসটা এখনো হয়নি।

মানিক : (ডেকে) মুকুল!

সুধীন : (ডেকে) মুকুল!

মানিক : (আরো জোরে) মুকুল! মুকুল।

সুধীন : (আরো জোরে) মুকুল! মুকুল!

[দর্শকদের শেষ সারি থেকে মুকুল উঠলো।]

মুকুল : কে কী কেন? কোথায়? কী হয়েছে?

সুধীন : ওখানে কী করছো?

মুকুল : অ্যাঁ?

সুধীন : (আরো চেঁচিয়ে) ওখানে বসে কী করছো তুমি?

মুকুল : কী বলছো?

মানিক : ধ্যাত্তেরি! কালা হয়ে গেছো নাকি?

মুকুল : হ্যাঁ এই যে! আমি এখানে আছি।

সুধীন : সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কেন?

মুকুল : কী?

সুধীন : তুমি ওখানে কেন আছো?

মুকুল : হ্যাঁ, ভালো আছি। তুমি?

মানিক : ধুত্তোরি! তুমি ওখানে আছো কেন মরতে?

মুকুল : দাঁড়াও আসছি। শুনতে পাচ্ছি না এখান থেকে।

[মুকুল স্টেজের দিকে এগোলো]

মানিক : আসুক একবার।

[মুকুল স্টেজে উঠে ওদের কাছে এলো।]

মুকুল : কী বলছিলে?

সুধীন : (চেঁচিয়ে) বলছিলাম—তুমি কি কালা হয়ে গেছো?

মুকুল : (সুধীনের দিকে কান পেতে) কী হয়ে গেছি?

[সুধীন মুকুলের কান থেকে লম্বা এক তুলো বার করলো। তখন খেয়াল করে মুকুলও অন্য কান থেকে তুলো সরালো]

সুধীন : (আগের মতো চেঁচিয়ে) এটা কী হয়েছে?

মুকুল : (চমকে মাথা সরিয়ে) ওঃ! চেঁচাচ্ছো কেন? আমি কি কালা নাকি?

সুধীন : কালাই তো হয়েছিলে কানে তুলো গুঁজে।

মুকুল : কী করবো? যা গোলমাল—

মানিক : (চোখ পাকিয়ে) গোলমাল?

মুকুল : ঐ—রাস্তায়। গাড়ি ঘোড়া—

সুধীন : তোমার গান তৈরি হয়েছে?

মুকুল : আমার তো গান নয়, লীড্।

সুধীন : লীড্ তৈরি হয়েছে?
মুকুল : লীড্ হবে না।
মানিক : হবে না মানে?
মুকুল : রেডি ওয়ান-টু থ্রি ফোর—
[গেয়ে উঠলো।]
সুধীন : (মানিককে) তোমার স্টেজ কদ্দুর?
মানিক : দেখো না চেয়ে।
[দু'জনে ঘুরে দাঁড়ালো। পর্দা খুলে গেলো। ভিতরে আরেকটা পর্দা সামান্য তেরছা করে টাঙানো, তার দৈর্ঘ্য স্টেজের দৈর্ঘ্যের চেয়ে কিছু কম। ফলে একপাশে উইংস্, পর্দা সরাবার দড়ি ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে। সেই পর্দাটার বাইরে একদিকে বসে অরুণা গাইছে, পাশে পরিতোষ হাঁড়িসঙ্গত করছে। মানিক দড়ি টেনে ভিতরের পর্দা খুলে দিলো। দেখা গেলো বীণা শূন্যে চোখ মেলে বসে আছে, অঞ্জলি পাকা চুলের জটা আর দড়ি লাগিয়ে অভিশাপ দিচ্ছে তাকে। মানিক চলে গেলো।]
সুধীন : ওটা কী হচ্ছে?
অঞ্জলি : দুর্বাসার অভিশাপ।
[মুকুল এর মধ্যে পরিতোষের গায়ে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে]
সুধীন : এখনো শেষ হোলো না তোমাদের ট্যাব্লো?
অঞ্জলি : এই তো, হয়ে এলো। বীণা, হরিণ শিশু এসেছে?
বীণা : খুকু বলছে শিং লাগাতে পারবে না।
অঞ্জলি : পারবে না, বটে? চলো তো দেখি!
[অঞ্জলি ও বীণার প্রস্থান]
পরিতোষ : (মুকুলকে ঠেলা মেরে) ধ্যাত্তেরি!
[মুকুল চমকে জেগে উঠে গেয়ে উঠলো। তারপর আবার ঘুমোলো।]
(আবার ঠেলে) আরে ধ্যাৎ! ওরকম করলে বাজানো যায়?
মুকুল : উঁ?
[মুকুল হাঁড়িটা টেনে নিয়ে মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লো।]
পরিতোষ : আরে? (ঠেলা দিয়ে) অ্যাই!
[সুধীন বেরিয়ে গিয়েছিলো, এখন আবার এসেছে।]
সুধীন : কী হোলো? ও কী, মুকুল ঘুমোচ্ছে নাকি?
অরুণা : ঘুমোবে না? সারা রাত সবাই জেগে—
[প্রকাণ্ড হাই তুললো]
পরিতোষ: তাই বলে আমার হাঁড়ি মাথায় দিয়ে—
[বলতে বলতে হাই তুললো মস্ত]
সুধীন : একটা রাত জেগে তোমাদের লম্বা লম্বা হা—ই—
[বলতে বলতে তারও হাই উঠলো। তাড়াতাড়ি হাই চেপে—]
করে ফেলো, করে ফেলো, তাড়াতাড়ি করে ফেলো।
[অন্যদিকে গেলো]

পরিতোষ : (মুকুলকে ঠেলে) শুনছেন?

[মুকুল হঠাৎ দাঁত খিঁচিয়ে ঘ্যাক করে উঠলো।]

(ভয় পেয়ে) ও সুধীনদা!

[পরিতোষ ছুটে পালালো। অরুণাও উঠে পায়ে পায়ে সরে পড়লো। মুকুল নিশ্চিন্তে ঘুমোতে লাগলো। মনোরঞ্জনের প্রবেশ]

মনোরঞ্জন : সুধীনবাবুকে কোথায় পাবো বলতে পারেন?

সুধীন : আমিই সুধীন।

মনো : নমস্কার। আমার নাম মনোরঞ্জন মহলানবীশ।

সুধীন : নমস্কার।

মনো : আমার ছেলের নাম বিশ্বরঞ্জন মহলানবীশ।

সুধীন : তাই না কি?

মনো : হ্যাঁ।

সুধীন : ও—বেশ সুন্দর নাম।

মনো : ও আপনাদের ক্লাবের মেম্বার।

সুধীন : আমাদের ক্লাবের—? ও, বিশু?

মনো : না। বিশ্বরঞ্জন।

সুধীন : হ্যাঁ? হ্যাঁ, ওকেই আমরা বিশু বলি।

মনো : ভালো করেন না। বিশু বলে ডাকা ও পছন্দ করে না।

সুধীন : তাই নাকি? কই কখনো তো কিছু বলে নি?

মনো : বিশ্বরঞ্জন বেশি কথা বলে না।

সুধীন : ও।

মনো : বিশ্বরঞ্জনের অনেক গুণ আছে।

সুধীন : হ্যাঁ, তা আছে। ও আমাদের এখানে—

মনো : আপনাদের বিচিত্রানুষ্ঠানে ওকে কী কী করতে দিয়েছেন?

সুধীন : অ্যাঁ—ওকে, মানে—

মনো : গান গাইছে তো?

সুধীন : গান?

মনো : রবীন্দ্রসংগীত ও খুব ভালো গায়।

সুধীন : জানতাম না তো?

মনো : বাজাও আমারে বাজাও।

সুধীন : অ্যাঁ?

মনো : বাজাও আমারে বাজাও।

সুধীন : আপনাকে? না না কী বলছেন?

মনো : 'বাজাও আমারে বাজাও' গানটা ওকে আমি নিজে শিখিয়েছি।

সুধীন : ও! ও আচ্ছা! আপনি নিজে শিখিয়েছেন? বাঃ।

মনো : আরো একটা রবীন্দ্রসংগীত ও জানে।

সুধীন : বলেন কী?

মনো : হ্যাঁ, সেটা ওকে ওর জ্যাঠামশাই শিখিয়েছেন।
সুধীন : ও।
মনো : সুধীরঞ্জন মহলানবীশ। আমার দাদা।
সুধীন : দাদা? ও হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক। ওর জ্যাঠামশাই তো আপনার দাদাই হবেন!
মনো : তা ছাড়া ও গীটার বাজায়।
সুধীন : আপনার দাদা?
মনো : না। বিশ্বরঞ্জন। ওকে 'জনগণমন' বাজাতে দেবেন।
সুধীন : আচ্ছা।
মনো : 'ধনধান্যপুষ্প ভরা'-টাও অনেকখানি তুলেছে। ওটাও রাখতে পারেন। একটু প্র্যাকটিস করলে হয়ে যাবে।
সুধীন : আচ্ছা।
মনো : বিশ্বরঞ্জন আবৃত্তিও ভালো করে।
সুধীন : তাই নাকি? ওর তো অনেক গুণ?
মনো : আমি তো গোড়াতেই সে কথা বলেছি আপনাকে।
সুধীন : হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছেন বটে।
মনো : আমাদের বংশের সকলেরই এইরকম।
সুধীন : সে তো হবেই।
মনো : সকলেরই শিল্পী মন। আমরা মহলানবীশ বংশ চারুশিল্পের পূজারী।
সুধীন : খুব ভালো, খুব ভালো।
মনো : আমাদের বংশে কখনো কেউ এঞ্জিনীয়ার হয়নি।
সুধীন : হওয়া উচিতও না।

[বিশু ছুটে ঢুকলো। প্যান্ট গোটানো, স্যান্ডো গেঞ্জি—হাতে প্লায়ার্স, স্ক্রু-ড্রাইভার, ইলেকট্রিক তার, হাতুড়ি।]

বিশু : সুধীনদা, দেখুন তো মানিকদার কাণ্ড! গ্রীনরুমে ছ'টা লাইট পয়েন্ট টানতে বলেছে, এদিকে তার রেখেছে এইটুকু!
মনো : বিশ্বরঞ্জন!!
বিশু : বাব্‌বাব্‌ বাবা??
মনো : বিশ্বরঞ্জন, তুমি—তুমি—
বিশু : আমি আসছি—একটু—এক্ষুনি—

[ছুটে পালালো।]

সুধীন : ইয়ে, মানে—বিশু—বিশ্বরঞ্জন—
মনো : (গভীর বেদনায়) ছিঃ!

[মনোরঞ্জন চলে গেলো। শ্যামল এলো বই হাতে মুখস্থ করতে করতে। প্রতীপ ছুটে এলো।]

প্রতীপ : কাঠি আসেনি এখনো, কাঠি! দেখেছো কাণ্ড!
সুধীন: কাঠি? কাঠি কী হবে।
প্রতীপ : আরে ম্যাজিক ওয়ান্ড—যাদুকাঠি! যাদুকাঠি লাগবে না!

সুধীন : ও, এই মানিক! মানিক!

[মানিকের প্রবেশ]

মানিক : কী?

প্রতীপ : কাঠি কই? পই পই করে যে বলে দিলাম!

মানিক : সব ব্যবস্থা আছে, কিচ্ছু ভেবো না।

প্রতীপ : কোথায় আছে, আমি দেখতে পাচ্ছি না!

মানিক : (খিঁচিয়ে) আরে সময় হলেই দেখতে পাবে!

প্রতীপ : কাঠি যদি ঠিক সময়ে না আসে তো ম্যাজিক হবে না বলে দিলাম।

মানিক : বাঁচা যাবে।

[প্রতীপ মানিকের দিকে কটমট করে তাকিয়ে সুধীনের দিকে ফিরলো।]

প্রতীপ : কাঠি না পেলে কিন্তু ম্যাজিকের ভয়ানক অসুবিধে হবে।

[প্রতীপ চলে গেলো। শ্যামল এলো আবৃত্তি করতে করতে]

শ্যামল : জ্যোৎস্না রাতে নিভৃত মন্দিরে/যে নামে প্রেয়সীরে—
উঁহু, প্রেয়সীরে/যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে—

মানিক : তোমার সঙ্গে চুনীবাবুর আলাপ হয়েছে?

সুধীন : কে চুনীবাবু?

মানিক : কী আশ্চর্য! এখানে কে চুনীবাবু? দাঁড়াও ডেকে আনি।

[চলে গেলো।]

শ্যামল : রেখে গেলে এইখানে/অনন্তের কানে—

সুধীন : শ্যামলদা, চুনীবাবু কে জানেন?

শ্যামল : চুনীবাবু? চুনীবাবু চুনীবাবু—ও, চুনীবাবু! উচ্চাঙ্গ সংগীত। বেনারস। হাফিজ খাঁ ঘরানা। রেখে গেলে এইখানে—

[শ্যামল চলে গেলো, মানিক এলো চুনীবাবুকে নিয়ে।]

মানিক : এই যে সুধীন—চুনীবাবু। তুমি কথাবার্তা বলে নাও, আমার অনেক কাজ।

[চলে গেলো]

চুনী : নমস্কার।

সুধীন : নমস্কার নমস্কার। আপনি কী গাইবেন আজ?

চুনী : আজ্ঞে?

সুধীন : আপনি তো ঐ—উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, না?

চুনী : আজ্ঞে না, লাইট।

সুধীন : লাইট? ও লঘুসঙ্গীত? তা বেশ। তবে বেশি হালকা করে ফেলবেন না যেন।

চুনী : না না, আমি লাইট দেবো।

সুধীন : হ্যাঁ, তা দিন। তবে লাইটেরও তো কম বেশি আছে? আমি বলছি—

চুনী : না না, সে লাইট না—

সুধীন : অ্যাই! আমিও ঐ কথাই বলছি। বেশি লাইট না হয়ে যায়।

চুনী : আজ্ঞে সে কথা নয়, মানে আমি অন্য লাইট, যাকে বলে—

[ভবেশ এলো]

ভবেশ : অ সুধীন। তোমাগো থিয়াটারে আমারে এউগ্গা পাট্ দিবা না?
সুধীন : থিয়েটার নয় ভবেশদা। এবার আমাদের বিচিত্রানুষ্ঠান।
ভবেশ : কী ঠান?
সুধীন : বিচিত্রানুষ্ঠান।
ভবেশ : বিসিত্রানুষ্ঠান? ল্যাখসে কেডা?
সুধীন : লিখবে কে আবার? আমরা করছি।
ভবেশ : আরে হেয়া তো বোঝলাম, তোমরা করো। আমি জিগাই—নাইট্যকার কেডা?
সুধীন : এ নাটকই না, তার নাট্যকার।
ভবেশ : নাটকই না, তবে এহানে করো কী?
সুধীন : বললাম তো—বিচিত্রানুষ্ঠান।
ভবেশ : আবার একই কথা কও! পাট্ দিবার ইস্সা নাই, কইয়া দিলেই তো পারো?
সুধীন : পার্ট না থাকলে দেবো কোত্থেকে?
ভবেশ : না দিবা না দিবা। তবে কইয়া দিলাম—এমন কার্ভালো সারা জিলায় কেউ আছিলো না। হ, হাচা কথা কই।
চুনী : (হঠাৎ) আলো, আলো!
সুধীন : অ্যাঁ?
ভবেশ : কী কন?
চুনী : লাইট মানে আলো।
ভবেশ : শিখাইবেন না, বোঝলেন? শিখাইবেন না। ইংরাজিতে ছেকেন্ হই নাই কোনোদিন, হ, হাচা কথা। জিগাইয়া দ্যাখবেন তুলসী মাষ্টররে। লাইট মানে আলো—শিখাইতে আইছেন আমারে! হঃ!

[ভবেশ রেগে চলে গেলো।]

চুনী : আমি বলছিলাম—আমি আলো।
সুধীন : সে কী? মানিক যে বললো আপনি চুনী বাবু?
চুনী : আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার নাম চুনীলাল দত্ত। আমি আলো করি।
সুধীন : আলো করেন? কী আলো করেন? সভা?
চুনী : না না, আলো দিই—
সুধীন : আলো দেন?
চুনী : লাইট! লাইট করি। লাইট দিই! আলো—মানে লাইট—

[মানিক ছুটে এলো]

মানিক : কথা হয়ে গেছে তো? আসুন চুনীবাবু, এই দিকে—

[চুনী বিহ্বলভাবে এগোলো]

সুধীন : ইয়ে, মানিক, শোনো একটু—

[মানিক ফিরে এলো]

মানিক : কী?
সুধীন : ও ভদ্রলোককে নিয়ে ভালো করো নি।
মানিক : কেন?

সুধীন : মাথাটা একটু—ইয়ে আছে।
মানিক : কী যে বলো? দারুণ আলো করে।
সুধীন : আলো—করে?
মানিক : আলো দেয়। দারুণ। চলুন চুনীবাবু।

[মানিক চুনীকে নিয়ে চলে গেলো]

সুধীন : কী যে সব পাগলের পাল্লায় পড়েছি!
শ্যামল : (হেঁকে) আজ তাই/চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।

[শ্যামল সালঙ্কারে সুধীনকে নমস্কার জানালো]

সুধীন : আপনার বিশ বছর কদ্দুর?
শ্যামল : আড়াইবার রিহার্সাল হয়েছে।
সুধীন : আড়াইবার?
শ্যামল : একবার প্রদীপ অর্ধেকটা করতেই সুবীর ওকে ডেকে নিয়ে গেলো সেটের কাজে। পুরো মরবার ফুরসত হোলো না।
সুধীন : ফুরসত হোলো না? বলি স্টেজেও কি অর্ধেক মরবে?
শ্যামল : ওকে পাচ্ছি না যে? ভয়ানক ব্যস্ত। কী করবো?
সুধীন : পাচ্ছেন না—আপনি মরুন তবে!
শ্যামল : আমি যে দীপক, কী করে মরবো?
সুধীন : ওসব জানি না। যার ফুরসত আছে সে মরবে।

[মানিকের প্রবেশ]

মানিক : এই যে শ্যামলদা! আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি তখন থেকে। নিন, গুলি করুন।
সুধীন : (খিঁচিয়ে) গুলি করুন! বলি সেটের কী হবে? লাইটের কী হবে?
মানিক : লাইট চুনীবাবু দেখছেন—
সুধীন : আরে বাবা লাইট মিউজিক নয়! আলো আলো—লাইট!
মানিক : হ্যাঁ সেই তো—
সুধীন : যাও যাও, দেখো ওগুলো—
মানিক : কিন্তু একবার না মরলে—
সুধীন : ও হয়ে গেছে, ভাবতে হবে না। শ্যামলদা মরবেন। পিস্তল কই?
মানিক : সুবীর তো আনবে বলেছিলো—
সুধীন : সব—বলেছিলো! দেখো দেখো দৌড়ে।

[মানিক চলে গেলো]

শ্যামল : আরে কী মুশকিল! এই মানিক! তুমি না মরলে কী করে হবে?
সুধীন : কেন হবে না?
শ্যামল : আরে দুর! এরকম পাঁচ মিনিটের নোটিসে মরা যায় নাকি।
সুধীন : না, তা যাবে কেন? হাসপাতালে তিনমাস না ঘষটালে মরে সুখ হয় না, না?

[এর মধ্যে পরিতোষ আর সুবীর একটা বড়ো গাছওয়ালা টব ধরাধরি করে এনেছে, পেছনে অঞ্জলি আর অরুণা। অঞ্জলির নির্দেশে টবটাকে পেছনদিকে বসানো হয়েছে। শ্যামল বেরিয়ে গেলো।]

অঞ্জলি : এই হোলো কণ্বমুনির আশ্রম।
সুধীন : হোলো তোমাদের?
অঞ্জলি : হবে কী? শকুন্তলাই কাৎ।
সুধীন : কাৎ মানে?
অঞ্জলি : ভীষণ মাথা ধরেছে।
সুবীর : ধরবে না? সারারাত জেগে—

[সুবীর চলে গেলো]

সুধীন : কী যে করবে তোমরা সব!
অঞ্জলি : তুমি একটু শকুন্তলার প্রক্সি দাও না?
সুধীন : আমি?
অঞ্জলি : হ্যাঁ। বীণা তো শুয়ে আছে—
সুধীন : হ্যাঁ, আমি তো বসে আছি কি না? এই সুবীর! সুবীর!

[দ্রুত প্রস্থান]

অঞ্জলি : (পরিতোষকে) তবে তুমি দাও।
পরিতোষ : আমি?
অঞ্জলি : হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি!
পরিতোষ : শকুন্তলা?
অঞ্জলি : হ্যাঁ শকুন্তলা!
পরিতোষ : দুষ্মন্ত হলে হয় না?
অঞ্জলি : না হয় না। এসো। এখানে দাঁড়াও। ওদিকে তাকাও। উদাস চোখ করো। প্রিয়ম্বদা এখানে।

[পরিতোষের চোখ পড়লো হাঁড়ির দিকে]

পরিতোষ : আমার হাঁড়ি!

[শকুন্তলার পোজ ছেড়ে দৌড়ে মুকুলের মাথার নিচ থেকে হাঁড়ি টেনে নিলো। মুকুল চমকে গোয়ে উঠে আবার ঘুমিয়ে পড়লো]

অঞ্জলি : আঃ! কী হচ্ছে? এদিকে এসো। ষষ্ঠ দৃশ্য—পতিগৃহে যাত্রা।
পরিতোষ : কার পতি?
অঞ্জলি : তোমার, আবার কার? হাঁড়িটা রাখো।
পরিতোষ : না, ভেঙ্গে যাবে।
অঞ্জলি : আচ্ছা নাও। এই দিকে পা বাড়াও। অনসূয়া—এই। প্রিয়ম্বদা এইখানে। চোখে আঁচল দাও শকুন্তলা।
পরিতোষ : আঁচল কোথায় পাবো?
অঞ্জলি : রুমাল দাও।

[হাঁড়ি হাতে রুমাল চোখে পরিতোষ যথাসম্ভব শকুন্তলার পতিগৃহে যাবার ভঙ্গী দেখালো। শ্যামলের প্রবেশ। মানিক উল্টোদিক দিয়ে ঢুকলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।]

শ্যামল : ভুলি নাই ভুলি নাই ভুলি নাই প্রিয়া।
মানিক : ওঃ, খাটতে খাটতে জান বেরিয়ে গেলো।

শ্যামল : মিথ্যা কথা!

মানিক : (চটে) মিথ্যে কথা? বটে?

শ্যামল : কে বলে রে ভোলো নাই? কে বলে রে খোলো নাই স্মৃতির পিঞ্জর দ্বার?

অঞ্জলি : আঃ শ্যামলদা, আশ্রম থেকে বেরোন।

শ্যামল : আশ্রম? কিসের আশ্রম?

অঞ্জলি : কণ্বমুনির আশ্রম। চোখে দেখতেও পান না?

শ্যামল : ওহো। (গাছটা দেখিয়ে) কণ্বমুনি, দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে! অতীতের চিরঅস্ত অন্ধকার—

[প্রস্থান। বীণা এলো ধীর পদে।]

অঞ্জলি : এই যে শকুন্তলা এসে গেছে, বাঁচা গেছে। (পরিতোষকে) বেরোও, বেরোও ওখান থেকে হাঁড়ি নিয়ে!

পরিতোষ : হ্যাঁ এখন বেরোও। এতোক্ষণ খেটে দিলাম কিনা?

[কিন্তু বীণা দর্শকদের দিকে তাকিয়ে একছুটে ভিতরের পর্দার উইংসের ওপাশে চলে গেছে। গলা বাড়িয়ে এদের ডাকছে চাপা গলায়।]

অঞ্জলি : আবার কী হোলো? নাঃ, পারা যায় না! অ্যাঁ? কী হয়েছে কী?

[সুধীনের প্রবেশ।]

সুধীন : কী, তোমাদের ট্যাবলো কি এখনো তৈরি হেলো না? (বীণাকে দেখে) কী, কী হয়েছে?

বীণা : (চাপাস্বরে) চলে এসো!

পরিতোষ : কেন?

বীণা : চলে এসো! দর্শক!

সুধীন : দর্শক? কী দর্শক?

বীণা : পর্দা টেনে দাও। দর্শকরা এসে গেছে, দেখতে পাচ্ছো না?

সুধীন : অ্যাঁ?

[দর্শকদের দেখলো, ঘড়ি দেখলো।]

ছ'টা বেজে গেছে! সর্বনাশ! পর্দা! পর্দা! মানিক। সুবীর!

[দর্শকদের দিকে চেয়ে দুর্বল হেসে একটা নমস্কারের ভঙ্গী করলো।]

পর্দা!—এই!

[পেছনে পরিতোষ আর অঞ্জলি জিনিসপত্র সরাবার চেষ্টা করছে। অরুণা পালিয়েছে। মানিক আর সুবীর ছুটে এসে পর্দার দড়ির জট ছাড়াচ্ছে। শ্যামল ঢুকলো।]

শ্যামল : চিহ্ন তব পড়ে আছে—

[দর্শকদের দেখে চূড়ান্ত ঘাবড়ে, তাদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে—]

তুতুখুমি হেথা নাই!

[দ্রুত প্রস্থান। হুড়হুড় করে ভিতরের পর্দা বন্ধ হয়ে গেলো। এখন ভিতরের উইংসের বাইরে মানিক আর সুবীরকে দেখা যাচ্ছে, আর অন্যদিকে পর্দার বাইরে নিদ্রিত মুকুল। ভিতর থেকে চাপা কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে লাগলো।]

অঞ্জলি : আশ্রমের বাকি গাছগুলো কোথায়?

সুধীন : আরে ধ্যাৎ! এখন আশ্রম কী? প্রোগ্রামটা কার কাছে?

অঞ্জলি : মানিকের কাছে।

বীণা : আঃ আস্তে!

সুধীন : মানিক, প্রোগ্রামটা কই?

মানিক : (পকেট হাঁটকে) খুঁজে পাচ্ছি না।

সুধীন : সর্বনাশ!

মানিক : কিছু হবে না। প্রথমে কোরাস।

বীণা : তারপর নাচ।

অরুণা : না, গান।

বীণা : না না নাচ!

সুধীন : আঃ চেঁচিও না, দর্শকরা এসে গেছে! মুকুল কোথায় মুকুল?

সবাই: মুকুল! মুকুল!

পরিতোষ : মুকুলদা বাইরে ঘুমোচ্ছে।

[মানিক আর সুবীর ভিতরের স্টেজে ঢুকে ভিতরের পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এলো। দু'জনে মুকুলকে চ্যাংদোলা করে তুললো। মুকুল জেগে উঠে চ্যাংদোলা অবস্থাতেই গেয়ে উঠলো। হঠাৎ ভিতরে একটা টেবিল উলটে পড়ার আওয়াজ আর দু'একটা চিৎকার। মানিক-সুবীর মুকুলকে ফেলে ভিতরে ছুটলো। মুকুল উঠে হঠাৎ সামনে দর্শকদের দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। চোখ রগড়ে ভালো করে দেখলো। তারপর পোজ মেরে নমস্কার করে গান ধরলো। হঠাৎ পর্দার ফাঁক থেকে দু'টো শক্ত হাত বেরিয়ে ঘাড় ধরে তাকে ভিতরে নিয়ে গেলো। গানটা আচমকা বন্ধ হয়ে গেলো। পর্দার আড়াল থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে লাগলো।]

সুধীন : শুরু করে দাও শিগ্গির! এই অঞ্জলিদি!

বীণা : আস্তে! শোনা যাবে যে!

সুধীন : না না, আস্তেই তো বলছি। অঞ্জলিদি!

অঞ্জলি : কী?

সুধীন : ঘোষণাগুলো যে করবো, প্রোগ্রাম তো নেই!

অঞ্জলি : আমার মনে আছে। তুমি যেখানে ঠেকবে, আমি বলে দেবো।

সুধীন : আচ্ছা। সুবীর, পার্দায় রেডী থাকো। আমি অ্যানাউন্স করছি। যেই ভিতরে আসবো, পর্দা টানবে।

[সুবীর ভিতরের উইংস দিয়ে বেরিয়ে দড়ির কাছে দাঁড়ালো]

সুধীন : ঘণ্টা দাও। এই!

[ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়লো। সুধীন বেরিয়ে এলো]

নমস্কার। শতাব্দীর এই বিচিত্রানুষ্ঠানে—

[পর্দার ভিতর থেকে একটা হাত বেরিয়ে সুধীনের কাঁধে টোকা দিলো। সুধীন বিরক্ত হয়ে হাতটা ঝেড়ে ফেললো।]

শতাব্দীর এই বিচিত্রানুষ্ঠানে—

[এবার হাতটা সুধীনের জামার হাতা ধরে টানাটানি শুরু করলো। সুধীন জামা ছাড়াবার আর ঘোষণা করবার চেষ্টা একসঙ্গে করতে লাগলো।]

বিচিত্র এই শতানুষ্ঠানে—মানে শতকের বিচিত্র—আঃ!

[এবার মানিকের মুখ বেরিয়ে এলো]

মানিক : (চাপাস্বরে) মুকুল ফের পালিয়েছে।

সুধীন : (চাপাস্বরে) পালিয়েছে—ধরে নিয়ে এসো।

[মানিকের মুখ ঢুকে গেলো]

আপনাদের অনুষ্ঠানের এই বিচিত্র শতাব্দীর—না না, আমাদের—আমাদের শতাব্দীর এই বিচিত্র আহ্বানে আপনাদের সাদর অনুষ্ঠান জানাচ্ছি।

[মানিকের মুখ বেরোলো]

মানিক : পাচ্ছি না।

সুধীন : (মুখটা ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে) আপনারা এর আগে আমাদের অভিনয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আমাদের উৎসাহ জানিয়েছেন।

[অন্তরালে প্রচুর চাপা কণ্ঠে 'মুকুল', 'মুকুল' ডাক চলছে]

এবার বিচিত্রানুষ্ঠানের এই নূতন মুকুল—ইয়ে, নূতন আয়োজনে আশা করি মুকুল—আশা করি আপনারা আগের মতোই মুকুল—আগের মতোই মুকুল—আগের মতোই—ইয়ে—নমস্কার।

[সুধীন তাড়াতাড়ি ঢুকে গেলো। এবং ঢোকামাত্রই সুবীর কর্তব্যমতো দড়িতে টান দিলো, পর্দা খুলে গেলো। ভিতরে চরম বিশৃঙ্খলা, সুবীর নিশ্চিন্তে পর্দার দড়ি বাঁধছে।]

কী আশ্চর্য! এতোগুলো লোক তোমরা মুকুলকে এখনো খুঁজে বার—

বীণা : এই!

সুধীন : কী?

বীণা : পর্দা!

অঞ্জলি-পরিতোষ-অরুণা-শ্যামল : (একসঙ্গে) পর্দা! পর্দা!

সুধীন : পর্দা কী? (ফিরে চমকে) এই পর্দা! সুবীর! (অন্যদের) মুকুল, শিগ্গির!

[সুবীর 'মুকুল' বলে ডাকতে ডাকতে ছুটলো।]

এই তুমি না! তুমি পর্দা!

অঞ্জলি : (চাপাস্বরে) চুপ! শুরু করে দাও!

সুধীন : কোরাস, লাইন।

[সবাই কোনোমতে লাইন দিলো। নমস্কার করলো। কিন্তু কেউ শুরু করছে না। আবার নমস্কার। আবার চাপাস্বর। সুধীন অঞ্জলিকে, অঞ্জলি অরুণাকে, অরুণা পরিতোষকে ধরতে বলছে, কিন্তু কেউ ধরছে না। ফলে আবার নমস্কার। অগত্যা সুধীন এগিয়ে এলো।]

নমস্কার। শতাব্দীর এই বিচিত্রানুষ্ঠানের প্রথম অনুষ্ঠান—সমবেত সংগীত। অর্থাৎ যাকে বলে কোরাস—এ ইয়ে—সূর্যবন্দনা। অর্থাৎ—সূর্যের বন্দনা। মানে সূর্যকে বন্দনা করে যে সংগীত—যে সংগীত—

[হঠাৎ মুকুল এসে লাইনে ঢুকে লীড করলো, সকলে একসঙ্গে গাইলো। সুধীনও লাইনে ঢুকে গেলো।]

কোরাস : (গান)

এই দুনিয়ায় রোজ রাতে
কালো আন্ধার ফাঁদ পাতে
(আর) সূয্যি মামার কৃপাতে
অন্ধকার যায় নিপাতে
(ও) সূয্যিমামার ভাগ্নের দল
রাত্তির জেগো না।
তাইরে নাইরে নাইরে না রে
তাইরে নাইরে নাইরে না।
সন্ধের পরে আন্ধার নামে
থাকবে ঘরে বাইরে না।
(ঐ) শেয়াল এবং প্যাঁচারা
রাত্তির জাগে ব্যাচারা
(ও) সূয্যিমামার ভাগ্নের দল
তোমরা জেগো না।

[গান শেষ হোলো। কিন্তু পর্দা পড়ে না। সুধীন তন্ময় হয়ে গান শুনছে।]

সুধীন : (চাপাগলায় পাশে অঞ্জলিকে) পর্দা!

অঞ্জলি : (পাশে পরিতোষকে) পর্দা!

পরিতোষ : (শ্যামলকে) পর্দা!

শ্যামল : (মানিককে) পর্দা!

মানিক : এই সুবীর, পর্দা!

[সুবীর চমকে দড়ি টানলো। পর্দা বন্ধ হোলো।]

মানিক : পর্দা টানছিলে না কেন?

সুবীর : বাঃ, কখন বন্ধ হবে আমাকে বলা হয়েছে?

[পর্দার আড়াল থেকে কণ্ঠস্বর]

অঞ্জলি : আঃ, চুপ! এবার নাচ।

বীণা : না না, এখন অরুণার গান।

সুধীন : আঃ! রেডি, স্টেজ ছাড়ো। পর্দা! এই সুবীর!

[সুবীর দড়ি টানলো, পর্দা সরলো। দু'একজন ছিটকে ছাটকে সরছে। অঞ্জলি মাঝখানে দাঁড়িয়ে।]

অঞ্জলি : আমাদের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান—শ্রীমতী অরুণা দেবীর গান।

[অঞ্জলি চলে গেলো। উল্টোদিক থেকে সুধীন ঢুকলো।]

সুধীন : এবার আপনাদের আবৃত্তি করে শোনাবেন—

[পরিতোষ হাঁড়ি নিয়ে ঢুকে গেছে, পেছনে অরুণা]

—শ্রীমতী অরুণা দেবী।

অরুণা : আবৃত্তি?

সুধীন : মানে—গান। সংগীত। এঁর সঙ্গে হাঁড়ি সঙ্গৎ করবেন শ্রীমান পরিতোষ।

[অরুণা গান ধরলো। হঠাৎ এক দর্শক উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো।]

দর্শক : ওরকম না! ওরকম না!

[অরুণা চমকে থেমে গেলো]

ওখানটা ওরকম সুর নয়!

[সুধীন ঢুকেছে]

সুধীন : ও মশাই, চুপ করুন!

[দর্শক ভদ্রলোক ক্ষেপে গেলো, স্টেজের দিকে এগিয়ে এলো]

দর্শক : চুপ করবো? কেন? চুপ করবো কেন? ভুলভাল সুরে গাইলেই হোলো? সুরের বিশুদ্ধতা বলে কিছু নেই?

[বলতে বলতে উঠে পড়েছে স্টেজে, তেড়ে গেছে অরুণার কাছে। অরুণা উঠে পড়েছে আগেই।]

কে আপনাকে ঐ সুর শিখিয়েছে? কে শিখিয়েছে নাম বলুন তার।

[সুধীন আর পরিতোষ দর্শককে টেনে আনবার চেষ্টা করছে, পারছে না।]

বলুন! কী নাম তার? কোথায় থাকে? ঠিকানা কী? তাকে একবার দেখে নেবো আমি—

[অরুণা পালিয়ে বাঁচলো। মানিক ছুটে এসেছে। ওরা তিনজন দর্শক ভদ্রলোককে উইংসের বাইরে নিয়ে গেলো।]

যা ইচ্ছে তাই সুরে গাইলেই হোলো? সুর বলে কিছু থাকবে না? কী পেয়েছেন কী?—

[দর্শককে মূল মঞ্চের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।]

সুধীন : (নেপথ্যে) পর্দা! পর্দা!

[সুবীর চেষ্টা করছে, কিন্তু পর্দা পড়ছে না।]

সুবীর : আটকে গেছে!

সুধীন : (নেপথ্যে) সর্বনাশ! শ্যামলদা কোথায়? তার আবৃত্তি দিয়ে দিচ্ছি।

[ছুটে স্টেজে ঢুকে পড়লো।]

এবার আপনাদের 'দেবতার গ্রাস' আবৃত্তি করে শোনাবেন—শ্রীশ্যামল চক্রবর্তী।

[পোজ দিয়ে যেদিক দিয়ে ঢুকেছিলো সেইদিকে আহ্বান জানালো। কেউ এলো না।]

(গলা চড়িয়ে) শ্যামল চক্রবর্তী!

[শ্যামল ঢুকলো উলটো দিক থেকে। নমস্কারাদি সারলো। পোজ নিয়ে দাঁড়ালো। সুধীন দেখেনি।]

(চিৎকার করে) শ্যামল চক্রবর্তী!

শ্যামল : (ভীম নির্ঘোষে) শাজাহান!

[সুধীন চমকে ফিরে তাকালো। শ্যামল আবৃত্তি শুরু করলো হাতের এক প্রসারিত ভঙ্গীতে।]

এ কথা জানিতে তুমি—
[চড়টা পড়লো সুধীনের গালে। শ্যামলকে থেমে যেতে হোলো। সুধীন অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে বেরিয়ে গেলো। শ্যামল আবার শুরু করলো।]
শাজাহান! একথা জানিতে তুমি ভারত ঈশ্বর শাজাহান/কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান,/শুধু তব অন্তর বেদনা/চিরন্তন হয়ে থাক সম্রাটের ছিল এ সাধনা।/রাজশক্তি বজ্র সুকঠিন/সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন,/কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস/নিত্যউচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করুক আকাশ/এই তব মনে ছিল আশ।/হীরামুক্তামানিক্যের ঘটা/যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা/যায় যদি, লুপ্ত হয়ে যাক,/শুধু থাক—

[সেই দর্শক ছুটে এলো স্টেজে]

দর্শক : থামুন থামুন। ঐরকম করে আবৃত্তি করে? রবীন্দ্রনাথের উপর কোনো মায়াদয়া নেই?

[মানিক আর সুধীন এসে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে]

চেঁচালেই আবৃত্তি হয়ে গেলো? অ্যাঁ? শুধু গলা ফাটিয়ে চেঁচালেই হালো?
[ওরা নিয়ে গেলো দর্শককে। শ্যামল আবার ধরলো, কিন্তু গোলমালে কবিতা ভুলে গেছে।]

শ্যামল : শুধু থাক—শুধু থাক নিভৃত মন্দিরে—শুধু থাক জীবনের ঘাটে ঘাটে—না না, শুধু থাক খরস্রোতে শুভ্র সমুজ্জ্বল—যাকে বলে নয়নের জল—
[প্রাণপণে ইশারা করছে প্রম্পট্ করতে, কিন্তু বই কোথায়? ভিতরের উইংসের বাইরে সুধীন, মানিক, অঞ্জলি।]

সুধীন : (নেপথ্যে) সঞ্চয়িতা?

মানিক: (নেপথ্যে) নেই।

সুধীন : (নেপথ্যে) মুখস্থ নেই কারো?

অঞ্জলি : (নেপথ্যে) চিহ্ন তব।

[শ্যামল এর মধ্যে সমানে 'শুধু থাক' 'শুধু থাক' করে যাচ্ছিলো]

শ্যামল : শুধু থাক—চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।
[বলেই আবিষ্কার করলো—কবিতা শেষ। অগত্যা আর একবার হাঁকলো।]
তুমি হেথা নাই!

[শ্যামল নমস্কার জানিয়ে সরে পড়লো]

সুধীন : (নেপথ্যে) এ কী? এর মধ্যে শেষ হয়ে গেলো? সর্বনাশ। এরপর কী?

অঞ্জলি : (নেপথ্যে) ঘোষণা—শিগ্গির যাও!

[অঞ্জলির ধাক্কা খেয়ে সুধীন ভিতরের মঞ্চে ঢুকে পড়লো।]

সুধীন : এবার—এবার আপনাদের—আমাদের—আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান—(রেডিওর মতো) আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানের ঘোষণা এখনি শুনতে পাবেন।

[বেরিয়ে গেলো।]

(নেপথ্যে) আরে কী আছে এর পর বলে দেবে তো?

অঞ্জলি : (নেপথ্যে) এরপর তো শকুন্তলা ছিল—

সুধীন : তো যাও!

অঞ্জলি : পর্দা বন্ধ না হলে আশ্রম সাজাবো কী করে?

সুধীন : ধুত্তোরি!

[প্রতীপ ছুটে এলো]

প্রতীপ : কাঠি কিন্তু এখনও পাই নি!

সুধীন : এই তো প্রতীপ! ঢুকে যাও।

প্রতীপ : বাঃ, কাঠি?

মানিক : আনছি আনছি।

[মানিক চলে গেলো]

সুধীন : ঢুকে যাও তুমি, কাঠি দেবে এখন।

প্রতীপ : পর্দা ফেলো তবে।

সুধীন : পর্দা বন্ধ হচ্ছে না।

প্রতীপ : অ্যাঁ? তাহলে কী করে হবে? সাজাতে হবে না?

অঞ্জলি : তোমার কমিকটা করে দাও না?

সুধীন : দুর! হাস্যরস আসে এ অবস্থায়?

[মুকুল এলো]

অঞ্জলি : এই তো মুকুল! যাও ঢুকে পড়ো।

মুকুল : ঢুকে পড়ো মানে?

[ধাক্কা মেরে মুকুলকে ঢুকিয়ে দেওয়া হোলো। অগত্যা মুকুল নমস্কার করে মধুর হেসে বেরিয়ে দেবার চেষ্টায় এগোলো, কিন্তু সুধীন বেরোতে দিচ্ছে না।]

মুকুল : আরে কী করবো বলবে তো?

সুধীন-অঞ্জলি : (একসঙ্গে) গান করবে, গান গান!

মুকুল: গান জানলে তো করবো?

সুধীন : গান জানো না মানে? কোরাস লীড করছো কী করে?

মুকুল : গান জানি না বলেই তো লীড করি।

সুধীন : তবে তাই করো গে!

মুকুল : কাকে লীড করবো?

সুধীন : ধ্যাত্তেরি! তুমি শুরু করো না, আমি দেখছি কাকে পাই।

[ধাক্কা দিয়ে মুকুলকে ঢুকিয়ে দিলো। মুকুল আবার ফিরে এলো।]

মুকুল : একা একা লীড শুরু করা যায়?

অঞ্জলি : না যায় তো গানই করো।

মুকুল : কী গান?

অঞ্জলি : যে কোনো গান!

[আবার ধাক্কা খেয়ে ঢুকতে হোলো তাকে। আবার মধুর হেসে নমস্কার করলো।]

মুকুল : (দর্শকদের) গান। যে কোনো গান।

[বেরোবার জন্য ফিরলো। কিন্তু ওদিকে মানিক এসে গেছে তখন, ফিরে আসতে হোলো তাকে।]

(দর্শকদের) গান। কী গান গাইবো বলুন তো? বলুন না? যে কোনো গান।

মানিক : (চাপাগলায় ধমকে) মুকুল!

মুকুল : আচ্ছা আচ্ছা আমিই করছি শুনুন। (ভেবে) আচ্ছা বাংলা গাইবো না ইংরিজি?

মানিক : (আরও ধমকে) মুকুল!

মুকুল : অ্যাঁ?

মানিক : গাও শিগ্গির!

মুকুল : বাংলা না ইংরিজি?

মানিক : দু'টোই গাও!

মুকুল : আচ্ছা আচ্ছা দু'টোই গাইছি। (মানিককে) কোনটা আগে গাইবো?

[মানিক আস্তিন গুটিয়ে এক পা এগোলো]

মুকুল : (তাড়াতাড়ি) দু'টোই একসঙ্গে। একসঙ্গে মানে—আমার এক বন্ধু একটা থিসিস লিখেছে, তার নাম মানিক।

মানিক : কী?

মুকুল : মানে, বন্ধুর নাম মানিক। থিসিসের নাম হোলো—'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের তুলনামূলক সমালোচনার ভিত্তিতে পারস্পরিক সমন্বয়সাধন এবং যৌগিক প্রাচী-প্রতীচি সঙ্গীতের উদ্ভাবন ও বিকাশের উদাহরণ সম্বলিত পর্যালোচনা। আমি দু' একটা উদাহরণ দিলেই আপনারা মানিকের মাথার সুস্থতা—না না, মানিকের যুক্তির সারবত্তা পরিষ্কার অনুধাবন করতে পারবেন।

মানিক : মুকুল তুমি বাজে কথা ছেড়ে গাইবে?

মুকুল : হ্যাঁ গাইছি তো? একটা ইংরিজি গান ধরুন—(গেয়ে) In a cavern, in a canyon/Exacavating for a mine,/Dwelt a miner forty-niner/And his daughter Clementine./O my darling, o my darling/O my darling Clementine, ? Thou art gone and lost for ever,/Dreadful sorry Clementine. এই হোলো ইংরিজি সুর। এইবার একটা বাংলা সুর নিন। ধরুন—শ্যামাসঙ্গীত।

[শ্যামাসঙ্গীতের সুরে ইংরিজি গানটা গাইলো]

আচ্ছা, এবার নিন—রবীন্দ্রসংগীত। (হাতজোড় করে উপর দিকে তাকিয়ে) গুরুদেব, মাপ কোরো—মানিককে। (গাইলো) আচ্ছা, রামপ্রসাদী (গাইলো)। কীর্তন (গাইলো)! ভাটিয়ালি (গাইলো)। কাওয়ালি, না কি গজল? না, কাওয়ালি। যাক গে, দু'টোর একটা।

[কাওয়ালির সুরে গাইতে শুরু করলো। শেষ হবার আগেই পর্দা বন্ধ হয়ে গেলো হড়হড় করে।]

সুবীর : এই তো! হবে না মানে?

সুধীন : খুব সময়ে হোলো যা হোক!

অঞ্জলি : না না সাজিয়ে ফেলা যাক এইবেলা—

সুধীন : হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাজিকটা সাজিয়ে ফেলো—

অঞ্জলি : কণ্বমুনির আশ্রম! গাছ, গাছটা এদিকে। শকুন্তলা—

প্রতীপ : টেবিল, ছাতা, ছাতা কই? কাঠি, কাঠি—

সুধীন : পর্দা খোলো—

অঞ্জলি : না না এখন না—

সুধীন : কতো দেরি হবে?

অঞ্জলি : অনেক। ততোক্ষণ আর কিছু দাও। পর্দার বাইরে।

সুধীন : অরুণা বেরিয়ে একটা গান গাও না। তোমার আগের গানটা তো শেষ হয়নি?

অরুণা : এখন?

সুধীন : হ্যাঁ হ্যাঁ এখন। পরিতোষ যাও তোমার হাঁড়ি দিয়ে।

অরুণা : কিন্তু—

[এতোক্ষণ কথাগুলো পর্দার আড়াল থেকে ভেসে আসছিলো। এখন অরুণা আর হাঁড়ি-সহ পরিতোষকে ঠেলে বের করে দেওয়া হোলো। অরুণা গান ধরলো, পরিতোষ হাঁড়ি, কিন্তু পর্দার আড়ালে হরেকরকম কণ্ঠস্বরে গান ভালো শোনা যাচ্ছে না। হঠাৎ উইংসের বাইরে দেখা গেলো সেই দর্শক ছুটে আসছে, কিন্তু মানিক পেছন থেকে ঝপ করে আর মাথায় একটা চাদর চাপা দিয়ে টেনে নিয়ে গেলো, অরুণা আর পরিতোষ টেরও পেলো না।]

সুধীন : (নেপথ্যে) সুবীর, পর্দা খোলো।

অঞ্জলি : (নেপথ্যে) না না একটু—

[পর্দা খুলে গেলো। অঞ্জলি আর সুধীন ছিটকে উইংসের এদিকে চলে এলো। ভিতরে স্টেজে দেখা গেলো—পেছনে গাছের টব, সামনে ম্যাজিকের টেব্‌ল্, প্রতীপ অভিবাদন জানাচ্ছে। অরুণা আর পরিতোষ কেটে পড়লো। মানিক এলো একরাশ ঝাঁটার কাঠি নিয়ে। প্রতীপের বর্তুলাকার চোখ না দেখে কাঠিগুলো সাবধানে সামনের টেবিলে রাখলো।]

মানিক : (নেপথ্যে) কাঠি।

[মানিক চলে গেলো। প্রতীপ কাঠিগুলো হাতে তুলে নিয়ে হু হু করে কেঁদে ফেললো। কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলো উল্টোদিক দিয়ে। উইংসের এপাশে তখন সুধীন, অঞ্জলি, মুকুল, অরুণা, পরিতোষ, বীণা ইত্যাদি।]

অঞ্জলি : সর্বনাশ! ম্যাজিক কে দেখাবে?

সুধীন : মুকুল যাও!

মুকুল : ম্যাজিক!

সুধীন : হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাজিক! প্রতীপ পারলে তুমিও পারবে।

মুকুল : প্রতীপ তো পারলো না।

সুধীন : তুমি পারো তাহলে।

[মুকুল এসে টেবিলের কাছে দাঁড়ালো, সরঞ্জামগুলো নিরীক্ষণ করে দেখলো। তারপরে উইংসের দিকে গেলো।]

মুকুল : আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট?

সুধীন : পরিতোষ—

মুকুল : মহিলা অ্যাসিস্ট্যান্ট চাই।

সুধীন : উঃ! বীণা যাও।

[বীণা স্টেজে ঢুকলো।]

মুকুল : একজনে হবে না।

সুধীন : আবার ক'জন লাগে?

মুকুল : তবে রইলো ম্যাজিক।

সুধীন : (তাড়াতাড়ি) অরুণা যাও।

[অরুণা এলো। মুকুল, বীণা আর অরুণাকে টেবিলের দু'পাশে দাঁড় করালো।]

মুকুল : (ভীষণ তাড়াতাড়ি) আমি আজ যে ম্যাজিক আপনাদের দেখাবো, সে ম্যাজিক এখন অবধি কেউ দেখায়নি, এখনো দেখায় না, পরেও দেখাবে না। এ ম্যাজিক অপূর্ব, অভূতপূর্ব, অবিস্মরণীয়, অজ্ঞাতনামা, অবিমৃশ্যকারিতা। এই এক প্যাকেট তাস, অতি সাধারণ এক প্যাকেট তাস, এর মধ্যে যে কোনো একটা তুলে নিন (অরুণা তুললো সবচেয়ে উপরেরটা), দেখে নিন, রেখে দিন। (অরুণা রাখলো) আপনারাও দেখুন (তুলে দর্শকদের দেখালো, তারপর নিজে দেখলো)। দেখেছেন তো? তাসটা হোলো...। (যে তাসটা তোলা হয়েছে তার নাম বললো।) এই এক টুকরো দড়ি, সাধারণ একটুকরো দড়ি, আচ্ছা এই ধরলাম—কেটে দিন (অরুণা কেটে দিলো)। আবার কাটুন। (অরুণা কাটলো)—এই দেখুন—চারটে দড়ি হয়ে গেছে। আচ্ছা, এই একগ্লাস জল, সাদা জল, কাঁচের গেলাস, কোনো ফাঁকি নেই—দেখেছেন তো? (ঢকঢক করে খেয়ে) এই দেখুন, খালি গেলাস, জল নেই। এই একটা ছাতা, বন্ধ ছাতা, এই দেখুন (ছাতা খুললো)—খোলা। আবার দেখুন (বন্ধ করলো)—বন্ধ। আচ্ছা এই একটা চামচ, বড়ো চামচ, সাধারণ চামচ (নিজের মাথায় ঠুকে দেখালো), এই রুমাল দিয়ে ঢাকলাম—সাধারণ রুমাল। এই দেখুন (রুমালটা খুলে ধরলো, চামচটা পড়ে গেলো)—উড়ে গেছে। রুমাল খালি। (কাঠের তৈরি নকল ডিম তুলে) এই একটা ডিম, হাঁসের ডিম, (বাঁ পকেটে রেখে) এই পকেটে রাখলাম। এই দেখুন (ডানপকেট থেকে প্লাস্টিকের হাঁস বার করে প্যাঁক প্যাঁক করে দেখালো।)—হাঁস হয়ে গেলো। আবার দেখুন—আরেকটা ডিম, হাঁসের ডিম, (ডান পকেটে রেখে)—এই পকেটে রাখলাম, এই দেখুন—এই পকেটে চলে গেছে। (বাঁ পকেট থেকে আগের ডিমটা বার করলো।) আবার রাখলাম, আবার এ পকেটে চলে গেছে (ডান পকেট থেকে বার করলো)। আবার রাখলাম, আবার চলে গেছে। এবার দেখুন, (বাঁ পকেটে রাখলো), ভালো করে দেখুন—এই, একসঙ্গে দু'টো!

[দু' পকেটে হাত ভরলো, কিন্তু মুখটা বিকৃত হয়ে উঠলো। হাত দু'টো বার করে এমন ভঙ্গী করলো যেন ডিম ভেঙে হাতে লেগেছে। অরুণা আর বীণার আঁচলে হাত মুছে নিলো। ওরা চটলেও কিছু বলতে পারলো না।]

উড়ে গেছে। দু'টো ডিমই উড়ে গেছে। আচ্ছা এই একটা বল, রবারের বল, এই হাতের মধ্যে, ভালো করে দেখুন, ওয়ান টু থ্রী (বলটা ছুড়ে ফেলে দিলো)—অদৃশ্য হয়ে গেছে। এই একটা রুমাল, সিল্কের রুমাল, এই হাতের মুঠোর মধ্যে রাখলাম, এই—এই (টেনে দেখাচ্ছে, আবার গুঁজছে)—এই—

[রুমালটায় সুতো বাঁধা ছিলো, সুতোর টানে বাইরে চলে গেলো, মুকুল টের পায় নি।]

এই—এই—এই—

[রুমালের ডগা বেরোচ্ছে না দেখে আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁজলো, পেলো না। মুঠোটা চোখের সামনে নিয়ে দেখলো, তারপর খুলে দেখলো—রুমাল নেই। মাটিতে দেখলো, নেই। এ পকেট ও পকেট দেখলো, টেবিল দেখলো—কোথাও পাওয়া গেলো না। অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে দর্শকদের দিকে চেয়ে হাসলো।]

হেঁ হে—আচ্ছা আর একটা দেখুন, আর একটা দেখুন! (অরুণার মাথা একটা কাপড় দিয়ে ঢাকলো) দেখেছেন?

[অরুণাকে টেনে এনে বীণার জায়গায় দাঁড় করালো, বীণাকে অরুণার জায়গায়।]

ভালো করে দেখুন (কাপড়ের ঢাকনাটা খুলে নিয়ে) বদলে গেছে। (হঠাৎ ভীষণ গম্ভীর হয়ে) এইবার যে খেলাটা আপনাদের দেখাবো, সেটা খুব কঠিন। মনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। আপনাদের অনুরোধ করছি,—এখন কোনোরকম আওয়াজ করবেন না হাঁচি কাশিও না।

[মুকুল চোখ বন্ধ করে মনের সব শক্তি নিয়োগ করছে। তার গাল দু'টো ফুলে উঠেছে, দেহ কাঁপছে, হাত মুঠো। অরুণা-বীণাও পোজ নিয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর হঠাৎ সশব্দে একটা তালি দিলো মুকুল। দিয়েই চোখ খুলে হেসে এমনভাবে অভিবাদন জানালো, যেন বিরাট একটা ম্যাজিক হোলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাপ্তি সঙ্গীত শুরু করলো মুকুল। অন্যরা এসে সারি বেঁধে গানে যোগ দিলো।]

কোরাস : (গান)

এসো মোরা মিলি সবে
সুমধুর কলরবে
করি এক গান—অপূর্ব গান।
যত গুণী আছে ভবে
শুনে সবে সুখী হবে
বিচিত্র তান—অপরূপ তান।

[সেই দর্শক ছুটে এসে বাধা দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু মানিক আর সুবীর তাকে জাপটে ধরে মুখে হাত চাপা দিলো। দর্শক ছটফট করতে লাগলো, গান চলতে লাগলো।]

গাও ভাই জনে জনে
গেয়ে চলো এক মনে
যায় যাক প্রাণ—কী হবে এ প্রাণ?
গাও এই শুভখনে
গেয়ে চল প্রাণপণে
ফেটে যাক কান—বাহুল্য কান।

বাকি ইতিহাস

বাকি ইতিহাস

চরিত্রলিপি

প্রকৃত

শরদিন্দু নাগ	বাংলার অধ্যাপক
বাসন্তী	শরদিন্দুর স্ত্রী
বাসুদেব	দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক

কল্পিত

প্রথম অঙ্ক

সীতানাথ চক্রবর্তী	মধ্যবিত্ত চাকুরে
কণা	সীতানাথের স্ত্রী
নিখিল	সীতানাথের ধনী বন্ধু
বৃদ্ধ	

দ্বিতীয় অঙ্ক

সীতানাথ	স্কুলের প্রধান শিক্ষক
কণা	সীতানাথের স্ত্রী
বিজয়	সীতানাথের বন্ধু
বিধুভূষণ	স্কুলের সেক্রেটারি

প্রথম অঙ্ক

[ভবানীপুরের কোনো এক অপ্রশস্ত রাস্তায় কোনো এক বয়স্ক তেতলা বাড়ির দোতলায় শরদিন্দু নাগের ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাটে প্রধান ঘর দু'টি—তার মধ্যে বসবার ঘরটিই অপেক্ষাকৃত বড়ো। ঘরের একদিকে সদর দরজা, অন্যদিকে শোবার ঘরের প্রবেশপথ। এই দুই দ্বারের মধ্যবর্তী অংশে, অর্থাৎ মঞ্চের পিছন দিকে—রান্নাঘরের পথ। রান্নাঘরটি আসলে বসবার ঘবেরই একটি শাখা, একটি কাঠের পার্টিশন তাকে খানিকটা আড়াল করেছে। যেখানে আড়াল নেই সেইখান দিয়েই বসবার ঘরের সঙ্গে যোগাযোগ। একটি পর্দা সেখানে আছে, কিন্তু সাধারণত সেটি সরানো থাকে। ফলে কয়েকটি তাক ও একটি কেঠো টেবিল, নানা আকারের টিন, বোতল এবং রান্নাঘরের সরঞ্জাম বসবার ঘর থেকে দৃশ্যমান। মূল রান্নার ব্যবস্থা পার্টিশনের আড়ালে অদৃশ্য।
রান্নাঘরের প্রবেশপথের কাছে ছোট খাবার টেবিল এবং খান তিনেক চেয়ার। টেবিলে প্লাস্টিকের চাদরটি এখনো চকচকে, কিন্তু চেয়ার তিনটির বয়স হয়েছে। ঘরের বাকি অংশে গোটা দুই আরাম কেদারা, একটি লেখবার টেবিল ও চেয়ার এবং ঘরের সর্বশ্রেষ্ঠ আসবাব—একটি বুককেস। বই, ফুলদানি, মহীশূরের কাষ্ঠপুত্তলি ইত্যাদি ঐ আসবাবটিতে কেন্দ্রীভূত।
রবিবার সকাল। শরদিন্দু চেয়ারে এলিয়ে বসে। খবরের কাগজে তার মুখ ঢাকা। শরদিন্দুর বয়স পঁযত্রিশের কাছাকাছি।
শোবার ঘর থেকে বাসন্তীর প্রবেশ। হাতে ইলেক্ট্রিক বিল।]

বাসন্তী : তুমি কালকেও ইলেক্ট্রিক বিল দাওনি?

শরদিন্দু : (কাগজ নামিয়ে) অ্যাঁ? ওহো, একদম ভুলে গেছি! জামার পকেটে রেখে দাও তো?

বাসন্তী : জামার পকেটেই তো ছিল! কাল অফিস যাবার সময়ে মনে করিয়েও দিলাম।

শরদিন্দু : শনিবার এমনিও দেওয়া মুশকিল। বড়ো ভিড় হয়। কাল দেবো ঠিক!

বাসন্তী : কালই কিন্তু লাস্ট ডেট। কাল না দিলে পয়সা বেশি লেগে যাবে।

শরদিন্দু : না না, কাল ঠিক দেবো। সোমবার দু'টো পিরিয়ড পর পর অফও থাকে।
[বাসন্তী বিল নিয়ে চলে গেলো। শরদিন্দু উঠে একটা কাঁচি নিয়ে এলো। খবরের কাগজের একটি অংশ কাটতে লাগলো সযত্নে। বাসন্তীর প্রবেশ। এবার হাতে একটি খাম।]

বাসন্তী : এটা কী? তোমার পকেটে ছিল?

শরদিন্দু : অ্যাঁ? ও—একটা বিয়ের নেমন্তন্ন।

বাসন্তী : কার?

শরদিন্দু : ভবতোষবাবুর মেয়ের। ভবতোষ মিত্তির—কেমিস্ট্রির হেড।

বাসন্তী : যাচ্ছো তুমি?

শরদিন্দু : নাঃ! কার্ড দিতে হয়—দিয়েছে। নইলে সায়েন্স সেকশনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই বিশেষ।

[বাসন্তী চলে গেলো। শরদিন্দুর কাটা শেষ হয়েছে। একটা বড়ো বাঁধানো খাতা নিয়ে এলো সে। তাতে অনেক খবরের কাগজের কাটিং সাঁটা। আঠা দিয়ে নতুন কাটিংটি সাঁটতে সাঁটতে হাঁকলো।]

বাসন্তী!

বাসন্তী : (ভিতর থেকে) কেন?

শরদিন্দু : কী করছো তুমি?

বাসন্তী : (ভিতর থেকে) ঘর গোছাচ্ছি।

শরদিন্দু : রাখো এখন। এখানে এসো।

[বাসন্তীর প্রবেশ]

বাসন্তী : কী?

শরদিন্দু : আজ রোববার।

বাসন্তী : (হেসে) সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

শরদিন্দু : কী করবে আজ বলো।

বাসন্তী : তুমি বলো।

শরদিন্দু : বেড়াতে যাবে? ট্রেনে করে?

বাসন্তী : কোথায় যাবে বলো?

শরদিন্দু : যেখানে বলবে। ডায়মণ্ড হারবার যাবে?

বাসন্তী : অতো দূর? আজ যে মশারিটা কাচবো ভেবেছিলাম।

শরদিন্দু : তবে চলো দুপুরে খাবার পর কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসি। বটানিক্যালে যাবে?

বাসন্তী : গেলে হয়। অনেকদিন যাওয়া হয়নি।

শরদিন্দু : ঐ বাসের ভিড়ের কথা ভাবলে যেতে ইচ্ছে করে না।

বাসন্তী : তাও ঠিক। যেতে যেতে দম ফুরিয়ে যায়।

শরদিন্দু : তবে কোথায় যাওয়া যায়?

বাসন্তী : মণিবাবুদের বাড়ি কিন্তু একবার যেতে হবে শিগগিরই! ওরা দু'দিন এসেছিলো।

শরদিন্দু : মণিদের বাড়ি? আজকে সেরে আসতে চাও?

বাসন্তী : তা সেরে এলে হয়।

শরদিন্দু : সে তো বিকেলে! দুপুরে কী করবে?

বাসন্তী : তুমি লেখাটা শেষ করবে না? কাল যে বলছিলে তাগাদা দিচ্ছে?

শরদিন্দু : ও হ্যাঁ। সেও তো এক আছে। এ মহা ঝামেলা হয়েছে বাবা। কলেজ ম্যাগাজিনে বছরে তিনবার তিনটি প্রবন্ধ লিখতে হবে।

বাসন্তী : বাংলার প্রফেসর হয়েছো কেন?

শরদিন্দু : তাও যদি সত্যি সত্যি প্রফেসর হতাম!

বাসন্তী : ঐ হোলো। কলেজে পড়ালেই প্রফেসর বলে।

শরদিন্দু : সেটা আরো যন্ত্রণা। বলবে প্রফেসর, দেবে লেক্‌চারারের মাইনে। তার ওপর আবার প্রবন্ধ লেখাবে বছরে তিনখানা!

বাসন্তী : আহা, লিখতে যেন কতো খারাপ লাগে তোমার।

শরদিন্দু : দূর! আগে ভালো লাগতো! এখন আর—!

বাসন্তী : কাল রাত্তিরে কতোটা লিখলে?
শরদিন্দু : আরম্ভটা করে রেখেছি শুধু।
বাসন্তী : কী লিখছো এবার?
শরদিন্দু : ঐ যা বলছিলাম তোমায়—নাট্যসাহিত্যে আধুনিকতা। তুমি আছো ভালো!
বাসন্তী : কেন?
শরদিন্দু : বেশ মিষ্টি মিষ্টি গল্প লিখছো, টাকাও পাচ্ছো—
বাসন্তী : আহা! দু'টো গল্পের তো আজ অবধি দিয়েছে টাকা। তাও সর্বসাকুল্যে—
শরদিন্দু : আরে, দু'টো কি আর দু'টোতেই থামবে? রাস্তা খুলে গেছে তোমার।
বাসন্তী : ছাই খুলে গেছে। গত একমাস ধরে একটা গল্প লিখতে পারলাম না!
শরদিন্দু : হবে হবে।
বাসন্তী : কচু হবে। প্লটই পাই না!
শরদিন্দু : প্লট? সমস্ত দুনিয়া গল্পের প্লটে ঠাসা! জীবনটাই তো গল্পের প্লট!
বাসন্তী : ও সব বড়ো বড়ো কথা রেখে সহজ সরল একটা গল্পের প্লট দিতে পারো?
শরদিন্দু : সহজ সরল গল্পের প্লট বলতে কী বোঝো?
বাসন্তী : বুঝি—ঘটনা। যা ঘটেছে।

[কড়া নড়ে উঠলো]

শরদিন্দু : বাসুদেব এলো বোধ হয়।
[শরদিন্দু দরজা খুলে দিলো। বাসুদেবের প্রবেশ। বয়সে শরদিন্দুর থেকে তরুণ।]
বাসুদেব : গুড মর্নিং শরদিন্দুদা। হ্যাপি সান্‌ডে। গুড মর্নিং বৌদি। চা কই?
বাসন্তী : (হেসে) এসে বসবেন তো আগে?
বাসুদেব : (ঝুপ করে বসে) বসলাম। এবার চা দিন!
বাসন্তী : কী আশ্চর্য! চা তৈরি করতে হবে না?
বাসুদেব : এই দেখুন! কতোবার বলেছি—প্রতি রবিবার এক বালতি চা সক্কালবেলাই করে রাখবেন, তা কিছুতেই শুনবেন না?
বাসন্তী : তৈরি করে রেখে দিলে ঠান্ডা হয়ে যাবে না?
বাসুদেব : তাও তো বটে। একটা বালতির সাইজের থার্মোফ্লাস্ক আপনাদের প্রেজেন্ট করতেই হচ্ছে। আপনাদের বিয়ের তারিখটা কবে বলুন তো?
শরদিন্দু : বিয়ের তারিখ? সে কি আর মনে আছে ভায়া?
বাসন্তী : আপনাদের মতো নবদম্পতি তো নই আমরা?

[রান্নাঘরে গেলো]

বাসুদেব : নবদম্পতি! আমরা নবদম্পতি? চার বছর হয়ে গেলো—

[খবরের কাগজটা নিয়ে ওল্টাতে শুরু করলো]

শরদিন্দু : চার বছর! আমাদের এগারো বছর পার হয়ে গেছে।
বাসুদেব : ঐ হোলো। চারে এগারোয় কতোটুকু তফাৎ?
শরদিন্দু : (হেসে) বেশি নয়। সাত বছর।
বাসুদেব : (কাটা জায়গায় পৌঁছে) এ কী, এডিটোরিয়ালটা কেটে নিয়েছেন বুঝি?
শরদিন্দু : ও, সরি! (খাতাটা নিয়ে) এখানে সেঁটে ফেলেছি। পড়বে?

বাসুদেব : (কাগজ ফেলে) নাঃ! ঐ একই কচকচি—ভালো লাগে না।
শরদিন্দু : ছেলে কেমন আছে?
বাসুদেব : ভালো না। সর্দি, কাশি, জ্বর। আপনারা বেশ আছেন—ও সব ঝক্কি নেই।
শরদিন্দু : ঝক্কি তোমার? না তোমার গিন্নির?
বাসুদেব : হ্যাঁ, আপনি তাই ভাবেন। ছেলের টেম্পারেচার উঠলে গিন্নির টেম্পারেচার চড়ে, আর গিন্নির টেম্পারেচার চড়লে কর্তার—
[গলার সামনে তর্জনী টেনে ইঙ্গিতে জবাই দেখালো। বাসন্তীর প্রবেশ।]
কই, চা হোলো?
বাসন্তী : দাঁড়ান, এই তো জল চড়ালাম।
বাসুদেব : মাটি করেছে। আজ ভীষণ তাড়া—এক্ষুনি উঠতে হবে।
বাসন্তী : সে কী? রোববার সকাল—
বাসুদেব : রোববার! সংসারী লোকের আবার রোববার!
বাসন্তী : ওঃ! খুব সংসার দেখাচ্ছেন! সংসার আমরা করি না?
বাসুদেব : হ্যাঃ! একে সংসার বলে? কর্তা কলেজে ছাত্রদের বৈষ্ণব সাহিত্য বোঝাচ্ছেন, বাড়িতে বোঝাচ্ছেন গিন্নিকে—হয়ে গেলো সংসার।
শরদিন্দু : তা তুমি বাড়িতে গিন্নিকে ফিলজফি পড়ালেই পারো?
বাসুদেব : ফিলজফি? লজিক? গিন্নিকে? আপনার হোলো কী শরদিন্দুদা?
বাসন্তী : ও, মেয়েরা লজিক বোঝে না—এই তো?
বাসুদেব : সেরেছে! মেয়েরা বোঝে না কে বলেছে? আমার গিন্নির কথা বলছি।
বাসন্তী : আপনার গিন্নি মেয়ে নয়?
বাসুদেব : শুনুন, শরদিন্দুদা শুনুন! তবু আপনি বলবেন—মেয়েরা লজিক বোঝে না।
শরদিন্দু : আমি বললাম? না তুমি বললে?
বাসুদেব : আঃ, যাকগে—যাকগে ওসব আজেবাজে কথা চায়ের আগে! একটা কথা বলুন তো?
শরদিন্দু : কী?
বাসুদেব : আজ ভবতোষ মিত্তিরের মেয়ের বিয়েতে যাচ্ছেন তো?
শরদিন্দু : নাঃ!

[বাসন্তী রান্নাঘরে গেলো]

বাসুদেব : তা যাবেন কেন? গেলে যে আমার উপকার হোতো!
শরদিন্দু : কী উপকার হোতো?
বাসুদেব : সঙ্গী পাওয়া যেতো!
শরদিন্দু : সঙ্গী অনেক পাবে। কলেজের সবাইকেই তো বলেছে।
বাসুদেব : আর্টসের দিকের বেশি কেউ যাবে না।
শরদিন্দু : তা তুমি যাচ্ছো কেন?
বাসুদেব : ভবতোষ মিত্তির যে আমার জ্ঞাতি সম্পর্ক –না গেলে নয়। তারপর প্রিন্সিপ্যাল সায়েব যাচ্ছেন, যদি কোনো ফাঁকে দু'-ছটাক তেল দিয়ে দিতে পারি। সে দিকটা ভেবে দেখেছেন?

শরদিন্দু : (হেসে) আমার আর তেল দিয়ে কোনো লাভ নেই। তেরো বছর লেক্‌চারার আছি, আরো তেরো বছর থাকবো।

বাসুদেব : গুজব শুনেছেন?

শরদিন্দু : কী গুজব?

বাসুদেব : আপনাদের হরেকৃষ্ণবাবু নাকি চলে যাবে?

শরদিন্দু : কোথায় চলে যাবে?

বাসুদেব : ভালো চাকরি পেয়ে গেছে না কি?

শরদিন্দু : হ্যাঁঃ! ওরকম কতোবার শুনলাম।

বাসুদেব : না না, খুব জোর গুজব। যদি যায় আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হওয়া মারে কে?

শরদিন্দু : এখানকার চাকরির থেকে ভালো চাকরি হরেকেষ্টকে কেউ দেবে না হে! ও সব গুজবে কান দিও না।

বাসুদেব : অল রাইট, অল রাইট। আপনি ভালো জানবেন। তবে হলে যেন খাওয়াটা পাই। ও বৌদি, চা হলো? ভীষণ তাড়া!

বাসন্তী : (রান্নাঘর থেকে) যাচ্ছি যাচ্ছি, হয়ে গেছে!

শরদিন্দু : তাড়াটা কিসের শুনি?

বাসুদেব : আমি বাজার করতে বেরিয়েছি।

[চা নিয়ে বাসন্তীর প্রবেশ]

শরদিন্দু : বাজার করবে—থলি কই?

[বাসুদেব পকেট থেকে নাইলনের জালের থলি বার করলো একটা]

বাসুদেব : এই দেখুন থলি।

বাসন্তী : দেখি দেখি! বেশ তো জিনিসটা। কোথায় পেলেন?

বাসুদেব : সে কী? আপনি দেখেননি এ জিনিস? নিউ মার্কেটে, এসপ্ল্যানেডের ফুটপাথে—ভর্তি!

বাসন্তী : কতো নিয়েছে?

বাসুদেব : কী জানি, মনে নেই। পাঁচ সিকে বোধ হয়।

বাসন্তী : তুমি তো কাল এসপ্ল্যানেড যাচ্ছো—একটা কিনে আনবে?

শরদিন্দু : কাল কখন এসপ্ল্যানেড যাচ্ছি?

বাসন্তী : বাঃ! ইলেক্ট্রিক বিল দিতে যাবে না?

শরদিন্দু : ও হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা। আচ্ছা দেখবো।

বাসন্তী : ছাই দেখবে! তোমার মনে থাকলে তো?

বাসুদেব : আচ্ছা, আমি আপনাকে এনে দেবো বৌদি!

বাসন্তী : ঠিক? পয়সা দিয়ে দিই তাহলে?

বাসুদেব : পয়সা লাগবে না। আপনাদের বিয়ের তারিখটা বলুন—প্রেজেন্ট করে দেবো।

বাসন্তী : উঃ, কাকে কী বলছি! বিয়ের তারিখ অবধি বসে থাকি আপনার প্রেজেন্টের আশায়।

বাসুদেব : কেন? বিয়ের তারিখের কতো আর দেরি? এক বছরের বেশি তো নয়? শরদিন্দুদা এক বছরের মধ্যে কিনে দেবে ভেবেছেন আপনি?

শরদিন্দু : (হেসে) তুমি এই বাসুদেবকে নিয়ে একটা গল্প লিখতে পারো না?

বাসুদেব : এই দেখুন! ভুলেই গেছিলাম। কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্‌ বৌদি! আপনার নতুন গল্প পড়ে আমরা সপরিবারে মুগ্ধ, অভিভূত, চমৎকৃত!

বাসন্তী : সপরিবারে কে কে?

বাসুদেব: মা, আমি, গিন্নি, ছেলে—

বাসন্তী : ছেলেও?

বাসুদেব : ছেলে আপনার গল্পটা গোগ্রাসে গেলবার চেষ্টায় ছিল। ওর মা দেখতে পেয়ে কেড়ে নিলো বলে সাড়ে সাত মিনিট গলা ফাটিয়ে চেঁচালো! মুগ্ধ বলবেন না একে?

বাসন্তী : (হেসে) নিশ্চয়ই!

বাসুদেব : আবার কবে বেরুচ্ছে? পরের মাসে?

বাসন্তী : আর বেরুবে না।

বাসুদেব : বেরুবে না মানে?

বাসন্তী : প্লট নেই! প্লট পাচ্ছি না কিছুতেই।

বাসুদেব : প্লট? এতো বড়ো পৃথিবীতে প্লটের অভাব?

শরদিন্দু : ঐ কথাটাই আমি বলছিলাম তুমি আসবার ঠিক আগে?

বাসন্তী : ও রকম বলতে সবাই পারে। আসল প্লট দেবার বেলা কেউ নেই।

বাসুদেব : আচ্ছা, কী রকম প্লট আপনার চাই বলুন?

বাসন্তী : আমি ঘটনা চাই। একজন টেনে আজে বাজে চিন্তা করে গেলো, আর তাই লিখে গল্প হয়ে গেলো—সে আমার দরকার নেই।

শরদিন্দু : ঘটনা পাওয়া তো আরো সোজা! কতো কী ঘটছে রোজ।

বাসন্তী : যথা?

শরদিন্দু : যে কোনো একটা ঘটনা নাও না—

বাসন্তী : 'যে কোনো' বললে হবে না। কী ঘটনা বলো।

বাসুদেব : ধরুন—একজনের স্ত্রীর মেজাজ গরম হয়েছে—

শরদিন্দু : দূর! ও কি একটা ঘটনা হোলো?

বাসুদেব : এর চেয়ে বড়ো ঘটনা আপাতত আমার মনে পড়ছে না। আমি চললাম।

শরদিন্দু : আরে বোসো।

বাসন্তী : বসুন বসুন। এখুনি যাবেন কী?

বাসুদেব : এখুনি না গেলে বাড়িতে দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। বঁটি নিয়ে বসে আছে।

বাসন্তী : আমাকে একটা প্লটের হদিশ না দিয়েই চললেন?

বাসুদেব : ও শরদিন্দুদা দেবেন। এই নিন, এতে অনেক ঘটনা পাবেন।
[খবরের কাগজটা শরদিন্দুর হাতে গুঁজে দিয়ে বাসুদেব চলে গেলো। সদর দরজায় খিল দিয়ে বাসন্তী ফিরলো।]

বাসন্তী : কই, পারলে না তো বলতে?

শরদিন্দু : কেন পারবো না? এই বাসুদেবের কথাটাই ধরো না। একজনের স্ত্রীর মেজাজ গরম হয়েছে—

বাসন্তী : ওরকম ঘটনায় সম্পাদক ঠান্ডা হবে না।

শরদিন্দু : আহা, ঘটনাটা বরাবরই তুচ্ছ—যদি আলাদা করে দেখো। কিন্তু ঐ তুচ্ছ ঘটনাটাই ঘটতে হয়তো অনেক কার্যকারণের খেলা চলেছে। কেন ঘটলো? কিসের জন্য ঘটলো? খুঁজলে দেখবে—ঘটনাটা একটা সারিবাঁধা ঘটনাবলীর চূড়ান্ত ফল। সেইটাই তো গল্প হতে পারে!

বাসন্তী : বেশ তো! কোন্ সারিবাঁধা ঘটনাবলীর চূড়ান্ত ফলে একজনের স্ত্রীর মেজাজ গরম হয়েছে বলো?

শরদিন্দু : ঐটাই নিতে হবে তার কোনো মানে আছে? ওর চেয়ে ভালো ঘটনা নেই?

বাসন্তী : তুমি ভেবে দেখো কী ভালো ঘটনা পাও।

[বাসন্তী চায়ের বাসনগুলি নিয়ে রান্নাঘরে গেলো]

শরদিন্দু : আচ্ছা, এই কাগজেই দেখো না, কী পাওয়া যায়—(বিড় বিড় করে) ইউ এন্ ও—সিকিওরিটি কাউন্সিল—কঙ্গো—

[বাসন্তী বাসন রেখে ফিরেছে]

—পাকিস্তান সীমান্ত—বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর—

বাসন্তী : কোনো মন্ত্রীর ঘটনায় আমি নেই।

শরদিন্দু : না না, মন্ত্রী কেন—

বাসন্তী : আর কী? জাপানে ভূমিকম্প? মোহনবাগানের জয়লাভ? পাটের বাজার দর?

শরদিন্দু : এই তো! "উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা"!

বাসন্তী : প্লীজ! আত্মহত্যা নয়। আত্মহত্যা আজকাল কোনো সম্পাদক বরদাস্ত করে না।

[শরদিন্দু একমনে খবটা পড়ছে]

আত্মহত্যা বাদ দিয়ে আর কী পাও দেখো।

বাসন্তী : (হঠাৎ মুখ তুলে) সীতানাথ চক্রবর্তী বলে কাউকে চেনো।

বাসন্তী : না।

শরদিন্দু : সীতা—নাথ চক্র—বর্তী। নামটা ভীষণ চেনা চেনা লাগছে।

বাসন্তী : অনেক নামই ওরকম চেনা চেনা লাগে।

শরদিন্দু : (চেঁচিয়ে) আরে—বটানিক্যাল গার্ডেন!

বাসন্তী : কী বটানিক্যাল— ?

শরদিন্দু : মনে পড়ছে না? বটানিক্সে আলাপ হয়েছিলো—সীতানাথ চক্রবর্তী আর তার বৌ—কী যেন নামটা?

বাসন্তী : হ্যাঁ হ্যাঁ। গত বছর—না, তারও আগের বছর বোধ হয়—

শরদিন্দু : বৌয়ের নামটা যেন কী—কনক, না কণিকা—

বাসন্তী : কণা, কণা!

শরদিন্দু : কণা? হ্যাঁ কণাই হবে।

বাসন্তী : এক সঙ্গে খাওয়া দাওয়া হোলো ভাগাভাগি করে, মনে আছে? ফিরলামও তো এক বাসে ভবানীপুর অবধি।

শরদিন্দু : সীতানাথ চক্রবর্তী। আশ্চর্য!

বাসন্তী : কী হয়েছে তার?

শরদিন্দু : (যেন হঠাৎ আবার মনে পড়লো) আত্মহত্যা করেছে।

বাসন্তী : (চমকে) আত্মহত্যা?

শরদিন্দু : হ্যাঁ, গলায় দড়ি দিয়ে।

বাসন্তী : তুমি—তাহলে—ঐ উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা তাহলে—

শরদিন্দু : হ্যাঁ, সীতানাথ চক্রবর্তী।

[বাসন্তী কাগজটা নিয়ে পড়লো।]

বাসন্তী : অন্য কোনো সীতানাথ চক্রবর্তীও তো হতে পারে?

শরদিন্দু : তা হতে পারে। কিন্তু—স্ত্রী আছে বলছে, ছেলেপুলে নেই, ভবানীপুর-নিবাসী—ভবানীপুরেই তো এলাম এক বাসে—

বাসন্তী : হ্যাঁ, ভবানীপুরে।

[অল্পক্ষণ পরে শরদিন্দু চেষ্টা করে হাসলো]

শরদিন্দু : নাও, তুমি ঘটনা চাইছিলে?

বাসন্তী : তাই বলে—এইরকম ঘটনা—

শরদিন্দু : কেন নয়? তুমি তাকে দেখেছো। তার স্ত্রীকে দেখেছো। পুরো একটা বেলা ধরে দেখেছো, কথা বলেছো—

বাসন্তী : তাতে কতোটুকু চেনা যায়?

শরদিন্দু : কিছুই চেনা যায় না। সেইটাই তো দরকার। তোমার মনে শুধু একটা ছাপ আছে, যাকে বলে ফার্স্ট ইম্‌প্রেশন। আর কিছু জানো না। তাদের আর্থিক অবস্থা, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব, তাদের সুখ-দুঃখ কিছু জানো না। এক কথায়—তুমি কল্পনা আরম্ভ করবার সম্বল পাচ্ছো, অথচ কল্পনায় বাধা হবার মতো কিছু নেই।

বাসন্তী : কী কল্পনা করবো?

শরদিন্দু : কল্পনা করবে—ঘটনাটা কেন ঘটলো? সীতানাথ চক্রবর্তী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে—এটা ঘটনা। কোন্ সারিবাঁধা ঘটনাবলীর চূড়ান্ত ফলে ঘটনাটা ঘটেছে—তাই কল্পনা করে গল্প লেখো।

বাসন্তী : কিন্তু—আত্মহত্যা?

শরদিন্দু : আত্মহত্যা অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং ঘটনা। সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে কেউ আত্মহত্যা করে না। আবার সম্পূর্ণ উন্মাদ হলেও করে না।

বাসন্তী : কেন করবে না?

শরদিন্দু : আমার ধারণা তাই। তোমার অন্য কিছু মনে হলে তাই লেখো।

বাসন্তী : ধরো—কোনো একটা জিনিসের যদি কেউ খুব বেশি, খুব খুব অসম্ভব রকম বেশি দাম দেয়, আর তারপর হঠাৎ একদিন দেখে সব ধ্বসে গেছে—

শরদিন্দু : ব্যস্ ব্যস্, আর দেখতে হবে না। এসে গেছে তোমার! বসে যাও কাগজ কলম নিয়ে।

বাসন্তী : এখন?

শরদিন্দু : বাধা কী?
বাসন্তী : রান্নাবান্না?
শরদিন্দু : দূর: রোববার বেলা সাড়ে আটটায় রান্নার চিন্তা। শুরু করে দাও গরম গরম।
বাসন্তী : তুমি কী করবে?
শরদিন্দু : আমি নাট্যসাহিত্যে আধুনিকতা নিয়ে বসি। বসি মানে শুই। রোববার সকালে বসে বসে প্রবন্ধ লেখা চলে না।

[শরদিন্দু কাগজপত্র গুছিয়ে ভিতরের দিকে গেলো। বাসন্তী কাগজ কলম নিয়ে লেখবার টেবিলে জাঁকিয়ে বসবার ব্যবস্থা করতে লাগলো।]

বাসন্তী : কী করে যে তুমি শুয়ে শুয়ে লেখো বুঝি না বাবা।
শরদিন্দু : কী করে যে তুমি বসে বসে লেখো বুঝি না বাবা। বিশেষ করে রোববার।

[শরদিন্দু ভিতরে চলে গেলো। বাসন্তী বসলো। ভাবলো। লিখতে শুরু করলো। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেলো ধীরে ধীরে। যখন আলোকিত হোলো, তখন বাসন্তী নেই। ঘর খালি।

সদর দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ। রান্নাঘর থেকে সাড়া দিলো কণা।]

কণা : খুলছি—একটু সবুর করো! শাকটা নামিয়ে যাচ্ছি!

[অল্প পরে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে প্রায় ছুটে কণা দরজা খুললো। খুলে যাকে দেখলো তাকে আশা করেনি।]

ও—আপনি!

নিখিল : সীতানাথ নেই?
কণা : বাজারে গেছে।
নিখিল : বাজারে? কতোক্ষণ হোলো গেছে?
কণা : আসবার সময় হয়ে গেছে। আমি তো ভেবেছিলাম—(থেমে গেলো)
নিখিল : কী ভেবেছিলে? (কণা চুপ) ভেবেছিলে সীতানাথ? (কণা চুপ) সীতানাথের জন্যে বসবো একটু? না ঘুরে আসবো?

[কণার খেয়াল হোলো সে পথ আটকে আছে। অপ্রস্তুত হয়ে পথ ছেড়ে দিলো।]

কণা : আসুন। বসুন, ও এক্ষুনি এসে পড়বে।

[কণা রান্নাঘরের দিকে গেলো]

নিখিল : কণা!

[কণা দাঁড়ালো, কিন্তু নিখিলের দিকে ফিরলো না]

কণা : কী?
নিখিল : সীতানাথ আসবার আগে একটা কথা বলবার ছিল।
কণা : আমার রান্না—
নিখিল : ভয় নেই। সেদিনকার কথা আবার টেনে আনছি না। অন্য কথা।
কণা : (অল্প থেমে) কী, বলুন।
নিখিল : সেদিন যা বলেছি ভুলে যেতে পারো না? (কণা চুপ) আবার আগের মতো সব কিছু হয় না? (কণা চুপ) জানি না তোমাকে কী করে বিশ্বাস করাবো—আমি সেদিন যা বলেছি, তা মনেপ্রাণে—

কণা : ও কথা থাক।

নিখিল : (অল্পক্ষণ তাকিয়ে থেকে) আচ্ছা থাক। (আর একটু থেমে) শুধু একটা কথা তোমাকে বলে রাখতে চাই। আমি আর কখনো ও কথা তুলবো না, শুধু একটা কথা দাও। যদি জীবনে কোনোদিন—কোনোসময়ে—সত্যিকারের প্রয়োজন বোধ করো, আমাকে জানাবে। (কণা নীরব) জানাবে না?

কণা : জানি না।

[নিখিল অল্পক্ষণ চেয়ে থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে সোজা সদর দরজার দিকে গেলো]

কোথায় যাচ্ছেন।

নিখিল : ঘুরে আসছি।

কণা : ও এক্ষুনি আসবে।

নিখিল : আসুক। তার পরে আসবো।

কণা : নিখিলদা। (নিখিল ফিরলো) বসুন।

[নিখিল বসলো না, কিন্তু ভিতরে এক পা এলো]

কথা দিচ্ছি, কোনোদিন দরকার হলে জানাবো।

[নিখিল কথা বললো না, কিন্তু তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।]

বসুন। আমি আসছি।

[রান্নাঘরে গেলো। নিখিল বসলো।]

চা খাবেন তো?

নিখিল : এখন থাক। সীতানাথ আসুক।

কণা : ও জল ফুটতে ফুটতে এসে পড়বে।

নিখিল : (পায়ের শব্দ শুনে) এসে গেছে মনে হচ্ছে।

[ভেজানো দরজা ঠেলে সীতানাথের প্রবেশ। হাতে বাজারের থলি।]

সীতানাথ : নিখিল? তুই কতোক্ষণ?

নিখিল : এই তো?

[সীতানাথ রান্নাঘরের দৃশ্যমান অংশে গিয়ে কণাকে বাজারের থলি দিলো]

সীতানাথ : চা করছো?

কণা : (আড়াল থেকে) জল বসিয়েছি, দেখতে পাচ্ছো না?

সীতানাথ : (নিখিলকে) কী রে, তোর পাত্তাই নেই আজকাল—ব্যাপার কী?

নিখিল : পাত্তা নেই মানে? এই তো সেদিন—

সীতানাথ : সেদিন? বোধ হয় এক মাস এ রাস্তা মাড়াসনি।

নিখিল : তুই এর মধ্যে ক'দিন আমার রাস্তা মাড়িয়েছিস?

সীতানাথ : বাঃ আমি—আমি তোর বাড়ি আবার কবে যেতাম?

নিখিল : তা যাবে কেন? আমি শুধু রোজ তোমার বাড়ি আসবো।

সীতানাথ : জানিস তো—কেন যাই না।

নিখিল : না, জানি না!

সীতানাথ : কতোবার তো বলেছি তোকে—তোর বাড়ির ঐ দারোয়ান, খানসামা, বেয়ারা,

টেরিয়ার, বুলডগ সব পার হয়ে দেখা করা—ও আমার পোষায় না। বলিনি?

নিখিল : হ্যাঁ, বলেছিস। একটা ওয়ার্থলেস ছুতো!

সীতানাথ : আজ আবার নতুন করে ক্ষেপলি কেন?

নিখিল : একে বলে—স্নবারি অফ্ পভার্টি।

সীতানাথ : নাঃ! তুই আজ লড়াইয়ের মুডে আছিস। কই তাড়াতাড়ি চা দাও, নইলে শান্তি রাখা যাচ্ছে না।

নিখিল : (হঠাৎ উঠে) না, চা থাক। আমাকে যেতে হবে।

সীতানাথ : সে কী রে? তুই আজ সত্যি সত্যি রেগে গেলি মনে হচ্ছে?

নিখিল : (অল্প রেগে) রাগতে যাবো কেন? রাগবার কী আছে?

সীতানাথ : কণার হাতের চা না খেয়ে চলে যাচ্ছিস, আর বলতে চাস রাগ করিসনি?

নিখিল : (হঠাৎ সত্যি রেগে) সব কথার একটা উল্টো অর্থ করিস কেন বল তো?

সীতানাথ : (অবাক) উল্টো অর্থ কিসের করলাম?

[নিখিল অল্পক্ষণ সামলাবার বৃথা চেষ্টা করলো]

নিখিল : না আমার—আমার কাজ আছে।

[নিখিল দ্রুত বার হয়ে গেলো। সীতানাথ অবাক হয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে দরজায় গেলো।]

সীতানাথ : এই নিখিল।

[কিন্তু নিখিল চলে গেছে। সীতানাথ দরজা বন্ধ করে রান্নাঘরের কাছে গেলো।]

কী ব্যাপার বলো তো?

কণা : (আড়াল থেকে) কী ব্যাপার আমি কী করে জানবো?

সীতানাথ : না এরকম তো কোনোদিন—

[কণা সীতানাথেব পাশ কাটিয়ে এসে টেবিলে চা রাখলো।]

তোমার চা কই?

কণা : রান্নাঘরে।

সীতানাথ : নিয়ে এসো।

কণা : আমার রান্না করতে হবে না?

সীতানাথ : রোববার তো আজ? তাড়া কিসের?

কণা : উনুন বয়ে যাচ্ছে।

সীতানাথ : যাক বয়ে।

কণা : যাক বয়ে? কয়লা কিনতে পয়সা লাগে না?

[সীতানাথ কণার মুখের দিকে একবার তাকালো। তারপর কিছু না বলে বসে চায়ে মুখ দিলো। কণা অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে রান্নাঘর থেকে নিজের চা নিয়ে এসে বসলো।]

কী?

সীতানাথ : কী?

কণা : চুপ করে আছো যে?

সীতানাথ : কী বলবো?

কণা : আমি কিছু ভেবে বলিনি। এমনি বলেছি।

সীতানাথ : কী বলেছো?

কণা : পয়সার কথা।

[সীতানাথ কথা না বলে চায়ে চুমুক দিলো।]

আমি তো জানি তুমি কেন পয়সা জমাচ্ছো এমন করে।

[সীতানাথ তবু নীরব, যেন একটা অভ্যস্ত অস্বস্তিতে আচ্ছন্ন]

আচ্ছা, আর কতো দেরি আছে?

সীতানাথ : এই তো, আর কিছু টাকা জমলেই—

কণা : (লাফিয়ে উঠে) এ মাসেরটা লেখা হয়নি! (একটা খাতা বার করে) এ মাসে কতো জমা দিয়েছো?

সীতানাথ : যা দিই বরাবর।

কণা : পঞ্চাশ। (লিখে হিসেব করে) তিন হাজার দু'শো আশি। আচ্ছা, সুদ কতো জমেছে তুমি জেনে নিলে না?

সীতানাথ : ওহো, মনে থাকে না। কাল ব্যাঙ্কে গিয়ে জেনে আসবো।

কণা : আচ্ছা, তিন হাজার দু'শো আশিতে একটা ঘরও তোলা যায় না?

সীতানাথ : ও রকমভাবে শুরু করে লাভ নেই—বলেছি তো তোমায়। ওতে আরো বেশি খরচ পড়ে।

কণা : হ্যাঁ, বলেছো। কিন্তু—ধৈর্য থাকে না যে এক এক সময়ে? খালি মনে হয়— জমিটা বিনা কাজে পড়ে আছে।

সীতানাথ : হবে হবে। জমি যখন হয়েছে, বাড়িও হবে।

কণা : উঃ, ভাগ্যিস তখন জমিটা কেনা হোলো! ভাবো, আজ যদি কিনতে হোতো, তবে ঐ জমিই—

সীতানাথ : (হেসে) সেইটাই তো ভরসা। বিপদে আপদে জমিটা অন্তত বেচে—

কণা : (প্রবল প্রতিবাদে) না, কক্ষনো না!

সীতানাথ : বাঃ, বিপদ আপদের কথা কেউ বলতে পারে?

কণা : না, যতো বিপদই হোক, জমি বেচা চলবে না।

সীতানাথ : ধরো তোমার যদি খুব অসুখ করে—

কণা : করুক! জমি বেচতে পাবে না।

সীতানাথ : চিকিৎসা করতে হবে না?

কণা : কোরো। ব্যাঙ্কে না হয় কিছু কম জমবে। তাই বলে জমি বেচা—

সীতানাথ : ধরো—আমার যদি এমন একটা অসুখ হয় যাতে—

কণা : কী সব বাজে কথা বলো—

সীতানাথ : বাজে কথা কেন? মানুষের জীবনে—

কণা : না, আমি শুনতে চাই না ও কথা।

[সীতানাথ হাল ছেড়ে দিলো। এ রকম হাল ছেড়ে দেওয়া যেন তার বেশ কিছু দিনের অভ্যাস।]

সীতানাথ : আচ্ছা। তোমার নিজের বাড়ির এতো সখ কেন বলো তো?

কণা : তুমি তো জানো।

সীতানাথ : জানি? না, বোধ হয় জানি না।

কণা : কতোবার তো বলেছি তোমায়?

সীতানাথ : (খানিকটা আপন মনে) হ্যাঁ, বলেছো। কিন্তু—আমি এখনো ঠিক বুঝতে পারি না।

কণা : বুঝতে পারতে—যদি আমার মতো করে বড়ো হতে।

[সীতানাথ চুপ করে বসে রইলো। কণা ঘরের মধ্যে অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ঘরের টুকিটাকি সাজ-সরঞ্জামে তার চোখ, তার হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। এই টেবিলটা তাদের। ঐ চেয়ার ক'টা, ঐ বুককেসটা, বইগুলি, ফুলদানি, ঐ দরজার পর্দা—সব তাদের। তাদের নিজেদের। কণার নিজের।]

নিজের বলতে একটা জিনিস কখনো পাইনি। ঘর তো দূরের কথা, শাড়ি, জামা—কিচ্ছু না। নিজের বলতে একটা চিরুনি পর্যন্ত ছিল না। তিন বোনে সব কিছু ভাগ। সব কিছু! ক'টাই বা জিনিস ছিল? একটা ফাটা আয়না—ঐ আয়নাটা ভেঙে আমি নাকি খুব মার খেয়েছিলাম। আমার মনে নেই, আমার শুধু ফাটধরা আয়নাটা মনে আছে। বড়দির কাছে শুনেছি। বড়দি মরে গেলো শ্বশুরবাড়িতে মার খেয়ে আর গাধাখাটুনি খেটে। মা কাঁদতো। আর কাশতো। কাশির সঙ্গে রক্ত উঠতো। মা মরে গেলো। চিকিৎসার ভানটাও হোলো না। বড়দি মরে গেলো। মেজদি তো—

[হঠাৎ থেমে গেলো]

সীতানাথ : থাক গে ওসব কথা।

কণা : (আপন মনে) এক এক সময়ে মনে হয়—মেজদি ভালোই করেছে।

সীতানাথ : তোমার চেয়েও?

কণা : আমার সঙ্গে তুলনা কোরো না। আমাব মতো ভাগ্য মেজদির ছিল না!

সীতানাথ : (হেসে) তোমার কী ভাগ্য?

কণা : (কান না দিয়ে) মেজদি স্বামী না পাক—থাকবার যোগ্য একটা আস্তানা পেয়েছে। পরবার মতো কাপড় পেয়েছে। দু'বেলা খেতে পেয়েছে পেট ভরে। কেন যাবে না? আমার মনে হয়—বেশ করেছে গেছে! লোকে যাই বলুক।

সীতানাথ : আমি কি কিছু বলেছি? তুমিই তো এক একদিন গালাগাল করো মেজদিকে।

কণা : ভুল করি। তুমি আছো, মাথার ওপর ছাত আছে, খাওয়া জুটছে—শুধু তাই নয়, জমি হয়েছে, বাড়ি হবে—বাড়ি। নিজের বাড়ি। তাই বুঝতে পারি না। যখন ভাবি—এ সব যদি না থাকতো, আর—কেউ এসে বলতো—তোমাকে খেতে দেবো, পরতে দেবো—

সীতানাথ : থাক ও কথা।

কণা : (না শুনে) যেমন মেজদিকে বলেছিলো—

সীতানাথ : কণা!

কণা : (নিদ্রোত্থিতের মতো) অ্যাঁ?

সীতানাথ : ও সব কথা থাক।

কণা : (খানিকক্ষণ না বুঝে তাকিয়ে থেকে) বাবা যদি বেঁচে থাকতো, কক্ষনো এমন হতে দিতো না। বাবা বেঁচে থাকলে—যেমন করে হোক মেজদিকে—

সীতানাথ : (অহেতুক কর্কশস্বরে) কে বলতে পারে?

কণা : (স্তম্ভিত) কী বলছো তুমি? বাবা বেঁচে থাকলে মেজদিকে ঐ পথ নিতে হোতো?

সীতানাথ : জানি না।

কণা : (আবার আপন মনে) আমি বলেছিলাম—বাবাকে এখানে নিয়ে এসো। হাসপাতালে দিও না। তুমি শুনলে না।

সীতানাথ : (প্রায় রূঢ় স্বরে) হাসপাতাল আগুন লেগে পুড়ে যাবে আমি জানতাম?

কণা : পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। একবার দেখতেও পেলাম না। তুমি একদিনও—একবারও আমাকে হাসপাতালে—

[সীতানাথ ছটফট করে উঠে পড়লো]

সীতানাথ : আমি—আমি একটু ঘুরে আসি।

কণা : অ্যাঁ?

সীতানাথ : আমি একটু ঘুরে আসছি।

কণা : কোথায় যাবে?

সীতানাথ : রাজেনদের আড্ডায় একটু গেঁজিয়ে আসি।

কণা : ও আড্ডা তো তোমার ভালো লাগে না বলো?

সীতানাথ : ভালো না লাগলেই কি সব কিছু ছাড়া যায়? পুরোনো বন্ধুবান্ধব—

কণা : তা যাও না। আমি কি না বলেছি? শুধু—চানটা করে গেলে হোতো না? জল পাবে না নইলে পরে।

সীতানাথ : চান? হ্যাঁ ঠিক—চানটা চুকিয়ে ফেলি। হ্যাঁ, পরে জল পাবো না, ঠিক বলেছো। [ভিতরে গেলো। প্রায় পালালো বলা চলে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কড়া নড়ে উঠলো। কণা দরজা খুলে দিলো।]

আগন্তুক : সীতানাথ চক্রবর্তী বাড়ি আছেন?

কণা : হ্যাঁ। ডেকে দিচ্ছি।

[সীতানাথের প্রবেশ। জামাটা খুলেছে সে।]

সীতানাথ : কে?

আগন্তুক : আপনার নাম সীতানাথ চক্রবর্তী?

[সীতানাথ জবাব দিলো না। কী একটা যেন বুঝতে পারছে সে। একটা ভয়াবহ কিছু। দ্রুত চিন্তা করছে যেন। হঠাৎ সচকিত হয়ে কণার দিকে ফিরলো।]

সীতানাথ : কণা, দেখো তো ভিতরে—আমার জামার পকেটে দেখো তো—একটা ইয়ে আছে—একটা কাগজ আছে দরকারি—দেখো তো একটু—

কণা : (ভিতরের দরজায় গিয়ে) কী কাগজ?

সীতানাথ : একটা চিঠি—টাইপ করা—যদি না পাও, একটু খুঁজে দেখো তো, বাক্সটা দেখো—

[কণার প্রস্থান]

আগন্তুক : আপনি সীতানাথ চক্রবর্তী তো?

সীতানাথ : (কৃত্রিম স্বাভাবিকতায়) অ্যাঁ? না, সীতানাথ চক্রবর্তী এখানে ভাড়াটে ছিল আগে। উঠে গেছে।

আগন্তুক : উঠে গেছে?

সীতানাথ : হ্যাঁ, অনেকদিন। মাস ছয়েক হবে। কেন? কী?

আগন্তুক : কোর্টের সমন আছে। আপনার গড়িয়ার মর্টগেজ জমি নিয়ে মামলা—

সীতানাথ : আমার জমি? আমার জমি কোথায়? সীতানাথের—

আগন্তুক : কেন হয়রানি করাচ্ছেন মশায়? বারো বচ্ছর কোর্ট বেলিফের চাকরি করছি, কিছু বুঝি না ভাবেন?

সীতানাথ : কী বোঝেন, না বোঝেন আমি জানি না। আমার নাম সীতানাথ চক্রবর্তী নয়।

আগন্তুক : ঝুটমুট বাজে কথা বলে কোনো লাভ নেই স্যার। আইনমতো আইডেন্টিফায়ার আপনাকে আইডেন্টিফাই করেছে—যখন আপনি বাজার করে ফিরলেন—

সীতানাথ : কে আইডেন্টিফাই করেছে?

আগন্তুক : সে তো আপনার দরকার নেই জানবার।

সীতানাথ : নিশ্চয়ই আছে! কোথাকার কে একজন—

আগন্তুক : আরে মশায়। আপনার ইস্ত্রী নিজে বললেন—

সীতানাথ : কক্ষনো বলেনি। আপনি কী শুনতে কী শুনেছেন—

[কণার প্রবেশ]

কণা : কই, পেলাম না তো?

আগন্তুক : এই যে, বলুন তো—এনার নাম সীতানাথ চক্রবর্তী নয়?

সীতানাথ : (চাপা দিয়ে) পেলে না? বাক্সটা দেখো আর একটু ভালো করে—

আগন্তুক : (দমবার পাত্র নয়) আমি পয়লা জিজ্ঞেস করতেই আপনি বললেন না—

সীতানাথ : (চেঁচিয়ে) বাজে কথা থাক! কী আছে দাও!

[এই 'দাও' বলাটাই ভুল হোলো। সামনস্ সই করালো আগন্তুক, কিন্তু 'তুমি' সম্বোধনের অপমান হজম করলো না।]

আগন্তুক : ভালো করে কথা বলবেন মশায়। কোর্ট-বেলিফ বলেই 'তুমি' বলে কথা বলবার কোনো রাইট নেই আপনার—

সীতানাথ : আচ্ছা থাক। চুপ করো।

কণা : (অস্ফুটস্বরে) কোর্ট বেলিফ?

আগন্তুক : (আরও উত্তপ্ত) চুপ করবো কেন মশায়? আমার পার্সোনাল ব্যাপার নয়। কোর্টের হুকুমে সমন দিতে এসেছি। চুপ করতে বলার কে আপনি? দেনার দায়ে বন্ধকী জমি নিয়ে মামলা—আর আমাকে বলে—

সীতানাথ : (চিৎকার করে) হয়ে গেছে ও কথা—আর কোনো কথা শুনতে চাই না আমি।

আগন্তুক : মেজাজ! মেজাজ দেখায় আমাকে। ফোতো কাপ্তেন যতো সব—

[গজগজ করতে করতে বার হয়ে গেলো। ঘর নিস্তব্ধ।]

কণা : (চেষ্টা করে) জমি—জমি—জমি নেই?

সীতানাথ : (ঘুরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে) কে বললো জমি নেই?

কণা : কোর্ট—কোর্টের সমন—দেনার দায়ে—

সীতানাথ : সব বাজে কথা! মিথ্যেবাদী জোচ্চোর লোকটা, যতো সব আজে বাজে কথা বলে—

[কিন্তু কণার রক্তশূন্য মুখের দিকে তাকিয়ে সীতানাথের কণ্ঠ দুর্বল হয়ে এলো।]

কণা : (আগের মতো) জমি নেই?

সীতানাথ : (কাছে গিয়ে অনুনয়ের স্বরে) কণা শোনো—জমি আছে। জমির কিছু হয়নি—বিশ্বাস করো। শুধু কয়েকটা দিনের ব্যাপার—সব ঠিক হয়ে যাবে—

কণা : দেনার দায়ে জমি—

সীতানাথ : (অতি দ্রুত) কণা শোনো—আমার বন্ধু, আমার ছোটবেলার বন্ধু—ভীষণ বিপদে পড়েছিলো কণা—দেনা না করে উপায় ছিল না—শুধু একমাস কণা—একমাস পরে টাকা শোধ দিয়ে দেবে সে—

কণা : কতো টাকা?

সীতানাথ : দু' হাজার। একমাস পরে—একমাসও না—

কণা : (হঠাৎ আর্তনাদে) না! না! জমি ছেড়ো না! ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে দিয়ে দাও! এক্ষুনি দিয়ে দাও! দেরি কোরো না! জমি—জমি কেড়ে নিতে দিও না—

[ব্যাঙ্কের নাম করামাত্র সীতানাথ অনিচ্ছায় চমকে উঠেছে। কিন্তু কণা তা লক্ষ্য করেনি।]

সীতানাথ : (কৃত্রিম নির্ভাবনায়) হ্যাঁ, নিশ্চয়। আমি তো তাই ভেবে রেখেছি—ব্যাঙ্ক থেকে তুলে দিয়ে দেবো। আমি তো বলেওছি তাই—তবু যে কেন এ সামন্‌স্ টামন্‌স্—শুধু বিরক্ত করবার জন্যে—

[সীতানাথের কথার অতি নিশ্চিন্ত ভাবটাই কণাকে পাথর করে দিলো আবার। একটা উপলব্ধি—একটা বিভীষিকাময় উপলব্ধি।]

কণা: ব্যাঙ্কের—ব্যাঙ্কের টাকাও কি—

সীতানাথ : কী ব্যাঙ্কের টাকা? ব্যাঙ্কে তিন হাজারের ওপর টাকা আছে—কিসের ভাবনা?

কণা : ব্যাঙ্কে টাকা থাকতে তুমি জমি বাঁধা দিলে কেন? তুমি—তুমি—সব—সব টাকা—

সীতানাথ : কণা, কী পাগলের মতো—

কণা : (হিস্টিরিয়ার চিৎকারে) কিচ্ছু নেই? জমি, টাকা, কিচ্ছু নেই? সব—সব গেছে?

সীতানাথ : সব আছে কণা—ব্যাঙ্কে তিন হাজার—

কণা : মিথ্যে কথা! মিথ্যে কথা!

[কণা ছুটে গিয়ে টেবিলের দেরাজ ধরে টান দিলো। চাবি বন্ধ। হ্যাঁচকা টান মারতে লাগলো আর একভাবে চেঁচাতে লাগলো।]

মিথ্যে কথা! মিথ্যে কথা! মিথ্যে কথা!

[সীতানাথ কণাকে টেবিল থেকে সরাতে চেষ্টা করতে লাগলো। বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু কণা পাগল। এক ঝটকায় খুলে এলো দেরাজ. কাগজপত্র ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। সীতানাথ কিছু করবার আগেই কণা ছোঁ মেরে তুলে নিলো, ব্যাঙ্কের পাসবুক। উদ্‌ভ্রান্ত হাতে পাতা ওল্টাতে লাগলো। এইবার, এতোক্ষণে, সীতানাথ স্তব্ধ হোলো। ধীরে ধীরে মুখ তুললো কণা। পাসবুকটাকে

ছুঁড়ে ফেললো একটা বাজে কাগজের মতো। তারপর চলে গেলো শোবার ঘরে।]

সীতানাথ : কণা!!

[একলাফে শোবার ঘরের দরজায় গেলো। কিন্তু কণা মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। সীতানাথ দরজায় সজোরে করাঘাত করতে লাগলো। তার চোখে ভয়।]

কণা! দরজা খোলো! কণা! আমাকে বলতে দাও। সব কথা বলতে দাও। কণা! আমি কথা দিচ্ছি—সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি দিব্যি করে বলছি! সব ঠিক হয়ে যাবে! দরজা খোলো!

[কণার সাড়া নেই। সীতানাথ ছটফট করে ঘুরে বেড়ালো ঘরে। তারপর আবার ছুটে এলো দরজায়।]

(ভাঙা বিকৃত গলায়) কণা! দরজা খোলো—নইলে দরজা ভেঙে ফেলবো আমি!

[হঠাৎ দরজা খুলে গেলো। কণা বেরিয়ে এলো। শান্ত থমথমে চেহারা। কাপড়টা বাইরে যাবার উপযোগী করে ঘুরিয়ে পড়েছে। পায়ে চটি। হাতে ব্যাগ। সীতানাথ যেন কণাকে জীবিত দেখার আনন্দে কিছু ভালো করে বুঝতে পারলো না।]

সীতানাথ : কণা!

[যেন চেপে ধরবে কণাকে। কিন্তু কণা পাশ কাটিয়ে দ্বিধাহীন পায়ে ঘর পার হয়ে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো। বিস্মিত সীতানাথ বাধা দেবার কথা ভাবতেও পারলো না।]

(সচকিত হয়ে) কণা! (ছুটে সদর দরজায় গিয়ে) কণা! কণা!

[কিন্তু কণা চলে গেছে। সীতানাথ এক ছুটে শোবার ঘরে গেলো। বেরিয়ে এলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জামা গলাতে গলাতে। বেরুতে যাচ্ছে, খোলা দরজায় দেখা গেলো এক শীর্ণকায় বৃদ্ধকে। শীর্ণ মুখে শুধু দু'টো চোখ জ্বলজ্বল করছে। সে চোখে কিছুটা স্বার্থপর ক্রূরতা, কিছুটা উন্মত্ততা। সীতানাথ পাথর হয়ে গেলো।]

আপনি! আপনি এখানে কেন?

[বৃদ্ধ হাসলো। হাসিটা যেন আরও ভয়াবহ।]

বৃদ্ধ . ভয় নেই বাবাজি। ঘাপটি মেরে ছিলাম। কণাকে বেরিয়ে যেতে দেখে তবে ঢুকেছি।

সীতানাথ : আপনি কথা দিয়েছিলেন—বাড়িতে কোনোদিন আসবেন না—

বৃদ্ধ : না এসে উপায় ছিল না বাবাজি। এর আগে কি এসেছি কোনোদিন?

সীতানাথ : আপনি যান। অফিসে আসবেন।

বৃদ্ধ : অফিসেই তো বরাবর এসেছি বাবা। আজ রোববার যে?

সীতানাথ : কাল আসবেন।

বৃদ্ধ : কাল হলে হবে না। আমার আজকেই দশটা টাকা দরকার—নইলে মরে যাবো।

[সীতানাথ অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো বৃদ্ধের দিকে]

সীতানাথ : মরে যাবেন? না, আপনার মৃত্যু নেই। প্রতিদিন কামনা করছি—আপনি মরুন। মরুন। কণা যা জানে তাই সত্যি হোক।

বৃদ্ধ : আবার কণাকে এর মধ্যে টানছো কেন বাবা? দশটা টাকা ফেলে দাও। কণাকে কিচ্ছুটি জানতে দেবো না।

সীতানাথ : দশটা টাকা। আমাদের জমি চলে গেলো। ব্যাঙ্কের টাকা—সব চলে গেলো! কিসের জন্যে? একটা মিথ্যেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে!

বৃদ্ধ : সে মিথ্যে তো তোমারই মতলবে চলেছে বাবা। আমি তো বরাবর বলে আসছি—এ সব লুকোছাপার দরকার নেই—

সীতানাথ : (প্রায় ক্ষেপে) আপনি বলে এসেছেন। আপনি নির্লজ্জ! চুরি করে জেলে গেলেন! বৌকে মেরেছেন। মেয়েকে মেরেছেন! আর একটা মেয়েকে ভাসিয়ে দিয়েছেন! শুধু একটা মেয়ের মনটাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে আমি এতোদিন ধরে—পিশাচ কোথাকার! বলে—লুকোছাপার দরকার নেই।

[বৃদ্ধ নির্বিকার। কিন্তু চোখে আরও ক্রুরতা।]

বৃদ্ধ : মাথা গরম করছো কেন বাবাজি?

সীতানাথ : একটা পয়সা নেই আমার! একটা পয়সা নেই আর! জমিও গেছে! দিনের পর দিন টাকা দিয়ে গেছি শুধু এই ভেবে যে আপনি মরবেন! মরে আমাদের বাঁচাবেন! কণাকে কিছু জানাতে হবে না। তবু পারলাম না। সব জেনে গেলো! সর্বনাশ হয়ে গেলো আমার! আর আপনি এসেছেন মেয়েকে নিজের চেহারা দেখাতে!

বৃদ্ধ : না, মোটেই না—আমি শুধু—

সীতানাথ : (কর্ণপাত না করে) মেয়েকে বলতে—দেখো! আমি মরিনি! হাসপাতালে আগুন লেগে ভদ্রলোকের মতো মরিনি! হাসপাতাল নয়—জেলে গেছিলাম! চুরি করে জেলে গেছিলাম! জেল থেকে বেরিয়ে আফিং খাচ্ছি। জুয়ো খেলছি! তোমাদের পয়সায়। তোমার স্বামী মিথ্যে কথা বলে লুকিয়ে রেখেছে এসব কথা। তোমার বাবা কী—তা বলে দিয়ে তোমাকে খুন না করে আমাকে আফিং খাবার টাকা দিয়েছে! দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে!

বৃদ্ধ : কিচ্ছু বলবো না আমি কণাকে। কিচ্ছুটি জানতে দেবো না। তুমি শুধু দশটা টাকা—

সীতানাথ : টাকা! একটা পয়সা নেই আমার! বেরিয়ে যান আপনি!

বৃদ্ধ : তবে কালই যাবো অফিসে। ব্যাঙ্ক থেকে তুলে দিও।

সীতানাথ : ব্যাঙ্ক!

বৃদ্ধ : ব্যাঙ্কেও নেই? সত্যি কথা বলছো?

সীতানাথ : আপনি বেরিয়ে যান!

[বৃদ্ধ সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালো। বুঝলো সীতনাথ সত্যি বলছে। তারপর হায়নার মতো হাসলো।]

বৃদ্ধ : তবে এবার মেজো মেয়ের বাড়িই যেতে হয়—কী বলো?

সীতানাথ : (স্তম্ভিত) আপনি—আপনার কি এক ফোঁটাও লজ্জা নেই?

বৃদ্ধ : বাবা বুড়ো বয়সে অভাবে পড়লে মেয়ে জামাইয়ের কাছে হাত পাতবে—এতে আর—

সীতানাথ : জামাই!

বৃদ্ধ : ঐ হোলো। জামাইয়ের থেকে ভালো এক হিসেবে। টাকা বেশি। বীণার বুদ্ধি বরাবরই কণার থেকে বেশি ছিল। (সীতানাথ হতবাক) তবে তোমার টাকা ফুরিয়েছে, এইবার কণা বুঝবে ঠিক।

সীতানাথ : (চিৎকার করে) চোপরাও! মিথ্যেবাদী! শয়তান!

বৃদ্ধ : সত্যি মিথ্যে বুঝবে শিগগিরই, এখন থাক ও কথা। গোটা পাঁচেক টাকা খুঁজে পেতে দিতে পারো কি না দেখো না? আমি চলে যাই। (সীতানাথ চেয়ে রইলো শুধু) নেই?

[বৃদ্ধ ধীরেসুস্থে চারিদিকে তাকালো। বুককেসের যে বস্তুটা মূল্যবান মনে হোলো, তুলে নিলো হাতে।]

তবে আর কী হবে? এইটাই বেচে দেখি ক'পয়সা আসে!

[ঠিক এইসময়ে কণা ঢুকলো ঘরে। বৃদ্ধ মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ালো হাতের জিনিসটা আড়াল করে। কণা বৃদ্ধকে একবার দেখলো তাকিয়ে, কিন্তু সে দিকে মন দেবার তার অবস্থা নয়। কথা না বলে ভিতরে চলে গেলো। বৃদ্ধ আড়চোখে দেখে সীতানাথের দিকে তাকিয়ে হাসলো, মুখে তর্জনী চাপা দিয়ে গোপনীয়তার ইঙ্গিত জানালো। তারপর হাতের বস্তুটি সীতানাথকে দেখিয়ে কাপড়ের আড়ালে নিয়ে বেরিয়ে গেলো। এক মুহূর্ত পরে কণা এলো। কাঁধে একটা কাপড়ের থলি। এলোমেলো করে কয়েকটা জামাকাপড় ঢোকানো হয়েছে যেন তাতে।]

সীতানাথ : কোথায় যাচ্ছো?

কণা : চলে যাচ্ছি।

সীতানাথ : চলে যাচ্ছো? কোথায়?

কণা : তা নিয়ে তোমার কী দরকার?

সীতানাথ . কণা, তোমার কাছে কি জমি-বাড়িটাই সব চেয়ে বড়ো? আমি কিছু নই?

কণা : (একটু থেমে) তুমি? তুমিই সব ছিলে—জমি-বাড়ি সব। তুমিই সব কিছু দিয়েছিলে। আবার তুমিই সব নষ্ট করে দিয়েছো।

সীতানাথ : কিন্তু আমি তো আছি!

কণা : না, তুমিও নেই আর। মিথ্যে বলে বলে, চুরি করে—তুমিও নষ্ট হয়ে গেছো। জমি, বাড়ি, তুমি—সব চলে গেছে। স—ব!

সীতানাথ : তুমি কোথায় যাচ্ছো?

কণা : শুনতে চাও? শুনতে ভালো লাগবে?

সীতানাথ : বলো।

কণা : মেজদি যে পথে গেছে।

সীতানাথ : কণা!

কণা : সত্যি কথা বললাম। ঐ আমাদের পথ। ঐটাই সত্যি। তুমি মিথ্যে ছিলে।

সীতানাথ : কণা—তুমি—

কণা : না, আর কিছু বোলো না। আর কিছু বলবার নেই। তুমি তোমার পথে থাকো। আমাকে আমার পথে যেতে দাও। আমাদের পথ। মেজদির আর আমার—

সীতানাথ : কিন্তু মেজদির বাড়িতে তুমি—

কণা : মেজদির বাড়িতে নয়। মেজদির পথে বলেছি।

সীতানাথ : কী বলতে চাও তুমি?

কণা : (একটু তাকিয়ে থেকে) পরে নিজেই জানতে পারতে। তবু যদি শুনতে চাও তো শোনো। আমি নিখিলদার কাছে যাচ্ছি।

সীতানাথ : (কথাটা যেন বোঝেনি) নিখিল?

কণা : হ্যাঁ, নিখিল। তোমার বড়োলোক বন্ধু নিখিল। সব জেনেশুনেই যাচ্ছি—কিছু বোঝাবার চেষ্টা করো না।

সীতানাথ : নিখিল!

কণা : নিখিলদা বলেছিল—যদি কখনো সত্যিকারের দরকার হয়, যেন তাকে বলি। আজ সেই দরকার হয়েছে।

[সীতানাথ আচ্ছন্ন। কিছু যেন মাথায় ঢুকছে না তার।]

সীতানাথ : নিখিল!

[কণা দরজার কাছে গেলো। সীতানাথ যেন জানতেই পারলো না। কণা ফিরে দাঁড়ালো।]

কণা : হয় তো এতো দরকারেও যেতে পারতাম না—তুমি নেই, তবু যেতে পারতাম না—যদি বাবা বেঁচে থাকতো।

[বোধ হয় এইটাই বাকি ছিল]

তোমাকে আঁকড়ে—একটা মিথ্যেকে আঁকড়ে পড়ে থাকতাম—শুধু বাবার কাছে মুখ রাখবার জন্যে। কিন্তু বাবা নেই, আর আমার লজ্জা নেই।

[কণা চলে গেলো। সীতানাথ আচ্ছন্ন হয়ে বসে রইলো। উঠলো। অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে বেড়ালো। তারপর উপরের দিকে তাকালো। ঘরের ছাতে কী যেন খুঁজছে। সম্মোহিতের মতো রান্নাঘরে গেলো। বেরিয়ে এলো। হাতে একগাছা লম্বা শণের দড়ি। দড়িটা হাতে নিয়ে আবার ছাতের দিকে তাকালো। পর্দা বন্ধ হোলো ধীরে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[বাসন্তী গল্প পড়ে শোনাচ্ছে, শরদিন্দু এলিয়ে বসে শুনছে।]

বাসন্তী : কণা চলে গেলো। সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ মৃদু হয়ে মিলিয়ে গেলো আর পাঁচটা শব্দের তরঙ্গে। সীতানাথ আচ্ছন্ন হয়ে বসে রইলো। পাঁচমিনিট। দশমিনিট। কতোক্ষণ কে জানে? হয়তো কয়েক মুহূর্ত। রান্নাঘরের কোণে লম্বা দড়িটা কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রয়েছে। আজ সকালেই সেটা দেখেছে সীতানাথ। দড়িটা এখন তার হাতে। কখন সে রান্নাঘরে গেছে—জানে না। কখন তুলে নিয়েছে দড়িটা, ফিরে এসেছে এ ঘরে—জানে না সীতানাথ, শুধু জানে দড়িটা তার হাতে। আর জানে একটা বাঁকানো লোহার হুক—মাথার ওপর, কড়িকাঠে।

[গল্প শেষ হোলো। বাসন্তী খাতা বন্ধ করে উৎসুক চোখে শরদিন্দুর দিকে তাকালো। শরদিন্দু উঠলো। চশমা খুলে পরিষ্কার করলো। আবার পরলো।]

কী?

শরদিন্দু : অ্যাঁ?

বাসন্তী : কিছু বলবে না?

শরদিন্দু : তোমার সম্পাদক হয়তো—

বাসন্তী : সম্পাদকের কথা সম্পাদক বলবে। তুমি তোমার কথা বলো তো?

শরদিন্দু : একটু—নাটকীয় হয়ে গেছে না?

বাসন্তী : (মনে মনে দমে গিয়ে) তা আত্মহত্যা ঘটনাটাই তো নাটকীয়!

শরদিন্দু : হ্যাঁ, বলতে পারো। কিন্তু তোমার গল্পে নাটকীয়তাটা কোনো কোনো জায়গায় যেন অবাস্তব হয়ে উঠেছে।

বাসন্তী : যথা?

শরদিন্দু : এই যে একটা মিথ্যেকে বাঁচিয়ে রাখতে সীতানাথ সর্বস্ব খোয়ালো—এটা কি খুব বাস্তব? মানে, এ রকম কি সাধারণ, স্বাভাবিক মানুষে করে?

বাসন্তী : আত্মহত্যাও তো সাধারণ স্বাভাবিক মানুষে করে না।

শরদিন্দু : কিন্তু সীতানাথ যে স্বাভাবিকের বাইরে, সেটা তো পরিষ্কার করে দেখাওনি কোথাও?

বাসন্তী : হ্যাঁ, তা ঠিক।

শরদিন্দু : তা ছাড়া অতোদিন ধরে এইরকম একটা ব্যাপার কি নিজের স্ত্রীর কাছে চাপা রাখা যায়?

বাসন্তী : তা কে বলতে পারে? তুমি রাখতে পারতে না—এইটুকু বলতে পারি।

শরদিন্দু : আচ্ছা, সে কথা থাক। কিন্তু চাপা রাখা কেন? শুধু কণার জন্যে?

বাসন্তী : 'শুধু কণা' বলছো কেন? আমি ধরে নিচ্ছি—কণা ছাড়া সীতানাথের জগতে অন্য কিছু ছিল না।

শরদিন্দু : এবং শেষ অবধি কণাও রইলো না—এই তো?

বাসন্তী : ঠিক তাই। এমন কি হয় না?

শরদিন্দু : হয়তো হয়। কিন্তু—আচ্ছা কণা, কণাকে তুমি কী দেখাতে চাইছো?

বাসন্তী : তুমি কী দেখছো?

শরদিন্দু : কণা যে নিখিলের কাছে গেলো, সে কি টাকার জন্যে? না, নিখিলকে সত্যিই ভালোবেসেছিলো বলে?

বাসন্তী : কণা কাউকেই সত্যি সত্যি ভালোবাসেনি। নিখিলকেও না, সীতানাথকেও না। ছোটবেলার একটানা দারিদ্র্য তাকে শুধু একটা জিনিসই শিখিয়েছে—দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাবার ইচ্ছে। টাকার লোভ নয়, নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের লোভ।

শরদিন্দু : যুক্তি হয়তো দেওয়া যায়, কিন্তু—

বাসন্তী : কিন্তু গল্পটা তোমার ভালো লাগেনি, এই তো?

শরদিন্দু : না না, তা কেন? তবে—আমি হলে এভাবে দেখতাম না ব্যাপারটাকে।

বাসন্তী : কীভাবে দেখতে?

শরদিন্দু : আমার মতে—আত্মহত্যা যদি কেউ করে, তবে বুঝতে হবে তার মনে কোথাও কোনো একটা অস্বাভাবিকতা বাসা বেঁধে ছিল। অনেকদিন ধরে ছিল! অর্থাৎ সে সুস্থ ছিল না।

বাসন্তী : হঠাৎ প্রচণ্ড শক পেলে সুস্থ লোক আত্মহত্যা করে না?

শরদিন্দু : হয়তো করে। কিন্তু ওভাবে আমি ব্যাপারটাকে দেখতে পারছি না। বিশেষ করে এই ক্ষেত্রে।

বাসন্তী : তার মানে তোমার মাথায় নিশ্চয় কিছু এসেছে?

শরদিন্দু : (হেসে) সত্যি কথা বলতে কী—সারা সকাল আমি এই নিয়েই ভেবেছি। প্রবন্ধ লেখা কিছুই এগোয়নি। মাথা থেকে তাড়াতে পারছিলাম না সীতানাথকে।

বাসন্তী : কী ভেবেছো?

শরদিন্দু : ধরো—সীতানাথ যদি—

বাসন্তী : না দাঁড়াও, বোলো না! লিখে ফেলো।

শরদিন্দু : লিখবো কী? আমি গল্প লিখতে পারি না কি?

বাসন্তী : খুব পারো। যা পারো লেখো।

শরদিন্দু : আরে যাঃ!

[ততোক্ষণে বাসন্তী শরদিন্দুর হাতে কাগজ গুঁজে দিয়েছে]

বাসন্তী : লেখো লেখো। তুমি যা ভেবেছো তাতে হয়তো আরো ভালো গল্প পাওয়া যাবে।

শরদিন্দু : বেশ তো, আমি বলছি, শোনো না—

বাসন্তী : ও বলে হয় না। লিখতে হলে তুমি আরো পরিষ্কার করে ভাববে। লেখো না বাবা, কেন অমন করছো?

শরদিন্দু : এখন?

বাসন্তী : হ্যাঁ, এখন।

শরদিন্দু : এই বললে মণিদের বাড়ি যাবে?

বাসন্তী : সে তো বিকেলে, এখনো বহু দেরি। আর সে তো কাল গেলেও চলে। লেখো লেখো।

শরদিন্দু : তুমি?

বাসন্তী : আমার একরাশ কাজ। সারা সকাল কিছু করা হয়নি গল্প লিখতে গিয়ে। মশারি-চাদর কাচতে হবে, ঘর গোছাতে হবে। সেলাই-ফোঁড়াই বহু কাজ।
[বাসন্তী চলে গেলো ভিতরে। শরদিন্দু অল্প ভাবলো; তারপর কাগজ ছেড়ে উঠে পড়লো।]

শরদিন্দু : দূর এ হয় নাকি? এই বাসন্তী?

[বাসন্তীর সাড়া পাওয়া গেলো না]

শুনছো? বাসন্তী!

[তবু সাড়া নাই। শরদিন্দু ধীরে ধীরে ফিরে এলো টেবিলে। চিন্তিত। একটা বই তুললো। নামিয়ে রাখলো। একবার পায়চারি করলো। তারপর হঠাৎ বসে লিখতে শুরু করলো। আলো কমে এলো ক্রমে। অন্ধকারের আড়ালে শরদিন্দু মঞ্চ ছেড়ে

গেলো। শূন্য মঞ্চ আলোকিত হোলো আবার। কড়া নাড়ার শব্দ। কণা রান্নাঘর থেকে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে দরজা খুলে দিলো। বিজয়ের প্রবেশ।]

কণা : কী ব্যাপার বিজয়দা? আপনার পাত্তাই নেই?

বিজয় : (হেসে) দু'দিন তো মোটে আসিনি।

কণা : বেছে বেছে দু'টো দিন বাদ দিয়েছেন!

বিজয় : কেন? কী হয়েছে?

কণা : কিছু না, বসুন।

বিজয় : সীতানাথ কোথায়?

কণা : চান করতে গেছে। বসুন।

বিজয় : বেছে বেছে দু'দিন বললে কেন?

কণা : ও দু'দিন ধরে ভালো নেই।

বিজয় : কী হয়েছে? শরীর খারাপ?

কণা : না, শরীর নয়। অস্থির হয়ে আছে বড়ো।

বিজয় : (একটু থেমে) আগের মতো?

কণা : না, অতোটা নয়—এখনো—তবে—(থেমে গেলো)

বিজয় : কী ঘটেছে জানো?

কণা : না। পরশু স্কুল থেকে একটা বই নিয়ে এলো। অনেক রাত অবধি পড়লো। তারপর থেকে ছটফট করছে খালি। বাকি রাতটা ঘুমোয়নি বলতে গেলে। কালও অমনি—

বিজয় : কী বই?

কণা : জানি না। আমাকে দেখাতে চায়নি। আড়াল করে করে রাখছিলো। আমিও জানতে চাইনি।

বিজয় : আছে বাড়িতে বইটা?

কণা : (একটু থেমে) সেইটাই কথা।

বিজয় : কী কথা?

কণা : ভোর রাত্রে ঘুম ভেঙে দেখি ঘরে নেই। রান্নাঘর থেকে আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এসে দেখি বইটার পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে পোড়াচ্ছে। আমার সাড়া পেয়ে এমনভাবে তাকালো—ভয় পেয়ে গেলাম।

বিজয় : কিছু জিজ্ঞেস করোনি?

কণা : সাহস হোলো না। একবার তাকিয়েই আবার একমনে পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে আগুনে দিতে লাগলো। মুখ না তুলেই বললো—যাও শুয়ে পড়ো গে। আমি—আমি চলে এলাম।

বিজয় : তারপর?

কণা : কালকেও সারা সন্ধে পায়চারি করে কাটিয়েছে। বার কয়েক বললো—বিজয় আসছে না কেন? সত্যি, আপনার ওপর এতো রাগ হচ্ছিলো কাল—খালি ভাবছিলাম এলে বাঁচি।

বিজয় : আমি আটকে পড়েছিলাম।

কণা : কাল সারারাত— (থেমে গেলো)

বিজয় : কী? ঘুমোয়নি?

কণা : না, ঘুমিয়েছে। ঘুমিয়েছে খানিকটা। কিন্তু—

বিজয় : ঘুমের মধ্যে কথা বলেছে আবার?

কণা : হ্যাঁ।

বিজয় : কী কথা?

কণা : বেশির ভাগই বুঝতে পারিনি—

বিজয় : যেটুকু বুঝতে পেরেছো, বলো।

কণা : এমনি সব আজে বাজে কথা—

বিজয় : (অল্প থেমে) কণা?

কণা : কী?

বিজয় : সীতানাথ ঘুমের মধ্যে কথা বললে তুমি ভয় পাও, কিন্তু কী কথা বলে আমাকে বলতে চাও না কেন?

কণা : বললাম তো—

বিজয় : বুঝতে পারি এমন কোনো কথা যা তুমি গোপন রাখতে চাও—

কণা : না, বিশ্বাস করুন বিজয়দা—

বিজয় : কিন্তু তুমি তো জানো—আমি কেন জানতে চাইছি? (কণা চুপ) সীতানাথের ছাত্ররা, সহকর্মীরা, বন্ধুরা—প্রত্যেকে ওকে শ্রদ্ধা করে। এমন অনেকে আছে—যারা ওকে দেবতা মনে করে। শুধু তুমি জানো, আর আমি জানি—সীতানাথ রোগী।

কণা : কিন্তু একে কি—রোগ বলবেন?

বিজয় : রোগ যদি না মনে করো, তবে এতো ভয় পাচ্ছ কেন? (কণা চুপ) গতবার দেখেছি—চার পাঁচ দিন সীতানাথ যেন অন্য জগতে বাস করেছে। কথা বলে সাড়া পাইনি। সারাদিন অন্যমনস্ক। রাত্রে—তুমিই বলেছো—রাত্রে ঘুমোয়নি। আর যেটুকু বা ঘুমিয়েছে—ভুল বকেছে। তুমিই বলেছো সে কথা। শুধু কী বলেছে ঘুমের মধ্যে—আমাকে তা বলতে পারোনি।

কণা : (দুর্বলভাবে) বলেছি তো—

বিজয় : যা বলেছো তা সব নয়। আমি তখনই বুঝেছিলাম তুমি সব বলোনি। জিজ্ঞেস করিনি এই ভেবে যে, বলবার হলে নিজেই বলতে। নিশ্চয় এমন কোনো কথা যা—

কণা : বিজয়দা, বিশ্বাস করুন—গোপনীয় কোনো কথা নয়। যা বলে তার কোনো মানে হয় না। কতগুলো নাম, টুকরো কথা, কোনো মানে হয় না তার—

বিজয় : কী নাম? কী কথা?

কণা : এমনি হয়তো একটা জায়গার নাম, কিম্বা—

বিজয় : চম্বলগড়?

কণা : (চমকে) আপনি কী করে জানলেন?

বিজয় : কণা! চম্বলগড়ে কী হয়েছিলো?

কণা : চম্বলগড়ের কথা আপনি কী করে জানলেন?

বিজয় : যেমন করেই জানি—

কণা : (উৎকর্ণ) ওর চান হয়ে গেছে! (চেঁচিয়ে) শুনছো?

সীতানাথ : (ভিতর থেকে) কী?

কণা : বিজয়দা এসেছে।

সীতানাথ : (ভিতর থেকে) যাচ্ছি।

কণা : (বিজয়কে) দাবাবোড়ে দেবো?

বিজয় : না। আচ্ছা হ্যাঁ—দাও।

[কণা দাবার ছক আর ঘুঁটি বার করে দিলো। বিজয় অন্যমনস্কভাবে সাজাতে লাগলো।]

কণা : আমি রান্না চড়াই। চা এখন দেবো, না পরে?

বিজয় : পরে হবে।

[কণা রান্নাঘরে গেলো। সীতানাথ এলো। সীতানাথের মুখের প্রত্যেকটি মাংসপেশী যেন টান হয়ে আছে। চোখ দু'টোতে জ্বালা। প্রায় অস্বাভাবিক চোখের দৃষ্টি থেকে থেকে যেন বাইরের বস্তুগুলিকে ছেড়ে ভিতরে চলে যাচ্ছে। কিছু একটা খুঁজছে যেন মনের কোনো কোটরে।]

সীতানাথ : (অন্যমনস্কভাবে) অনেকদিন আসিসনি।

বিজয় : ক'দিন?

সীতানাথ : তা দিন চার পাঁচ হবে।

বিজয় : দু'দিন আসিনি শুধু। কাল আর পরশু।

সীতানাথ : দু'দিন? আমি ভেবেছিলাম আরো বেশি।

[সীতানাথ যা বলছে তাতে তার মন নেই। আঙুলগুলি দাবার ঘুঁটি নাড়াচ্ছে—সাজাচ্ছে না। বিজয় লক্ষ্য করছে সীতানাথকে।]

বিজয় : (ধীরে) স্কুলে কিছু ঘটেছে?

সীতানাথ : অ্যাঁ? হ্যাঁ।

বিজয় : কী?

সীতানাথ : (একটা নিঃশ্বাস ফেলে) একটা ছেলেকে এক্সপেল করে দিতে হোলো।

বিজয় : কী করেছিলো?

[সীতানাথের দৃষ্টি সাময়িকভাবে বিজয়ের দিকে ফিরলো]

সীতানাথ : যা করেছিলো তাতে এক্সপেলড্ হওয়াটা সব চেয়ে কম শাস্তি। আসলে তাকে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে চাবুক মারা উচিত ছিল।

বিজয় : সীতানাথ!

সীতানাথ : কী?

বিজয় : না, কিছু না। তোর মুখে ওরকম কথা শোনা অভ্যাস নেই তো! তুই জীবনে কখনো কারো গায়ে হাত তুলেছিস আজ অবধি?

[সীতানাথের হাত সহসা চার পাঁচটা ঘুঁটি উল্টে ফেললো ছকের উপরে। সীতানাথ উঠে পড়লো চেয়ার ছেড়ে। অস্থিরভাবে চলে গেলো একদিকে—বিজয়ের দিকে পিছন ফিরে।]

কী করেছিলো?

সীতানাথ : ক্লাসে—আমার ক্লাসে—লুকিয়ে একটা বই পড়ছিলো। একটা জঘন্য বই!

বিজয় : জঘন্য মানে—ব্লু বুক?

সীতানাথ : (অস্বাভাবিক জোর দিয়ে) হ্যাঁ, ব্লু বুক! তবে খোলা বাজারে বিক্রি হয়। ভারত সরকারের দয়ায়।

[বিজয় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো। কড়া নাড়ার শব্দ।]

(চেঁচিয়ে) খোলা আছে।

[দরজা ঠেলে বিধুভূষণবাবুর প্রবেশ। বয়স ষাটের উপর। শান্ত সৌম্য চেহারা—কিন্তু দুর্বল নয়।]

এ কী! আপনি? আপনি এখানে—

বিধু : কেন? আসতে নেই?

সীতানাথ : আমাকে খবর দিলে আমিই তো যেতাম।

বিধু : না হয় আমিই এলাম। তফাৎটা কী? এখনো অতো অথর্ব হইনি।

সীতানাথ : বসুন। আমার স্কুলের বন্ধু বিজয় সেনগুপ্ত। ইনি আমাদের স্কুলের সেক্রেটারি—বিধুভূষণবাবু।

বিধু : (হেসে) আমি ভেবেছিলাম—অন্য পরিচয়টা দেবে। (বিজয়কে) সীতানাথ আমার ছাত্র। কলেজে আমার কাছে পড়েছে।

সীতানাথ : (নীরস কণ্ঠে) আপনি কেন এসেছেন আমি জানি।

বিধু : (হেসে) সেইজন্যেই কি স্কুলের সেক্রেটারি বলে পরিচয় দিলে?

সীতানাথ : আমি অপেক্ষা করছিলাম কখন আপনি ডেকে পাঠাবেন। আমি তৈরি ছিলাম। আপনি এলেন কেন?

বিধু : ক্ষতি কী?

সীতানাথ : ক্ষতি আছে। আমার ক্ষতি। ডেকে পাঠালে আমার পক্ষে অনেক সহজ হোতো।

[সীতানাথ ঘরের অন্যদিকে, পিছন ফিরে। নিজেকে শক্ত করছে সে।]

বিধু : সীতানাথ, তুমি তো জানো—তুমি যখন আমার ছাত্র ছিলে তখন থেকেই আমি তোমাকে কতোটা শ্রদ্ধা করি, বিশ্বাস করি, তোমার—

সীতানাথ : (সহসা রূঢ় স্বরে)—আপনি স্কুলের সেক্রেটারি হিসেবে কথা বলুন। আমি হেডমাস্টার হিসেবে জবাব দিচ্ছি।

বিজয় : সীতানাথ!

[সীতানাথের সংযমের বাঁধ যেন ভেঙে পড়লো বিজয়ের কথায়।]

সীতানাথ : (প্রায় চিৎকার করে) তুই চুপ কর বিজয়! তুই এর মধ্যে কথা বলিস না!

[অল্পক্ষণ নীরবতা। বিধুভূষণ আঘাত পেয়েছেন, কিন্তু সীতানাথকে বোঝেননি তা নয়।]

বিধু . বেশ। সেক্রেটারি হিসেবেই বলছি। অশোক ভাল ছাত্র। পরপর দু'বছর ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে উঠেছে—

সীতানাথ : তাতে অপরাধের গুরত্ব কমে না।

বিধু : না, কিন্তু শাস্তির গুরত্ব কমতে পারে। এটা তার প্রথম অপরাধ—

সীতানাথ : প্রথম অপরাধ যদি খুন হয়, তবে ফাঁসি যেতে হয় অনেক সময়ে।

বিধু : কিন্তু এ তো খুন নয়।

সীতানাথ : ফাঁসির হুকুমও তার হয়নি। স্কুল থেকে নাম কেটে দেওয়াটা এক্ষেত্রে সব চেয়ে কম শাস্তি বলে আমি মনে করি।

বিধু : এক্সপেল করে দেওয়ার চেয়ে বড়ো শাস্তি আমরা আর কী দিতে পারি?

সীতানাথ : না, পারি না। ওর যা অপরাধ তার তুলনায় অতি সামান্য শাস্তি বাধ্য হয়েই আমাদের দিতে হচ্ছে। তাই শাস্তি কমাবার আর কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

বিধু : সীতানাথ শোনো। একটা বই সে পড়ছিলো—

[সীতানাথ হঠাৎ বিধুভূষণের দিকে ফিরলো। তার চোখে অস্বাভাবিক একটা জ্বালা। হাত কাঁপছে।]

সীতানাথ : 'একটা বই' নয়—জগতের জঘন্যতম বই! বিষাক্ত বই! চরমতম বিকৃতির নির্লজ্জ বর্ণনা! এসপ্ল্যানেডে পুলিসকে লুকিয়ে যে অশ্লীল বই বিক্রি হয়—তাও বোধ হয় এর তুলনায় ধর্মগ্রন্থ! আপনি যদি পড়তেন, তবে বুঝতে পারতেন!

বিধু : আমি পড়িনি, স্বীকার করছি। কিন্তু বইটাকে বিদেশে অনেকে সাহিত্য বলে মেনেছে। ভারতবর্ষেরও একজন পণ্ডিত ব্যক্তি বইটাকে বে-আইনি করবার মতো কিছু পাননি বলেছেন—

সীতানাথ : সেটা ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য! ঐসব তথাকথিত পণ্ডিতদের জন্যে এইরকম একটা বই ভারতবর্ষের খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে! যে বই বয়স্ক লোকের পড়লে ক্ষতি হয়, সেই বই অশোকের মতো চোদ্দ পনেরো বছরের ছেলেরা পড়ছে! না স্যার! অশোককে এক্সপেল না করে আমরা কোনো উপায় নেই!

বিধু : (ধীরে) যে বই খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে, তা পড়বার জন্যে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়াটা লঘুপাপে গুরুদণ্ড হবে সীতানাথ।

সীতানাথ : (চিৎকার করে) চতুর্দিকে চুরি হচ্ছে, ঘুষ চলছে—তাই বলে আপনার ছেলে চুরি করলে আপনি তাকে শাস্তি দেবেন না? আপনি কি মনে করেন অশোক আমার কাছে কিছুই না? অশোক সান্যাল শুধু খাতায় লেখা একটা নাম—কেটে দিলে কিছু যায় আসে না আমার? (অন্য স্বরে) আজ সারাটা দিন সমস্ত স্কুল থমথমে হয়ে রয়েছে—ছাত্রদের মুখে কথা নেই, টীচারদের ঘরে হাসিগল্পের আওয়াজ নেই, বেয়ারারা পা টিপে হাঁটছে, দারোয়ান ফটকে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে—তবু একটা ছাত্র, একজন টীচার আমার কাছে এসে বলেনি—অশোককে তাড়িয়ে দেবেন না! (আবার চিৎকার করে) কেন জানেন? ওরা জানে অশোককে তাড়িয়ে দেওয়াটা আমার কাছে কী! ওরা জানে অন্য কোনো উপায় থাকলে এ আমি করতাম না। তাই বলতে আসেনি। কিন্তু আপনি এসেছেন!

[সীতানাথের সমস্ত শরীর কাঁপছে। দু'হাতে একটা চেয়ারের পিঠ ধরে নিজেকে খাড়া রেখেছে। সীতানাথের চিৎকারে উৎকণ্ঠিত কণা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে খানিকক্ষণ আগে। বিজয় উঠে দাঁড়িয়েছে, যেন দরকার হলে সীতানাথকে ধরবে। বিধুভূষণ স্তব্ধ।]

বিধু : (অল্প পরে, শান্ত স্বরে) হ্যাঁ সীতানাথ। আমি এসেছি। ওরা তোমার কাছে আসেনি, কিন্তু দলে দলে আমার বাড়িতে এসেছে। নালিশ জানাতে নয়। তোমার ওপর নালিশ করবার কথা তোমার স্কুলের ছাত্র মাস্টার কেউ ভাবতে পারে না। তবু এসেছে শুধু একটা প্রশ্ন নিয়ে—কোনো উপায় আছে কি? (অল্প থেমে) তুমি বইটা আমাকে দাও, আমি পড়ে দেখি।

সীতানাথ : বইটা আমি ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলেছি।

বিধু : আচ্ছা, আমি যোগাড় করে নেবো—কিন্তু একটা কথা দাও। যদি পড়ে আমার মনে হয়—ও বই পড়ার অপরাধে অশোকের এক্সপেল্ড্ হওয়াটা গুরুদণ্ড হচ্ছে, তুমি মানবে কি?

সীতানাথ : (একটু থেমে) মানবো। কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিতে হবে।

বিধু : তার মানে তুমি—

সীতানাথ : আমি রিজাইন্ করবো।

বিধু : একে কি মানা বলে?

সীতানাথ : আমার চেয়ে যোগ্য লোক অনেক আছে।

বিধু : (নিশ্বাস ফেলে) চলি তাহলে।—বৌমা কোথায়?

[রান্নাঘরের দরজা থেকে এগিয়ে এসে কণা বিধুভূষণকে প্রণাম করলো।]

বিধু : ওহো, তুমি এখানেই ছিলে? আমি দেখতে পাইনি।

কণা : চা খাবেন তো?

বিধু : না না, কিছু না, কিছু না। আর একদিন হবে। (বিজয়কে) চলি।

সীতানাথ : আমি—মন্মথবাবুকে বলতে পারি—বইটা কিনে আপনার বাড়ি—

বিধু : (হেসে) বইটা আর কী কাজে লাগবে? চলি বৌমা। এসো একদিন। সীতানাথ, তুমিও অনেক দিন আসোনি। গৌরী তো কাকাবাবু কাকাবাবু করে মাথা খেয়ে ফেললো। (বিজয়কে) গৌরী আমার নাতনি—সীতানাথের অন্ধ ভক্ত! চলি আজ!

[বিধুভূষণ চলে গেলেন। সীতানাথ একটা চেয়ারে বসে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। বিজয় সীতানাথের দিকে চিন্তিতভাবে চেয়ে আছে। কণার দৃষ্টি উৎকণ্ঠিত।]

কণা : চা করবো এখন? (সীতানাথ শুনতে পেলো না)

বিজয় : (চোখ না সরিয়ে) করো।

[কণা রান্নাঘরে চলে গেলো।]

বইটা কী? (সীতানাথ শুনতে পেলো না। আরো জোরে) বইটা কী?

সীতানাথ : অ্যাঁ?

বিজয় : কী বই পড়ছিলো অশোক?

[সীতানাথের চোখের জ্বালা আবার ফিরে এলো]

সীতানাথ : লোলিটা।

বিজয় : নাবোকোভের লোলিটা?

সীতানাথ : নাবোকোভের লোলিটা। তুই যদি পড়তিস বইটা, তবে বুঝতে পারতিস কেন অশোককে এক্সপেল করতে হয়েছে। (সীতানাথ আবার উত্তেজিত হয়ে উঠে

পড়লো) তোর মনে আছে—কিছুদিন আগে তুই আমাকে পেঙ্গুইনের বার করা লেডি চ্যাটার্লিজ্ লাভার পড়তে দিয়েছিলি? লরেন্সের মূল বইটা? মনে আছে?

বিজয় : মনে আছে।

সীতানাথ : আমি পড়ে তোকে কী বলেছিলাম মনে আছে?

বিজয় : বলেছিলি—এ বইটা এতোদিন ধরে কেন আটকে রাখা হয়েছিলো!

সীতানাথ : একজ্যাক্টলি! যদি ঐ বইটা অশোককে পড়তে দেখতাম—তাকে এক্সপেল করবার কথা ভাবতাম না।

বিজয় : কেন?

সীতানাথ : কেন? তার কারণ লেডি চ্যাটার্লি স্বাভাবিক। অনেক নীতিবাগীশ বইয়ের চেয়ে স্বাভাবিক। অশোকের বয়সের ছেলের উপযোগী হয় তো নয়, কিন্তু তবুও ও বই পড়লে মারাত্মক ক্ষতি কিছু বোধ হয় হোতো না। কিন্তু লোলিটা—অস্বাভাবিক। বিকৃত! লোলিটা একটা ছোট মেয়ে—বারো বছরের বাচ্চা মেয়ে—তাকে নিয়ে—সে না পড়লে তুই ধারণা করতে পারবি না!

বিজয় : (স্থিরকণ্ঠে) আমি পড়েছি।

সীতানাথ : (থমকে) পড়েছিস?

বিজয় : হ্যাঁ, পড়েছি।

[সীতানাথ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে বিজয়ের দিকে তাকালো।]

সীতানাথ : তোর—মনে হয় না—অশোককে এক্সপেল করা উচিত হয়েছে?

[বিজয় নীরবে দাবার ঘুঁটি সাজাতে লাগলো]

বল! মনে হয় না তোর?

বিজয় : (দাবার চাল দিয়ে) নে খেল।

সীতানাথ : বিজয়, তুই যদি—

বিজয় : খেল!

সীতানাথ : না। আগে তুই আমার প্রশ্নের জবাব দে।

বিজয় : (সিধে হয়ে বসে মুখ তুলে) বেশ, দিচ্ছি! লোলিটা পড়া—বিশেষ করে ক্লাসে বসে পড়া অশোকের পক্ষে খুব অন্যায় হয়েছে। কিন্তু তার জন্যে তাকে এক্সপেল করা চলে না।

সীতানাথ : (অল্পক্ষণ তাকিয়ে থেকে) বিজয় তুই—তুই লোলিটা পড়িসনি!

[বিজয় শুধু হাসলো]

(চিৎকার করে) লোলিটা একটা নাবালিকা মেয়ে!

বিজয় : তাতে কী?

সীতানাথ : বিজয়, বিজয়! তুই জানিস না তুই কী বলছিস! কী জঘন্য অস্বাভাবিক বিকৃতির তুই সমর্থন করছিস!

বিজয় : আমি বিকৃতির সমর্থন করছি না। লোলিটার লেখকও তা করেনি। লেখক বলেনি—এমনি করো। বলেছে—এরকম হয়।

সীতানাথ : (প্রায় আর্ত চিৎকারে) কক্ষনো হয় না!

[কণা আবার উৎকণ্ঠিত হয়ে রান্নাঘরের দরজায় বেরিয়ে এলো]

বিজয় : বিকৃতিটাকে অস্বীকার করলেই কি তার অস্তিত্ব চলে যাবে?

সীতানাথ : (দম বন্ধ হওয়া গলায়) বিজয়—তুই—

কণা : (ছুটে এসে) শোনো—ওরকম কোরো না—

বিজয় : (উঠে চড়া গলায়) না কণা। ওকে বলতে দাও!

[কণা সরে গেলো। কিন্তু বিজয়ের গলা শুনে সীতানাথ থমকে দাঁড়ালো। বিজয়ের দিকে তাকালো। দৃষ্টিতে কিছুটা যেন ভয়। বিজয় সমানে চেয়ে রইলো সীতানাথের দিকে। আস্তে আস্তে সীতানাথ বসলো। দাবার চাল দিলো। বিজয়ও বসলো। পাল্টা চাল দিলো। অন্যমনস্ক সীতানাথ একটা ঘুঁটি এগিয়ে দিলো।]

ওটা কী দিচ্ছিস?

সীতানাথ : অ্যাঁ?

বিজয় : ওটা কী দিচ্ছিস তুই?

সীতানাথ : ও।

[চাল ফিরিয়ে নিলো। দাবায় মন দেবার চেষ্টা করলো। তারপর উঠে পড়লো এক ঝটকায়।]

বিজয়, তুই—তুই বোস। আমি আসছি এক্ষুনি।

কণা : কোথায় যাচ্ছো?

সীতানাথ : এই একটু—এই মোড় থেকে একটু—আমার মাথাটা ধরে উঠেছে, একটু বাইরে থেকে ঘুরে এসে—

বিজয় : (উঠে) চল্ আমিও যাচ্ছি।

সীতানাথ : না না, তুই বোস। আমি এক্ষুনি ফিরবো। পাঁচ মিনিট—বড়ো জোর দশ মিনিট। বোস—চলে যাসনি—

[বলতে বলতে সীতানাথ বেরিয়ে গেলো। উৎকণ্ঠিত কণা দরজা অবধি গেলো।]

বিজয় : কণা!

কণা : (ফিরে) অ্যাঁ?

বিজয় : চম্বলগড়ে কী হয়েছিলো? (কণা চুপ, অন্যদিকে ফিরে) তুমি যদি সব আমাকে খুলে না বলো, আমি কিছুই করতে পারবো না।

কণা : আমাকে বলতে বারণ করেছে।

বিজয় : যে বারণ করেছে সে রোগী। তার চিকিৎসার জন্যে তুমি বলছো।

কণা : কিন্তু—

বিজয় : খুব লজ্জার কথা কি?

কণা : লজ্জা? না, একেবারেই না। বলতে আমি চাই বিজয়দা, আমি একা যেন আর সামলাতে পারছি না। শুধু ও বারণ করেছে বলে—

বিজয় : ওর বারণ কি সব সময়ে তুমি শোনো?

কণা : ছোটখাটো ব্যাপারে হয়তো শুনি না, কিন্তু এটা—বিজয়দা আপনি জানেন না, ও যদি কখনো কোনোদিন শোনে আমি আপনাকে বলেছি—আপনি কথা দিন কখনো ওকে জানতে দেবেন না?

বিজয় : আমি শুধু কথা দিতে পারি—অত্যন্ত প্রয়োজন না হলে ওকে জানতে দেবো না।

কণা : প্রয়োজন?

বিজয় : ওর চিকিৎসার খাতিরে যদি প্রয়োজন হয়।

কণা : ও! (একটু থেমে) কিন্তু চম্বলগড়ের কথা কী করে জানলেন?

বিজয় : হাতের কাছে কাগজ কলম থাকলে সীতানাথ হিজিবিজি লেখে। সবাই লেখে, কিন্তু সীতানাথ মধ্যে মধ্যে চমকে উঠে হাতের কাগজ কুচি কুচি করে ছিঁড়তে থাকে। সেইজন্যেই বোধ হয় নজরে পড়েছিলো।

কণা : চম্বলগড় লেখে?

বিজয় : আরো অনেক কিছু লেখে, তবে চম্বলগড় লিখলেই ছেঁড়ে। যদি টের পায়। আর একটা নাম— (থেমে গেলো)

কণা : কী নাম?

বিজয় : না, আগে তুমি চম্বলগড়ের কথা বলো।

কণা : আর একটা কী নাম?

বিজয় : পরে বলবো, তুমি—

কণা : পার্বতী?

[বিজয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো]

বিজয় : হ্যাঁ। পার্বতী।

কণা : (নিশ্বাস ফেলে) আমাকে বলতে বারণ করে খুব লাভ হয়নি ওর।

বিজয় : কণা, তোমার যদি বলতে খুব খারাপ লাগে—

কণা : না বিজয়দা। বরং এখন বলা আরো সহজ। ও নিজেই বলছে। বলে ফেলছে।

বিজয় : বলো তবে।

কণা : চম্বলগড়। চম্বলগড় শহর নয় বিজয়দা—জঙ্গল। ঘোর জঙ্গলের মধ্যে ছোট একটা বসতি। বিশ পঁচিশটা মেটে ঘর। একটা নালার মতো সরু নদী—ঝরঝরে পরিষ্কার জল। তার ধারে ফরেস্ট্রির ডাকবাংলো। বিয়ের তিন বছর পরে আমরা গিয়েছিলাম। ওর বন্ধু তপনবাবু ফরেস্ট অফিসার—তিনি ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তপনবাবুর সঙ্গে ও আর সম্পর্ক রাখে না—দশ বছর হয়ে গেলো।

বিজয় : কেন?

কণা : হয়তো চম্বলগড়ের কোনো কথা মনে রাখতে চায় না বলে।

বিজয় : বলো তারপর।

কণা : একমাসের ওপর—প্রায় দেড় মাস ছিলাম চম্বলগড়ে। দু'মাস থাকার কথা ছিল—ওর গ্রীষ্মের ছুটি তখন। দেড় মাস ছিলাম। বড়ো ভালো লেগেছিলো আমার। প্রচণ্ড গরম, তবু ভালো লাগতো। শালবনের পাতাগুলো যেন আগুনের হল্কা হয়ে জ্বলতো। গরমে বাতাস যেন স্বচ্ছ ধোঁয়া হয়ে থরথর করে কাঁপতো। চম্বলগড় আমি কখনো ভুলবো না।

বিজয় : কণা, তোমায়—

কণা : অ্যাঁ?

বিজয় : তোমায় তাড়া দিতে চাই না, কিন্তু—সীতানাথ হয় তো এক্ষুনি ফিরবে।

কণা : হ্যাঁ, বলি। চম্বলগড়ের জঙ্গলে কথা বলবার মতো এক ছিল বনোয়ারীলাল। গ্রামের লোকদের ভাষা বুঝতাম না। বনোয়ারীলাল কাশ্মীরী, তার সঙ্গে ভাঙা হিন্দীতে তবু কথা বলা যায়। কিন্তু তার ফরেস্ট্রির চাকরি—ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতে হয়। আমাদের তাই একমাত্র সঙ্গী ছিল—পার্বতী।

বিজয় : পার্বতী?

কণা : বনোয়ারীলালের মেয়ে। মা-মরা মেয়ে, বাবাও সারাদিন বাইরে। একা একা ঘুরে সময় কাটাতো মেয়েটা। ঘোরবার জায়গাও বেশি বড়ো নয়। জঙ্গলে যাওয়া বারণ ছিল বাবার। জঙ্গল খুব নিরাপদও ছিল না। পুলিশের তাড়া খেয়ে শহর বাজার থেকে চোর-ডাকাত প্রায়ই জঙ্গলে লুকোতো। তা ছাড়া বুনো জানোয়ারও ছিল কিছু।

বিজয় : তারপর?

কণা : ফর্সা ফুটফুটে সুন্দর চেহারা ছিল পার্বতীর। হাসলে ভারি সুন্দর দেখাতো। আর হাসতেও পারতো মেয়েটা! সারাদিন হাসতো।

বিজয় : কতো বয়স?

কণা : বছর দশেক। দশ কি এগারো।

[বিজয়ের চোখের দৃষ্টি যেন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো]

বিজয় : হ্যাঁ, বলো।

কণা : আমাদের সঙ্গেই কাটতো তার সারাদিন। আমার চেয়েও ওর সঙ্গে বেশি ভাব ছিল তার। ও ভীষণ ভালোবাসতো মেয়েটাকে। অল্পক্ষণ দেখা না হলেই যেন ছটফট করতো। দু'জনেই। আমারও খারাপ লাগতো! আসলে বোধ হয় পার্বতী ছিল বলেই চম্বলগড় অতো ভালো লেগেছিলো। নইলে শুধু শালবন আর নদী নিয়ে অতোদিন টিকতে পারতাম না ঐ নির্বান্ধব জঙ্গলে। অথচ পরে ভেবেছি, কেন যে ওর সঙ্গে ভাব হয়েছিলো!

বিজয় : কেন?

কণা : বলছি। পার্বতী থাকা সত্ত্বেও ও বোধ হয় শেষদিকে হাঁপিয়ে উঠেছিলো। আমাকে দু'একবার বলেছে—ফিরবে না কি? আবার রাজি হলে বলতো—না, পুরো ছুটিটা কাটিয়েই যাই। কিন্তু তবু—কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠতো মাঝে মাঝে! একদিন অমনি এক অবস্থায় পার্বতীকে একটা ধমক দিলো। আশ্চর্য লেগেছিলো আমার। পার্বতী সারাদিন কাঁদলো। সন্ধেবেলা বাবার বকুনি খেয়েও ঘর থেকে বেরুলো না। শেষে ও-ই শান্ত করলো বহু কষ্টে। বনোয়ারী হেসে বলতো—আপনারাই নিয়ে যান একে, আমি দেখাশোনা করতে পারি না। কি জানি, বনোয়ারী যদি সিরিয়াসলি বলতো, হয়তো নিয়েই আসতাম। (নিশ্বাস ফেলে) কিন্তু ওসব বলে আর কী হবে?

[কণা নিজেকে যেন শক্ত করে নিলো। তারপর তাড়াতাড়ি বলে যেতে লাগলো—যেন গল্পটা চোকাতে পারলে বাঁচে।]

একদিন বিকেলে পার্বতী আবদার ধরেছিলো বেড়াতে যাবে বলে। ও যেতে

চায়নি। খুব টানাটানি করছিলো। শেষে হঠাৎ ও কেমন যেন চটে উঠে—চটে উঠে পার্বতীকে ঠাস্ করে একটা চড় মারলো—

বিজয় : (স্তম্ভিত) কী বলছো!

কণা : হ্যাঁ, বিজয়দা। আমার দেখেও বিশ্বাস হয়নি! ওরও বোধ হয় বিশ্বাস হয়নি। পার্বতী—পার্বতী সে যে কীরকমভাবে তাকিয়ে রইলো—কীরকম অবাক হয়ে—তারপর সোজা ছুটে চলে গেলো—বাইরে—ও ডাকলো, আমি ডাকলাম, এলো না—ছুটে গেলাম—ও ছুটে বেরুলো—কিন্তু পার্বতী একেবারে সোজা ছুটেছে—জঙ্গলের দিকে! প্রায় সন্ধে তখন। ও টর্চটা নিয়ে ছুটলো পেছন পেছন ঐ জঙ্গলে। তারপর কতোক্ষণ যে কেটে গেলো—অন্ধকার হোলো—বনোয়ারী ফিরলো—গ্রামের লোকজন মিলে মশাল জ্বেলে জঙ্গলে ঢুকলো সবাই, আমি শুধু একা বারান্দায় বসে—সে যে কতোক্ষণ বিজয়দা, কতোক্ষণ—আমি জানি না—(কণা আচমকা থেমে গেলো)

বিজয় : তারপর?

কণা : (মরা গলায়) ওকে নিয়ে এলো প্রথমে। জামাকাপড় ছেঁড়া, মাটিমাখা—মাটি আর রক্ত। অন্ধকারে শুকনো নালীতে পড়ে গেছিলো, মাথায় চোট পেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলো। সারারাত অজ্ঞান। সকালে জ্ঞান ফিরলো—কিন্তু প্রবল জ্বর। জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইলো।

বিজয় : আর পার্বতী?

কণা : পার্বতীকে পাওয়া গেলো পরদিন দুপুরে—গড়ের ভগ্নস্তূপের মধ্যে। কাউকে যেন চিনতে পারছে না সে। আর চোখে—চোখে সে যে কী ভয়ের ছাপ দাগ কেটে বসে গেছে বিজয়দা—যেন জীবনে কোনোদিন উঠবে না!

বিজয় : জঙ্গলের ভয়?

কণা : না, বিজয়দা। জঙ্গলের ভয় আছে, কিন্তু মানুষের কাছে জঙ্গল লাগে না। বলছিলাম না—জঙ্গলে অনেক সময়ে চোর-ডাকাত লুকিয়ে—

[বিজয় চেয়ার ঠেলে ছিটকে উঠে দাঁড়ালো]

বিজয় : তুমি বলতে চাও—?

কণা : হ্যাঁ, বিজয়দা। খবরের কাগজে পড়ি মধ্যে মধ্যে—আইন-আদালতের কাহিনীতে। বিশ্বাস হতে চায় না। কিন্তু হয়। ঘটে। মানুষই করে।

[অল্পক্ষণ স্তব্ধতা]

বিজয় : সীতানাথ কী করলো?

কণা : ওর কিছু করবার ছিল না। পার্বতীর ভয় কেউ কাটাতে পারলো না। শেষে ওর কাছে নিয়ে এলো—যদিও ও তখন জ্বরে আচ্ছন্ন। পার্বতী—হয়তো ওর ঐ ব্যান্ডেজ বাঁধা চেহারা দেখেই—হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো। আর তাইতে—ও-ও আবার অজ্ঞান হয়ে গেলো। তারপর আমি আর পার্বতীকে ওর কাছে আনতে দিইনি। (প্রায় ব্যাকুলভাবে) কী করবো বিজয়দা, ও তো আমার কাছে অনেক বেশি! পার্বতীকে আমিও ভালোবাসতাম, কিন্তু ওকে তো—

বিজয় : তুমি ঠিকই করেছো।

কণা : ও ছাড়া আর উপায় ছিল না আমার! ওর জ্বর একটু কমতেই ওকে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম কলকাতায়। দশ বছর পার হয়ে গেছে বিজয়দা, কিন্তু এখনো যেন ঐ ক'টা দিন ভাবলে মাথা খারাপ হয়ে যায়!

বিজয় : পার্বতীর খবর এর মধ্যে আর পাওনি?

কণা : কী করে পাবো? বনোয়ারীলাল আমাদের ঠিকানা জানে না। আমি লিখবো ভেবেছিলাম—কিন্তু ও দেয়নি লিখতে। চম্বলগড়ের সমস্ত ব্যাপার মন থেকে মুছে ফেলতে কী আপ্রাণ চেষ্টা যে করেছে! চম্বলগড়ে থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো বলে তপনবাবুর সঙ্গে দেখা করাই ছেড়ে দিলো। সারাদিন শুধু কাজ—শুধু কাজ আর কাজ নিয়ে ডুবে রইলো। আজও তাই আছে। ঐ স্কুল ছাড়া আর কাছে কিছু নেই আর! আমিও নেই!

[শেষ কথাটা বলেই কণা চমকে থেমে গেলো]

বিজয় : তুমিও নেই?

কণা : (সামলাবার চেষ্টা করে হেসে) আমি—আমার দিকে তাকাবার সময় আছে ওর? সারাদিন তো স্কুলের কাজ নিয়ে—

বিজয় : না, তুমি আরো কিছু বলতে চেয়েছিলে! (কণা চুপ) কণা, যদি সব কথা—সমস্ত কথা খুলে না বলো—

কণা : কিন্তু সে কথা একেবারে অবান্তর! তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই এর—

বিজয় : সীতানাথের কাছে তুমিও নেই—এরকম একটা কথা অবান্তর? (কণা চুপ) সীতানাথ যে 'লোলিটা' পড়ার অপরাধে অশোককে স্কুল থেকে তাড়াচ্ছে—কেন জানো?

কণা : না।

বিজয় : লোলিটার ইতিহাস ঠিক পার্বতীর মতো নয়, তবু মিল আছে। লোলিটাও একটি নাবালিকা মেয়ে।

কণা : ও।

বিজয় : লোলিটার লেখককে হাতে পেলে ও ফাঁসি দিতো। না পেয়ে অশোককেই কঠিন শাস্তি দিচ্ছে কারো বারণ না শুনে। আসলে লোলিটাদের ওপর, পার্বতীদের ওপর যারা অন্যায় করে—তাদের প্রতি সীতানাথের অস্বাভাবিকরকম তীব্র ঘৃণা। এতোটা তীব্র হোতো না, যদি না পার্বতীর দুর্ঘটনার জন্যে ও নিজেকে দায়ী করতো। এ এক কাল্পনিক অপরাধ-চেতনা—ওর কাছে আঘাত পেয়েই তো পার্বতী জঙ্গলে গিয়েছিলো। এ কথা বোঝো?

কণা : একটু একটু বুঝি।

বিজয় : আমিও সব বুঝি না। সব বুঝতে চাইছি। সব বুঝতে হবে—তোমাকে আমাকে দু'জনকেই। তাই বলছি—কোনো কথা আড়াল কোরো না কণা। (কণা নিরুত্তর) বলো!

কণা : (দুর্বলভাবে) কী বলবো?

বিজয় : কেন তুমি বললে—সীতানাথের কাছে তুমিও নেই?

কণা : (হঠাৎ জ্বালাধরা কণ্ঠে) বললাম, কারণ—চম্বলগড়ের পর থেকে আপনার বন্ধু

ব্রহ্মচারী, আজ দশবছর—নিন এবার, এর থেকে কী বোঝবাব আছে আপনার বুঝুন।

[কণা দ্রুতপায়ে শোবার ঘরে চলে গেলো। বিজয় স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো অল্পক্ষণ।]

বিজয় : কণা!

[সাড়া এলো না। বিজয় ঘড়ি দেখলো। উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে একবার সদর দরজার দিকে তাকালো। আবার ডাকলো।]

কণা! কণা!

[অন্ধকার হয়ে গেলো মঞ্চ। অল্পক্ষণ। আলো জ্বললে দেখা গেলো—বিজয় নেই। ঘরে শুধু কণা, রাতজাগা প্রতীক্ষায়। কান পাতা সদর দরজার দিকে। পায়ের শব্দ। কণা উঠলো। কড়া নাড়া। কণা একছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলো। বিজয়।]

বিজয় : ফেরেনি?

কণা : না।

বিজয় : তুমি যে ক'টা ঠিকানা দিয়েছিলে সব জায়গায় গেছি। একমাত্র বিধুভূষণবাবুর বাড়িতে শুনলাম আধ ঘণ্টাটাক আগে গিয়েছিলো।

কণা : আধ ঘণ্টা আগে?

বিজয় : দু'মিনিট ছিল। প্রকাণ্ড একটা পুতুল নিয়ে গিয়েছিলো। সেটা গৌরীকে দিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেছে।

কণা : পুতুল? হঠাৎ এই সময়ে গৌরীকে পুতুল দিতে গেলো কেন?

বিজয় : তা কেউ জানে না। বিধুবাবুর সঙ্গে সিঁড়িতে দেখা হয়েছিলো—কথাই বলেনি।

কণা: আর কেউ কিছু বলতে পারলো না?

বিজয় : আর কেউ দেখেনি। গৌরীর মা রান্নাঘরে ছিলেন।

কমা : গৌরী কী বললো?

বিজয় : সে আট বছরের মেয়ে—কী বলবে? বললো—কাকাবাবু এসেই চলে গেলো। তোর জন্যে এইটা এনেছি, চলি—বলেই পুতুলটা দিয়ে চলে গেলো। (অল্পক্ষণ নীরবতা) আমি আর একবার ঘুরে দেখি।

কণা : আর কোথায় দেখবেন? সব তো দেখলেন।

বিজয় : পার্কটা দেখে আসি একবার। যদি ওখানে বসে থাকে।

কণা : ক'টা বাজে এখন?

বিজয় : আটটা দশ।

কণা: দু'ঘণ্টা হয়ে গেলো!

বিজয় : ভয় পেও না। কাছে পিঠেই ঘুরছে কোথাও। দেখছি আমি।

[থেমে গেলো। সিঁড়িতে পদশব্দ। দু'জনে উৎকর্ণ। বিজয় ছুটে গিয়ে এক ঝটকায় দরজা খুলে ফেললো। পদশব্দ থেমে গেলো হঠাৎ।]

কে? (সাড়া নেই) সীতানাথ?

[অল্প পরে সীতানাথের সাড়া এলো]

সীতানাথ : (নেপথ্যে) হ্যাঁ।

বিজয় : সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছিস কেন—অন্ধকারে?

সীতানাথ : না, আসছি।

[সীতানাথের প্রবেশ। হাতে একটা মোড়ক। সীতানাথের চুল অবিন্যস্ত, মুখ ক্লান্তিতে শীর্ণ। কিন্তু চোখে এক বিচিত্র আলো। যেন ভিতরে একটা মুক্তির আনন্দের উত্তেজনা।]

তুই এতোক্ষণ থাকবি ভাবিনি!

কণা: বিজয়দা এতোক্ষণ তোমাকে সারা বিশ্ব খুঁজে বেড়িয়েছে।

সীতানাথ : সে কী রে?

বিজয় : কী করছিলি তুই এতোক্ষণ?

সীতানাথ : ঘুরছিলাম। এমনি—ঘুরছিলাম।

বিজয় : কেন?

সীতানাথ : ভাবছিলাম। তা ছাড়া—কিছু কাজও সেরে এলাম। (বসলো)

বিজয় : কাজ মানে—গৌরীকে পুতুল দিয়ে আসা?

সীতানাথ : (অল্প চমকে) তুই কী করে—? ও, তুই বিধুবাবুর বাড়ি গেছিলি?

[সীতানাথ মোড়কটা এমনভাবে রাখতে চাইছিলো, যেন কারো নজরে না পড়ে। কিন্তু কণা দেখলো।]

কণা : ওটা কী?

সীতানাথ : একটা খেলনা।

কণা : কার জন্যে?

সীতানাথ : গৌরীর জন্যেই কিনেছিলাম। স্কিপিং রোপ। তারপর মনে হোলো—পুতুলটাই গৌরী পছন্দ করবে বেশি।

কণা : তা ওটাও দিতে না হয়? ওটা নিয়ে আর কী করবে?

সীতানাথ : সেটা খেয়াল হয়নি তখন। পরে একদিন দিয়ে আসবো।

কণা : কিন্তু হঠাৎ গৌরীকে এ সময়ে—দশ মিনিটের মধ্যে ফিরবে বলে বেরিয়ে—?

সীতনাথ : দোকানটা পড়লো সামনে—তাই। তোমরা এতো ভাববে জানলে যেতাম না। বিজয়, দাঁড়িয়ে রইলি যে?

বিজয় : আর বসে কী হবে—যাই। দাবা তো হচ্ছে না আজ আর!

সীতানাথ : না যাসনি, আর একটু থাক। তোর সঙ্গে কথা আছে।

কণা! (উঠলো। কী যেন ভাবলো।)

কণা : কী?

সীতানাথ : আমি—আমি বিজয়ের সঙ্গে একটু একা কথা বলতে চাই। তুমি কি ঘণ্টাখানেক চৌধুরীদের ফ্ল্যাটে কাটাতে পারো?

[কণা একটু অবাক হোলো। বিজয়ের দিকে তাকালো। বিজয় ঘাড় নেড়ে ইশারা করলো।]

কণা : খুব পারি। সুরমাদি তো যাই না বলে নালিশ করে। আমি কাপড়টা চট করে—না, এমনিই যাই। রাস্তায় তো বেরুতে হচ্ছে না?

[কণা সদর দরজার দিকে গেলো। সীতানাথ কেমন যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখলো।]

সীতানাথ : (হঠাৎ যেন সচকিত হয়ে) কণা!

কণা : (ফিরে) কী?

[সীতানাথ কণার কাছে গেলো। হঠাৎ দু'হাত কণার কাঁধে রেখে একদৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকালো।]

সীতানাথ : তুমি কিছু মনে কোরো না কণা।

কণা : (হেসে) হঠাৎ আমার সঙ্গে ভদ্রতা শুরু করলে যে?

সীতানাথ : না। ভদ্রতা নয়। শুধু—

কণা : শুধু কী?

সীতানাথ : আমাকে নিয়ে তোমার খুব ভাবনা, জানি। ভেবো না আর। সব ঠিক হয়ে যাবে। সব, স—ব ঠিক হয়ে যাবে। (কণা শুধু চেয়ে রইলো) যাও এখন। এক ঘণ্টা সময় দাও আমাকে।

[কণা চলে গেলো। সীতানাথ দরজায় খিল তুলে দিলো।]

বিজয়, তোর সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে আমি আজ বলেছিলাম—লোলিটায় যে বিকৃতির বর্ণনা আছে—তা হয় না। তুই বলেছিলি হয়। মনে আছে?

বিজয় : আছে।

সীতানাথ : আমি ভুল বলেছিলাম। না, ভুল নয়—মিথ্যে বলেছিলাম। জেনে শুনে মিথ্যে বলেছিলাম। আমি জানি—হয়। হয় জানি, কিন্তু মানতে চাই না। তাই হয় না বলি।

বিজয় : হয়—কী করে জানলি?

সীতানাথ : আমি দেখেছি।

বিজয় : কোথায় দেখেছিস?

সীতানাথ : প্রথম দেখেছি মধ্যভারতের এক জঙ্গলে। অনেকদিন আগে। কণা আর আমি বেড়াতে গেছিলাম গ্রীষ্মের ছুটিতে—চম্বলগড়। একটা ভাঙা কেল্লা ছিল জঙ্গলের মধ্যে। দিনের বেলাও সেখানে কেউ যেতে চাইতো না। বলতো ফেরারি খুনে ডাকাতরা দরকার হলে ওখানে লুকোয়। সে কথা সত্যি কিনা জানি না, কিন্তু একজন অন্তত ডাকাত—একজন খুনে ডাকাত— (হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে দাঁড়ালো) না, ডাকাতের কথা পরে। তার আগে—তার আগে পার্বতীর কথা বলা দরকার। পার্বতী একটা দশ বছরের ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে। আমাকে খুব ভালোবাসতো। আমি তাকে একদিন একটা—একটা চড় মেরেছিলাম। তাই সে অভিমান করে জঙ্গলে—জঙ্গলে গিয়ে—সেই ডাকাতের—একটা খুনে ডাকাতের হাতে পড়ে—

বিজয় : (হঠাৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে) সেটা কি তোর দোষ?

সীতানাথ : (চমকে) অ্যাঁ?

বিজয় : তুই রাগ করে একটা চড় মেরেছিলি বলেই সমস্ত দুর্ঘটনার দায়িত্ব নিজের উপর তুলে নিলি? Fool! You're a fool!

সীতানাথ : (অল্প হেসে) কণা তোকে গল্পটা বলেছে, না?

হ্যাঁ, বলেছে। বলতে আমি বাধ্য করেছি। আমি জানতাম কোনো একটা কাল্পনিক অপরাধ-চেতনা নিয়ে তুই ক্রমাগত নিজেকে—

সীতানাথ : তুই কিছু জানিস না বিজয়, কিছু জানিস না। কণাও জানে না।

বিজয় : জানে না?

সীতানাথ : কেন আমি পার্বতীকে মেরেছিলাম। কেন আমি পালিয়ে আসতে চেয়েছিলাম চম্বলগড় থেকে। নিজেকে ছিঁড়ে পালিয়ে আসতে চেয়েছিলাম—পার্বতীর কাছ থেকে দূরে! তবু শেষ অবধি পারলাম না—উঃ! কেন যে পারিনি! (সীতানাথ প্রায় চিৎকার করে উঠলো)

বিজয় : কী বলছিস তুই?

সীতানাথ : (মরা গলায়) বিকৃতি।

বিজয় : সীতানাথ!

সীতানাথ : (আচ্ছন্ন স্বরে) লোলিটা। পার্বতী। কণা জানে না। কণা জানে না—ঐ ডাকাত আমিও হতে পারতাম। হওয়া সম্ভব ছিল।

বিজয় : (চিৎকার করে) কক্ষনো না!

সীতানাথ : (যেন না শুনে) দিনের পর দিন। রাতের পর রাত। একটা বিষাক্ত জীবাণু মনের মধ্যে হাজার হাজার, লাখ লাখ হয়ে উঠেছে। সমস্ত মন ছেয়ে ফেলেছে বিষ দিয়ে। দিনের পর দিন। রাতের পর রাত। যন্ত্রণায় ছটফট করেছি। প্রাণপণে লড়াই করেছি। পালিয়ে আসতে চেয়েছি। পারিনি। ওকে সরিয়ে দিতে চেয়েছি। মেরেছি! কিন্তু কী যে হয়ে গেলো! কেন মেরেছিলাম? কেন ও জঙ্গলে গেলো? কেন? কেন?

[বিজয় লাফিয়ে এসে সীতানাথের দুই বাহু চেপে ধরলো। ঝাঁকানি দিলো সজোরে।]

বিজয় : সীতানাথ! সীতানাথ! কী হতে পারতো তা নিয়ে কেন নিজেকে শেষ করছিস? তা তো হয়নি! পার্বতী ডাকাতদের হাতে পড়েছিলো!

সীতানাথ: কিন্তু যদি ডাকাতের হাতে না পড়ে আমার হাতে পড়তো—

বিজয় : তাহলে কী হোতো? তুই তাকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনতিস! সীতানাথ, কী হতে পারতো—সে সর্বনেশে চিন্তা বন্ধ কর। যা হয়েছে তাকে মেনে নে। অতীত বলে মেনে নে। দুর্ঘটনা বলে মেনে নে! মেনে ভোলবার চেষ্টা কর!

সীতানাথ : (অনেকটা শান্তভাবে) হ্যাঁ, দুর্ঘটনা। অতীত। বহু বছর। প্রায় দশ বছর। ভুলে যাওয়া যেতো। মানা যেতো। মানা যাচ্ছিলো। স্কুলের কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে ভুলছিলাম। ছাত্ররা, সহকর্মীরা—শ্রদ্ধা করতো। ভালোবাসতো। কণা ছিল। শত অন্যায় সত্ত্বেও কণা আমাকে ত্যাগ করেনি। কণা ছিল। কিন্তু—কিন্তু বিজয়, পার্বতী আবার ফিরে এসেছে।

বিজয় : কী বলছিস যা তা?

সীতানাথ : আবার ফিরে এসেছে। প্রথমে আমি টের পাইনি, সাবধান হইনি। যখন টের পেলাম—তখন আর উপায় নেই। সেই বিষ আবার সমস্ত মন আচ্ছন্ন করে তুলছে। বিজয়, আমি রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না! অশোককে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছি, বিধুবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করছি—কিন্তু বিষ মরছে না। পার্বতী ফিরে আসছে বিজয়! পার্বতী ফিরে এসেছে!

বিজয় : কী আবোল তাবোল বকছিস তুই? কোথায় পার্বতী?
[সীতানাথ বিহ্বলভাবে বিজয়ের দিকে তাকালো। তারপর ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে নিলো। বিহ্বলভাব কাটিয়ে শক্ত হয়ে উঠলো মুখ। শান্ত, কিন্তু অতি স্পষ্ট উচ্চারণে একটা শব্দ সমস্ত ঘর কাঁপিয়ে তুললো যেন।]

সীতানাথ : গৌরী।

[বিজয় যেন মুখে চাবুক খেলো]

বিজয় : (আর্ত প্রতিবাদে) না!

সীতানাথ : (স্থির কণ্ঠে) হ্যাঁ, বিজয়। গৌরী। পার্বতী হয়তো অতীত। কিন্তু গৌরী বর্তমান। পার্বতী হয়তো অন্য ডাকাতের হাতে পড়েছিল, কিন্তু গৌরীর কথা কে বলতে পারে?

বিজয় : তুই বলতে পারিস! তোর মনে যাই থাক, বাইরে তার কখনো প্রকাশ হবে না। আমি তোকে চিনি!

সীতানাথ : চিনিস না। দেখলি তো—চিনতিস না।

বিজয় : হ্যাঁ, চিনি। সমস্ত ব্যপারে তোর এতো সংযম—আর এইটুকু পারবি না তুই? গৌরীর কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারবি না?

সীতানাথ : চেষ্টা তো করেছি অনেক।

বিজয় : আরো কর! এ চম্বলগড়ের জঙ্গল নয়। এখানে তোর স্কুল আছে, কাজ আছে, কণা আছে, আমি আছি! আরো চেষ্টা কর—নিশ্চয়ই পারবি!

সীতানাথ : জানি না।

বিজয় : শোন সীতানাথ। আজ যে তুই আমাকে বলতে পারলি—এই বলাই তোকে জোর দেবে। তুই এতোদিন মনের মধ্যে পুষে রেখে ভুল করেছিলি। ভেবে দেখ তুই! ভেবে দেখ—সত্যি কি না!

সীতানাথ : কী জানি? হয় তো! আজ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে অনেক ভেবেছি। হয় তো, হয় তো শেষ অবধি মুক্তি পাবো।

বিজয় : হয় তো নয় সীতানাথ, নিশ্চয়ই পাবি!

সীতানাথ : একটা প্রশ্নের শুধু জবাব দে বিজয়।

বিজয় : বল।

সীতানাথ : যে ডাকাত পার্বতীকে শেষ করেছে, তার ফাঁসি ছাড়া অন্য শাস্তি আছে কি না?

বিজয় : সীতানাথ, এসব কথা নিয়ে—

সীতানাথ : গৌরীকে তুই দেখেছিস আজ?

বিজয় : দেখেছি।

সীতানাথ : যদি কখনো শুনিস গৌরীকে—গৌরীকে কেউ—

বিজয় : চুপ কর!

সীতানাথ : আর যদি শুনিস, যে করেছে তার ফাঁসির হুকুম হয়েছে—অন্যায় মনে করবি তুই?

বিজয় : সীতানাথ, তুই—

সীতানাথ : বল না তুই! অন্যায় হুকুম মনে করবি?

বিজয় : না, মনে করবো না! (অসম্ভব জোর দিয়ে) কিন্তু সীতানাথ, তুই জানিস—তুই সেই ডাকাত ছিলি না, কোনোদিন হবিও না! চেষ্টা করলেও হতে পারবি না! তুই জানিস সে কথা। মনে মনে যাই ভাবিস, যাই চাস—সব তোর মনে। কোনোদিন—কোনোদিন বাইরে তা একবারও বেরোবে না। জানিস তুই! জানিস না?

[সীতানাথের মুখে গভীর প্রশান্তি। কণ্ঠস্বর শান্ত।]

সীতানাথ : হ্যাঁ, বিজয়, জানি। এখন জানি। কোনোদিন—কোনোদিন আমার হাতে গৌরীর ক্ষতি হবে না। কোনোদিন না।

[বিজয় আনন্দে সীতানাথের হাত চেপে ধরলো]

বিজয় : সীতানাথ!

[সীতানাথ তাক থেকে একটা অ্যালবাম টেনে নিয়ে এলো]

সীতানাথ : এই দেখ। চিনতে পারিস?

বিজয় : গৌরী?

সীতানাথ : আট বছরের জন্মদিনে। আমি তুলেছিলাম। ভালো হয়নি ছবিটা?

বিজয় : সুন্দর হয়েছে।

সীতানাথ : আর একটা ছবি দেখাই তোকে।

[ঘরের এক দুর্লভ্য স্থান থেকে মলাট দেওয়া একটা মোটা বই বার করলো। কাগজের মলাটের আড়াল থেকে বেরুলো একটা লুকিয়ে রাখা বহু পুরোনো ছবি।]

বিজয় : পার্বতী?

সীতানাথ : হ্যাঁ। এও আমি তুলেছিলাম। পার্বতীর সব মুছে ফেলেছি—শুধু এই ছবিটা লুকিয়ে রেখেছিলাম। কণাও জানে না। দু'টো ছবিতে কোনো মিল খুঁজে পাস?

বিজয় : না, বিশেষ—শুধু চোখ দুটো—

সীতানাথ : হ্যাঁ, চোখ। চোখে আশ্চর্য মিল। আর রঙ। দু'জনেই ধবধবে ফর্সা।

[সীতানাথ ছবিটা টেবিলে রেখে কাগজ কলম নিয়ে বসলো]

ক'টা বাজে বিজয়?

বিজয় : পৌনে ন'টা।

সীতানাথ : (লিখতে লিখতে) তুই একটা উপকার করবি আমার?

বিজয় : কী বল?

সীতানাথ : খাটতে হবে কিন্তু!

বিজয় : কী বল না?

[সীতানাথ লেখা কাগজটাকে ভাঁজ করে বিজয়ের হাতে দিলো]

সীতানাথ : এই চিঠিটা বিধুবাবুর বাড়ি পৌঁছে দিবি।

বিজয় : আজ রাতে?

সীতানাথ : হ্যাঁ, আজ এক্ষুনি।

বিজয় : কী লিখেছিস?

সীতানাথ : পড়ে দেখতে পারিস।

[বিজয় পড়লো। তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।]

বিজয় : সীতা, সত্যি?

সীতানাথ : হ্যাঁ। নাবোকোভের দোষে, আমার দোষে, অশোকের সর্বনাশ করা চলে না। বিধুবাবু ঠিকই বলেছিলেন।

বিজয় : কিন্তু এ তো তুই কাল স্কুলে গিয়ে—

সীতানাথ : না বিজয়! বিধুবাবুকে এক্ষুনি জানানো দরকার। আজ বড়ো খারাপ ব্যবহার করেছি। তুই যা, এক্ষুনি যা। নইলে শান্তি পাবো না আমি।

বিজয় : কণা—?

সীতানাথ : কণাকে আমি ডেকে নেবো। তুই যা, দেরি করিসনি। কাল আসিস কিন্তু। সকালেই আসিস।

বিজয় : সকালে?

সীতানাথ : হ্যাঁ, সকালে। তোর, আসা দরকার। খুব দরকার।

বিজয় : আচ্ছা, আসবো।

[সীতানাথ হঠাৎ বিজয়ের হাত জোরে চেপে ধরলো]

সীতানাথ : তোর মতো বন্ধু আমার কেউ নেই বিজয়। তুই—তুই বুঝবি!

বিজয় : কী বুঝবো?

সীতানাথ : আমাকে। যা, দেরি করিসনি।

[প্রায় ঠেলে বিজয়কে বার করে দিলো। আবার খিল দিলো দরজায়। ফিরে এসে মোড়কটা নিয়ে টেবিলে রাখলো। পার্বতীর ছবিটা নজরে পড়লো। তুলে নিলো হাতে।]

পার্বতী! সে ডাকাতের এতোদিন ফাঁসি দেওয়া হয়নি রে! আজ দেবো।

[মোড়কটা খুলে স্কিপিং রোপ বার করলো। দড়িটা সাপের মতো লিকলিক করে উঠলো। একটা উন্মত্ত আনন্দে সীতানাথ দড়িটার স্পর্শ অনুভব করতে লাগলো। তারপর অ্যালবামটা তুলে নিলো।]

গৌরী! গৌরী! তোর কোনো ভয় নেই। সে ডাকাত তোকে ছুঁতে পারবে না! তাকে আমি ফাঁসি দেবো। পার্বতীকে বাঁচাতে পারিনি, কিন্তু তোর কোনো ভয় নেই। তোর কাকাবাবু—সে ডাকাতকে ফাঁসি দিয়ে দেবে।

[সীতানাথ দড়িতে ফাঁস পরালো। তারপর কণার ফোটো লাগানো ফ্রেমটা তুলে নিলো।]

চলি কণা। কিছু মনে কোরো না।

[ফ্রেমটা নামিয়ে রাখলো। ছাতের দিকে তাকালো। তারপর দড়ির দিকে। আবার ছাতের দিকে। পর্দা বন্ধ হোলো ধীরে।]

তৃতীয় অঙ্ক

[শরদিন্দু পড়ছে। বাসন্তী গালে হাত দিয়ে বসে শুনছে।]

শরদিন্দ : 'চলি কণা। কিছু মনে কোরো না।'—এর বেশি আর কিছু কণাকে বলবার নেই সীতানাথের। আর কোনো চিন্তা নেই তার। এক প্রগাঢ় প্রশান্তি, এক অনির্বচনীয় নিশ্চিন্তুতায় তার ক্ষতবিক্ষত মন আবিষ্ট। আর চিন্তা নেই। আর ভয় নেই। দড়িটা হাতে সাপের মতো লিকলিক করে উঠলো। ছাতের দিকে তাকালো সীতানাথ। কড়িকাঠে গাঁথা বাঁকানো লোহার হুকে পরম মুক্তির আশ্বাস।

[শরদিন্দু কাগজ রাখলো। বাসন্তী স্তব্ধ।]

কী?

বাসন্তী : আমার গল্পের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে।

শরদিন্দু : এটা কি সমালোচনা হোলো?

বাসন্তী : আমি কি সমালোচক?

শরদিন্দু : তোমার মনে কী যেন প্রশ্ন রয়েছে একটা?

বাসন্তী : কে বললো?

শরদিন্দু : তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে।

বাসন্তী : না, প্রশ্ন নয়—তবে—

শরদিন্দু: কী?

বাসন্তী : আমি ভাবছি—সত্যি সত্যি সীতানাথ কী কারণে আত্মহত্যা করলো?

শরদিন্দু : অর্থাৎ আমি যে কারণ দেখিয়েছি সেটা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না তোমার?

বাসন্তী : না না, সম্ভব হবে না কেন? নিশ্চয়ই সম্ভব। কিন্তু ওটা তো তোমার গল্প।

শরদিন্দু : আমার গল্পটা সম্ভব, কিন্তু সত্যি ঘটনাটা কিছুতেই আমার গল্পের মতো নয়—এই তো?

বাসন্তী : তুমি ভুল বুঝছো! আমি—

শরদিন্দু : (অল্প অধৈর্য) আমি ঠিকই বুঝেছি! তুমি ভেবে দেখো, বুঝতে পারবে।

বাসন্তী : তুমি রাগ করছো কেন?

শরদিন্দু : (অল্প রেগে) মোটেই রাগ করছি না। রাগ করবার কিছুই নেই এতে!

বাসন্তী : আমি তো বলছি, তোমার গল্পটা অনেক ভালো হয়েছে—

শরদিন্দু : সে কথা কে শুনতে চায়?

বাসন্তী : তবে কী শুনতে চাও বলো?

শরদিন্দু : আমি তোমার গল্পের সম্ভব-অসম্ভব নিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করেছি। যা মনে হয়েছে খুলে বলেছি। আর তুমি ভালো হয়েছে বলেই চুপ, অথচ মনে মনে গল্পটা নাকচ করে বসে আছো!

বাসন্তী : (অল্প অধৈর্য) কে বললো আমি গল্পটাকে নাকচ করে বসে আছি?

শরদিন্দু : (উত্তেজিত) নাকচ করোনি? সত্যি কথা বলো! তুমি বিশ্বাস করো এই কারণে

সীতানাথ আত্মহত্যা করেছে?

বাসন্তী : কিন্তু—

শরদিন্দু: বলো! বিশ্বাস করো তুমি?

বাসন্তী : কিন্তু সীতানাথ সত্যি সত্যি কী কারণে আত্মহত্যা করেছে আমরা কী করে জানবো?

শরদিন্দু : (আরও উত্তেজিত) ঐ তো! ঐ তো! সত্যি কারণটা তা নয়! সত্যি কারণটা অন্য! আমি যা লিখেছি—আগাগোড়া ভুল!

[কাগজগুলি টেবিলের উপর আছড়ে ফেললো]

বাসন্তী : (উত্তেজিত) আগাগোড়া ভুল আমি মোটেই বলিনি! আমি শুধু বলছি—আসল কারণটা তুমি জানছো কী করে? তুমি যা লিখেছো, সে তো তোমার কল্পনা!

শরদিন্দু : (প্রায় চিৎকার করে) কল্পনা হলেই আগাগোড়া ভুল হতে হবে?

বাসন্তী : কী আশ্চর্য! তোমার কী হয়েছে বলো তা?

[শরদিন্দু যেন ধাক্কা খেয়ে ধাতে ফিরলো]

শরবিন্দু : অ্যাঁ? (অল্প থেমে) বাসন্তী!

বাসন্তী: কী?

শরদিন্দু : আমি বোধহয়—আমরা বোধহয় সীতানাথের আত্মহত্যা নিয়ে একটু বেশি মাথা ঘামিয়ে ফেলেছি।

বাসন্তী : হ্যাঁ, কেমন যেন ঢুকে গেছে মাথায়।

শরদিন্দু : (চেষ্টা করে হেসে) সীতানাথের ভুত ঘাড়ে চেপেছে বোধহয়।

[বাসন্তী হঠাৎ শিউরে উঠলো—যেমন হয় আমাদের সকলেরই মাঝে মাঝে।]

কী হোলো?

বাসন্তী : (উঠে পড়ে) না, কিছু না। আমি শুতে যাচ্ছি। ঘুম পেয়েছে।

শরদিন্দু : আমার এক ফোঁটাও ঘুম পাচ্ছে না।

বাসন্তী : আমারও ঘুম পায়নি আসলে! কিন্তু এগারোটা বাজে। কাল সোমবার।

শরদিন্দু : আমার মনে হচ্ছে আজ ঘুম আসবেই না একেবারে।

বাসন্তী : (যেন নিজেকে আশ্বস্ত করতে জোর দিয়ে) খুব আসবে। শুলেই ঘুম আসবে। আমি শুতে যাচ্ছি।

শরদিন্দু : যাও, আমি একটু পরে যাবো।

বাসন্তী : দেরি কোরো না। কাল সোমবার।

[ঘুমোবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে বাসন্তী শোবার ঘরে গেলো। শরদিন্দু অনির্দিষ্টভাবে খানিক বসে থেকে, খানিক ঘুরে, নিজের লেখা কাগজগুলি তুলে নিয়ে চোখ বোলালো। পাতা ওলটালো। ঘরের আলো একটু কমে এসেছে। আলোয় যেন একটা নীলাভ আভাস। রান্নাঘরের প্রবেশ পথে প্রায় গাঢ় অন্ধকারে মিশে আছে সীতানাথের নিস্পন্দ মূর্তি। নিস্পন্দ আর ঋজু।

শরদিন্দু বিরক্তভাবে কাগজগুলি আছড়ে ফেললো টেবিলে। বিড়বিড় করে কী যেন বললো। হয় তো 'রাবিশ' অথবা অনুরূপ কিছু। তারপর সহসা যেন সীতানাথের উপস্থিতি টের পেলো। পিছনে না তাকিয়েই টের পেলো।]

শরদিন্দু : কে?

[সীতানাথ সাড়া দিলো না। শুধু এগিয়ে এলো এক পা সামনের দিকে, আর একটু আলোয়। শরদিন্দু তখনো সামনের দিকে চেয়ে।]

কে?

সীতানাথ : আমি। সীতানাথ।

শরদিন্দু : সীতানাথ চক্রবর্তী?

সীতানাথ : হ্যাঁ। কেন? চিনতে পারছো না?

[সীতানাথ কথা বলতে বলতে সামনের দিকে এলো। সহজভাবে। এখন থেকে সে আর একটা মানুষ শুধু। শরদিন্দু ধীরে ধীরে তার দিকে ফিরে তাকালো।]

শরদিন্দু : চিনতে পারছি। বুঝতে পারছি না।

সীতানাথ : সহজ কথা বোঝা শক্ত। সহজ কথা কেউ বুঝতে পারে না। বোধ হয় কেউ বুঝতে চায় না।

শরদিন্দু : বুঝতে পারলাম না।

সীতানাথ : আমিও তাই বলছি। বুঝতে পারলে না। তোমার স্ত্রী বুঝতে পারলো না। কণা বুঝতে পারলো না। কেউ বুঝতে পারলো না! কী করে বুঝবে? সহজ কথা যে?

শরদিন্দু : সহজ কথা হলে বুঝতে পারবে না? কেন?

সীতানাথ : কী জানি? হয় তো ভয়ে।

শরদিন্দু : কিসের ভয়?

সীতানাথ : যুক্তির ভয়। বুঝলে যুক্তি আসে। যুক্তি এলে তাকে মানতে হয়। মানলে যুক্তি এগোয়। সিদ্ধান্তের দিকে এগোয়। সিদ্ধান্তকে মানুষ ভয় করে।

শরদিন্দু : কী সিদ্ধান্ত?

সীতানাথ : শেষ সিদ্ধান্ত। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তার পরে আর যুক্তি নেই। হয় সিদ্ধান্ত মানো, না হয় যুক্তিতে অস্বীকার করতে করতে পিছু হঠো।

শরদিন্দু : বুঝলাম না!

সীতানাথ : কী করে বুঝবে? সহজ কথা যে?

শরদিন্দু : (অল্পক্ষণ চেয়ে থেকে) তুমি আত্মহত্যা করলে কেন?

সীতানাথ : না করলে কী করতাম?

শরদিন্দু : বেঁচে থাকতে।

সীতানাথ : বেঁচে থেকে কী করতাম?

শরদিন্দু: কী করতে মানে? সব মানুষ যা করে তাই করতে!

সীতানাথ : সব মানুষ কী করে?

শরদিন্দু : কতো কী করে! প্রত্যেক মানুষেরই কিছু না কিছু কাজ আছে। কতো কিছু করবার আছে।

[সীতানাথ ততোক্ষণে কাটিং-এর খাতাটা তুলে দেখছে]

সীতানাথ : যেমন—খবরের কাগজের কাটিং রাখা?

শরদিন্দু : তা কেন?

[সীতানাথ খাতাটার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে অন্য পাশে গেছে। তার পিঠ শরদিন্দুর দিকে।]

সীতানাথ : কেন নয়? এও তো একটা কাজ। করবার মতো একটা কিছু।

শরদিন্দু : হ্যাঁ, কেন নয়?

সীতানাথ : আমিও কাটিং রাখি। খবরের নয়। ছবির। খবরের ছবির।

শরদিন্দু : খবরের ছবি?

সীতানাথ : হ্যাঁ। দেখবে?

[খাতাটা বন্ধ করে ফিরলো। ফিরে এসে শরদিন্দুর হাতে দিলো। শরদিন্দু টেবিলে পেতে বসে খুললো। যেন অন্য খাতা। প্রথম পাতা নয়, মাঝখানে একটা পাতা। সীতানাথ তার পিছনে দাঁড়িয়ে তার কাঁধের ওপর থেকে দেখতে লাগলো, খাড়া দাঁড়িয়ে, না ঝুঁকে।]

ওটা কী, চিনতে পারছো?

শরদিন্দু : এ তো মহাভারতের ছবি?

সীতানাথ : হ্যাঁ। দুঃশাসনের রক্তপান। ভীম প্রতিশোধ নিচ্ছে। জানো গল্পটা?

[শরদিন্দু জবাব না দিয়ে পাতা ওল্টালো]

প্রাচীন মিশরের ছবি। ফারাও-এর ক্রীতদাসরা পাথর টেনে তুলছে পিরামিড তৈরি করতে। ঐ যে লোকটার হাতে চাবুকটা দেখছো? ওটা গরুর চামড়ার—খুব শক্ত!

[শরদিন্দু পাতা ওল্টালো]

রোমান সম্রাটের নৌবিহার। ক্রীতদাসরা দাঁড় টানছে। ও চাবুকটাও চামড়ার, তবে তাতে গিঁট বেঁধে আরো মোক্ষম করা হয়েছে।

শরদিন্দু : (পাতা উল্টে) এ সব কী ছবি সেঁটেছো?

সীতানাথ : (যেন শোনেনি) রোমের কলোসিয়ম্। ক্রীশ্চানদের সিংহ দিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে।

[শরদিন্দু যান্ত্রিকভাবে পাতা উল্টে চললো। সীতানাথ নীরস নির্বিকার কণ্ঠে একটার পর একটা ছবির পরিচয় দিয়ে চললো।]

খুঁটিতে বাঁধা ঐ যে মেয়েটাকে পোড়ানো হচ্ছে—ওর নাম জোয়ান অফ্ আর্ক। —ওটা অপরাধ স্বীকার করাবার যন্ত্র—মধ্যযুগের ইওরোপ। ঐ চাকাটা ঘোরালে টানের চোটে মানুষের হাড়গোড় ভেঙে যায়।—নেপোলিয়নের জয়যাত্রার ছবি। বেয়নেটটা কীরকম গেঁথে আছে দেখেছো? —ওটা সাহারা মরুভূমির একটি বাণিজ্যপথ। শিকলে বাঁধা ক্রীতদাস চালান যাচ্ছে! লক্ষ্য করো—ও চাবুকটাতে ন'টা মুখ—সব ক'টায় গিঁট বাঁধা ছোট ছোট লোহার টুকরো।—ওটা আলাবামার তুলোক্ষেত। আঙ্কল টম্‌স্ কেবিন পড়েছো?

[সীতানাথ সরে গেছে এর মধ্যে। খবরের কাগজটা তুলে নিয়েছে। কিন্তু তবু সমানে বলে যাচ্ছে, যেন শরদিন্দুর সামনে কী ছবি পড়ছে তা তার জানা।]

কাঁটা তারের বেড়ায় ঝুলছে নিচুদরের একজন সৈনিক। প্রথম মহাযুদ্ধ।

[সীতানাথ কাঁচি দিয়ে খবরের কাগজের একটা ছবি কাটছে]

সীতানাথ : হিটলারের কন্‌সান্‌ট্রেশন ক্যাম্প। ঐ লোকগুলো ইহুদী। পেছন ডানদিকে ঐ

সাদা বাড়িটা গ্যাস চেম্বার।—মাদ্রিদের একটি রাস্তা—স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময়কার। ঐ পড়ে থাকা বাচ্চা ছেলেটার ডান হাতটা নেই, দেখেছো? হাতটা ছিঁড়ে বোমা-খাওয়া জঞ্জালে হারিয়ে গেছে।—ওটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ছবি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনেকগুলো ছবি পাবে—নানা দেশের। —হ্যাঁ, হিরোশিমা। ঠিক ধরেছো। হিরোশিমা।

[শরদিন্দু সশব্দে খাতা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালো। তার যেন দম বন্ধ হয়ে এসেছে। সীতানাথ শান্তভাবে হাতের সদ্য-কাটা ছবিটা তার দিকে বাড়িয়ে ধরলো।]

ভিয়েৎনাম। সেঁটে রাখতে পারো।

শরদিন্দু : এ সব কী ছবি?

সীতানাথ : (শান্ত স্বরে) খবরের ছবি শরদিন্দু।

শরদিন্দু : বেছে বেছে এইসব ছবি জমা করেছো কেন?

সীতানাথ : এই তো ইতিহাস।

শরদিন্দু : ইতিহাস!

সীতানাথ : মানুষের ইতিহাস। জীবনের ইতিহাস।

শরদিন্দু : মিথ্যে কথা! এ মৃত্যুর ইতিহাস।

সীতানাথ : (স্মিতহাস্যে) মৃত্যুকে বাদ দিয়ে কি জীবন হয়?

[এক মুহূর্ত উত্তর জোগালো না শরদিন্দু। তারপর--]

শরদিন্দু : কিন্তু মৃত্যুর ইতিহাস তো জীবনের ইতিহাস হতে পারে না?

সীতানাথ : (একটা নিশ্বাস ফেলে) হয় তো তাই। আলাদা আলাদা মানুষের জীবনের আলাদা আলাদা ইতিহাস—হয় তো আছে। এ তা নয়। এ বাকি ইতিহাস।

শরদিন্দু : বাকি ইতিহাস?

সীতানাথ : হ্যাঁ, বাকি ইতিহাস। কিন্তু মানুষেরই।

[শরদিন্দুর অল্পক্ষণ চেয়ে রইলো]

শরদিন্দু : তুমি আত্মহত্যা করলে কেন সীতানাথ?

সীতানাথ : তুমি আত্মহত্যা করোনি কেন শরদিন্দু?

শরদিন্দু : (স্তম্ভিত) আমি? আমি আত্মহত্যা কেন করবো?

সীতানাথ : কেন করবে না? যুক্তি দাও।

শরদিন্দু : যুক্তি? এ তো সহজ যুক্তি। বাঁচতে চাই বলে।

সীতানাথ : কেন বাঁচতে চাও?

শরদিন্দু : কেন বাঁচতে চাই? বাঁচতে কে না চায়?

সীতানাথ : অনেকেই চায় না।

শরদিন্দু : কে বললো চায় না?

সীতানাথ : কে বললো চায়?

শরদিন্দু : যদি না চায় তো বেঁচে আছে কেন? আত্মহত্যা করছে না কেন--তোমার মতো?

সীতানাথ : বেঁচে নেই। আত্মহত্যা করছে। হয়তো আমার মতো নয়।

শরদিন্দু : তার মানে?

সীতানাথ : তার মানে তারা গলায় ফাঁসি দিয়ে ঝুলছে না। কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে জ্বলছে

না। কোমরে পাথর বেঁধে ডুবছে না। তারা নিঃশব্দে নীরবে বাঁচা বন্ধ করে বসে আছে।

শরদিন্দু : এ কথার কোনো অর্থ হয় না।

সীতানাথ : কোন্ কথার অর্থ হয়—বলো, শুনি।

শরদিন্দু : মানুষ হয় বাঁচবে, না হয় মরবে!

সীতানাথ : অর্থপূর্ণ কথা বলেছো। খাঁটি কথা বলেছো। সেইজন্যেই আমি মরেছি।

শরদিন্দু : সেইজন্যে মরেছো?

সীতানাথ : সেইজন্যে মরেছি। মানুষ হয় বাঁচবে, না হয় মরবে। কথাটা অর্থপূর্ণ, যেহেতু যুক্তিসঙ্গত। এই যুক্তির সিদ্ধান্ত কী?

শরদিন্দু : কী?

সীতানাথ : সিদ্ধান্ত—যদি বাঁচা না যায়, তবে মরো।

শরদিন্দু : বাঁচা যাবে না কেন?

সীতানাথ : কেন, তুমি বলো?

শরদিন্দু : আমি কী বলবো? আমি তো বেঁচে আছি।

[সীতানাথ শুধু হাসিমুখে চেয়ে রইলো। যেন মজার কথা বলেছে শরদিন্দু।]

(অধৈর্য স্বরে) আমি তো বেঁচে আছি!

সীতানাথ : (স্নিগ্ধকণ্ঠে) তুমি আত্মহত্যা করোনি কেন শরদিন্দু?

শরদিন্দু : (প্রবল প্রতিবাদে) কেন করবো?

সীতানাথ : কেন করবে না শরদিন্দু?

শরদিন্দু : আমি—আমার স্ত্রী আছে!

সীতানাথ : আমারও স্ত্রী ছিল!

শরদিন্দু : বন্ধুবান্ধব আছে!

সীতানাথ : আমারও ছিল।

শরদিন্দু : আমার চাকরি আছে! কাজ আছে!

সীতানাথ : আমারও চাকরি ছিল। কাজ ছিল।

শরদিন্দু : (চিৎকার করে) কিন্তু তুমি আত্মহত্যা করেছো!

সীতানাথ : (স্নিগ্ধকণ্ঠে) আর তুমি আত্মহত্যা করোনি। কেন করোনি শরদিন্দু?

শরদিন্দু : (ক্রুদ্ধ অস্বীকারে) আমার বাঁচতে ভালো লাগে, তাই করিনি!

[সীতানাথের মুখের হাসি আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেলো। চোখের দৃষ্টিতে, ওষ্ঠাধরের বক্রতায় একটা গভীর অশ্রদ্ধা ফুটে উঠলো ক্রমে।]

(দুর্বল স্বরে) আমার বাঁচতে ভালো লাগে—

সীতানাথ : (চূড়ান্ত অশ্রদ্ধায়) মিথ্যেবাদী। প্রবঞ্চক। কাপুরুষ।

শরদিন্দু : আমি—কাপুরুষ?

সীতানাথ : (রূঢ় তর্জনে) চুপ করো।

[শরদিন্দু স্তব্ধ হোলো। চেয়ে রইলো।]

আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম—তুমি কেন আত্মহত্যা করোনি। তুমি জবাব দিতে পারলে না।

[শরদিন্দুর উদ্যত প্রতিবাদ সীতানাথের কঠিন দৃষ্টিতে নীরবে রয়ে গেলো]

সীতানাথ : তুমি আমাকে প্রশ্ন করেছো—আমি কেন আত্মহত্যা করেছি? আমি জবাব দিচ্ছি—শোনো।

[সীতানাথ কথা বলতে লাগলো। শরদিন্দুকে উদ্দেশ করে নয়। শরদিন্দুর অস্তিত্ব যেন মনেই নেই তার। কথা বলতে লাগলো যেন দর্শকদের উদ্দেশে। অনেক সময়ে দর্শকদের বাইরে যে আরো বড় দুনিয়া আছে—তার উদ্দেশে।]

উনিশ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। উনিশ বছর আগে।

শরদিন্দু : উনিশ বছর?

সীতানাথ : (কর্ণপাত না করে) উনিশ বছর আগে পৃথিবী সুন্দর ছিল। মানুষরা সজীব ছিল। জীবন মূল্যবান ছিল। উনিশ বছর আগে।

শরদিন্দু : (খানিকটা যান্ত্রিকভাবে) উনিশ বছর আগে?

[শরদিন্দুর কোনো কথাই যেন সীতানাথের কানে যাচ্ছে না। শরদিন্দুও ঠিক সীতানাথকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করছে না।]

সীতানাথ : এক বছর পরে বাবা মারা গেলেন। আঠারো বছর আগে। পৃথিবী নামক গ্রহের মানুষ নামক চারশো কোটি প্রাণীর মধ্যে একটি প্রাণী মরে গেলো—আমার বাবা। আঠারো বছর আগে।

শরদিন্দু : আমার বাবাও মারা গেছেন আঠারো বছর আগে।

সীতানাথ : আঠারো বছর আগে। সমস্ত দুনিয়াটা ওলট-পালট হয়ে গেলো আর একটি প্রাণীর কাছে। আমার কাছে। নিশ্চিন্ত আনন্দ মুছে রাজ্যের দুশ্চিন্তা। নিশ্চিন্ত আরাম ছুটে রাজ্যের পরিশ্রম। নিশ্চিন্ত আশ্রয় ভেঙে রাজ্যের বিপর্যয়। জীবনের যতো রস, যতো রঙ—সব ধুয়ে মুছে ভেঙে গলে একটি মাত্র প্রশ্নে এসে দাঁড়ালো—মানুষ হতে হবে। আঠারো বছর আগে—

শরদিন্দু : আঠারো বছর আগে—

সীতানাথ : মানুষ হতে হবে। মানুষ। তখন মানুষ হওয়া বলতে বুঝতাম—লেখাপড়া করে পরীক্ষা পাস করা। করে নিজের পায়ে দাঁড়ানো। তার অন্য নাম চাকরি করা। তার অন্য নাম—নিজের অনেকখানি অংশ নিয়মিত বিক্রি করে নিয়মিত গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা। একটিমাত্র প্রশ্ন। একটিমাত্র প্রতিজ্ঞা। বাধা-বিপত্তি—অভাব-দারিদ্র্য-লাঞ্ছনা-অপমান সব কিছুর বিরুদ্ধে লড়বার হাতিয়ার একটি মাত্র প্রতিজ্ঞা। জীবনের একটি মাত্র অর্থ।

শরদিন্দু : আমারও—এই একই প্রতিজ্ঞা। আঠারো বছর আগে—

সীতানাথ : আর এক বছর। আই.এ.। আরো দু'বছর। বি.এ.। আরো দু'বছর। এম.এ.। কলেজ। লাইব্রেরি। ধার করা। ধার শোধ দেওয়া। ছাত্র পড়ানো। রাত জেগে পড়া। পরীক্ষা। আরো ধার। আরো ছাত্র পড়ানো। আরো রাত জেগে পড়া। আরো পরীক্ষা। শেষ পরীক্ষা। এম.এ.। মানুষ হবার শেষ পদক্ষেপ। এম.এ.। আজ থেকে তেরো বছর আগে।

শরদিন্দু : আমিও এম.এ. পাস করেছি তেরো বছর আগে।

সীতানাথ : শেষ পরীক্ষা। পরীক্ষার শেষ। মানুষ হওয়া গেছে। নিজের পায়ে দাঁড়ানো গেছে। চাকরি পাওয়া গেছে। প্রতিজ্ঞার শেষ। পাঁচ বছর ধরে যে প্রতিজ্ঞা জীবনের একমাত্র অর্থ ছিল—সে প্রতিজ্ঞার শেষ। তেরো বছর আগে।

শরদিন্দু : তেরো বছর আগে—

সীতানাথ : তেরো বছর আগে জীবনের আরম্ভ। আর জীবনের শেষ। আবার নতুন অর্থ খোঁজা। আবার নতুন প্রতিজ্ঞা খোঁজা। নতুন জীবনের আরম্ভ। রাশি রাশি ছাত্র সারি বেঁধে বসে আছে। সারি সারি বেঞ্চি। বেঞ্চিতে সারি সারি ছাত্র।

শরদিন্দু : আমিও কলেজে পড়াই। আশ্চর্য! আজ তেরো বছর হোলো।

সীতানাথ : তেরো বছর ধরে রাশি রাশি ছাত্র। সারি সারি বেঞ্চিতে রাশি রাশি ছাত্র। দিনের পর দিন। বছরের পর বছর। একই বেঞ্চি। একই বক্তৃতা। নতুন মুখ। পুরোনো মুখ। যেন একই ছাত্র। বছরের পর বছর। এক বছর। দু'বছর। কণার সঙ্গে দেখা।

শরদিন্দু : দু'বছর?

সীতানাথ : এগারো বছর আগে কণার সঙ্গে দেখা। স্কুল টিচার কণা।

শরদিন্দু: স্কুল টিচার? বাসন্তীও স্কুলে পড়াতো।

সীতানাথ : স্কুল টিচার কণা। রাশি রাশি ছাত্রী। সারি সারি বেঞ্চিতে রাশি রাশি ছাত্রী। অথচ কণা তরুণ। অথচ কণা সজীব। কণা উজ্জ্বল। কণা উৎসুক। কণা জীবনের অর্থ। নতুন জীবনের অর্থ। ভবিষ্যৎ জীবনের অর্থ। স্কুল টিচার কণা। সঙ্গী কণা। স্ত্রী কণা।

শরদিন্দু : বাসন্তী! (উত্তেজনায়) এ তো-- এ তো আমার গল্প! বাসন্তী!
[এতোক্ষণ পরে এই প্রথম যেন শরদিন্দুর কণ্ঠস্বর সীতানাথের কানে গেলো। ধীরে ধীরে শরদিন্দুর দিকে ফিরে তাকালো সে। কিন্তু শুধু কণ্ঠস্বরই শুনেছে যেন, কথা শোনেনি। সীতানাথের স্বর আগের চেয়ে তীব্র হয়ে উঠতে লাগলো। কথা আগের চেয়ে দ্রুত। শরদিন্দুর চোখে তার চোখ।]

সীতানাথ : সঙ্গী কণা। স্ত্রী কণা। বছরের পর বছর। এগারো বছর। সারি সারি বেঞ্চি। রাশি রাশি ছাত্র। কণা! কলেজ। কণা! বক্তৃতা। কণা! জীবনের নতুন অর্থ। বেঁচে থাকার নতুন কারণ। রাশি রাশি ছাত্র, রাশি রাশি মিনিট ঘণ্টা দিন মাস বছর, রাশি রাশি অর্থহীনতার মধ্যে একটা অর্থ—কণা!

শরদিন্দু : বাসন্তী!

সীতানাথ : কণা! এগারো বছরের স্ত্রী কণা। এগারো বছরের রাশি রাশি সেকেন্ড মিনিট ঘণ্টা, এগারো বছরের রাশি রাশি অর্থহীনতায়, আস্তে আস্তে—কণা—তলিয়ে গেলো।
[সীতানাথ আবার অন্য দিকে ফিরলো। তার শেষ ক'টি কথা তীব্রতা হারিয়ে এক নিরালম্ব নির্জীবতায় ভারি।]

শরদিন্দু : (চিৎকার করে) না!!

সীতানাথ : (নির্জীব কণ্ঠে) কণা তলিয়ে গেলো। রাশি রাশি মিনিট ঘণ্টা দিনের অভ্যাসে জীবনের নতুন অর্থ তলিয়ে গেলো।

শরদিন্দু : কক্ষনো না! বাসন্তী তলিয়ে যায়নি—!

[সহসা কণার প্রবেশ। শোবার ঘর থেকে। হাতে ইলেকট্রিক বিল।]

কণা: তুমি কালকেও ইলেকট্রিক বিল দাওনি?

সীতানাথ : অ্যাঁ? ওহো, একদম ভুলে গেছি! জামার পকেটে রেখে দাও তো?

কণা : জামার পকেটেই তো ছিল! কাল অফিস যাবার সময়ে মনে করিয়েও দিলাম।

সীতানাথ : শনিবার এমনিও দেওয়া মুশকিল। বড় ভিড় হয়। কাল দেবো ঠিক!

কণা : কালই কিন্তু লাস্ট ডেট। কাল না দিলে পয়সা বেশি লেগে যাবে।

সীতানাথ : না না, কাল ঠিক দেবো। সোমবার দু'টো পিরিয়ড পর পর অফও থাকে।

[কণা বিল নিয়ে চলে গেলো]

(আগের মতো নির্জীব কণ্ঠে) কণা তলিয়ে গেলো।

শরদিন্দু : বাসন্তী তলিয়ে যায়নি! বাসন্তী তলিয়ে যায়নি!

সীতানাথ : (ডেকে) কণা!

কণা : (ভিতর থেকে) কেন?

সীতানাথ : কী করছো তুমি?

কণা : (ভিতর থেকে) ঘর গোছাচ্ছি।

সীতানাথ : রাখো এখন। এখানে এসো।

[কণার প্রবেশ]

কণা : কী?

সীতানাথ : আজ রোববার।

কণা : (হেসে) সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

সীতানাথ : কী করবে আজ বলো।

কণা : তুমি বলো।

সীতানাথ : বেড়াতে যাবে? ট্রেনে করে?

কণা : কোথায় যাবে বলো?

সীতানাথ : যেখানে বলবে। ডায়মণ্ডহারবার যাবে?

কণা : অতো দূর? আজ যে মশারিটা কাচবো ভেবেছিলাম?

সীতানাথ : তবে চলো দুপুরে খাবার পর কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসি। বটানিক্যালে যাবে?

কণা : গেলে হয়। অনেকদিন যাওয়া হয়নি।

সীতানাথ : ঐ বাসের ভিড়ের কথা ভাবলে যেতে ইচ্ছে করে না।

কণা : তাও ঠিক। যেতে যেতে দম ফুরিয়ে যায়।

সীতানাথ : তবে কোথায় যাওয়া যায়?

কণা : মণিবাবুদের বাড়ি কিন্তু একবার যেতে হবে শিগগিরই। ওরা দু'দিন এসেছিলো।

সীতানাথ : মণিদের বাড়ি? আজকে সেরে আসতে চাও?

কণা: তা সেরে এলে হয়।

শরদিন্দু : (আর্ত প্রতিবাদে) না! না! এ সব মিথ্যে কথা।

[কণা ফিরে গেলো শোবার ঘরে। শরদিন্দুর কথা না শুনে, তার দিকে না চেয়ে।]

সীতানাথ : সজীব কণা। প্রাণের সজীবতা অভ্যাসের সজীবতায় এসে দাঁড়ালো। উৎসুক

কণা। অন্তরের ঔৎসুক্য হোলো অভ্যাসের ঔৎসুক্য। জীবনের সঙ্গী কণা হোলো অভ্যাসের সঙ্গী।

শরদিন্দু : (কোণঠাসা শিকারের মতো) মিথ্যে কথা! আমি মানি না। আমি মানি না! বাসন্তী অভ্যাস নয়। বাসন্তী জীবন! বাসন্তী জীবনের অর্থ!

[কণার প্রবেশ। হাতে নাইলনের থলি।]

কণা : বেশ জিনিসটা, না? তুমি তো কাল এসপ্ল্যানেড যাচ্ছো—একটা কিনে আনবে?

সীতানাথ : কাল কখন এসপ্ল্যানেডে যাচ্ছি?

কণা : বাঃ! ইলেকট্রিক বিল দিতে যাবে না?

সীতানাথ : ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা। আচ্ছা দেখবো।

কণা: ছাই দেখবে! তোমার মনে থাকলে তো?

[কণার প্রস্থান]

সীতানাথ : (নির্জীব স্বরে) জীবনের অর্থ এগারো বছরের অর্থহীনতায় বিলুপ্ত।

শরদিন্দু : আমি মানি না!

সীতানাথ : এগারো বছব! এগারো শতাব্দী। এগারো হাজার বছর। রাশি রাশি বছরের অর্থহীনতার ইতিহাস। রাশি রাশি মানুষের, রাশি রাশি কীটের অর্থহীনতার ইতিহাস।

শরদিন্দু : আমি মানি না!

[সীতানাথ সহসা ঘুরে শরদিন্দুর মুখোমুখি দাঁড়ালো। তার মুখ আবার পরম অশ্রদ্ধায় কঠিন।]

সীতানাথ : তুমি মানো না! শরদিন্দু নাগ বলছে—আমি মানি না! রাশি রাশি কীটের একটা কীট বলছে—ইতিহাস মানি না।

শরদিন্দু : ইতিহাস এ নয়!

সীতানাথ : (তীব্র বিদ্রূপে) ইতিহাস কী শরদিন্দু? পরীক্ষা পাসের প্রতিজ্ঞা? সজীব উজ্জ্বল উৎসুক স্ত্রীর সাহচর্যের সান্ত্বনা?

শরদিন্দু : (মরিয়া চিৎকারে) হ্যাঁ, তাই! হ্যাঁ, তাই! হ্যাঁ, তাই!

সীতানাথ : (খাতাটা তুলে দেখিয়ে) আর—বাকি ইতিহাস?

শরদিন্দু : (ভয়ে) বাকি ইতিহাস?

সীতানাথ : হ্যাঁ, বাকি ইতিহাস। পরীক্ষা নয়। চাকরি নয়। কণা নয়। বাসন্তী নয়। বাকি ইতিহাস! দাঙ্গার ইতিহাস! মহাযুদ্ধের ইতিহাস! রাশি রাশি বছরের হত্যা নির্যাতন যন্ত্রণার ইতিহাস! কুরু-পাণ্ডব সিকন্দর নীরো চেঙ্গিস খা নেপোলিয়ন হিটলারের ইতিহাস। হাজার হাজার বছরের ইতিহাস পিরামিডের পাথরে, কলোসিয়মের বালিতে, জালিয়ানওয়ালাবাগের দেওয়ালে, হিরোশিমার পোড়া মাটিতে লেখা রয়েছে! হাজার হাজার বছরের বাকি ইতিহাস!

শরদিন্দু : (আর্তস্বরে) কিন্তু তার আমি কী করতে পারি?

[সীতানাথ হঠাৎ নিস্তব্ধ হোলো। এক দীর্ঘ মুহূর্ত শরদিন্দুর দিকে চেয়ে রইলো। খাতাটা টেবিলের উপর রাখলো ধীরে। তারপর অন্যদিকে ফিরলো। তার গলা আবার শান্ত নির্জীব।]

সীতানাথ : না। তুমি কিছু করতে পারো না। আমি কিছু করতে পারিনি। কারো কিছু করবার নেই। নির্যাতন হত্যা দাঙ্গা যুদ্ধ—সব কিছু চলবে, সব কিছু মানুষই করবে—তবু মানুষের কিছু করবার নেই। যে মানুষ শান্তিতে দু'বেলা খেতে পেলে খুশি, সে-ই অন্য মানুষের পেটে বেয়নেট গুঁজে দেবে। যে বৈজ্ঞানিক একটা জন্তুর যন্ত্রণা চোখে দেখতে পারে না, সে-ই একসঙ্গে লক্ষ মানুষ ধ্বংসের অস্ত্র তৈরি করবে। এরা সবাই মানুষ। তোমার মতো। আমার মতো। এরা সবাই জীবনের এক একটা অর্থ খুঁজে নিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করছে।

শরদিন্দু : তবু তো বাঁচছে?

সীতানাথ : বাঁচবার ভান করছে। অর্থ যখন থাকছে না, তখন অভ্যাস সম্বল করে বাঁচবার ভান করছে। যেমন আমি করেছিলাম। যেমন তুমি করছো।

শরদিন্দু : না, এ হয় না! এ হতে পারে না! ইতিহাসের আর একটা দিক আছে! যুদ্ধের ও পিঠে শান্তি আছে! নির্যাতনের ও পিঠে ভালোবাসা আছে। নিশ্চয়ই আছে! না হলে—না হলে তো সবাইকে আত্মহত্যা করতে হয়।!

[সীতানাথ প্রশান্ত হাসিমুখে শরদিন্দুর দিকে ফিরলো। সে হাসির সামনে ভয়ার্ত শরদিন্দু শিউরে পিছিয়ে গেলো।]

তুমি কেন আত্মহত্যা করেছো?

[সীতানাথ নিরুত্তর হাসি নিয়ে চেয়ে রইলো]

(আর্তস্বরে) বেঁচে থাকা কি যেতো না? অন্য সকলের মতো বেঁচে থাকা কি যেতো না?

সীতানাথ : মানুষ হয় বাঁচবে, না হয় মরবে।

শরদিন্দু : (প্রায় শেষ চেষ্টায়) কিন্তু অন্য সবাই?

সীতানাথ : (ধীর ধৈর্যে) অন্য সবাই পারে শরদিন্দু। না বেঁচে, না মরে পারে।

শরদিন্দু: কী করে পারে তারা?

সীতানাথ : আশায়।

শরদিন্দু : আশা?

সীতানাথ : জীবনের অর্থ ফুরোলে ভাবে—একদিন অর্থ ফিরবে। বেঁচে থাকা শেষ হলে ভাবে—একদিন আবার শুরু হবে। তাদের আশা আছে।

শরদিন্দু : তোমার আশা ছিল না?

সীতানাথ : না। আমার আশা ছিল না। আমার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব একাকার হয়ে গিয়েছিলো।

শরদিন্দু : (রুদ্ধ নিশ্বাসে) আমার? (সীতানাথ নিরুত্তর) বলো! আমার?

সীতানাথ : (জবাব না দিয়ে, অন্যদিকে যেতে যেতে) আজ সারাদিন তোমরা আমার আত্মহত্যার কারণ কল্পনা করে কাটিয়েছো।

শরদিন্দু : (আপন মনে) হ্যাঁ। কল্পনা।

সীতানাথ : (ঘুরে দাঁড়িয়ে) যখন কল্পনা করেছো শরদিন্দু, তখন কি আসল কারণ জানতে না?

শরদিন্দু : (ধীরে) হয় তো জানতাম। এখন মনে হচ্ছে জানতাম।

সীতানাথ : (স্নিগ্ধ স্বরে) তুমি আত্মহত্যা করোনি কেন শরদিন্দু?

[শরদিন্দু শুনতে পেলো না। যেন সে গভীর চিন্তায় ডুবে আছে।]

তুমি আত্মহত্যা করোনি কেন শরদিন্দু?

[শরদিন্দু আবার ফিরলো। ঘরের অন্যদিকে গেলো ধীরে ধীরে। দাঁড়ালো। তারপর ক্লান্তভাবে সীতানাথের দিকে ফিরলো।]

শরদিন্দু : তুমি যাও শরদিন্দু।

সীতানাথ : আমি সীতানাথ।

শরদিন্দু : তুমি যাও সীতানাথ!

[সীতানাথ চলে গেলো। মিশে গেলো অন্ধকারে। শরদিন্দু স্তব্ধ। টেব্‌ল ল্যাম্পের গুটিয়ে পাকিয়ে রাখা তারটা চোখে পড়লো। যেন নতুন চোখে দেখছে তারটাকে। প্লাগ খুলে হাতে তুলে নিলো তারটা। ল্যাম্পটা নিভে গেলো। একবার ছাদের দিকে তাকালো। গুটি খুললো ধীরে ধীরে। তারটা অনেকটা লম্বা, হাতে একটা পাক খেয়ে ফাঁসের মতো দেখতে হয়েছে। কড় কড় শব্দে কড়া নড়ে উঠলো। শরদিন্দু চমকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো হাতের তারটা। আবার কড়া নাড়া। সঙ্গে বাসুদেবের হাঁক—'শরদিন্দুদা!' শরদিন্দু দরজা খুলে দিলো। বাসুদেবের প্রবেশ। পরিধানে নিমন্ত্রণের সাজ। মনে প্রচুর স্ফূর্তি।]

বাসুদেব : কনগ্র্যাচুলেশন্‌স্ শরদিন্দুদা! কী খাওয়াবেন বলুন!

শরদিন্দু: কী ব্যাপার—তুমি—এতো রাত্রে—

বাসুদেব : থাকতে পারলাম না শরদিন্দুদা! খবরটা না দিয়ে বাড়ি যেতে পারলাম না। বিয়েবাড়ি থেকে সোজা চলে এসেছি।

শরদিন্দু : খবর? কী খবর?

বাসুদেব : আপনাদের হরেকেষ্ট সত্যিই যাচ্ছে! নোটিস দিয়ে দিয়েছে।

শরদিন্দু : অ্যাঁ?

বাসুদেব : খোদ প্রিন্সিপ্যালের মুখে শোনা! সব্বাই শুনেছে। ভবতোষ মিত্তিরের বাড়ি। হরেকেষ্ট নিজেও ছিল।

শরদিন্দু : (যেন এতোক্ষণে বুঝছে) হরেকৃষ্ণ—চলে যাচ্ছে?

বাসুদেব : একদম পাকা! এক মাসের মধ্যে আপনি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর! কই, বৌদি কই? বৌদি! বৌদি!

বাসন্তী : (ভিতর থেকে) কে?

বাসুদেব : (চেঁচিয়ে) আপনি ঘুমোচ্ছেন? শরদিন্দুদা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হয়ে গেলো--আর আপনি ঘুমোচ্ছেন পড়ে পড়ে?

[বাসন্তীর প্রবেশ। ঘুম থেকে উঠে এসেছে, কেশ-বেশ কিছুটা অবিন্যস্ত।]

বাসন্তী: কী ব্যাপার?

বাসুদেব : শিগগির চায়ের জল চড়ান! খাওয়াটা পরে হবে, চা-টা হোক আগে!

শরদিন্দু : হরেকৃষ্ণ চলে যাচ্ছে?

বাসুদেব : আপনার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না?

বাসন্তী: তার মানে তুমি—

বাসুদেব : অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর! এক মাসের মধ্যে!

বাসন্তী: সত্যি!

[বাসন্তীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বাসুদেব উচ্ছল। শরদিন্দুর মুখে হাসি ফুটেছে।]

শরদিন্দু : হরেকেষ্ট গেলো শেষ অবধি?

বাসুদেব : আরে ঐজন্যেই তো বাড়ি যেতে পারলাম না। বিয়েবাড়ি থেকে সোজা ছুটে এলাম খবরটা দিতে। বৌদি, জল চড়ান শিগগির!

বাসন্তী : আজ আপনাকে সত্যিই এক বালতি চা খাওয়াবো!

[বাসন্তী রান্নাঘরে ছুটলো। আলো জ্বাললো রান্নাঘরের। শরদিন্দু তখনো যেন ধাতে ফেরেনি।]

বাসুদেব : কী ব্যাপার শরদিন্দুদা? অমন ঝিমিয়ে আছেন কেন? এতো বড়ো একটা খবর!

শরদিন্দু : অ্যাঁ? (গা-ঝাড়া দিয়ে) না। না, ঝিমিয়ে থাকবো কেন? বাসুদেব, তুমি—তুমি আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছো! বিরাট খবর এনেছো তুমি! দারুণ খবর!

[ল্যাম্পের তারটা তুলে দৃঢ় হাতে প্লাগে ভরে দিলো। ল্যাম্পটা জ্বলে উঠলো।]

আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছো তুমি!

[বাসন্তীর প্রবেশ]

বাসন্তী: জানো, হিটারটা জ্বলছে না। কী করি?

শরদিন্দু : (প্রায় চেঁচিয়ে) জ্বলছে না? কাগজ জ্বালিয়ে চা করো! এই নাও কাগজ!

[নিজের গল্প-লেখা কাগজগুলি বাসন্তীর হাতে গুঁজে দিলো]

এই নাও! এই নাও কাগজ! কাগজ জ্বালিয়ে চা করো!

বাসন্তী: এ কী? এটা তো—

শরদিন্দু : হ্যাঁ হ্যাঁ—এইগুলোই জ্বালো! কোনো দরকার নেই এর! কোনো দরকার নেই! কোনো দরকার নেই!

[বিস্মিত বাসন্তীকে প্রায় ঠেলে রান্নাঘরে ঢুকিয়ে দিলো। ফিরে এলো এক নিশ্চিন্ততার আনন্দ নিয়ে। তবু এ আনন্দ যেন চাবুক মেরে জাগিয়ে তোলা আনন্দ।]

বাসুদেব : (অল্প বিস্মিত) আপনি যেন ক্ষেপে গেলেন মনে হচ্ছে?

শরদিন্দু : ক্ষেপে গেছি? হ্যাঁ বাসুদেব। ক্ষ্যাপাই দরকার। চাকরি নিয়ে, প্রোমোশন নিয়ে—ক্ষ্যাপাই দরকার! এ ছাড়া বাঁচবার কোনো রাস্তা নেই! এ ছাড়া—

[কিন্তু শরদিন্দুর চোখ পড়েছে কাটিং-এর খাতাটায়। পাথর হয়ে গেছে সে সহসা।]

বাসুদেব: কী হোলো শরদিন্দুদা?

[শরদিন্দু তুলে নিলো খাতাটা কম্পিত হাতে। নিজের থেকে দূরে ধরে রেখেছে। একবার খোলবার চেষ্টা করলো। পারলো না।]

শরদিন্দুদা!

[শরদিন্দু খাতাটা বাসুদেবের হাতে দিলো। তার চোখে বিভীষিকা।]

শরদিন্দু : (ভাঙা গলায়) বাসুদেব! খাতাটা খুলে দেখো তো? দেখো তো কী আছে?

বাসুদেব : কেন? কী?

[শরদিন্দু অন্যদিকে ফিরে, চেয়ারের পিঠে ভর রেখে]

শরদিন্দু : কী? কী আছে?

বাসুদেব : এ তো—খবরের কাগজের কাটিং!

শরদিন্দু : (রুদ্ধশ্বাসে) কাটিং? সব কাটিং? ছবি নেই?

বাসুদেব : কই, না তো? এ তো সম্পাদকীয় বেশির ভাগ।

শরদিন্দু : ভালো করে দেখো বাসুদেব। একটাও ছবি নেই?

বাসুদেব : (পাতা উল্টে) কই, দেখছি না তো? কী হয়েছে আপনার?

শরদিন্দু : (অস্ফুট কণ্ঠে) বাকি ইতিহাস!

বাসুদেব ! কী ইতিহাস?

[শরদিন্দু ফিরলো। তার মুখে ক্লান্তি—কিছুটা নিশ্চিন্ততার, কিছুটা বাকি ইতিহাসের চেতনার।]

শরদিন্দু : না। কিছু না বাসুদেব। একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম। তুমি আসবার ঠিক আগে।

[সে 'দুঃস্বপ্ন' যেন ফিরে আসছে। শরদিন্দু অস্বীকার করবার চেষ্টা করছে প্রাণপণে। নিশ্চিন্ততা মুছে যাচ্ছে চোখ থেকে।]

একটা দুঃস্বপ্ন শুধু! দুঃস্বপ্ন! একটা বাজে মিথ্যে অর্থহীন দুঃস্বপ্ন!

[শরদিন্দুর গলা চড়ছে। উৎকণ্ঠিত বাসন্তী রান্নাঘরের দরজায় বেরিয়ে এসেছে। বাসুদেব উদ্বিগ্ন।]

বাসুদেব : কী দুঃস্বপ্ন?

[শরদিন্দু দু'হাতের শক্ত মুঠোয় কপাল রেখে বসে। তার শরীর যন্ত্রণায় কঠিন। বাকি ইতিহাসের চেতনা বহন করে বাকি জীবনটা বেঁচে থাকবার যন্ত্রণা।]

শরদিন্দু : ইতিহাস বাসুদেব! বাকি ইতিহাস! বাকি ইতিহাস!

এনুগু, নাইজেরিয়া
১৯৬৫

বাঘ

মুখবন্ধ

এই নাটকটি Murray Schisgal-এর 'The Tiger'-এর ছায়া অবলম্বনে রচিত। যখন লিখেছি, তখন মূল নাটকটি আমার হাতে ছিল না। লিখেছি স্মৃতির ভিত্তিতে, ফলে যা বদলাবার বদলেছে। তার চেয়েও বড়ো কথা— মূল নাটকের যা বক্তব্য ছিল, তার থেকে আমার নাটকের বক্তব্য সম্পূর্ণ আলাদা। ১৯৬৮ সালে আমাদের নাট্যসংস্থা 'শতাব্দী' মঞ্চে উপস্থিত করেছে এই নাটক। বর্তমানে 'অয়না' নাট্যগোষ্ঠী তৃতীয় থিয়েটারের ধারায় অভিনয় করে চলেছে। মফঃস্বলে গ্রামেগঞ্জেও এ নাটক গৃহীত হয়েছে, যা আমি একেবারেই ভাবিনি। সম্ভবত 'বাঘ'-এর মূল বিষয় বন্ধুত্ব—এই কারণেই।

[ঘরটা একটু অদ্ভুত। আকারটা তেড়াবাঁকা। পিছনের দেওয়াল একটানা নয়, একটা অংশ খাঁজ কেটে এগিয়ে এসেছে। সেই দিকে একটা দরজা, কিন্তু পাল্লা নেই। অন্য একটি ছোট ঘরের অংশ দেখা যায়। ছোট এই ঘরটিতে রান্নার ব্যবস্থার আভাস। দেওয়ালের বাকি অংশে আর একটি দরজা, তার বাইরে বারান্দা মতো। বারান্দাটা কিছু উঁচু, তাই দরজা দিয়ে ঢুকতে গেলে এক ধাপ নামতে হয় এবং দরজার উপরের চৌকাঠে মাথা ঠুকে যাবার সম্ভাবনা সাবধান না হলে। দুই দরজার মধ্যবর্তী অংশে একটি ছোট দেরাজহীন সস্তা টেবিল, তার পাশে একটা ছোট টুল। বারান্দার দরজার অন্যপাশে মঞ্চের ধার ঘেঁষে একটা তক্তাপোশ। সামান্য একটা বিছানা। ঘরে আর আছে একটা হাতাওয়ালা কাঠের বড়ো চেয়ার, আর কাঠের দু'টো অসমান খেলো বুক-শেল্‌ফ্‌—বইয়ে কাগজে ঠাসা। ঘরে একটি মাত্র জানলা—খাটের পাশে। এক ফালি আলো খাটের উপর এবং ঘরের খানিকটায় পড়ে জানলার জানান দেয়। আলোটি সম্ভবত রাস্তার আলো।

যবনিকা যখন সরলো, মঞ্চ অন্ধকার। শুধু রাস্তার আলোটা অন্ধকারে গুলে বারান্দার দরজার সামনেটাকে খানিকটা দৃশ্যমান করেছে। বারান্দায় ভারি পদশব্দ। কেউ যেন ভারি মোট বয়ে নিয়ে আসছে। দরজাটা লাথি খেয়ে ছিটকে খুলে গেলো। বারান্দা থেকেও একফালি পাতলা আলো এসে পড়লো ঘরে। দরজায় বাঘের ছায়ামূর্তি। কাঁধের ভারি বোঝা- সমেত নিচু হয়ে সাবধানে, কিছুটা কষ্টে বাঘ ঘরে ঢুকলো। বোঝাটাকে ঝুপ করে নামালো খাটের ওপর। বোঝা ছটফট করতে লাগলো। বাঘ দরজাটা বন্ধ করে দিলো। ঘরের অন্য পাশে গিয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বাললো। বাঘ যথেষ্ট বলবান, কিন্তু পালোয়ান নয়। চোখ দু'টো ধারালো, কিন্তু ঠোঁটে চিবুকে ছেলেমানুষি ভাব। ফলে মুখে একটা বেমানান অভিব্যক্তি। বয়স বোঝা মুশকিল, কিন্তু তিরিশের কম নয়। খাটে ছটফট করা বোঝাটি একটি মেয়ে। তার বয়স তিরিশের কাছাকাছি। আঁটসাঁট শক্ত গড়ন, মুখশ্রী সাধারণ। মুখশ্রী বর্তমানে খুব প্রকাশিত নয়, কারণ মুখ কাপড় দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। হাত দু'টোও পিছমোড়া করে বাঁধা, পা দু'টোও তাই। বাঘের কব্জিতে স্ট্র্যাপ লাগানো মেয়েদের ব্যাগ ছিল একটা। সেটাকে টুলের উপর রাখলো অবহেলায়।]

বাঘ : (হাত ঘষতে ঘষতে) ব্যস্‌! ব্যস্‌! কব্জা। ফতে! কামাল! হাঃ হাঃ!

[মেয়েটির মুখ দিয়ে একটা গোঙানি আওয়াজ বেরোলো]

কী বলবে বলো? খুলে বলো? হাঃ হাঃ পরিষ্কার করে বলো! যা বলবার আছে খুলে বলতে পারো এখন—পরিষ্কার করে! হাঃ হাঃ!

[গোঙানি। মাথা নেড়ে মুখের বাঁধন খুলে দেবার কাকুতি।]

কী বললে? মুখ বাঁধা? কথা বলবে কী করে? হাঃ হাঃ! কথা! (ভেংচে) কথা! কী কথা বলবার আছে শুনি? ক'টা কথা জানো? শুধু বক বক বক বক বক বক বক বক কল কল কল কল কল কল কল কল ভ্যার ভ্যার ভ্যার ভ্যার ভ্যার ভ্যার ভ্যার ভ্যার—এই তো কথা! এই তো জানো! কথা! অ্যাঁ?

[গোঙানি। ছটফট।]

হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো বলো! কী চাই বলো! মুখ খুলে দেবো? চ্যাঁচাবে? হাত খুলে দেবো? আঁচড়াবে? পা খুলে দেবো? পালাবে? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! কিচ্ছু হবে

না। কিস্‌সু হবে না। একেবারে বিলকুল কিস্‌সু না! এ ঘরটা কী জানো? বাঘের গর্ত! বাঘের ডেরা। এ তোমার বালিগঞ্জের ফ্ল্যাট নয়! নিউ আলিপুরের ছিমছাম হ্যাপি লজ্ নয়! শ্যামবাজারের কিলবিলে লোকজনে ঠাসা উইটিবি নয়! বাঘ! বাঘের গর্ত!

[গোঙানি]

ইয়েস ম্যাডাম! জী মেমসাব! বাঘের ডেরা। (নিজের বুকে টোকা মেরে) বাঘ! ব্যাঘ্রাচার্য মহাশার্দুল! শের খাঁ দ্য টাইগার! রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার!

[গোঙানি]

উঁহু! সরি মেমসাব। মুখ খোলা হবে না এখন!

[গোঙানি]

কী বললে? কেন? বলো তো কেন? চ্যাঁচাবে বলে? আজ্ঞে না মেমসাব। কিচ্ছু হবে না। চ্যাঁচালে কিস্‌সু হবে না। ত্রিসীমানায় একটি লোক নেই! আরো আট ঘণ্টা থাকবে না। তারপর আসবে। পিলপিল করে আসবে। তালা খুলবে, ফটক খুলবে, দরজা খুলবে, ঠেলা আনবে, লরী আনবে—গুদামে গুদামে হৈ হৈ রৈ রৈ—বস্তা প্যাকিংবাক্স হাল্লা হট্টগোল হেঁইও হাফিজ্! সারাদিন! যতোক্ষণ দিনের আলো থাকে! তারপর সন্ধে হলেই তালা বন্ধ! ফটক বন্ধ! ঠেলা সাফ্! লরী ভাগল্‌বা! পিল পিল পিল পিল—অল ক্লীয়ার। (মুখে সাইরেনের আওয়াজ করে) অল ক্লীয়ার! সারা তল্লাটে একটা জ্যান্ত প্রাণী—বাঘ! শের খাঁ দ্য টাইগার!

[গোঙানি]

চ্যাঁচাও চ্যাঁচাও! যতো পারো চ্যাঁচাও! কিচ্ছু হবে না। কিস্‌সু হবে না। তুমি এখন আমার হাতের মুঠোর মধ্যে! হাঃ হাঃ! থাবার মধ্যে! বাঘের থাবা! কব্জা! ফতে!

[গোঙানি। ছটফট।]

হ্যাঁ হ্যাঁ বলো বলো! খুলে দেবো? মুখের বাঁধন খুলে দেবো? চ্যাঁচাবে? নিশ্চয়! নিশ্চয় চ্যাঁচাবে—(রোমাঞ্চকর সিনেমার নায়িকার ভয়ার্ত চিৎকার নকল করে) আঁ-আঁ-আঁ-আঁ! এমনি করে, না?

[ছটফট থেমে এলো। গোঙানিও স্তব্ধ।]

কী? চুপ করে গেলে যে? আমার চিৎকারে কেউ সাড়া দিলো না—অ্যাঁ? চেঁচিয়ে লাভ নেই? অ্যাঁ? না না, তবু চেঁচিও। মুখ খুলে দেবো—চেঁচিও। (আবার নকল করে) আঁ-আঁ-আঁ-আঁ! অ্যাঁ? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ?

[একটা হালছাড়া ক্লান্ত গোঙানি। ছটফটানি থেমে এলিয়ে পড়া।]

কী? ঠান্ডা যে? ঠান্ডা যে একদম? হাঃ হাঃ—হাতের মুঠোর মধ্যে। থাবার মধ্যে। যা খুশি তাই করবো! যা ইচ্ছে তাই! তোমার ঐ সাজানো গোছানো সাবধানে জিইয়ে রাখা শরীরটাকে থাবা দিয়ে ধারালো নখ দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে—

[মেয়েটি সহসা আছড়ে উপুড় হয়ে পড়লো খাটের উপর। ভেঙে পড়লো উচ্ছ্বসিত কান্নায়। বাঘ উন্মত্ত আনন্দে অট্টহাস্য হাসতে লাগলো। কান্না বাড়তে লাগলো। বাঘের হাসি ক্রমে যেন সস্তা থিয়েটারি হাসিতে দাঁড়াচ্ছে। হঠাৎ হাসি থামিয়ে চিৎকার করে উঠলো সে।]

শাট্ আপ!

[কান্না থামলো না]

স্টপ ইট্! চোপ্! চোপ্ একদম!

[কান্না চলতে লাগলো। বাঘ যেন অস্থির হয়ে উঠছে।]

কেঁউ কেঁউ কেউঁ কেঁউ—চোপ্! চোপ্ বলছি!

[কান্না অবিরাম। বাঘ হঠাৎ ছুটে এসে চুলের মুঠি ধরে টেনে তুললো মেয়েটাকে। একটা প্রচণ্ড চড় তুলে মেয়েটার মুখের ছ'ইঞ্চি দূরে দাঁত খিঁচানো মুখটা ঠেলে দিয়ে শাসিয়ে উঠলো।]

চুপ! একদম চুপ! একটা আওয়াজ নয় আর!

[বাঘের চিৎকার প্রায় আর্ত হয়ে উঠেছে। মেয়েটির কান্না দু'টো হেঁচকি তুলে থেমে এলো। বাঘ চুলের মুঠি ছেড়ে অন্যদিকে সরে গেলো।]

(দাঁতে দাঁত চেপে) দ্যাট্স্ বেটার!

[মেয়েটি বসে তাকিয়ে রইলো বাঘের দিকে। তার চোখের ভয় যেন কেটে আসছে। একটা আশা, একটা সাহস যেন জেগে উঠছে। বাঘ অন্যদিকে ফিরে। একটা অস্ফুট আওয়াজ করলো মেয়েটা। ভয়ার্ত গোঙানি নয়, যেন দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা। বাঘ ঘুরে দাঁড়ালো।]

কী চাই?

[মেয়েটি মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে মুখের বাঁধন খুলে দেবার অনুরোধ জানালো]

খুলে দেবো? কেন? আবার কাঁদবে—কেঁউ কেঁউ কেঁউ কেঁউ?

[মেয়েটির মাথা নাড়ে জানালো—না]

ঠিক? ঠিক বলছো?

[মেয়েটি ঘাড় নেড়ে জানালো—হ্যাঁ]

মনে থাকে যেন। কেঁউ কেঁউ করলেই—

[হাতে চড়ের ভঙ্গী দেখালো। তারপর এগিয়ে এসে মুখের বাঁধনটা খুলে দিলো। বাঘ শাসানো ভঙ্গীতে তাকিয়ে রইলো এক মুহূর্ত, কিন্তু মেয়েটি কাঁদলো না। বাঘ সরে এলো।]

মেয়েটি : (চাপা ভাঙা গলায়) আমার হাতটা খুলে দাও।

বাঘ : (ভেংচে) তা না?

মেয়েটি : বড়ো লাগছে—খুলে দাও!

বাঘ : কেন? আঁচড়াবে? চোখ গেলে দেবে?

মেয়েটি : কিছু করবো না। ভীষণ লাগছে। খুলে দাও। খুলে দাও!

[মেয়েটির গলায় আবার কান্নার আভাস]

বাঘ : (ধমকে) অল রাইট—শাট্ আপ্!

[মেয়েটি চুপ করলো। বাঘ এক ঝটকায় মেয়েটির হাতের বাঁধন খুলে দিলো। সে জ্বালা করা কব্জিতে হাত ঘষতে লাগলো।]

মেয়েটি : আমাকে ছেড়ে দাও—

বাঘ : কী?

মেয়েটি : আমাকে ছেড়ে দাও—

বাঘ : ছেড়ে দেবো? ছেড়ে দেবো? হাঃ হাঃ হাঃ—ছেড়ে দেবার জন্যে ধরে এনেছি তোমাকে? ছেড়ে দেবার জন্যে ঐ অন্ধকার নির্জন গলিতে ঘাপটি মেরে বসে ছিলাম? বলো? বলো? কাপড় নিয়ে, দড়ি নিয়ে, ঘাপটি মেরে বসে রইলাম—ঘাড়ে করে ঐ গতরখানি বয়ে আনলাম—সব ছেড়ে দেবার জন্যে, কী বলো?

মেয়েটি : আমাকে ছেড়ে দাও, তোমার দু'টি প্যায়ে পড়ি—

বাঘ : (ভেংচে) ছেড়ে দ্যাও, তোমার দু'টি পায়ে পাড়—

মেয়েটি : ঐ ব্যাগে আমার সব কিছু আছে—সব নিয়ে আমাকে—

বাঘ : হাঃ হাঃ হাঃ—সব কিছু! বোকা পেয়েছো আমাকে—অ্যাঁ? সব কিছু! মেয়েদের সব কিছু থাকে—(আঙুল দিয়ে দেখিয়ে) ঐখানে!

[মেয়েটি ব্লাউজের ভিতর থেকে একটা ছোট মানিব্যাগ বের করে বাড়িয়ে দিলো।]

মেয়েটি : এই নাও! এই নাও! নিয়ে আমাকে ছেড়ে দাও! আমাকে ছেড়ে দাও!

[বাঘ হঠাৎ এসে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিলো হাত থেকে। হিংস্র ভঙ্গীতে তাকিয়ে রইলো এক মুহূর্ত। তারপর ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো টুলের দিকে মাটিতে।]

বাঘ : (চাপা হিংস্র গলায়) টাকা! টাকা দেখায় আমাকে!

মেয়েটি : আমার কাছে আর কিছু নেই! সত্যি বলছি! কুড়ি টাকা আছে ঐ ব্যাগে—

বাঘ : কুড়ি টাকা! হেঃ! কুড়ি টাকা বুকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে! কুড়ি টাকার প্রাণ ধুক ধুক ধুক ধুক করছে!

মেয়েটি : আমি আরো টাকা দেবো! আমার স্বামীকে বলে আরো টাকা দেবো। আমাকে—

বাঘ : বাঃ বাঃ! এবার স্বামী দেখাচ্ছে!

মেয়েটি : অনেক টাকা দেবে। আমাকে ছেড়ে দিলে সে অনেক টাকা দেবে—

বাঘ : (বিদ্রূপ করে) তাই না কি? কতো টাকা?

মেয়েটি : পাঁচ শো টাকা। আমাকে ছেড়ে দিলে—

বাঘ : পাঁচ শো? বলো কী? এতো টাকা দেবে?

মেয়েটি : হাজার টাকা দেবে। আমি দিব্যি করে বলছি—

বাঘ : হাজার? ওরে বাবা! অতো টাকা রাখবো কোথায়?

মেয়েটি : দু'হাজার দেবে! তিন হাজার! যা আছে সব দেবে! আমাকে ছেড়ে দাও!

বাঘ : তিন হাজার? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

মেয়েটি : আমাকে ছেড়ে দাও! আমাকে ছেড়ে দাও!

[মেয়েটি দাঁড়িয়ে উঠলো। পায়ের বাঁধন যেন ভুলে গিয়েছিলো। হুমড়ি খেয়ে পড়তে গেলো, বাঘ ধরে ফেললো এক লাফে এসে, স্বাভাবিক সাহায্য করবার প্রবৃত্তিতে। তারপর যেন সচেতন হয়ে রুক্ষভাবে ঠেলে বসিয়ে দিলো খাটে। মেয়েটি নিচু হয়ে পায়ের বাঁধন খুলতে গেলো।]

বাঘ : (ধমকে) কী হচ্ছে?

মেয়েটি : বড়ো লাগছে পায়ে।

বাঘ : লাগুক!

মেয়েটি : ব্যথা করছে—ভীষণ ব্যথা করছে—

বাঘ : করুক!

মেয়েটি : আমি পালাবো না। সত্যি বলছি—পালাবো না!

বাঘ : পালাবে! হাঃ! বারান্দা সিঁড়ি উঠোন পাঁচিল—এ গোলোকধাঁধা থেকে বেরোনো তোমার ঐ মুরগির মগজে কুলোলে তো!

মেয়েটি : তবে দড়িটা খুলতে দাও। ভীষণ লাগছে!

বাঘ : (ধমকে) এ তো মহা আবদার দেখি! একটা পেলে আর একটা চায়!

মেয়েটি : আমি পালাবো না—কথা দিচ্ছি—

বাঘ : অ্যাঃ—কথা দিচ্ছি! পালাবার মুরোদ আছে তোমার?

মেয়েটি : তবে কেন—

বাঘ : ঠিক আছে, খুলে ফেলো। পালাবে! চেষ্টা করে দেখো না একবার—কী করি তোমার দেখবে—

[মেয়েটি ততোক্ষণে দড়ি খুলতে শুরু করে দিয়েছে]

পালাবে! কতো পালানেওয়ালা দেখলাম!

[মেয়েটি দড়ি খুলে ফেলেছে]

মেয়েটি : আমাকে ছেড়ে দাও—

বাঘ : (ধমকে) আঃ! একই কথা ঘ্যান ঘ্যান ঘ্যান ঘ্যান করে—

মেয়েটি : তুমি যতো টাকা চাও—

বাঘ : ফের টাকা! একটি চড়ে মুখ ভেঙে দেবো তোমার! টাকা দেখাচ্ছে!

মেয়েটি : আমাকে ধরে রেখে কী করবে তুমি?

বাঘ : কী করবো? (আবার থিয়েটারি দুর্বৃত্তের ভঙ্গী ফিরে এলো) কী করবো? যা খুশি তাই করবো! তোমার নরম সুললিত শরীরটাকে—

[বাঘের কণ্ঠস্বরে অঙ্গভঙ্গীতে নির্মম ধর্ষকের চেহারা যতোই ফুটুক, উপস্থিত মেয়েটির দেহের সঙ্গে তার যেন কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো নারীদেহ সম্বন্ধেই আছে কি না সন্দেহ। হয়তো এইটাই মেয়েটির ভয়ে মুহ্যমান না হবার একটা কারণ।]

মেয়েটি : ও রকম করে বোলো না!

বাঘ : (স্তম্ভিত) বটে! আমি কীরকম করে বলবো তা তুমি ঠিক করে দেবে! (ফেটে পড়ে) তুমি কার সঙ্গে কথা বলছো খবর রাখো?

মেয়েটি : (ভয়ে ভয়ে) বাঘ?

বাঘ : ইয়েস! বাঘ! শের খাঁ দ্য টাইগার।

মেয়েটি : (হঠাৎ কাতর অনুনয়ে) ছেড়ে দাও—আমাকে ছেড়ে দাও। আমি বাড়ি যাই—অনেক রাত হয়ে গেছে—আমার স্বামী ভাববে—ভীষণ ভাববে—

বাঘ : চোপরাও! স্বামী ভাববে! স্বামী এতোক্ষণে কোন্ মেয়ের বাড়ি—

মেয়েটি : না কক্ষনো না! ও মোটেই—

বাঘ : হ্যাঁ হ্যাঁঃ! জানা আছে! তোমাদের স্যুট-টাই-রুজ্-লিপস্টিক-মার্কা জানোয়ারগুলোর বেলেল্লাপনা জানতে কিছু বাকি নেই আমার।

মেয়েটি : আমরা মোটেই ওরকম জাতের লোক—

বাঘ : তবে কী জাতের, শুনি? প্রতি শুক্কুরবার রাত ন'টার পর এই নির্জন পাড়া দিয়ে ফেরো কোন্ দেব্তার পুজো দিয়ে?

মেয়েটি : (অবাক হয়ে) প্রতি শুক্কুরবার—তুমি তাহলে আগেই আমাকে?

বাঘ : ইয়েস্ মেমসাব্! প্রতি শুক্কুরবার রাত ন'টা, সাড়ে ন'টা, কখনো কখনো দশটার সময়ে ঐ ফাঁকা গলি দিয়ে খুট্ খুট্ খুট্ খুট্—চোরের মতো এদিক ওদিক চাইতে চাইতে—

মেয়েটি : চোরের মতো? ঐ ফাঁকা গলিটায় আমার ভয় করে বলে—

বাঘ : ভয় করে তো অতো রাতে ওখান দিয়ে যাও কেন? ভয় করে তো যে নাগরের কাছে অভিসারে যাও তিনি পৌঁছে দেন না কেন? ধরা পড়ে যাবেন বলে?

মেয়েটি : কোনো নাগ্—কোনো—কারো কাছে আমি অভিসারে যাই না। আমি ও রকম মেয়ে নই!

বাঘ : নাঃ! যাও তীর্থ করতে!

মেয়েটি : আমাদের অফিসের মেয়েরা মিলে একটা মহিলা সমিতি করেছি, তার মিটিং হয় প্রত্যেক শুক্কুরবারে, তাই—

বাঘ : (ব্যঙ্গ করে) মহিলা সমিতি! তোমার স্বামীও এখন কোন্ মহিলা সমিতিতে পড়ে আছে কে জানে?

মেয়েটি : সত্যি বলছি মহিলা সমিতি! আমি প্রমাণ করতে পারি—

বাঘ : যে মেয়ে মহিলা সমিতি করে, সে মেয়ে রাত দশটায় ঐ গলিতে ঢোকে না।

মেয়েটি : কিন্তু ঐ গলিটা যে আমার বাড়ির শর্ট কাট! নইলে অনেক ঘুরতে হয়। আমি কী করে জানবো তুমি আমার জন্যে প্রত্যেক শুক্কুরবার লুকিয়ে থাকো—

বাঘ : (রেগে) তোমার জন্যে লুকিয়ে থাকি? এ যেন পাড়ার ইয়ার ছোকরা, ইস্কুলের মেয়ে দেখতে রকে এসে বসেছে—না?

মেয়েটি : আমি কি তাই বলেছি? আমি শুধু—

বাঘ : (চিৎকার করে) তুমি কী বলেছো আমি শুনতে চাই না! আর একটা কথা বললে মুখ থেঁতলে দেবো একেবারে!

[মেয়েটিকে চুপ করে গেলো। তার মুখ আবার কান্নায় কুঁচকে উঠলো। দু'একটা ফোঁপানির শব্দ।]

(ক্ষেপে) আবার! আবার কেঁউ কেঁউ?

[মেয়েটি নাক টেনে সামলে নিলো। তারপর উঠে টুলের দিকে এক পা গেলো।]

(লাফিয়ে এসে) কোথায় যাচ্ছো?

মেয়েটি : ব্যাগে আমার রুমালটা আছে—

বাঘ : থাক গে! চুপ করে বোসো ওখানে!

মেয়েটি : মুখটা মুছবো একটু—

বাঘ : অ্যাঃ! মুখটা মুছবো! পাউডার মাখবো! রঙ লাগাবো!

মেয়েটি : না, শুধু রুমালটা—

[বাঘ অধৈর্য হয়ে ব্যাগটা তুলে ছুঁড়ে দিলো মেয়েটির গায়ে। মেয়েটি রুমাল বার করে চোখ মুখ মুছলো। বাঘ অন্যদিকে ফিরে আছে দেখে পাউডার কমপ্যাক্ট খুলে

ডালার ভিতরকার আয়নাটা দেখবারও চেষ্টা করলো, কিন্তু বাঘ হঠাৎ ফেরায় তাড়াতাড়ি সেটা ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেললো।]

আমার—আমি একটু জল খাবো।

বাঘ : জল খাবে?

মেয়েটি : হ্যাঁ, বড়ো তেষ্টা পেয়েছে—

বাঘ : বটে? আর কী চাই বলো? একটু চা করে দেবো? ক্ষিদে পেয়েছে?

মেয়েটি : আমি শুধু একটু জল চেয়েছি। গলাটা একেবারে শুকিয়ে—

বাঘ : নিজে উঠে নিয়ে খাও। আমি তোমার চাকর নই!

মেয়েটি : (উঠে) কোথায় আছে বলো?

[বাঘ আঙুল দিয়ে ছোট ঘরটা দেখিয়ে দিলো। মেয়েটি সেদিকে এগুলো।]

বাঘ : দাঁড়াও!

[মেয়েটি দাঁড়িয়ে গেলো]

চুপ করে বসে থাকো ওখানে! একদম নড়বে না!

[মেয়েটি খাটে গিয়ে বসলো। বাঘ অল্পক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভিতরের ঘরে গেলো। এক মুহূর্ত। মেয়েটি হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠে পড়লো। ব্যাগটা হাতে করে পা টিপে টিপে গিয়ে ছোট ব্যাগটা কুড়িয়ে নিলো। ছোট ঘরটায় প্রবেশপথের দিকে একবার ঝুঁকে তাকালো। তারপর লঘু পায়ে দ্রুত হেঁটে সোজা বারান্দার দরজার দিকে গেলো। একটানে দরজাটা খুলে ফেললো। দ্বারপথে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বাঘ। তার হাতে এক গ্লাস জল।]

বাঘ : (ঘরে ঢুকে) কোথায় যাচ্ছিলে?

মেয়েটি : (পিছিয়ে এসে) না, কই—কোথায়— ?

বাঘ : পালাচ্ছিলে?

মেয়েটি : না না পালাবো কেন?

বাঘ : আমি বাঘ হয়েছি ঘাস খেয়ে?

মেয়েটি : না, না, আমি—

বাঘ : বাঃ! ব্যাগ দু'টোও বাগিয়ে নিয়েছো! ইজ্জৎ বাঁচাতে দু'হাজার তিন হাজার হাঁকছিলে—অ্যাঁ? আর এখন ভাবলে ইজ্জতের সঙ্গে কুড়িটা টাকাও যদি বাঁচে—

মেয়েটি : (তাড়াতাড়ি ব্যাগ রেখে) না মোটেই না। আমি—ব্যাগটা মাটিতে পড়ে আছে দেখে কুড়িয়ে রাখছিলাম—

বাঘ : (গ্লাসটা ঠক করে টেবিলের উপর রেখে) রুজ-লিপস্টিক-মার্কা মেমসাহেবের ইজ্জৎ আর সতীত্ব!

[মেয়েটি কী জবাব দিতে গিয়ে চেপে গেলো। জলটা খেয়ে নিলো ঢক ঢক করে। বাঘের মুখে যেন একটা তিক্ত হতাশার ছায়া।]

(আপন মনে) ইজ্জৎ! সতীত্ব! কুড়ি টাকার খেঁকি কুত্তা সব!

মেয়েটি : (হঠাৎ খাড়া হয়ে) দেখো, তুমি—তুমি যা ভাবো আমি তা নই! আমি একজন—একজন খেটে খাওয়া মেয়ে। অফিসে চাকরি করি।

বাঘ : খেটে খাওয়া! খাওয়া! বলো রুজ লিপস্টিক শাড়ি গয়নার খরচা—

মেয়েটি : না মোটেই না।

বাঘ : কেন, স্বামীর রোজগারে খাওয়া কুলোয় না? খুব তো দু'হাজার তিন হাজার হাঁকছিলে?

মেয়েটি : হ্যাঁ কুলোয়—কিন্তু—কী করে বোঝাই তোমাকে। যখন প্রথম চাকরি নিয়েছিলাম, তখন এরকম অবস্থা ছিল না। হ্যাঁ ভাত জুটতো, কিন্তু—

বাঘ : লিপস্টিক জুটতো না! কী বলো?

মেয়েটি : মোটেই তা নয়।

বাঘ : তা নয়? বটে?

[বাঘ মেয়েটার ব্যাগ টেবিলে উপুড় করে ফেললো। নানা টুকিটাকি জিনিসের মধ্যে পাওডার কমপ্যাক্টটাও বেরুলো।]

মেয়েটি : দেখো—লিপস্টিক আছে? দেখো? লিপস্টিক আমি কক্ষনো—

বাঘ : (কমপ্যাক্টটা তুলে) এই তো! এটা কী?

মেয়েটি : ও তো পাওডার!

বাঘ : হুঁঃ!

[ফেলে দিয়ে অন্য পাশে গেলো]

মেয়েটি : পাওডার লাগালে কী হয়েছে? সব মেয়েই তো—

বাঘ : হয়েছে হয়েছে! চুপ করো!

[বাঘের যেন কোথায় গণ্ডগোল হয়ে গেছে। মিলছে না কোথায় যেন।]

মেয়েটি : (ভয়ে ভয়ে) ছেলেরাও তো অনেক সময় পাওডার—

বাঘ : (চিৎকার করে) আমি ছেলে নই! আমি বাঘ! বুঝেছো? ঢুকেছে মোটা মাথায়? বাঘ! টাইগার!

মেয়েটি : আমি তো তোমার কথা কিছু বলি নি—

বাঘ : কারুর কথাই বলতে হবে না তোমাকে! চুপ করে থাকো!

[মেয়েটি চুপ করলো]

(আপন মনে) কথা! খালি বক বক বক বক কল কল কল কল ভ্যার ভ্যার ভ্যার ভ্যার—কথা! Hollow men! Stuffed men! Leaning together! Head-piece filled with straw! বিলকুল straw! কথা! Going round and round the mulberry bush! (হঠাৎ চেঁচিয়ে, মেয়েটিকে) কথা যে বলো—কথার মানে বোঝো?

মেয়েটি : কেন বুঝবো না?

বাঘ : ঘণ্টা বোঝো! Hollow men! Stuffed men! কার কবিতা—জানো?

মেয়েটি : না।

বাঘ : It's a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing! Nothing! কে লিখেছে—জানো?

মেয়েটি : (উজ্জ্বল মুখে) ওটা জানি। শেক্সপীয়ার। ম্যাকবেথ। আমাদের বি.এ. কোর্সে ছিল—

বাঘ : (হঠাৎ স্থির হয়ে) বি.-এ.?

মেয়েটি : হ্যাঁ, বি.এ.-র ইংলিশ কোর্সে—
বাঘ : তুমি বি.এ. পড়েছো?
মেয়েটি : হ্যাঁ।
বাঘ : পাস করেছো?
মেয়েটি : হ্যাঁ, তা না হলে চাকরি পাওয়া যায় এই বাজারে?
বাঘ : অনার্স ছিল?
মেয়েটি : না, পাস কোর্স।
বাঘ : গ্র্যাজুয়েট! ডিগ্রি! কলেজ! হুঃ!—কটা বিদেশী কবির নাম শুনেছো?
মেয়েটি : (অল্প হকচকিয়ে) বিদেশী কবি?—শেলী, কীটস্, ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ, বায়রন—
বাঘ : ইয়েট্স্? অডেন?
মেয়েটি : না।
বাঘ : মায়াকোভ্স্কি? ডাইল্যান টমাস? টি. এস্. এলিয়ট?
মেয়েটি : টি. এস্. এলিয়টের নাম শুনেছি।
বাঘ: কচু শুনেছো!
মেয়েটি : হ্যাঁ, সত্যি—
বাঘ : ঐ নামই শুনেছো।
মেয়েটি : আমি—
বাঘ : কী কী নিয়েছিলে বি-এ-তে?
মেয়েটি : ইকনমিক্স? আর—
বাঘ : ইকনমিক্স? কীন্স্ পড়েছো?
মেয়েটি : হ্যাঁ। পড়েছি মানে—ঐ—
বাঘ : নোট পড়েছো! হুঃ! প্রোডাক্টিভ ফোর্সেস্, প্রোডাক্শন রিলেশন্স্—মানে বোঝো?
মেয়েটি : প্রোডাক্শন রিলেশন্স্?
বাঘ : ছাই বোঝো! কচু বোঝো! ডস্টয়েভ্স্কি পড়েছো?
মেয়েটি : না! কিন্তু—নাম শুনেছি।
বাঘ : তবে আর কী? নাম শুনেছো! ডিগ্রি! কলেজ! স্রেফ নোট মুখস্থ করে খাতায় উগরে পাস করেছো। কিস্সু বোঝো না! কিস্সু জানো না!
মেয়েটি : (অল্প অভিমানের সুরে) আমি কি বলেছি আমি সব জানি?
বাঘ : হয়েছে হয়েছে থামো! ডিগ্রি দেখাচ্ছে!
মেয়েটি : ডিগ্রি দেখাচ্ছি? আমি কি সেধে বলেছি আমি বি.এ. পাস?
বাঘ : (চেঁচিয়ে) আমি বি.এ. পাস করি নি—বুঝলে? আমি কলেজেই পড়ি নি! কলেজের চৌকাঠ মাড়াই নি আমি! তোমাদের ঐ বি.এ. এম.এ. ডিগ্রি ডিপ্লোমার আমি থোড়াই পরোয়া করি!
মেয়েটি : কিন্তু তুমি তো অনেক পড়াশুনো করেছো—
বাঘ : আলবাৎ পড়েছি! একশোবার পড়েছি! নোট নয়—বই! বই পড়েছি! (শেল্ফ্ দেখিয়ে) ঐ সব বই দেখেছো? ওর প্রত্যেকটি আমার! মাইনের অর্ধেক টাকা

দিয়ে বই কিনি আমি! (স্বর বদলে) বেশি বই হয় না। ভালো বই দু'তিনটেই হয় না তাতে।

মেয়েটি : তুমি চাকরি করো?

বাঘ : (খিঁচিয়ে) বেশ করি! তোমার তাতে কী?

মেয়েটি : তোমার কেউ নেই?

বাঘ : হাঃ হাঃ হাঃ—আমি বাঘ! বাঘের কেউ থাকে? বাঘ একা গর্তের মধ্যে থাকে—থাবা পেতে। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে—চাকুম্ চুকুম্ চাকুম্ চুকুম্। গর্তের মধ্যে গুঁড়ি মেরে, থাবা পেতে—(থাবা পাতা বাঘের অঙ্গভঙ্গী নকল করে চলেছে) বসে বসে অপেক্ষা করে—নিঃশব্দে—শিকার আসবে—শিকার আসবে একদিন—খুট খুট খুট খুট—ভীতু হরিণের মতো—চোরের মতো—এদিক ওদিক চাইতে চাইতে—অন্ধকার পথে—আরো কাছে—আরো কাছে—চুপ নোড়ো না একদম—নিশ্বাস বন্ধ করে থাকো—আসছে—আসছে—আরো কাছে—আর একটু—এইবার—এক লাফে ঘাড়ের ওপর—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! টুঁটি কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে এসো গর্তে—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! কড়মড় করে কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেলো—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

[বাঘের অভিনয়ে মেয়েটির কোনো অংশ নেই। মেয়েটিকে ভুলে গেছে যেন সে। মেয়েটিও দর্শক হয়ে দেখছে যেন।]

মেয়েটি : আচ্ছা তুমি এর আগে—

বাঘ : (বাধা পেয়ে খেপে) শাট্ আপ্!

মেয়েটি : না, আমি শুধু জিজ্ঞেস—

বাঘ : আমি শুধু বক বক বক বক কল কল কল কল ভ্যার ভ্যার ভ্যার ভ্যার—কথা! চাকরি করতে যাও—কথা ! রাস্তায় যাও—কথা! চায়ের দোকানে যাও—কথা! সিনেমায় যাও, থিয়েটারে যাও—কথা! মানে নেই, অর্থ নেই—শুধু কথা কথা কথা! (চিৎকার করে) আসল কথা আছে ঐ সব বইয়ে! আরো বইয়ে—যা আমি কিনতে পারি না। যারা সত্যিকারের বিদ্বান—তারা জানে কথা। বড়ো বড়ো পণ্ডিত—কলেজের, ইউনিভার্সিটির প্রফেসর—তারা জানে! কিন্তু শালারা বলে না। বলতে চায় না। এই তোমার মতো মোটামাথা বোদামারা ছাত্রছাত্রীদের জন্যে বলতে চায় না। নোট দিয়ে দেয়। বলে—মুখস্থ করো। আসল কথা চেপে যায়। আমি কলেজে পড়লে দেখিয়ে দিতাম! শালাদের কথা বলিয়ে ছাড়তাম! পেটে বোমা মেরে আসল কথা বের করে নিতাম—হ্যাঁ!

মেয়েটি : তুমি কলেজে পড়ো নি কেন?

বাঘ : (হঠাৎ রুখে উঠে) তাতে তোমার কী?

মেয়েটি : না, আমি—

বাঘ : (চোদ্দ বছরের ছেলের মতো জ্বালাকরা চোখের জল-চেপে-রাখা চিৎকারে) তোমার বাবার কী? আমি ঘেন্না করি তোমাদের কলেজকে! ঘেন্না করি! থুঃ! থুঃ! কলেজ!

[বাঘ বড়ো চেয়ারটিকে সশব্দে ঘুরিয়ে মেয়েটির দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসলো, হাতের

মুঠোয় চিবুক রেখে। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। মেয়েটি উঠলো। আস্তে আস্তে এগিয়ে বাঘের পিছনে এসে দাঁড়ালো। হাতের একটা অস্পষ্ট ভঙ্গী—যেন কাঁধে হাত রাখবে, কিন্তু রাখলো না। ফিরে এলো আস্তে আস্তে. তক্তাপোশের কাছে।]

মেয়েটি : (চিন্তিত সুরে) তুমি ঠিক বলেছো। কলেজে কিছু পড়ায় না। কিছু শেখায় না। আমরা সব নোট মুখস্থ করে করে—না বুঝে, না শিখে—কিন্তু—আচ্ছা, সবটাই কি কলেজের দোষ? আমরা কি শিখতে চেয়েছি? এই যে তুমি কলেজে না পড়েও এতো বই পড়ছো, আমরা তো কখনো— ? জানো, একজন প্রফেসর ছিলেন আমাদের—লতিকাদি—তিনি কিন্তু প্রায়ই বলতেন—পরীক্ষা পাসটা বড়ো কথা নয়। সীলেবাসের বাইরে অনেক জানবার আছে—অনেক কথা। তুমি যে বলছিলে না—আসল কথা? লতিকাদি বলতেন কিন্তু। বলতেন জীবনটাকে ঠিক—সীলেবাসে বাঁধা যায় না। জীবন অনেক—অনেক বড়ো জিনিস। আরো কত সব ভালো ভালো কথা সুন্দর করে বলতেন। তখন ভালোও লাগতো—কিন্তু আসলে কিছু বুঝিনি বোধ হয় তখন।

বাঘ : (পিছন ফিরে বসেই) জীবন! জীবন একটা জঙ্গল! যতো সব বুনো জানোয়ার—ছোট বড়ো যতো সব জানোয়ার পা টিপে টিপে ঘুরে বেড়াচ্ছে—চোরের মতো—ভয়ে ভয়ে—কখন কার শিকার হয়ে যায়, এই ভয়ে চোরের মতো।

মেয়েটি : না না, জীবনটা ঠিক ওরকম নয়—

বাঘ : (চেয়ার ছেড়ে উঠে মুখোমুখি হয়ে) আলবাৎ ওরকম! কয়েকটা হিংস্র মাংসাশী জন্তু—আর বাকি সব পালে পালে হরিণ, ছাগল, খরগোশ!

মেয়েটি : না না, এ তুমি—

বাঘ : তুমি তো না না করবেই! তুমি তো ঐ হরিণ খরগোশের দলেই! কিন্তু আমি বাঘ! শের খাঁ দ্য টাইগার! আমি শিকার হই না, শিকার ধরি। যেমন তোমাকে ধরেছি! থাবা পেতে, গুঁড়ি মেরে—এক লাফে—

মেয়েটি : কিন্তু আমি তো তোমার প্রথম শিকার, না?

বাঘ : (থমকে) কে বললে?

মেয়েটি : তুমি তো প্রত্যেক শুক্কুরবারে ঐ গলিতে আমার জন্যে—

বাঘ : মোটেই শুক্কুরবারে নয়! প্রত্যেকদিন রাত্রে আমি ঐ গলিতে ঘাপটি মেরে থাকি! তিনমাস ধরে প্রতিদিন। ন'টা থেকে এগারোটা। সাড়ে এগারোটা। বারোটা।

মেয়েটি : আমি ছাড়া আর কোনো মেয়ে বুঝি অতো রাতে ঐ গলিতে—

বাঘ : হ্যাঁ যায়! আরো মেয়ে যায়। ওদিকের বস্তির অনেক মেয়ে। ছোট, বড়ো, বুড়ি—অনেক মেয়ে।

মেয়েটি : তাদের কাউকে শিকার করো নি কেন?

বাঘ : তাদের কিছু নেই। তাদের ভয় নেই। তাই বলে ভেবো না তারা দেখতে খারাপ! তাদের বয়স বেশি! তোমার চেয়ে কমবয়সি, তোমার থেকে অনেক অনেক ভালো দেখতে মেয়েকে আমি ঐ গলি দিয়ে যেতে দেখেছি!

মেয়েটি : তাহলে তুমি বেছে বেছে— ?

বাঘ : (না শুনে) আরো যায়—ঐ বস্তিরই—গালে মুখে রঙ মাখা— ওদের অনেক দিন দেখেছি—দরজায় দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে—আমার গা রি রি করে! ওরা বাঘের শিকার নয়! ওরা—ওরা গিরগিটি! লিকলিকে গিরগিটি!

মেয়েটি : আচ্ছা তুমি—

বাঘ : অ্যাঁ?

মেয়েটি : তুমি শিকার খোঁজো কেন?

বাঘ : খুঁজি মানে? শিকার করি। শিকার করেছি!

মেয়েটি : আচ্ছা বেশ—করেছো। কিন্তু কেন?

বাঘ : কী কেন?

মেয়েটি : আমরা সব হরিণ খরগোশ, আমরা শিকার হই, তুমি শিকার করো—কেন?

বাঘ : কেন? তোমরা মুখ্যু তাই! তোমরা শুধু কথা বলো—বক বক বক বক করে কথা বলো--মানে বোঝো না—অর্থ বোঝো না—(স্বর বদলে) আমিও কথা বলি—বক বক বক বক—(হঠাৎ ঘুরে) ঐ সব বই—ওখানেও কথা—হ্যাঁ দামী কথা, আসল কথা—কিন্তু কথা। কাজ নয়। কাজ। কাজ চাই, বুঝলে? কাজ।

মেয়েটি : কী কাজ?

বাঘ : যে কোনো কাজ। না না, যে কোনো নয়—কাজের মতো কাজ। এখানে খুট খুট, ওখানে টুকটাক—ওরকম কাজ নয়। এমন কাজ যাতে—যাতে কাজ হয়।

মেয়েটি : কী কাজ?

বাঘ : (ধমকে) বলছি তো কী কাজ! ঢুকছে না মোটা মাথায়?

মেয়েটি : সে তো প্রথম কাজটা বললে। তাতে আবার কী 'কাজ' হয়—আমি সেইটা জিজ্ঞেস করছিলাম।

বাঘ : তাতে আগুন জ্বলে ওঠে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে! একটা মানুষের একটা কাজ! আগুন-জ্বলা কাজ!

মেয়েটি : আগুন জ্বললে তারপর কী হবে?

বাঘ : (চিৎকার করে) পুড়ে ছাই হয়ে যাবে—গোমুখ্যু কোথাকার!

মেয়েটি : বা বা বা, ওটা কীরকম কাজ হোলো?

বাঘ : তবে কী রকম কাজ করবো? তোমার মতো সিনেমা দেখবো? শাড়ি কিনবো? পাওডার ঘষবো?

মেয়েটি : আমি বুঝি ও সব ছাড়া আর কিছু করি না?

বাঘ : কোন ঘণ্টাটা করো?

মেয়েটি : চাকরি করি—

বাঘ : চাকরি! চাকরিটা কাজ? চাকরি হচ্ছে যাঁতা। ঘর ঘর ঘর ঘর যাঁতা! আমরা সব মুঠো মুঠো দানা—পিষে পিষে—কী তৈরি হচ্ছি বলো তো?

মেয়েটি : কী?

বাঘ : ছাতু! ছাতু! সাতু!

মেয়েটি : আচ্ছা ধরো, এই যে আমি মহিলা সমিতি করি—

বাঘ : মহিলা সমিতি—তোমার গুষ্ঠির পিণ্ডি! বলো—এই যে আমি নাগরের বাড়ি যাই—

মেয়েটি : আঃ কী বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি কথা বলো! ও রকম করলে কথা বলা যায়?

বাঘ : তা কে তোমাকে কথা বলতে মাথার দিব্যি দিয়েছে?

মেয়েটি : কে কথা বলছে? তুমি তো তখন থেকে—এ কাজ করো, ও কাজ করো, আগুন জ্বালো, ছাই হও—খালি বক বক বক বক!

বাঘ : (স্তম্ভিত) আমি বক বক—?

মেয়েটি : আবার কে? কী কাজ সেটা বোঝাতে পারে না ঠিক করে—

বাঘ : তোমাকে বুঝিয়ে কী হবে? তোমার নিরেট মাথায় পেরেক ঠুকে কী হবে—সেটা বলতে পারো?

মেয়েটি : তুমি নিজে বুঝেছো?

বাঘ : আলবাৎ বুঝেছি।

মেয়েটি : ছাই বুঝেছো! শুধু মোটা মোটা বই পড়েছো!

বাঘ : আমি—

মেয়েটি : আর কী কাজ জিজ্ঞেস করলে—খালি আগুন জ্বলবে, ছাই হবে—ঐ ছাই ই হবে।

বাঘ : দেখো তুমি—

মেয়েটি : তুমি কোন কাজটা করেছো আজ অবধি?

বাঘ : (চিৎকার করে) আমি শিকার করেছি! আমি বাঘ!

মেয়েটি : তুমি কেন বাঘ হয়েছো বলতে পারো?

[বাঘ তাকিয়ে রইলো]

তুমি শিকার খোঁজো কেন? তুমি তো—তুমি তো মেয়েদের সহ্যই করতে পারো না মনে হয়—

বাঘ : (মুখ ফিরিয়ে বিড় বিড় করে) খালি বক বক বক বক—

মেয়েটি : তুমি--আচ্ছা তুমি আজ অবধি কোনো মেয়ের সঙ্গে মিশেছো?

[বাঘ ফিরে দাঁড়ালো]

কোনো মেয়েকে কখনো ছুঁয়েছো?

বাঘ : বেরিয়ে যাও! বেরিয়ে যাও এখান থেকে!

[মেয়েটির প্রথম প্রতিক্রিয়া হোলো বিতাড়িতের অপমানবোধ। তারপর মুক্তির আশা।]

মেয়েটি : চলে যাবো? ছেড়ে দিচ্ছো আমায়?

বাঘ : গেট আউট! গেট আউট অফ হিয়ার! গেট আউট!!

[মেয়েটি তাড়াতাড়ি ব্যাগ দু'টো গুছিয়ে তুলে নিলো। তারপর আগের কথা মনে পড়ায় বাঘের দিকে একবার চেয়ে ব্যাগ নামিয়ে রাখতে গেলো। বাঘ অন্যদিকে ফিরে। আবার নিলো। গিয়ে দরজা খুললো। ফিরে তাকালো। বাঘ তখনো পিছন ফিরে।]

মেয়েটি : আমি—যাচ্ছি।

[বাঘ জবাব দিলো না। নড়লো না।]

(আরো জোরে) আমি যাচ্ছি।

বাঘ : যাও! স্বামীর কাছে গিয়ে শুয়ে থাকো গে! একটা কিছু মিথ্যে কথা বানিয়ে বোলো—সত্যি বললে যদি ঘরে না নেয়!

মেয়েটি : (স্থির কণ্ঠে) আমার স্বামী এখনো ফেরে নি। ও তাস খেলতে যায় প্রত্যেক শুক্কুরবার। এগারোটা বারোটার আগে ফেরে না।

বাঘ : বাঃ, চমৎকার ব্যবস্থা! তুমি মহিলা সমিতির নাম করে বেরোও, সে তাস খেলার নাম করে—

মেয়েটি : উঃ, তোমায় যে কী করে বিশ্বাস করাবো আমি সত্যিই মহিলা সমিতি—

[ভিতরে এসে ব্যাগ খুলে হাঁটকাতে লাগলো]

বাঘ : বিশ্বাস করাবার কোনো দরকার নেই। আমি তোমার স্বামী নই।

[ব্যাগ থেকে খান তিনেক রসিদ বইয়ের মতো বার হয়েছে]

মেয়েটি : এই দেখো! শ্যামা নৃত্যনাট্য। চ্যারিটি পারফর্মেন্সের টিকিট। আমরা মহিলা সমিতি থেকে অর্গানাইজ করছি—চোদ্দ তারিখ মঙ্গলবার সাড়ে ছ'টায়। দেখেছো?

বাঘ : কী দেখবো?

মেয়েটি : এক টাকা দু'টাকা তিন টাকা।—নেবে একটা?

[বাঘ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো]

বাঘ : আমি—টিকিট নেবো?

মেয়েটি : চ্যারিটি! ভালো উদ্দেশ্য। আমরা লাভের টাকা দিয়ে—

বাঘ : তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

[মেয়েটি যেন সত্যিই খানিকটা সিরিয়াসলি বলে ফেলেছিলো। এখন বুঝতে পেরে টিকিট ঢুকিয়ে রাখলো।]

মেয়েটি : না, বলছিলাম—সত্যিই আমি মহিলা সমিতির মিটিং-এ যাই। তুমি যা ভাবো তা নয়।

বাঘ : আর তোমার স্বামী?

মেয়েটি : ও-ও তাস খেলতে যায়। রোজ যায়।

বাঘ : রোজ? এই যে বললে শুধু শুক্কুরবারে—

মেয়েটি : না রোজ যায়। কেন যাবে না?

বাঘ : নিশ্চয়, কেন যাবে না? শুধু—তাস খেলতে যায়, না আর কোথাও—সেইটা কথা!

মেয়েটি : আর কোথাও! হুঁঃ! আর গেলেই বা কী? আমার কিছু যায় আসে না!

বাঘ : বটে?

মেয়েটি : (কণ্ঠস্বরে ঝাঁজ) হ্যাঁ, সত্যি! আমার কিছু যায় আসে না। আমি কী করি না করি—ওরও কিচ্ছু যায় আসে না।

বাঘ : বাঃ, খুব ভালো।

মেয়েটি : (আরো ঝাঁজ) হ্যাঁ ভালোই তো! কেন ভালো হবে না? কী কথা বলবো ওর সঙ্গে? কিছু বোঝে ও? ঐ লতিকাদি—লতিকাদির কথা—বলিনি ভেবেছো? ঐ

যে—জীবনটাকে একটা সীলেবাসে বাঁধা যায় না, জীবনটা আরো বড়ো—অনেক বড়ো—বিরাট—কতো জটিল—ও সব ও কিচ্ছু বোঝে না, জানো? হেসে উড়িয়ে দেয়। হ্যা হ্যা করে হাসে।

বাঘ : তুমি বোঝো?

মেয়েটি : আমি বুঝি না বুঝি, বুঝতে চেষ্টা করি। এই তো সেদিন—মহিলা সমিতির করুণাকে বলছিলাম—করুণা মিটিং-এ আসে না, বলে সংসার, শ্বশুর শ্বাশুড়ি, ছেলেমেয়ে। ওকে বলছিলাম—সংসারের বাইরেও একটা জগৎ আছে—বৃহত্তর জগৎ! একটা জীবন আছে, যার মানে—যার মানে—আলাদা—

বাঘ : কী মানে?

মেয়েটি : যাই মানে হোক—সেটা আলাদা। সেটা আরো বড়ো। ঐ যে তুমি এক রকম মানে দিলে—ঐ জঙ্গল—কয়েকটা হিংস্র জন্তু, আর বাকি সব হরিণ খরগোশ—ওটাও তো একটা মানে।

বাঘ : ও মানে তো তুমি মানলে না?

মেয়েটি : নাই বা মানলাম? তবু তো একটা মানে। আর না-মানাটাই ধরো না! আমি তর্ক করতে পারি। আলোচনা করতে পারি। করতে করতে হয় তো আমিও একটা মানে পেয়ে যাবো! হয় না এরকম? হতে পারে না?

বাঘ : (চিন্তিতভাবে) হ্যাঁ পারে। নিশ্চয়ই পারে।

মেয়েটি : (উৎসাহিত) ঐ যে তুমি বললে—কাজ। আসল কথা। কোনটা কাজ? কোনটা আসল কথা? সেটা তো চিনে বের করতে হবে? এই সব বাজে অর্থহীন কথাগুলো, যাকে তুমি বলো—কী যেন?

বাঘ : বক বক বক বক কল কল কল কল—

মেয়েটি : হ্যাঁ হ্যাঁ—ভ্যার ভ্যার ভ্যার ভ্যার।

বাঘ : (অন্যমনস্ক) ভ্যার ভ্যার ভ্যার ভ্যার। জন্মাচ্ছে, বড়ো হচ্ছে—ভ্যার ভ্যার করছে। চাকরি করছে, সংসার করছে—ভ্যার ভ্যার করছে। বুড়ো হচ্ছে, রোগে ভুগছে—ভ্যার ভ্যার করছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভ্যার ভ্যার ভ্যার ভ্যার করতে করতে পটল তুলছে। একবার ভেবে দেখছে না—ভ্যার ভ্যার থামিয়ে কিছু করা যায় কিনা!

মেয়েটি : ঠিক! একটু ভেবে দেখে না—ভ্যার ভ্যার করবার জন্যে ভগবান দুনিয়ায় আনেন নি মানুষকে—

বাঘ : ভগবান? ভগবানও ভ্যার ভ্যার। ভগবান ভ্যার ভ্যার করবার সাফাই। খেতে পাচ্ছি না, পরতে পাচ্ছি না—ভগবানের ইচ্ছে—ভ্যার ভ্যার। বছর বছর গুষ্টি বাড়ছে—ভগবানের কৃপা—ভ্যার ভ্যার। দাঙ্গা হচ্ছে, যুদ্ধ বাধছে—ভগবানের লীলা—ভ্যার ভ্যার।

মেয়েটি : হ্যাঁ হ্যাঁ, দাঙ্গা! যুদ্ধ! ওগুলো কেন? শুধু ঘরে বসে ভ্যার ভ্যার করলেও হোতো। আবার মারামারি কাটাকাটি করা চাই! তাও কামান বন্দুকে কুলোয় না—অ্যাটম বোমা!

বাঘ : অ্যাটমবোমা! অ্যাটমবোমা বানাচ্ছে! কী করবি? দুনিয়া রসাতলে পাঠাবো।

তারপর? থাকবি কোথা? কেন—চাঁদে থাকবো? এক একটা রকেট চাঁদে পাঠাতে কতো টাকা খরচ হয় জানো? তা দিয়ে দুনিয়ার সব লোককে বোধ হয় এক বেলা পেট ভরে খাইয়ে দেওয়া যায়!

মেয়েটি : অথচ কতো লোক খেতে পায় না। ফুটপাথে শোয়। এ সব কথা কেউ ভেবে দেখে না। কিন্তু ভেবেও তো কিছু পাওয়া যায় না! এ বলে এদিকে চলো, ও বলে ওদিকে চলো—কোন্‌টা ঠিক বুঝবো কী করে? এ যেন—এ যেন এক হাঁড়ি সিদ্ধ চালে এক মুঠো আতপ চাল কে মিশিয়ে দিয়েছে—বাছো বসে বসে!

বাঘ : (হঠাৎ সচেতন হয়ে মেয়েটির দিকে ফিরে) তুমি যে পণ্ডিত হয়ে উঠছো আস্তে আস্তে?

মেয়েটি : (অন্যমনস্কভাবে বসে) না জানো—পণ্ডিত নয়। আমি কিছু বুঝি না, কিন্তু আমার বুঝতে ইচ্ছে করে। বি.এ. পাস করেছি, কিন্তু কিচ্ছু জানি না। তুমি অতো কবির নাম করলে—আমি—ঐ অতো বই তুমি কেনো—পড়ো-- আমারও পড়তে ইচ্ছে করে। কলেজে যেন কিছুই পড়া হয়নি—শুধু পাস করার চিন্তায় কেটেছে কলেজটা। আচ্ছা তুমি—(থেমে গেলো)

বাঘ : কী?

মেয়েটি : একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? তুমি রেগে উঠো না—

বাঘ : কী কথা?

মেয়েটি : তুমি কলেজে পড়লে না কেন? টাকার অভাবে?

বাঘ : না।

মেয়েটি : তবে?

বাঘ : (তিক্ত চিৎকারে) বিদ্যে! বিদ্যের অভাবে! আমি ম্যাট্রিক পাস করতে পারি নি।

মেয়েটি : (অবাক হয়ে) ম্যাট্রিক পাস করতে পারো নি?

বাঘ : তিনবার! তিন-তিনবার চেষ্টা করেছি। ফেল। ঘ্যাচ্‌ঘ্যাচ্—ফেল।

মেয়েটি : কিন্তু তুমি—তোমার যা পড়াশুনো—তুমি তো অনেক বি.এ. ক্লাসের ছাত্রের কান কাটতে পারো?

বাঘ : এদিকে এসো, এখানে। এই দেখো—দেখেছো? ইকনমিক্স! পলিটিক্স! এই তাক দু'টোয় ইংলিশ লিটারেচার—পোয়েট্রি, ড্রামা, নভেল। এই দেখো—বৈষ্ণবপদাবলী—রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের সব প্রবন্ধ আমার আছে—ক'জন পড়ে প্রবন্ধ? এই দেখো—ফিলজফির বই এই তাকে। একটা বই সেদিন দেখলাম কলেজ স্ট্রীটের রেলিঙে—ষোলো টাকা চাইলো। চোদ্দ অবধি নামবে বোধ হয়। আসছে মাসে কিনবো ঠিক। থাকলে হয়।

মেয়েটি : তবু তুমি ম্যাট্রিক পাস করতে পারো নি?

বাঘ : (অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে) ঐ অঙ্ক।

মেয়েটি : অঙ্ক?

বাঘ : ম্যাথামেটিক্স। আমি কিছুতেই পারি না। কতো চেষ্টা করলাম। তৃতীয়বার ম্যাথামেটিক্স ছাড়া অন্য কিছু পড়িই নি! কতো অঙ্ক মুখস্থ করে ফেললাম। তবু যে কী গোলমাল হয়ে যায়! ও আর হবে না। কলেজ ফলেজ—ও সব হবে না আর!

মেয়েটি : ম্যাথামেটিক্স! ম্যাথামেটিক্স পাস করা খুব সোজা।
বাঘ : হ্যাঁ সোজা! তুমি তো সব জানো!
মেয়েটি : আরে আমার বি.এ.-তে ম্যাথামেটিক্স ছিল!
বাঘ : ম্যাথামেটিক্স ছিল? বি.এ.-তে?
মেয়েটি : ইকনমিক্স আর ম্যাথামেটিক্স। আমার অঙ্ক খুব ভালো লাগে।
বাঘ : অঙ্ক ভালো লাগে?
মেয়েটি : আরে অঙ্ক মোটেই শক্ত জিনিস নয়। অঙ্কের জন্যে তোমার কলেজে পড়া হোলো না?
বাঘ : তোমার সোজা লাগতে পারে, আমার লাগে না।
মেয়েটি : তুমি নিশ্চয়ই খুব বাজে মাস্টারের কাছে শিখেছো!
বাঘ : কী পড়াতো—কিছুই বুঝতাম না। জিজ্ঞেস করলে গেলেই দাঁত খিঁচুনি।
মেয়েটি : আচ্ছা তুমি—ম্যাথামেটিক্সের কোন্‌টা তোমার শক্ত লাগে? অ্যালজেব্রা?
বাঘ : অ্যালজেব্রা তো কিছুই বুঝি না। এ বি সি ডি এক্স ওয়াই দিয়ে অঙ্ক যে কী করে হয়? ভাষার অপব্যবহার! ভাষার অপমান!
মেয়েটি : আচ্ছা জিওমেট্রি?
বাঘ : প্রব্লেম একটু একটু পারি। থিওরেম মাথায় ঢোকে না একদম। আর অ্যারিথমেটিক্—পার্সেন্টেজ, সুদকষা, লাভক্ষতি, চৌবাচ্চা, রেলগাড়ি, দড়ি, বাঁদর—কিস্‌সু বুঝি না!
মেয়েটি : আচ্ছা—কী আশ্চর্য! ম্যাথামেটিক্স?
বাঘ . (ঝাঁঝিয়ে) হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার তো আশ্চর্য লাগবেই! তুমি ম্যাথামেটিক্সে বি.এ. পাস করেছো—তোমার আশ্চর্য লাগবে না? যাও বাড়ি যাও, আমাকে জ্বালিও না!
মেয়েটি : (একটু চুপ করে থেকে) আচ্ছা তুমি—তুমি আমার কাছে অঙ্ক শিখবে?
বাঘ : আমি? অঙ্ক? (হো হো করে হেসে) তোমার কাছে?
মেয়েটি : (হাসির অন্য মানে ধরে) হাসছো কেন? আমি যতোটা পারি চেষ্টা করবো।
বাঘ : তুমি? কখন? কী করে?
মেয়েটি : আমি প্রত্যেক শুক্কুরবার তো এদিকে আসি? সমিতি থেকে একটু আগে না হয় বেরিয়ে পড়বো! ন'টা থেকে ধরো—সাড়ে দশটা? হবে না?
বাঘ : (ঠাট্টা নয় বুঝে হতভম্ব) প্রত্যেক শুক্কুরবার—?
মেয়েটি : কম হয়ে যাচ্ছে না? একদম গোড়া থেকে শুরু করতে হবে তো? আচ্ছা, আর একটা দিন—মঙ্গলবার কি বুধবার? সপ্তায় দু'দিন হলে তবু কিছুটা হয়, না?
বাঘ : সপ্তায় দু'দিন? তুমি আসবে? এখানে? আমার ঘরে?
মেয়েটি : এখানেই তো ভালো। (চারিদিকে তাকিয়ে) ঐ টেবিলটাকে আলোর কাছে এনে রেখো, কেমন?—আনো না এখনই। ধরো তো?
[দু'জনে ধরাধরি করে টেবিলটা সরিয়ে আনলো। বাঘ কিছুটা বিহ্বল। মেয়েটির উৎসাহ বাড়ছে। চেয়ার আর টুলটা টেবিলের কাছে পাতলো।]
তুমি ওখানে বসবে। (চেয়ারটা দেখালো)

বাঘ : না, ওখানে তুমি। আমি এই টুলে বসবো।

মেয়েটি : আচ্ছা। (চেয়ারে বসে) আচ্ছা, আজই একটু শুরু করে যাই না? (ঘড়ি দেখে) সাড়ে দশটা। আরো কয়েক মিনিট থাকা যায়। তোমার খাতা পেনসিল আছে?

বাঘ : সব আছে। খাতা, পেনসিল, অঙ্কের বই—

[বার করে টেবিলে রাখলো]

মেয়েটি : (বই খাতা খুলে) আচ্ছা, ধরো—পার্সেন্টেজ।

[বাঘ টুলে বসলো। মনোযোগী ছাত্র।]

প্রতি একশোতে কতো। ধবো তুমি ব্যাঙ্কে টাকা রেখেছো। ব্যাঙ্ক সুদ দেয় তো? সুদের হিসেবটা কী হবে? ওরা বললো থ্রি পার্সেন্ট। মানে—শতকরা তিন। তার মানে? প্রতি একশো টাকায় বছরে তিন টাকা দেবে। তুমি যদি একশো টাকা রাখো—বছরের শেষে তিন টাকা পাবে, থ্রি পার্সেন্ট তো? আচ্ছা, যদি দু'শো রাখো? কতো টাকা পাবে?

বাঘ : দু'শো (ভেবে) একশো টাকায় তিন টাকা পাচ্ছি। তা হলে দু'শোয় হওয়া উচিত—তিন—তিন দুগুণে ছয়। ছ' টাকা, না?

মেয়েটি : এই তো! এই তো পারলে! কে বললে তুমি অঙ্ক পারো না?

বাঘ : (উৎসাহিত হয়ে) তাহলে সিক্স পার্সেন্ট হয়ে গেলো, না?

মেয়েটি : (ধৈর্যে) না, তা হোলো না। তা কেন হবে? সিক্স পার্সেন্ট মানে তো একশোতে ছয়, তাই না? কিন্তু তুমি তো দু'শো রেখেছিলে। থ্রি পার্সেন্ট হিসেবেই দু'শোতে ছ'টাকা হোলো। টাকা—ছ'টাকা, ছয় পার্সেন্ট নয়।

বাঘ : ও হ্যাঁ, ঠিক ঠিক।—আমার মাথাটা একেবারে নিরেট, না?

মেয়েটি : মোটেই না। কে বললে?

বাঘ : (দুঃখে) আমি জানি।

মেয়েটি : তুমি জানো না। কিস্‌সু জানো না। দেখবে? আচ্ছা বলো তো—সিক্স পার্সেন্ট যদি সুদের হার হয়, আর তুমি যদি দু'শো টাকা রাখো—কতো পাবে বছরের শেষে?

বাঘ : বলবো?—সিক্স পার্সেন্ট, না?

মেয়েটি : (উৎকণ্ঠিত) ভেবে বোলো। হুট করে বলতে হবে না।

বাঘ : সিক্স—পার্সেন্ট। একশোয় ছয়। দু'শো রেখেছি। দু'শো। (বিড় বিড় করে) ছয় দু'গুণে বারো—বারো—(ভয়ে ভয়ে) বারো টাকা?

মেয়েটি : (খুব খুশি হয়ে বাঘের কাঁধ চাপড়ে) এই তো! এই তো পেরেছো! তবে? বললাম না?

বাঘ : (উৎসাহে) আর একটা বলো।

মেয়েটি : না রে, আজ যাই। দেরি হয়ে যাবে। আমি মঙ্গলবার আসবো (উঠলো)।

বাঘ : (উঠে) ঠিক?

মেয়েটি : নিশ্চয়ই, বাঃ! ন'টা নাগাদ।

বাঘ : আমি সাড়ে আটটা থেকে ঐ গলিতে দাঁড়িয়ে থাকবো।

মেয়েটি : সাড়ে আটটা থেকে দাঁড়াতে হবে না। ন'টার একটু আগে এলেই হবে।

বাঘ : (বই খাতা দেখিয়ে) আমি কিছু করে রাখবো?

মেয়েটি : না, এখন না। মঙ্গলবার তোমাকে পার্সেন্টেজ ভালো করে বুঝিয়ে হোমটাস্ক দিয়ে যাবো।

বাঘ : খুব বেশি বেশি করে হোমটাস্ক দিও। আমার অনেক সময়। সব করে রাখবো। যদি পারি অবশ্য।

মেয়েটি : নিশ্চয়ই পারবে! আমি কি খারাপ মাস্টার?

বাঘ . (চেয়ে থেকে) না। না, তুমি খুব ভালো মাস্টার। তুমি—খুব ভালো।

মেয়েটি : তুমিও খুব ভালো ছাত্র। কিন্তু—একটা কথা।

বাঘ : কী?

মেয়েটি : সব সময়ে অঙ্ক হলে চলবে না। তোমাকেও মাস্টারি করতে হবে।

বাঘ : আমাকে?

মেয়েটি : হ্যাঁ তোমাকে। (শেল্‌ফ্‌ দেখিয়ে) আমি ঐ সব কিচ্ছু জানি না। তোমাকেও শেখাতে হবে। আমি তখন ঐ টুলে বসবো, তুমি চেয়ারে—

বাঘ : না না না না! তুমি চেয়ারে! তুমি সব সময়ে ঐ চেয়ারে!

মেয়েটি : কেন? বাঃ?

বাঘ : হ্যাঁ হ্যাঁ—তাই। তুমি চেয়ারে।

মেয়েটি : কিন্তু—

বাঘ : তর্ক কোরো না। আমি বাঘ না? শের খাঁ দ্য—

বাঘ ও মেয়েটি : (একসঙ্গে) টাইগার!

[দু'জনে একসঙ্গে হেসে উঠলো]

বাঘ : চলো তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

মেয়েটি : না না, আমার একা যাওয়াই ভালো। তুমি শুধু বাড়ির দরজা থেকে রাস্তাটা দেখিয়ে দাও।

বাঘ : আচ্ছা, চলো।

মেয়েটি : (দরজার কাছে, ইতস্তত করে) তুমি ঐ যে বইটার কথা বলছিলে—ষোলো টাকা দাম, কিনে ফেলো না?

বাঘ : আসছে মাসে কিনবো ঠিক। ওটা আমি বহুদিন ধরে—

মেয়েটি : আসছে মাসে যদি না থাকে? (টাকা বার করে) তুমি বরং—

বাঘ : না না, সে হবে না!

মেয়েটি : আরে—ধার দিচ্ছি! মাসের আর ক'দিন বাকি? তুমি মাইনে পেলে দিয়ে দিও আমাকে!

বাঘ : না, এ—

মেয়েটি : তারপর বইটা যদি না পাও, আমি বলবো—বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে!

বাঘ : আচ্ছা—আচ্ছা দাও।

[মেয়েটি দু'টো নোট বাড়িয়ে দিলো]

না না, দশ টাকা দাও। বাকিটা আমার আছে। (একটা নোট নিয়ে) আমি তোমাকে—আসছে শুক্কুরবার দিয়ে দেবো।

মেয়েটি : আচ্ছা। চলো।

[দু'জনে বেরিয়ে গেলো বারান্দা দিয়ে। কয়েক মুহূর্ত মঞ্চ শূন্য। তারপর বাঘ ফিরলো। তার চোখ শাণিত, উজ্জ্বল। সারা ঘরটায় তার দৃষ্টি ছড়িয়ে গেলো একবার। টেবিলের কাছে এলো সে। টুলে বসলো। পেনসিল হাতে প্রথমে বিড় বিড় করে, তারপর জোরে কথা বলতে লাগলো।]

বাঘ : আচ্ছা, যদি ফোর পার্সেন্ট হয়? একশোয় চার, না? তাহলে দু'শোয়—দু'শোয় হওয়া উচিত চার দু'গুণে আট! আটই তো! আট টাকা। আচ্ছা, তিনশোয় কী হবে? সেটা তো বললো না? তিনশো—তিনশো, না? আচ্ছা, দেখি—ফোর পার্সেন্ট, একশোয় চার, দু'শোয় আট, তিনশোয়—তিনশোয় বারো হবে তো? বারো টাকা! কেন নয়? তিন গুণ—তিন চারে বারো। হতেই হবে! আলবাৎ হবে! তিনশোয় বারো টাকা! আমি বাঘ—আমি বলছি বারো টাকা! আমি বাঘ! ব্যাঘ্রাচার্য মহাশার্দুল! শের খাঁ দ্য টাইগার!

ডিসেম্বর, ১৯৬৫

পরে কোনোদিন

মুখবন্ধ

নাটকটির ভিত্তি একটি কল্পবিজ্ঞানমূলক ইংরিজি গল্প। নাটকে যে মাত্রাটি আনা হয়েছে শেষ দিকে, সেটা অবশ্য গল্পটাতে একেবারেই ছিল না। অনেক বছর আগে একটা সংকলনে এটি ছাপা হয়েছিলো।

বাদল সরকার

পরে কোনোদিন

চরিত্রলিপি

মোহনপুরনিবাসী

শঙ্কর দত্ত	মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র
শিবলাল দত্ত	শঙ্করের দাদা
অনিল	শঙ্করের বন্ধু
সুরেশ্বর	শঙ্করের বন্ধু

বহিরাগত

ওমেরী
হারিয়ন
ক্লিয়া
হলিয়া
ক্লেফ্
সেরিন

প্রথম অঙ্ক

[প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার হয়ে গেছে। পর্দা সরেছে, কিন্তু মঞ্চ সম্পূর্ণ অন্ধকার। একটা ফিস্‌ফিসে কণ্ঠস্বর—ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে। হাঁপানোর শব্দ। মানসিক শক্তিতে প্রচণ্ড যন্ত্রণা জয় করে একটা প্রতিজ্ঞাকে খাড়া করবার চেষ্টা করছে কেউ। প্রতিজ্ঞাকে স্পষ্ট করতে চাইছে কণ্ঠস্বরে, কাজে। হাঁপানোর শব্দের মধ্যে কথা ফুটে উঠেছে ক্রমে—বোধগম্য কথা। সামান্য আলো ফুটে উঠেছে সেই সঙ্গে। তাতে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—মঞ্চের একদিকে একটি খাট, তার উপরে শঙ্করের ছায়ামূর্তি—চেষ্টা করছে উঠতে, উঠে মঞ্চের অন্যদিকে যেতে—যেদিকে একটা টেবিলের রেখাচিত্র ফুটে উঠছে আবছা আলোয়।]

শঙ্কর : আঃ! আঃ! আমি! আমি—বলবো! বলে যাবো! আমি—লিখ্—লিখে যাবো! জানিয়ে যাবো! স্-সবাইকে! আমি যদি—যদি জানতাম—কোনোরকমে জানতে পারতাম—হয়তো—ঠেকাতাম—বন্ধ করতাম—কোনোরকমে! কিম্বা কিছু একটা করতাম ওদের ধরে—জোর করে বাধ্য করতাম—যাতে—যাতে এতো যন্ত্রণা—এতো—হোতো না—কিছু একটা—ওঃ! (দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে গেছে শঙ্কর। উঠবার চেষ্টা করতে লাগলো।) আমি—লিখে যাবো। আমি—জানাবো—সবাইকে জানাবো। এবার—এবার কিছু হবে না। এখন—এখনকার মানুষদের—কিছু হবে না। কিন্তু পরে—পরে কোনোদিন—ভবিষ্যতে—। ওরা তো—ওরা তো—সব সময়ে—আসে— সর্বকালে—যদি কখনো—কোনোদিন—ওদের—চিনতে পারা যায়—ধরা যায়—ধরে বাধ্য করা যায়—ঠেকাতে—বন্ধ করতে—বদলাতে—। (শঙ্কর বুকে হেঁটে টেবিলের কাছে পৌঁছেছে। ধরে ওঠবার চেষ্টা করছে!) যাবে! নিশ্চয়ই যাবে। বাধ্য করা যাবে—যদি চিনতে পারা যায়! ওরা পারে! করে না। করতে চায় না! বাধ্য করতে হবে—যদি চিনে বার করা যায়—ওদের—কোনো সময়ে—ভবিষ্যতে—তাই—তাই লিখবো। লিখতে হবে। আমাকে—আমাকে লিখতে হবে!—

[এক অস্বাভাবিক প্রচেষ্টায় শঙ্কর নিজের শরীরটাকে তুলে বসিয়েছে চেয়ারে। কাগজ পেতেছে টেবিলে। তার পিঠ দর্শকদের দিকে। তার যন্ত্রণা-জর্জর নিশ্বাসের শব্দ চাপা দিয়ে স্পষ্ট সতেজ কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। মঞ্চের শঙ্কর আর কথা বলছে না, কথা বলছে তার যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর। মঞ্চের শঙ্কর শুধু লিখে চলেছে। আলো আবার কমে আসছে।]

শঙ্করের কণ্ঠস্বর : অক্টোবর, উনিশশো ছাব্বিশ। আশ্বিন, তেরোশো তেত্রিশ। মোহনপুর, হিলটপ রোড, শৈলধাম। এই দ্বিতল গৃহ যখন আমার পিতৃদেব ঈশ্বর জয়গোপাল দত্ত নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তখনও মোহনপুরের সমৃদ্ধির যুগ আরম্ভ হয় নাই। অভ্রের খনি খুঁড়িয়া প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করিতে ইংরাজরাও আসে নাই। মহাযুদ্ধের পর হইতেই মোহনপুরের সমৃদ্ধি। কেবলমাত্র অভ্রের খনি নহে,

মোহনপুরের নৈসর্গিক শোভা উপভোগ করিতে এবং এখানকার স্বাস্থ্যকর জলবায়ুতে শরীর-মন স্নিগ্ধ করিতে দলে দলে ইংরাজ ও ধনবান ভারতীয় প্রতি বৎসর এখানে আসা আরম্ভ করিলেন। বিশেষ করিয়া পূজার ছুটিতে। মোহনপুর জমজমাট হইয়া উঠিল। এই টিলার মাথায় তাঁহাদের জন্য হিলটপ হোটেল নির্মিত হইল, শৈলধামের সামনের রাস্তা পাকা হইয়া হিলটপ রোড নামে অভিহিত হইল। কিন্তু শৈলধামের দোতলার বারান্দা হইতে সারা শহরের যে অপূর্ব দৃশ্য তখনো অবাধে দেখা চলিত, তাহা বন্ধ হইয়া গেল রাস্তার ওপারে সারি সারি বাড়ি উঠিয়া। তা সত্ত্বেও এই শৈলধাম গত দুই বৎসর পূজার সময়ে চড়া দরে ভাড়া দেওয়া গিয়াছে। প্রথম বৎসর পঞ্চাশ টাকায়, দ্বিতীয় বৎসর আশি টাকা। আর এই বৎসর—এই উনিশশো ছাব্বিশ সালের পূজায়—

[মঞ্চ বেশ কিছুক্ষণ আগেই সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিলো। পর্দাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। কণ্ঠস্বর থামবার অল্প আগে পর্দা খুলতে আরম্ভ করেছে। ঘরে সকালের আলো। খাটটা ঘরের একই দিকে আছে, কিন্তু ঠিকভাবে বসানো নেই। যেন কেউ এসে নামিয়ে রেখেছে এইমাত্র। গোটা তিনেক চেয়ার, একটি গদিওয়ালা আরামকেদারা এলোমেলো পড়ে আছে। একপাশে একটি তোরঙ্গ আর বিছানা। পেছনে, দর্শকদের বাঁদিকে—একটি জানলা। বন্ধ রয়েছে। দরজাটা মাঝখানের অল্প ডানদিকে, খোলা, এবং পর্দা সরানো। দরজা দিয়ে পিছনের চওড়া বারান্দার প্রাচীর দেখা যায়। তার পিছনে রাস্তার ওপাশের বাড়ি। ঘরটি দোতলায়। বারান্দায় বাঁদিকে যেন নিচে যাবার সিঁড়ি। আর ডানদিকে বারান্দাটা অন্য ঘরগুলিতে যাবার পথ। শঙ্কর ও শিবলাল ধরাধরি করে লেখার টেবিলটা পাশের কোনো ঘর থেকে নিয়ে আসছে বারান্দা দিয়ে। প্রথমে শঙ্কর পিছু হটে ঢুকলো।]

শিব : সাবধান, হোঁচট খাসনি। শোন—ঐদিকে?

শঙ্কর : হ্যাঁ, এদিকে। ঠিক আছে। এখানেই থাক না। আমি পরে—

শিব : (টেবিল নামিয়ে) ব্যস! আর কী আনবি বল?

শঙ্কর : আর কিছু লাগবে না দাদা, তুমি বোসো তো।

শিব : না না, যা দরকার এখনই এনে রাখা ভালো। ক'দিন থাকতে হবে, ঠিক নেই তো?

শঙ্কব : আর কিচ্ছু লাগবে না আমার।

শিব : বুকশেলফ্‌টা? তোর বই-টইগুলো—

শঙ্কর : সে দরকার হলে আমি নিয়ে আসবো এখন। এগুলোও আমি একটা মুটে ডেকে করে নিতে পারতাম—

শিব : মুটে! মোহনপুরের সেদিন নয় রে এখন। কলকাতায় থাকিস, খবর রাখিস না তো? এই ক'টা জিনিস ওঘর থেকে এঘরে আনতে চার আনা চেয়ে বসতো। ভাবতে পারিস? চার আনা!

শঙ্কর : বলো কী? চার আনা তো কলকাতাতেও—

শিব : কলকাতা হোলো বেকার মানুষে ঠাসা। মোহনপুর তো তা নয় এখন! অভ্রের খনিতে লোক পাবার জন্যে সায়েবরা পয়সা ছড়াচ্ছে। মুঠো মুঠো পয়সা—

ছড়াচ্ছে। মোহনপুরের এমন দিন কখনো আসেনি আগে। সেইজন্যেই তো বলেছিলুম—এই সময়টায় যদি গুছিয়ে নেওয়া না যায় তো—

শঙ্কর : (অস্বস্তি বোধ করে) হ্যাঁ। সে ঠিক, তবে—

শিব : তোর খুব কষ্ট হবে, সেইটাই আমার খারাপ লাগছে।

শঙ্কর : না না, কষ্ট কিছু না, কষ্টের জন্যে নয়—

শিব : কষ্ট নয়? এলি ছুটি কাটাতে—আর এই নির্বান্ধব পুরীতে একা একা—

শঙ্কর : সে একরকম ভালোই হয়েছে দাদা। পরীক্ষার বছর—ছুটিটা ভালো করে না পড়লে মুস্কিল আছে।

শিব : হ্যাঁ, তা অবিশ্যি—মেডিকেল কালেজের পড়া তো সোজা নয়? তবে, এতোদিন পরে এলি, পুজোর সময়টা—তোর বৌদি তো আমাকে—

শঙ্কর : আমি তো যাচ্ছি—রোজ দু'বেলা খেতে যাবো তো বাড়িতে—

শিব : সেও তো এক—এতোখানি রাস্তা হেঁটে রোজ দু'বেলা—

শঙ্কর : কোথায় এতোখানি? দশ মিনিটের রাস্তাও নয়! কলকাতায় রোজ কালেজে হেঁটে যাই না? সেই ফড়েপুকুরের মেস থেকে পটলডাঙা—

শিব : যাক, মনে হয় এদিকে ঝটপট চুকে যাবে কাজ। তুই বুদ্ধিমান ছেলে, কালেজে পড়লি এতোদিন—বুদ্ধি খাটিয়ে একটা কিছু ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলতে পারবি দু'চার দিনেই—

শঙ্কর : (আবার অস্বস্তিতে) কী জানি? কতোদূর কী করা যাবে—

শিব : না না, ও কথা বললে চলবে না। যেমন করে হোক, এ ভাড়াটেদের সরাতেই হবে। আমি বেণীবাবুকে বলে রেখেছি। তার বাড়ি এর থেকে অনেক ভালো—নতুন—সামনে ধু-ধু খোলা—ওদের আপত্তি হবার কোনো কারণই নেই।

শঙ্কর : কিন্তু—

শিব : আর যদি করেও আপত্তি—হিলটপ হোটেলে ব্যবস্থা করে দেবো।

শঙ্কর : হিলটপ? সে যে অনেক খরচ দাদা?

শিব : খরচা পুষিয়ে যাবে ভায়া—পুষিয়ে যাবে! এই বাড়ির জন্যে—পঁচিশ হাজার! ভাবতে পারো? পঁচিশ হা—জার। কী আছে এ বাড়িতে? ওপরে চারটে—নিচে চারটে—আটখানি তো ঘর মোটে। পয়সার অভাবে মেরামত করা হয় না—ভগ্নদশা—পঁচিশ হাজার। এরকম দর কেউ দেবে—ভাবতে পেরেছিস কোনোদিন?

শঙ্কর : পাগল বোধ হয়।

শিব : পাগল নয় ভাই, পাগল নয়। দিনকাল বদলে যাচ্ছে, আমাদেরই বুঝতে দেরি হয়। এই এদের কথাই ধর না—যারা কাল আসছে। একমাসের জন্যে দু'শো টাকা। তাও আগাম। পুরো টাকা আগাম। নগদ দু'শো।

শঙ্কর : (অস্বস্তিতে) হ্যাঁ, ঐ আগাম দিয়েছে বলেই তো আরো—

শিব : (নিজের কথার ঝোঁকে) গতবারে আশি পেলুম, তা ভাবলুম এবার একশো হেঁকে দেখি। উকিলবাবুকে—বুঝলি? উকিলবাবুকে বললুম—দেখুন, এবার ভাড়া

দেওয়া অসুবিধে, আমার নিজের দরকার, ভাই আসবে কলকাতা থেকে। ওঃ। ভাগ্যিস তোর কথাটা মুখে এসেছিলো। নইলে তোর এখানে থাকা একেবারেই চলতো না।

শঙ্কর : হ্যাঁ, ঐ কথাটা তোমায় জিজ্ঞেস করবো ভাবছিলাম। ওরা পুরো বাড়িটা ভাড়া নেয়নি?

শিব : (আত্মতৃপ্তিতে) আরে, তাই তো নেবার কথা, তাই বরাবর হয়। কিন্তু ঐ যে দর বাড়াবার মতলবে তোর আসার কথা বললুম না উকিলবাবুকে? ঐটেই কাজে লেগে গেলো। গোলেতালে হয়ে গেলো ভায়া—গোলেতালে।

শঙ্কর : কীরকম?

শিব : উকিলবাবু বললেন—তাঁর উপর ইন্‌স্ট্রাক্‌শন আছে—দোতলায় তিনখানা ঘর, আর বারান্দা—এ যেন থাকেই। আপনার ভাই থাকবে, থাকুক না? ঘর তো আরো আছে?

শঙ্কর : তিনখানা ঘরেই দু'শো টাকা?

শিব : ঐ তো, ঐ কথাই তো বলছি। দিনকাল বদলে যাচ্ছে। বিলকুল বদলে যাচ্ছে।

শঙ্কর : তা বারান্দা কেন? বারান্দার কথা আলাদা করে আবার কেউ বলে নাকি?

শিব : কে জানে, বড়োলোকের খেয়াল। আধখানা বাড়িই বা দু'শো টাকায় কেউ নেয় না কি?

শঙ্কর : বারান্দার কথা জানলোই বা কী করে?

শিব : হতে পারে আগের বছরের ভাড়াটেদের চেনাশোনা কেউ। তাই হবে। নইলে শৈলধাম, হিলটপ রোড, দোতলার বারান্দা—এতো কথা লিখেছে কী করে চিঠিতে?

শঙ্কর : উকিলবাবু বলে থাকতে পারেন।

শিব : কেমন করে? ওদের চিঠি পেয়ে উকিলবাবু প্রথম আমার সঙ্গে বাড়ি দেখতে এলেন।

শঙ্কর : কী বলছো? উকিলবাবু বাবার আমলে কতোবার এসেছেন এ বাড়িতে!

শিব : আরে না না, এ বিশ্বনাথবাবু নয়। এ এক ছোকরা সলিসিটর, নতুন অফিস করেছে মোহনপুরে। তুই দেখিসনি। কী যেন নামটা, কী ব্যানার্জি—

শঙ্কর : সে সলিসিটর চেনে এদের?

শিব : চোখেও দেখেনি কস্মিনকালে। সব নাকি চিঠিপত্রে। লীজের কাগজ সই হয়ে এলো ডাকে, টাকা এলো ডাকে—সব ডাকে।

শঙ্কর : একমাসের জন্যে ভাড়া—তার সলিসিটর, লীজের লেখাপড়া—কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছে।

শিব : গোলমেলে বলে গোলমেলে? আমি কিছু বলবার আগেই—দোতলার তিনখানি ঘর, বারান্দা, রান্নাঘর, জলকল—টাইপ করা ফরমে খসখস করে লিখে. টেবিলে দু'শো টাকা রেখে—নিন, সই করুন। আমি তো তাজ্জব! ভাবি—গুপ্তধন পোঁতা আছে না কি এ বাড়িতে? (হা হা করে হাসলেন) আসলে কী জানিস? এখন বুঝছি—এই পঁচিশ হাজার দর পাবার পর—দিনকালই বদলে যাচ্ছে।

শঙ্কর : (চিন্তিত) না, কিন্তু দাদা—আমি ভাবছি—এতো আটঘাট বেঁধে যারা বাড়ি ভাড়া নিলো, তারা কি সহজে ছাড়বে?

[চিন্তাটা শিবলালের মাথাতেও এসেছে]

শিব : কেন ছাড়বে না? বেণীবাবুর বাড়ি দেখলেই বুঝতে পারবে, এর থেকে কতো ভালো।

শঙ্কর : কিন্তু যদি কোনো কারণে এই বাড়িটাই—

শিব : আর যদি নাই হয়—হিলটপ হোটেলে আপত্তি হতে পারে কখনো? বল? সে সম্ভব? হিলটপ হোটেলের ভেতরে গেছো কোনোদিন? দেখেছো ঘরগুলো?

শঙ্কর : না।

শিব : আমি দেখেছি একবার। গদি কার্পেট আসবাব—সে একেবারে—ঝকঝক তকতক। সাড়ে বারো টাকা দিনে। একখানি ঘর—দিনে—সাড়ে বা—রো টা—কা।

শঙ্কর : সাড়ে বারো?

শিব : খাওয়া বাদে! খাওয়া আলাদা খরচ। টিফিনটা দেয় শুধু সকালে।

শঙ্কর : তা ঐখানে তুমি—

শিব : তাও পোষায় ভাই। হিসেব করে দেখেছি। তিনটে আলাদা ঘরও যদি ধরিস—বারোশো টাকায় হয়ে যায়। আর এদিকে পঁচিশ হাজার।

শঙ্কর : তা যারা কিনতে চাইছে—একটা মাস পরে পেলে কী এমন এদিক-ওদিক হয় তাদের?

শিব : ঐটেই আমি বুঝতে পারছি নে। বলিনি ভেবেছিস? অনেকবার বলেছি। ঐ এক কথা।

শঙ্কর : কী কথা?

শিব : পঁচিশে অক্টোবরের মধ্যে খালি বাড়ি দখল দিতে পারলে কিনবে। তার পরে হলে চলবে না।

শঙ্কর : কতোটুকু পরে? এদের তো একত্রিশে অবধি মেয়াদ—ছ'টা দিন।

শিব : একদিন হলেও না। ছাব্বিশে অক্টোবর হলেই লবডঙ্কা। সেইজন্যেই তো বলছি ভাই, যদি হোটেলে যেতেও রাজি না হয়, তোকেই যেমন করে হোক তাড়াতে হবে।

শঙ্কর : কিন্তু আমি—যা সব শুনছি তাতে—

শিব : যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। পঁচিশ হাজার টাকা পেলে এই বাজারে মোহনপুরে কতো কী যে করা যায় তোর ধারণা নেই। ব্যবসা আছে, অভ্র আছে—বুঝে-সুঝে খাটাতে পারলে তোর আমার তিন পুরুষের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

শঙ্কর : কিন্তু—

শিব : জানিস তো অবস্থা। বাবা তো এই বাড়িতে ঢেলে আর কিছুই রাখতে পারলেন না। আমি তো বসত বাড়িটা তুলতে গিয়ে দেনা করে বসে আছি। মোহনপুরের দিনকাল ভালো যাচ্ছে, তাই—নইলে ধর মেডিকেল কালেজের খরচা—

শঙ্কর : (কুণ্ঠিত) আমি পাসটা করে বেরুলে—

শিব : জানি ভাই, জানি। সেই ভরসাতেই তো দেনা করতে ভয় পাইনি। কিন্তু সেও তো একবছর দেরি। আর এরকম দরও তো রোজ রোজ কেউ দিচ্ছে না?

শঙ্কর : সবই বুঝি দাদা। কিন্তু কী করে ভাড়াটে তাড়াতে হয়, সে তো কোনোদিন শিখিনি।

শিব : তোর খুব খারাপ লাগছে জানি। আমারও লাগে। শুধু এই পঁচিশ হাজারের কথা ভেবে—তবে একটা কী জানিস? তোকে হয়তো কিছুই করতে হবে না। বড়োলোক তো, একজন বাইরের লোক সারাক্ষণ পাশে পাশে রয়েছে, এতেই উত্যক্ত হয়ে নিজেরাই ছাড়তে চাইবে হয় তো। বিশেষ এখন বেণীবাবুর অমন ভালো বাড়ি কিম্বা হিলটপ হোটেল রয়েছে।

শঙ্কর : সে যদি হয়, তবে তো ভালোই—

শিব : তাই হবে, তাই হবে। তুই অতো ভাবিস না। দেখ না কী বলে—কাল সকালেই তো আসছে।

শঙ্কর : কী নাম যেন?

শিব : আমার মনে থাকে না। বিদঘুটে নাম। বাঙালি নয়, এইটুকু জানি।

শঙ্কর : মারোয়াড়ি?

শিব : না, তাও নয়। কোন্ দেশের লোক সে নাম দেখে ধরতেই পারলাম না! তুই দেখে কিছু বুঝতে পারিস যদি—দলিলে আছে নাম। হ্যাঁ, রাত্তিরে আসবার সময়ে মনে করে দলিলটা সঙ্গে আনিস কিন্তু। যাতে কাল সকালেই হিল্লে হয়ে যায়!

শঙ্কর : ক'জন আসছে?

শিব : কিচ্ছু জানি নে ভাই। ক'জন লোক, বুড়ো না ছোকরা, পুরুষ না মেয়ে—কিচ্ছু জানি নে। এদেরও জানি নে, আর যে পাগল পঁচিশ হাজার দেবে বলছে—তারও জানি নে।

শঙ্কব : সেও কি সলিসিটর না কি?

শিব : না, দালাল। কোট-প্যান্টুলুন পরা দালাল। আগে দেখিনি কখনো। মোহনপুরে অবিশ্যি এতো লোক এসেছে ইদানিং—

শঙ্কর : খাঁটি লোক তো?

শিব : সে সব ব্যবস্থা ঠিক আছে ভায়া। এ বাড়ি খালি করতে পারলে ওদিকে কোনো গণ্ডগোল হবে না। আমিও তো ব্যবসা করে খাই? (ট্যাঁকঘড়ি দেখে) নে, চল এখন। আমায় দোকানে যেতে হবে।

শঙ্কর : আমি পরে যাবো দাদা। এদিকটা একটু গুছিয়ে নিয়ে যাবো।

শিব : আচ্ছা, তাই যাস। বেশি দেরি করিস না। খুকি-পলটু আগে খেতে বসতে চায় না। বলে কাকুর সঙ্গে খাবো।

শঙ্কর : না না, দেরি হবে না।

[শিবলাল দরজার কাছে গিয়ে কী ভেবে ফিরে দাঁড়ালো। চিন্তাগ্রস্ত শঙ্কবের দিকে তাকিয়ে ফিরে এলো। কাঁধে হাত রাখলো।]

শিব : শঙ্কর, সব ঠিক হয়ে যাবে। অতো চিন্তা করিস না।

[শিবলাল ঘর থেকে বেরুবার আগেই আলো নিভে গেলো। অন্ধকারে ঘোড়ার গাড়ির আওয়াজ থামলো যেন বাড়ির সামনে এসে। অন্ধকারে শঙ্করের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর।]

শঙ্করের কণ্ঠস্বর : দাদা বলিয়া গেলেন—অতো চিন্তা করিস না। কিন্তু পরদিন প্রাতে দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া যখন আগন্তুকদের তিনজনকে গাড়ি হইতে নামিতে দেখিলাম—চিন্তা না করিয়া উপায় রহিল না।

[আলো ফুটে উঠছে। এবারও সকালের আলো, তবে আরো সকাল। শঙ্কর বারান্দার প্রাচীরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে নিচে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। ঘরের আসবাবপত্র এর মধ্যে সাজানো হয়ে গেছে।]

দেখিয়া মনে হইল, বাড়ি ছাড়িবার জন্য ইহারা আসে নাই। বরং ইচ্ছা করিলে আমাকেই বাড়িছাড়া করিতে পারে। কিন্তু এ কথা মনে হইয়াছে পরে, বিস্ময়ের চমক কাটিবার পরে। এতো বিস্মিত বোধ হয় জীবনে কখনও হই নাই ইহার আগে।

[শঙ্কর হঠাৎ পিছু হটে এলো, যেন আগন্তুকদের কারো সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে। ঘুরে দাঁড়ালো সিঁড়ির দিকে। তার মুখে অসহায় বিস্ময়। নিচে যাবে, না বারান্দায় থাকবে, না ঘরে ঢুকবে, ঠিক করতে পারছে না যেন। তারপর ছুটে ভিতরে এলো। টেবিলের এ পাশে এসে দাঁড়ালো দরজার দিকে মুখ করে—যেন টেবিলটা মাঝখানে রেখেছে আত্মরক্ষার জন্য। তার ভঙ্গী আড়ষ্ট, আত্মসচেতন। দেহ স্থির।

ভারি পদশব্দ সিঁড়ি ভেঙে বারান্দা দিয়ে এগিয়ে আসছে। সে পদশব্দে একফোঁটা দ্বিধা নেই, আড়ষ্টতা নেই, লঘুতা নেই। সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস যেন পদশব্দেই বোঝা যায়। দরজার সামনে এসে ঘুরে দাঁড়ানোতেও পদশব্দে একরতি ছন্দপতন নেই। সাধারণ মানুষের হাঁটাচলা একরকম হয় না। এ যেন বহু বছরের অভিজ্ঞ প্রতিভাশালী অভিনেতা, বহু বছরের অভ্যাসে শাহানশা জঁহাপনার মতো হেঁটে এলো—যে হাঁটা জঁহাপানা স্বয়ং হাঁটতে পারতেন কিনা সন্দেহ। এবং চেহারাতেও তাই। দীর্ঘ সবল দেহ। সুপুরুষ। বয়স বোঝা শক্ত। বার্ধক্য দূরে থাক, প্রৌঢ়ত্বের লক্ষণও নাই। অথচ এতো আত্মবিশ্বাস কোনো তরুণের মুখশ্রী, কণ্ঠস্বর বা ভঙ্গীতে দেখা যায় না।]

আগন্তুক : আপনি শিবলাল দত্ত?

[বাংলা উচ্চারণ স্পষ্ট, পরিষ্কার। প্রতিটি শব্দের ওজন ও সুর যেন নিখুঁতভাবে মাপা। এতো ভালো করে বাংলা বাঙালি বলে না। ভদ্রলোক যে বাঙালি নন, তা এক নজরে বোঝা যায়, যদিও বাঙালি সাজ—ধবধবে সাদা ধুতি, পাঞ্জাবি, চাদর। এতো নিখুঁতভাবেও সাধারণ বাঙালি সাজতে পারে না। কাপড়ের চাদরের প্রতিটি ভাঁজ যথাস্থানে, ভঙ্গীর পরিবর্তনেও ভাঁজগুলি বদলে যেন আপনা থেকেই আবার সাজিয়ে যায়। তবু মনে হয় এ তার নিজস্ব পোশাক নয়, যেন থিয়েটারের রাজবেশ, যে বেশ আসল রাজার চেয়েও ভালোভাবে ধারণ করতে অভ্যাস করেছে কুশলী অভিনেতা। তফাৎ এই যে, অভিনেতা রাজবেশ পরা আয়ত্ত করে চেষ্টায়, আর এ

যেন রাজবেশেই অভ্যস্ত, সাধারণ পোশাক পরা আয়ত্ত করেছে নিখুঁতভাবে।]

শঙ্কর : না। (আটকে যাওয়া গলা পরিষ্কার করে) না, আমি তাঁর ছোটভাই—শঙ্করলাল দত্ত। আপনি—বাঙালি?

আগন্তুক : না। কিন্তু আমরা সকলেই বাংলা শিখেছি। আমার নাম ওমেরী। এর নাম—হারিয়ন।

[ওমেরীর প্রসারিত হাতের রাজসুলভ ভঙ্গীর সঙ্গে সম্পূর্ণ ছন্দ মিলিয়ে দরজায় হারিয়নের আবির্ভাব। হারিয়ন দীর্ঘদেহী নয়। বৃদ্ধ, কিন্তু এতো সুন্দর বৃদ্ধ শঙ্কর আগে কখনো দেখেনি। মুখের রেখা, পাকা চুল—সবই যেন রূপসজ্জা। ঋজু ধারালো ভঙ্গী। বাকি সব দিকে, অর্থাৎ বাকি সব অসাধারণত্বে, ওমেরীর সঙ্গে আশ্চর্য মিল।]

আর ইনি—ক্লিয়া।

[এবার আবির্ভাব ক্লিয়ার। শঙ্করের পিছনে ফেরা ভঙ্গী থেকেও যেন বোঝা যায়, সে মনে মনে ক্লিয়ার প্রবেশের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছিলো। ক্লিয়া অপূর্ব সুন্দরী। প্রায় অপার্থিব এ সৌন্দর্য। অসাধারণত্বে তার ভঙ্গী দু'জনেরই মতো—যেন রানি সাধারণ মেয়ের সাজ-পোশাক, চলা-ফেরা নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করে নিজেকে অসাধারণ করে তুলেছে। এদের তিনজনেই যেন নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে এতো বেশি নিশ্চিত যে, কোনো দৃষ্টিকটু আত্মম্ভরিতার বাষ্পও মুখভাবে, ভঙ্গীতে, কথায় এক মুহূর্তের জন্যে প্রকাশ হয় না।]

শঙ্কর : (অস্ফুট কণ্ঠে) বসুন।

[হারিয়ন জানালার কাছে। সারা ঘরে তার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। যেন উৎসাহী পণ্ডিত দর্শক যাদুঘরের কোনো বিচিত্র বস্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। ক্লিয়া বড়ো চেয়ারে বসলো—মনে হোলো যেন দরবারে সিংহাসনে বসলো। তার অকুণ্ঠ দৃষ্টি শঙ্করের দিকে। শঙ্কর না তাকিয়েও বুঝতে পারছে সে কথা। ওমেরী টেবিলের উল্টোদিকে শঙ্করের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।]

ওমেরী : জানেন নিশ্চয়ই আমরা এখানে ছুটি কাটাতে এসেছি। একমাস থাকবো। ঐ বারান্দা আর তিনখানি ঘর আমাদের জন্যে প্রস্তুত করে রাখবার কথা। আপনি এই ঘরে থাকতেন মনে হয়। আশা করি আজকের মধ্যে এ বাড়ি ছেড়ে দিতে আপনার কোনো অসুবিধে হবে না।

শঙ্কর : দাঁড়ান—এক মিনিট—একটা কথা। একটা ব্যাপার হয়ে গেছে—মানে, একটা অসুবিধে—এ বাড়িটা, মানে—আপনাদের জন্য আমরা এর চেয়ে বড়ো অনেক ভালো একটা বাড়ি ঠিক করে রেখেছি—অন্য একটা বাড়ি। অর্থাৎ—

হারিয়ন : (অল্প হেসে) অন্য বাড়ি? না।

[অন্য বাড়ি যে কতো কল্পনাতীত সেটা ওতেই স্পষ্ট বোঝা গেলো]

শঙ্কর : কিন্তু—শুনুন। সে বাড়িটা এর চেয়ে অনেক ভালো। নতুন। তাছাড়া, তার সামনেটা এরকম চাপা নয়—সারা শহরটা দেখা যায়—

ক্লিয়া : (হারিয়নের মতোই) না।

[শঙ্করের দৃষ্টি চকিতে ক্লিয়ার দিকে গিয়েই ফিরে এলো]

শঙ্কর : আপনারা একবার দেখুন সে বাড়িটা দয়া করে—

ওমেরী কোনো প্রয়োজন নেই শঙ্করবাবু। দেখলেও আমাদের মত বদলাবে না।

শঙ্কর : আচ্ছা বেশ, আমরা না হয় হিলটপ হোটেলে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—

ক্লিয়া : (পরম কৌতুকে) হিলটপ হোটেল?

[তিনজনে একযোগে হেসে উঠলো হিলটপ হোটেলের উল্লেখে]

ওমেরী না, শঙ্করবাবু। আমরা এই বাড়িটা ভাড়া নিয়েছি, এখানেই থাকবো। আপনি দয়া করে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়িটা ছেড়ে দেবেন।

শঙ্কর : (হালছাড়া জিদে) না। এ ঘরটা আপনাদের লীজের চুক্তির মধ্যে নেই।

ওমেরী নেই?

শঙ্কর : না। এদিকে পরপর তিনটে ঘর আপনাদের। বারান্দাটা তিনটে ঘরের সামনেই একটানা পাবেন। রান্নাঘর, জলকল নিচে। লীজে শুধু এই আছে। এ ঘরটায় আমি থাকবো।

[অল্পক্ষণ নীরবতা। শঙ্কর যেন ঝগড়ার জন্য প্রস্তুত। ওমেরীর চোখে একটা শীতল দূরত্ব। হারিয়নের মুখ ভাবলেশহীন। ক্লিয়ার চোখে অল্প ঔৎসুক্য, অল্প কৌতুকের আভাস। ওমেরী অন্যদের দিকে ফিরলো। হারিয়নের কাঁধ দুটো সামান্য একটু উঠলো। ক্লিয়ার ঠোঁটে খুব মৃদু একটি হাসি। যেন প্রশ্রয়ের ভাব।]

ওমেরী : বেশ। থাকবেন। শুধু দয়া করে দেখবেন, আমরা যেন বিনা ব্যাঘাতে, শান্তিতে থাকতে পারি। (দীর্ঘ পদক্ষেপে বারান্দায় গেলো। ফিরে দাঁড়ালো।) আর মিস্ত্রি ডেকে এইখানে একটা দরজা তৈরি করিয়ে দেবেন। আজকের মধ্যে।

[বারান্দায় ওদের মহলের প্রবেশ পথটা দেখালো]

শঙ্কর : ওখানে? কিন্তু—

[ওমেরীর হাতের একটা সামান্য সঞ্চালন শঙ্করকে থামিয়ে দিলো]

ওমেরী : সমস্ত খরচ আমরা দেবো। এবং যাবার সময়ে আবার দরজা সরিয়ে ঠিক যেমন আছে করিয়ে দিয়ে যাবো—যদি চান।

['যদি চান' কথাটায় একটু অতিরিক্ত জোর। ওমেরীর মুখে অল্প হাসির আভাস। শঙ্কর নিরুত্তরে তাকিয়ে রইলো। ওমেরী বারান্দা দিয়ে ওপাশে গেলো। ভারি মাপা পদক্ষেপে যেন ঘর তিনটি পর্যবেক্ষণ করছে। ক্লিয়া উঠে শঙ্করের দিকে এক পা এগুলো। শঙ্কর আত্মসচেতন হয়ে কোন্ দিকে তাকাবে ঠিক করে উঠতে পারলো না।]

ক্লিয়া : আপনি পড়েন?

শঙ্কর : হ্যাঁ। কলকাতায়। ডাক্তারি পড়ি।

ক্লিয়া : পুজোর ছুটিতে দেশে এসেছেন?

শঙ্কর : হ্যাঁ।

[হারিয়ন একবার ক্লিয়ার দিকে তাকিয়ে আবার অন্যদিকে ফিরেছে]

হারিয়ন : (যেন নির্বিকারভাবে) ক্লিয়া!

ক্লিয়া : (অল্প হেসে) হ্যাঁ, জানি। মনে আছে। (শঙ্করকে) একটা বাংলা বই আমি পড়তে চাই। আপনার কাছে আছে কিনা জানি না।

শঙ্কর : কী বই বলুন?

[ওমেরী ফিরে এসেছে দরজার সামনে। বারান্দার রেলিং-এ ঝুঁকে দু'বার হাততালি দিলো।]

ওমেরী : মালপত্র উপরে নিয়ে এসো ভাই এক এক করে। সাবধানে এনো।

[ঘরের দিকে ফিরলো]

শঙ্কর : কী বই, বললেন না?

ক্লিয়া : (ওমেরীর দৃষ্টি অনুভব করে হেসে) থাক, আপনি ভাববেন না। আমি খুঁজে নেবো।

[ক্লিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে ওদের ঘরের দিকে চলে গেলো। ওমেরী পথ ছেড়ে দাঁড়ালো। হারিয়নও গেলো। প্রত্যেকের প্রতিটি ভঙ্গী ছন্দোময়, তাতে নৃত্যের সুষমা। অথচ নাচেনি কেউ, শুধু হেঁটেছে, ঘুরেছে, সরে দাঁড়িয়েছে। ওমেরী এক মুহূর্ত শঙ্করের দিকে চেয়ে রইলো। শঙ্কর ঘুরে দাঁড়ালো। এতোক্ষণে প্রথম দর্শকের দিকে ফিরলো সে। তার কপালে ঘাম, হাত মুঠো, সারা শরীরে একটা টান।

আলো নিভে গেলো ধীরে ধীরে, ওমেরী আর শঙ্করের নিশ্চল মূর্তিকে অন্ধকারে ডুবিয়ে। করাত চালানো, র‍্যাঁদা ঘষা আর হাতুড়ির আওয়াজ—প্রথমে আস্তে, তারপর জোরে। শঙ্করের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শুরু হলে সে সব আওয়াজ নেমে এসে ক্রমে মিলিয়ে গেলো।]

শঙ্করের কণ্ঠস্বর : প্রাচীর উঠিয়া গেল। মোহনপুরের তিনজন পাকা মিস্ত্রি তিনগুণ দক্ষিণা লইয়া একদিনে দরজা বানাইয়া দিল। শৈলধামের দোতলা দুই মহলে ভাগ হইয়া গেল। বহির্মহলে দ্বাররক্ষকের মতো আমি। অন্দরমহলে তিনজন বিচিত্র মানুষের অজানা জীবনযাত্রা। বন্ধ দ্বারের ওপার হইতে শব্দে গন্ধে যেটুকু ভাসিয়া আসে, তাহা হইতে সে জীবনযাত্রার কিছু আভাস পাই। মাঝে মাঝে দরজা খোলে। তিনজন বাহির হইয়া যায় তালা লাগাইয়া। আমি আমার ঘরের খোলা দরজা দিয়া, জানালা দিয়া দেখি। ওমেরী বা হারিয়ন সোজা হাঁটিয়া যায়, আমার ঘরের দিকে দৃক্‌পাত করে না। আমার অস্তিত্ব যেন জানেই না। আমি সোজা তাকাইয়া থাকিতে পারি। কিন্তু ক্লিয়া যখন যায়—অন্যদের সঙ্গে নয়, যখন একা যায়, তখন দরজার দিকে তাকাইতে পারি না। চেষ্টা করিয়াও পারি নাই। বুঝিতে পারি, ক্লিয়া তাহার নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টি সম্পূর্ণ মেলিয়া আমার ঘর, আমাকে দেখিয়া গেলো। ক্লিয়াকে লজ্জাহীনা স্বৈরিণী ভাবিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। পারি নাই। অথচ তখনই জানিয়াছি, অনুভবে বুঝিয়াছি, ক্লিয়া—ক্লিয়া—(যেন উচ্চারণ করতে পারছে না) ক্লিয়া—আমাকেই দেখে। বারান্দা দিয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত যাতায়াত করে—দেখিবার জন্যই। জানি না কেন। হয় তো কৌতূহল, অথবা ঔৎসুক্য। অথবা—

[শঙ্করের কণ্ঠ সহসা থেমে গেলো। আলো ফুটে উঠলো। এবারও সকালের আলো। জানালা দরজা দুই-ই খোলা, পর্দা সরানো। শঙ্কর বড় চেয়ারে বসে বই পড়ছে। চেয়ারটি পাশের দিকে ফেরানো, যাতে শঙ্কর অল্প আয়াসে দরজার দিকে তাকাতে পারে। বার দুই তাকালোও। বইয়ে তার মন নেই। হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। নতুন তোলা দরজার পাল্লাটা আস্তে আস্তে খুলছে। ক্যাঁচ করে মৃদু একটা টানা আওয়াজ

হয় দরজাটা খুললে। শঙ্করের চোখ বইয়ে নেমে এলো। দেহ আড়ষ্ট। পাল্লাটা খোলে বারান্দার প্রাচীরের গায়ে। এ ঘরের দরজা দিয়ে দেখা যায়। হাতলে ক্রিয়ার হাত—পাল্লার গায়ে শুয়ে আছে। নিটোল একটি বাহু শুধু—আলোয় উজ্জ্বল হয়ে আছে। এক মুহূর্ত। তারপর ক্রিয়া। ধীর পদক্ষেপে দরজা পার হয়ে গেলো। তার অলস দৃষ্টি খোলা দরজা দিয়ে এসে শঙ্করকে ছুঁয়ে গেলো। দৃষ্টিতে কৌতূহল, উৎসুক্য। আর—হয়তো একটা ইচ্ছা—শঙ্কর চোখ তুলে তাকাক। ক্রিয়াকে ডাকুক। আলাপ করুক।

শঙ্কর তাকাতে পারলো না। ক্রিয়ার দৃষ্টি জানলা দিয়েও ঘুরে গেলো ঘরে। শঙ্কর জানলো, কিন্তু তাকালো না। এক মুহূর্ত। তারপর বই ফেলে উঠে দৃঢ় পদক্ষেপে গিয়ে একটানে জানলার পর্দা টেনে দিলো। দরজারও। ফিরে এলো ঘর্মাক্ত কপালে। বই নিয়ে টেবিলের কাছে চেয়ারে বসলো। যে চেয়ারটি দরজার দিকে পিঠ করে, সেইটিতে। বই খুললো। কিন্তু বৃথা। আবার উঠলো ধীরে ধীরে। পায়ে পায়ে গিয়ে দরজার পর্দা সরিয়ে দিলো। তারপর জানলার। আবার বসলো বড়ো চেয়ারে, বই কোলে, প্রতীক্ষায়।

পদশব্দ। শঙ্কর উৎকর্ণ। অনিল জানলায় এসে দাঁড়ালো।]

অনিল · শঙ্কর।

শঙ্কর : (ভীষণ চমকে) অনিল!—আয়, আয়।

অনিল : না, আসবো না।

শঙ্কর : আসবি না কী রে?

অনিল : না। তোর সঙ্গে আমার সাংঘাতিক ঝগড়া আছে।

শঙ্কর : (হেসে) তা ভিতরে না এলে ঝগড়া করবি কী করে?

[অনিল ঘরে এলো]

অনিল : তুই আমার বিয়েতে এলি নে কেন?

শঙ্কর : কলকাতা থেকে আসা কি সোজা কথা?

অনিল : যা-যাঃ! কলকাতা দেখাসনি আমাকে। না হয় যাই-ইনি কোনোদিন, তাই বলে কলকাতা কতো দূরে তাও জানি নে ভাবিস?

শঙ্কর : তাছাড়া পরীক্ষা ছিল যে সামনে।

অনিল : যতো ছুতো। যাঃ! মা কতোবার তোর কথা বললেন—শঙ্কর আসবে, শঙ্কর ঠিক আসবে। আমি বলেছিলাম—মা, শঙ্কর এখন কলকাতার বাবু, ওর কি আসবার সময় হবে, না ইচ্ছে হবে?

শঙ্কর : তুই বসবি?

অনিল : না, বসবো না। (বসলো)

শঙ্কর : কাল বিকেলে কোথায় গিয়েছিলি?

অনিল : আরে তুই গেছিস, তার দশ মিনিট পরেই আমি ফিরেছি। মাকে বললাম—আর একটু বসিয়ে রাখতে পারলে না?

শঙ্কর : আর একটু? আধঘণ্টার উপর ছিলাম। পায়েস খেলাম, শরবৎ খেলাম, মাসিমার সঙ্গে কতো গল্প হোলো—তোর আর পাত্তাই নেই।

অনিল : নতুন বৌয়ের সঙ্গে আলাপ তো হয়নি?

শঙ্কর : (হেসে) আলাপ কী করে হবে? মাসিমা কি অতো মডার্ন?

অনিল : মায়ের আবার বেশি বেশি। আজকালকার দিনে—

শঙ্কর : আর মাসিমা বললেও তোর বৌ বেরুতো নাকি আমার সামনে?

অনিল : কেন? তুই ভেবেছিস সেকেলে কলাবৌ? মোটেই নয়। কথাবার্তায়—সে তুই দেখলেই বুঝবি। খানিকটা ইংরিজিও জানে। আমার শ্বশুরমশাইয়ের লেখাপড়ার দিকে খুব ঝোঁক। নিজের হাতে পড়িয়েছেন বাড়িতে।

শঙ্কর : তোর খুব পছন্দ হয়েছে বল?

অনিল : তা, সত্যি কথা বলতে কী, ভালোই লাগছে। আমার তো বেশ ভয় ছিল—কী জোটে কপালে। চল না—আলাপ করে আসবি?

শঙ্কর : এখন?

অনিল : কেন? কী রাজকর্মটা করছিস এখন?

শঙ্কর : না না, তা নয়। তবে—বোস না তুই। এই তো এলি? আমি বিকেলে যাবো এখন।

অনিল : ঠিক?

শঙ্কর : হ্যাঁ রে হ্যাঁ, ঠিক যাবো। তোর খবর বল। ইস্কুলের কাজ চলছে কেমন?

অনিল : আরে, তুই শুনিসনি? মাস্টারি ছেড়ে দিয়েছি, ছ'মাস হতে চললো।

শঙ্কর : সে কী? কী করছিস তবে?

অনিল : ঠিকেদারি। মোহনপুরে এমন সময়ে মাস্টারি করে কেউ? হাসপাতালের ওদিকে পাকা রাস্তা তৈরি হচ্ছে। নতুন হাসপাতালটা দেখলি?

শঙ্কর : না। তবে দাদা বলছিলেন। খুব বিরাট ব্যাপার করেছে না কি?

অনিল : ওঃ, এলাহি কাণ্ড!—তুই এসেছিস কবে?

শঙ্কর : এই তো--রোববার।

অনিল : তা, এ বাড়িতে উঠলি কেন? শিবুদাকে জিজ্ঞেস করলাম, বললেন—তোর নাকি ভয়ানক পড়াশুনোর চাপ। তাই নিরিবিলি থাকবি বলে এসেছিস।

শঙ্কর : (হেসে) তবে তো শুনেইছিস। আবার জিজ্ঞেস করছিস কেন?

অনিল : না। মনে হোলো—পুজোর সময়টা—দাদা-বৌদির কাছে না থেকে একা একা—

শঙ্কর : পুজোর দিন ক'টা ওবাড়িতেই কাটাবো।

অনিল : ভালো কথা। অষ্টমী পুজোর দিন রাত্তিরে আমাদের বাড়ি খাবি। বলে রাখলাম।

শঙ্কর : কী খাওয়াবি বল?

অনিল : ডাল-ভাত খাবি, আর কী? বিয়েতে আসিসনি কেন?

শঙ্কর : তবে যাবো না।

অনিল : তোর ঘাড় যাবে। হ্যাঁ রে, সুরেশ্বর আসবে না?

শঙ্কর : আসবে। ষষ্ঠী পুজো নাগাদ।

অনিল : কেন, এতো দেরি কেন? ওর কলেজ তো বন্ধ?

শঙ্কর : বললো—নতুন চাকরি, অনেক পড়াশুনো করে নিতে হবে।

অনিল : সেই সুরেশ্বর—এখন কলকাতার কলেজের ইংরিজির প্রফেসর। অ্যাঁ? দেখতে

দেখতে কতো বছর যে কেটে গেলো। তা—সুরেশ্বর বিয়ে-থা করবে না?

শঙ্কর : (হেসে) তুই নিজে ফেঁসেছিস বলে সবাইকে ফাঁসাতে চাইছিস বুঝি?

অনিল : (গম্ভীরভাবে) ফাঁসা নয় রে, ফাঁসা নয়। বিয়ে হবার আগে সবাই ওরকম ভাবে। বিয়ে কর। তারপর বুঝবি?

[আলো নিভে গেলো। শঙ্করের কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।]

শঙ্করের কণ্ঠস্বর : সুখী অনিল। নূতন বৌয়ের গল্পে বিভোর হইয়া কতোক্ষণ যে কাটাইয়া দিল। যতোক্ষণ ছিল, ভয়ে ভয়ে রহিলাম—ক্লিয়া বুঝি ফিরিয়া আসে। অনিল যদি ক্লিয়াকে দেখে, তাহার নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টি দেখে, তাহা হইলে কী ভাবিবে জানিতাম। কিন্তু ক্লিয়া আসিল না। অনিল অবশেষে চলিয়া গেল। কেমন যেন মনে হইল—এইবার ক্লিয়া ফিরিবে। যেন সে অনিলের প্রস্থানের জন্যই নিচে অপেক্ষা করিয়া আছে।

[আলো জ্বললো। শঙ্কর বড়ো চেয়ারে বই কোলে বসে। পদশব্দ। ক্লিয়া ফিরে আসছে। জানালায়। শঙ্কর মাংসপেশী টান করে বসে রইলো, জানলার দিকে তাকাতে পারলো না। তারপর যেন বেপরোয়া প্রতিজ্ঞায় চোখ তুলে সোজা তাকালো দরজার দিকে। ক্লিয়া দরজায়। শঙ্করের চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে গেলো। হাসলো। পরিচিতকে সম্ভাষণের হাসি। শঙ্কর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। যেন কিছু বলবে। 'নমস্কার' বা 'আসুন', বা ঐরকম কিছু। কিন্তু মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরুলো না। মাথা নিচু করে ঘুরে দাঁড়ালো। বইটা ঝুলে রইলো নির্জীব হাতে। ক্লিয়ার হাসি যেন একটু বিষণ্ণ; আর হয় তো কিছুটা মায়া তাতে।

চলে গেলো ক্লিয়া। হাসি নিয়েই চলে গেলো ভিতরে। অন্দরমহলের দ্বার রুদ্ধ হোলো আস্তে আস্তে। ক্লিয়ার বাহু, ক্লিয়ার হাত—অদৃশ্য হয়ে গেলো। এক মুহূর্ত। জানলায় শিবলাল। শঙ্কর সেদিকে পিছন ফিরে। দেখতে পেলো না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। শিবলাল ঘরে ঢুকলো।]

শিব : কী রে?

[শঙ্কর ভীষণ চমকে ফিরে দাঁড়ালো]

কী রে, কী হোলো? ওরকমভাবে দাঁড়িয়ে ছিলি যে?

শঙ্কর : কই, না—কীরকমভাবে?

শিভ : অমন অদ্ভুতভাবে—পাথরের মতো, চমকে উঠলি সাড়া পেয়ে—

শঙ্কর : বোসো বোসো। তুমি, এ সময়ে হঠাৎ?

শিব : তুই কাল রাত্তিরে খেতে গেলি নে কেন?

শঙ্কর : কেন, আমি তো বৌদিকে বলে এসেছিলাম, আসবো না।

শিব : বলেছিলি—না আসতেও পারিস। আমরা ভেবেছিলুম আসবি। কেন, আসবি নে কেন?

শঙ্কর : রাত্রে ক্ষিদে থাকে না বিশেষ। তা ছাড়া পড়ারও—

শিভ : ক্ষিদে থাকে না? সে কী রে? এই বয়সে ক্ষিদে হয় না বললে চলবে কেন? অসুখ-বিসুখ হয়নি তো?

শঙ্কর : না না, অসুখ হবে কেন?

শিব : অসুখ না হলে কিছু না খেয়ে সারারাত—

শঙ্কর : না না, খেয়েছি। কিছু খেয়েছি—

শিব : কী খেয়েছিস? বাজারের আজেবাজে জিনিস বেশি না খাওয়াই ভালো।

শঙ্কর : না না, আজে বাজে নয়—তুমি ভেবো না। আমি ভালোই আছি।

শিব : (একটু থেমে) এদিকে—কিছু এগুলো?

শঙ্কর : ন্—নাঃ।

শিব : (আপন মনে) পাঁচদিন কেটে গেলো। দালালটা কাল আবার এসেছিলো। বলছিলো—যারা কিনতে চায় তারা নাকি নিজেরাই আসবে মোহনপুরে।

শঙ্কর : কবে?

শিব : দিন কয়েকের মধ্যেই।

শঙ্কর : (অল্প থেমে) কী করবো কিছু বুঝতে পারছি না।

শিব : আশ্চর্য! হিলটপ হোটেলে পরের পয়সায় থাকতে চায় না—

শঙ্কর : পয়সা এদের কাছে প্রশ্ন নয়।

শিব : আরে, আরামটা তো পেতো?

শঙ্কর : জানি না। হোটেলের কথায় তো হো-হো করে হেসে উঠলো।

শিব : আশ্চর্য! হিলটপ হোটেল! কেমন যেন—গোলমেলে। আচ্ছা, সারাদিন করে কী?

শঙ্কর : সারাদিন বাইরে বাইরে ঘোরে। রাত্রে ফেরে।

শিব : দুপুরে খেতে ফেরে না?

শঙ্কর : নাঃ। খাওয়া-দাওয়ার পাট বাড়িতে নেই বললেই হয়। নিচের রান্নাঘর তো ব্যবহারই করে না। রাত্তিরে খেলেও ঘরেই খায়।

শিব : রান্না করে না তো খায় কী?

শঙ্কর : কী জানি? নানা রকম গন্ধ আসে, তাইতে বুঝি।

শিব : ঘরে রান্না করে নাকি? তাহলে ঐ ছুতো ধরে কিছু একটা করা যায় না?

শঙ্কর : বুঝবো কী করে? রান্নার আওয়াজ তো কখনো পাইনি। হয়তো খাবার কিনে এনে খায়। না—না--তাই বা কী করে হবে?

শিব : কেন?

শঙ্কর : যাই খাক, আমাদের দেশি খাবার নয়। গন্ধ যা আসে. তার একটাও চেনা গন্ধ নয়।

শিব : কীরকম?

শঙ্কর : সে নানারকম খোসবাই। যেন খুব দামী মশলাপাতির গন্ধ। আবার মাঝে মাঝে এমন গন্ধ পাই, গা গুলিয়ে ওঠে।

শিব : কী জানি, বুঝি না বাবা। কোন্ মুল্লুক থেকে যে এলো! বেড়াতেই এসেছে বলছিস?

শঙ্কর : সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সারাদিন টৈ টৈ করে, কোথায় কী দেখলো বারান্দায় বসে বলাবলি করে, শুনতে পাই অনেক সময়ে। কিন্তু —

[থেমে গেলো]

শিব : কিন্তু, কী?

শঙ্কর : (চিন্তিত) বেড়াবার ধরনটা ঠিক বুঝি না। কোন্ এক অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়েছিলো সেদিন। এখান থেকে বেশ দূরে। বারান্দায় বসে গল্প করছিলো, শুনতে পেলাম—যেন তীর্থদর্শন করে এসেছে। মনে হোলো—কোন্ এক মহাপুরুষের জন্মস্থান দেখে এসেছে।

শিব : মহাপুরুষ? মোহনপুরের ত্রিসীমানায় কোনো মহাপুরুষ জন্মেছে বলে তো শুনিনি কখনো।

শঙ্কর : শোনো নি? আমি তো তোমাকেই জিজ্ঞেস করবো ভাবছিলাম।

শিব : (চিন্তা করে) এক যদি বলিস—এই মোহনপুরেই জন্ম—কী যেন নাম? কংগ্রেসের বড়ো লীডার—

শঙ্কর : না না, এ কবি একজন। মহাকবি না কি! তবে এরা যে কাকে মহাপুরুষ বলে বোঝা মুস্কিল। সেদিন একটা বই এনে তিনজনে এমন ভাব করছে—যেন গ্রন্থসাহেব। বারান্দায় বসে ওদের একজন চেঁচিয়ে পড়ছিলো—শুনলাম। এমন কিছুই তো মনে হোলো না।

শিব : বাংলা?

শঙ্কর : হ্যাঁ, বাংলা। লেখকের নামটাও উচ্চারণ করছে যেন ঠাকুর-দেবতার নাম। আমি তো নাম শুনিনি কোনোদিন।

শিব : কী নাম?

শঙ্কর : মনেই নেই। শুনেছি আর ভুলেছি। সাদামাটা নাম একটা।

শিব : অদ্ভুত তো!

শঙ্কর : (অন্যমনস্কভাবে) কোন্ দেশ থেকে যে এসেছে এরা—

শিব : যেখান থেকেই আসুক, সেখানে যদি ফিরে যেতো পঁচিশের আগে তো বাঁচতুম।

শঙ্কর : অ্যাঁ? হ্যাঁ।

শিব : (উঠে) চলি রে। তুই কিন্তু খাওয়া-দাওয়া বাদ দিসনি। খেতে না গেলেই চিন্তা হয়।

শঙ্কর : না না, যাবো ঠিক।

শিব : ইয়ে—ওরা তিনজন কে কে আছে বলছিলি।

শঙ্কর : কে কে মানে?

শিব : মানে—একটি পরিবার? না কি তিন বন্ধু—

শঙ্কর : বলেছি তো—দু'জন পুরুষ, একজন মহিলা।

শিব : হ্যাঁ, তাই ভাবছিলুম, মানে—পরিবারই হবে তাহলে।

শঙ্কর : হতে পারে।

শিব : হতে পারে কেন? বলেনি কিছু?

শঙ্কর : না। আমার সঙ্গে কোনো কথাই হয় না।

শিব : তবু, দেখেশুনে কী মনে হয়? বয়স কীরকম?

শঙ্কর : একজন বয়স্ক। বুড়োমতো।

শিব : কে? মহিলাটি?

শঙ্কর : না। পুরুষ।
শিব : তবে কি—বাবা, ছেলে আর মেয়ে?
শঙ্কর . হতে পারে।
শিব : মেয়েটি—বিবাহিতা?
শঙ্কর : (অল্প থেমে) জানি না।
শিব : কেন, দেখে বোঝা যায় না?
শঙ্কর : আমি খুব কম দেখেছি।
শিব : না ৩বু, মানে—বাচ্চা মেয়ে?
শঙ্কর : না। খুব বাচ্চা নয়।
শিব : কতো বয়স হবে?
শঙ্কর : কুড়ি বছরের কম নয়।
শিব : ও, তাহলে নিশ্চয়ই বিয়ে হয়ে গেছে। মানে—ছেলের বৌই হবে। কী বলিস্?
শঙ্কর : কী করে বলবো?
শিব · কম দেখেছিস—মানে—পর্দানশীন? বেরোয় না বুঝি?
শঙ্কর : না, রোজই বেরোয়।
শিব : তবে?
শঙ্কর : তবে কী?
শিব : (কুণ্ঠিতভাবে) বলছিলি—খুম কম দেখেছিস। তাই বলছিলাম—
শঙ্কর : হ্যাঁ দাদা, সত্যিই খুব কম দেখেছি। তার কারণ—ও যখন বারান্দা দিয়ে যায় আমি ওদিকে তাকাই না। আমার সে অভ্যেস নেই।
শিব : (অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে) না না, হ্যাঁ হ্যাঁ, বটেই তো—ঠিকই তো—
শঙ্কর : (স্থিরকণ্ঠে) দাদা, আমাকে নিয়ে ভেবো না।
শিব : না না, ভাববো কেন—কী ভাববো? ভাববার কী আছে? তোর বৌদি জিজ্ঞেস করছিলো, তাই আমি এমনি—
শঙ্কর : বৌদিকেও ভাবতে বারণ করে দিও।
শিব : না না, ভাববে আবার কী? মাথা খারাপ?

[বারান্দার দরজা খুলে যাচ্ছে। কজার মৃদু আর্তনাদ। ক্লিয়ার বাহু। শিবলাল শঙ্কর দু'জনেই ফিরে তাকিয়েছে। ক্লিয়া দরজায়। শিবলালকে আশা করেনি, কিন্তু দ্বিধা করলো না। দ্বিধা এদের স্বভাবে নাই। ক্লিয়া হাসলো।]

ক্লিয়া : আপনি শিবলালবাবু, না?

[সেই ছন্দোময় নমস্কার]

শিব : অ্যাঁ? হ্যাঁ, হ্যাঁ। নমস্কার।
ক্লিয়া : আপনাকে এখানে আগে তো কখনো দেখিনি? আসেন না বুঝি?
শিব : না, আমি—আমার দোকান আছে তো? সারাদিন—মানে, সময় একেবারেই—পাই না আর কি—
ক্লিয়া : (হেসে) অবশ্য আমরাও বাড়িতে খুব কম থাকি।
শিব : হ্যাঁ, সে তো ঠিক, মানে—বেড়াতেই তো আসা—

[ক্লিয়া শিবলালের দিকে তাকিয়ে। শিবলাল চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ক্লিয়ার মুখের হাসি মিলিয়ে এসেছে। চোখে প্রথমে একটা কৌতূহল ছিল, তাতে এখন খানিকটা বিষণ্ণতা এসে মিশেছে যেন।]

ক্লিয়া : আচ্ছা আসি।

[শঙ্করের দিকে একবার তাকিয়ে ক্লিয়া দ্রুতপায়ে চলে গেলো। জানালা দিয়ে আর তাকালো না। অল্পক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতা।]

শিভ : (কৃত্রিম স্বাভাবিকতায়) ইয়ে, চলি রে—দেরি হয়ে যাচ্ছে। তুই শরীরের যত্ন নিস কিন্তু। খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম করিস না। আচ্ছা চলি—অ্যাঁ? খাবার সময়ে দেখা হবে! চলি এখন—

[শিবলাল চলে গেলো। শঙ্কর দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর হঠাৎ কী ভেবে বারান্দায় গেলো। রেলিং-এ ঝুঁকে দাঁড়ালো। হাত নাড়লো রাস্তায় শিবলালের উদ্দেশে। তারপর রাস্তাব এধার ওধার দেখে নিলো ভাল করে। ফিরে এলো ঘরে। এগিয়ে এলো টেবিলের দিকে। শঙ্করের কণ্ঠস্বর।]

শঙ্করের কণ্ঠস্বর : আমি জানিতাম, ক্লিয়া বাহির হয় নাই। ক্লিয়া নিচে রহিয়াছে। এই প্রথম উপলব্ধি করিলাম—ক্লিয়া কখন বাড়ি থাকে না থাকে, আমি জানিতে পারি । না দেখিয়াই জানিতে পারি।

আমি জানিতাম—ওমেরী ও হারিয়ন বাহির হইয়া গিয়াছে। সকালে তাহাদের বাহির হইতে দেখিয়াছি।

আমি জানিতাম—ক্লিয়া, ওমেরী বা হারিয়ন কাহারও স্ত্রী নহে। ক্লিয়া বিবাহিতা নহে। কী করিয়া জানিলাম, বলিতে পারি না।

আরও জানিতাম।— ক্লিয়া আজ আসিবে। আলাপ করিবে। ক্লিয়াকে বাড়িতে রাখিয়া ওমেরী ও হারিয়ন যখন বাহির হইয়া গেল, তখন হইতে জানিতাম, ক্লিয়া আসিবে।

[ক্লিয়া জানালায় দাঁড়িয়ে। ভিতরে তাকিয়ে।]

ক্লিয়া আসিবে।

[ক্লিয়া জানালা ছেড়ে গেলো]

ক্লিয়া—আসিবে।

[ক্লিয়া দরজায়। দুই হাত দরজার চৌকাঠে]

ক্লিয়া—আসিবে।

ক্লিয়া : আসতে পারি?

[শঙ্কর ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। পর্দা বন্ধ হয়ে গেলো।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[ক্লিয়া দরজায়, চৌকাঠে হাত। শঙ্কর এখন সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ক্লিয়ার মুখোমুখি।]

ক্লিয়া : আসতে পারি?

শঙ্কর : (স্পষ্ট উচ্চারণে) আসুন।

[ক্লিয়া ঘরে এলো। সারা ঘরে তার চোখ ছড়িয়ে গেলো একবার।]
বসুন।
[ক্লিয়া বসলো বড়ো চেয়ারে। শঙ্কর তখনো টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে।]

ক্লিয়া : ওমেরী আর হারিয়ন বেড়াতে গেছে।

শঙ্কর : জানি। দেখেছি।

ক্লিয়া : আমার বেরোতে ইচ্ছে করলো না। মনে হোলো—বারান্দায় আরাম করে বসে আজকের সুন্দর দিনটা উপভোগ করি। সত্যি, এতো সুন্দর শরৎ, পর পর এতো সুন্দর দিন—সারা পৃথিবীতে কখনো এসেছে বলে মনে হয় না।

শঙ্কর : (সহজ হবার চেষ্টায় হেসে) আপনার—আপনি কি সারা পৃথিবীর আবহাওয়ার ইতিহাস জানেন?

ক্লিয়া : (না হেসে) হয়তো কোনো দেশে এসেছে কখনো। কিন্তু তখন নিশ্চয়ই সেখানকার সময় এতো ভালো ছিল না। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অর্থনৈতিক দুঃসময়—কিছু না কিছু ছিলই, যার জন্যে সুন্দর শরৎ, সুন্দর দিন সব ব্যর্থ হয়ে গেছে। কিন্তু সব মিলিয়ে মোহনপুর এখন সমৃদ্ধির শিখরে। তাই মোহনপুরের এই শরতের তুলনা নেই। এই একমাত্র—

শঙ্কর : আপনি—এরকমভাবে কথা বলেন কেন?
[কথাটা বলে ফেলেই সচেতন হয়ে উঠলো শঙ্কর। সঙ্কুচিত হোলো। ক্লিয়ার চোখ বারান্দা থেকে শঙ্করের দিকে ফিরে এলো।]

ক্লিয়া : কীরকমভাবে?

শঙ্কর : না, কিছু মনে করবেন না—আমি কিছু না ভেবেই—মানে—

ক্লিয়া : (হেসে) বলুন না? কীরকমভাবে কথা বলেছি?

শঙ্কর : কীরকম—ঠিক—বোঝাতে পারবো না। মানে—কীরকম যেন—সুন্দর করে—সাজিয়ে—সাজিয়ে মানে—কৃত্রিম নয়। কৃত্রিম একেবারেই নয়। বরং খুব স্বাভাবিক, অথচ প্রত্যেকটা কথা এতো—এতো ঠিক—যেন আগে থেকে লিখে তৈরি করা ছিল—যেটা সবচেয়ে ভালো শোনায়—মানে সাধারণ বাঙালি তো ওরকমভাবে—(হঠাৎ হেসে) দেখছেন তো—আমি কীরকমভাবে কথা বলছি?

ক্লিয়া : আমাদের কথা শুনে কি আপনার মনে হয়—আমরা অভিনয় করছি?

শঙ্কর : অভিনয়? হ্যাঁ, খানিকটা তাই। কিন্তু খুব, খু—ব ভালো অভিনয়। সুন্দর, অথচ স্বাভাবিক। শুধু কথায় নয়, সাজপোশাক, চলাফেরা—সব কিছুতেই।

ক্লিয়া : আমরা যে দেশে থাকি, সেখানে ছোটবেলা থেকেই আমাদের এইরকম শিক্ষা দেওয়া হয়। সব বিষয়েই বাহুল্য আর অপরিচ্ছন্নতা বাদ দিয়ে চলতে আমরা ছোটবেলা থেকেই শিখি। (যেন ভদ্রতার খাতিরে) এ একরকম জাতীয় কুসংস্কার বলতে পারেন। আসলে আমরা হাতে সময় অনেক বেশি পাই। তাই এই সব দিকে মন দিতে পারি।

শঙ্কর : আপনাদের দেশ কোথায়?

ক্লিয়া : (হেসে) বাংলাদেশের বাইরে।

শঙ্কর : তা জানি। কিন্তু কোথায়?

ক্লিয়া : ও কথা থাক শঙ্করবাবু।

শঙ্কর : ও। আচ্ছা। (অল্প থেমে) কিছু মনে করবেন না।

ক্লিয়া : না, আমি কিছু মনে করিনি।

শঙ্কর : আপনারা বেড়াতে এসেছেন?

ক্লিয়া : বলতে পারেন—তীর্থদর্শনে এসেছি।

শঙ্কর : (অবাক) তীর্থদর্শনে? মোহনপুরে?

ক্লিয়া : আমার কথাটা বলা উচিত হয়নি। ভুলে যান ও কথা। আপনি চা খান?

শঙ্কর : চা? কলকাতায় খাই মাঝে মাঝে। অভ্যেস নেই বিশেষ।

ক্লিয়া: আমাদের দেশের চা একটু খেয়ে দেখুন। ভালো লাগতে পারে।

[ক্লিয়া উঠে দ্রুতপদে বার হয়ে গেলো। বারান্দার দরজাটা খোলা রেখেই গেলো। শঙ্কর একবার ঘরের দরজা অবধি গেলো। আবার ফিরে এলো খাটের কাছে। সে যেন খানিকটা ঘোরের মধ্যে আছে। খাটে বসলো।

ক্লিয়া ফিরে এলো। শঙ্কর তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো। ক্লিয়ার দু'হাতে দু'টি বিচিত্র পাত্র। চায়ের পাত্রের সঙ্গে কোনো মিল নেই তার। অনেকটা যেন হাতলহীন ঢাকা দেওয়া ধুনুচির মতো। পাতলা স্ফটিকের তৈরি। ঢাকাটা পাত্রেরই অবিচ্ছিন্ন অংশ। একপাশে একটি সরু লম্বা ছিদ্র। ছিদ্রপথে ধোঁয়ার আভাস।]

শঙ্কর : এর মধ্যে হয়ে গেলো?

ক্লিয়া : অবাক হচ্ছেন? আমাদের চা একটু অন্যরকম। তৈরি করার প্রণালীও অনেক সহজ।

[শঙ্কর খাটে বসে একটি পাত্র হাতে নিলো। গরম ভেবে সাবধানে তুলেছিলো, কিন্তু হাতে নিয়ে বুঝলো, পাত্র গরম নয় মোটেই।]

শঙ্কর : এটা—কীরকম ব্যাপার? এর মধ্যে চা করেন কী করে?

ক্লিয়া : বলবো পরে। আগে খেয়ে দেখুন—কেমন লাগে।

[শঙ্কর এক চুমুক খেলো। পাত্র গরম না হলেও পানীয়টা যথেষ্ট গরম—শঙ্করের চমক দেখে বোঝা গেলো।]

কেমন লাগছে?

শঙ্কর : ভালো। (আর এক চুমুক খেয়ে) খুব ভালো। কিন্তু—চায়ের মতো নয় তো?

ক্লিয়া : না। চা নয় এটা। আমরা একে বলি—'কায়লিন'। অতো তাড়াতাড়ি খাবেন না। আস্তে আস্তে খান, ভালো লাগবে। সহজে ঠাণ্ডা হবে না।

[ক্লিয়া বড়ো চেয়ারটা খাটের দিকে সরিয়ে নিলে বসলো]

শঙ্কর : কেমন যেন—গা শির-শির করছে। আমার চায়ের অভ্যেস নেই বলে বোধহয়।

ক্লিয়া : সে জন্য নয়। এতে খানিকটা মাদকতা আছে।

শঙ্কর : (চমকে) তার মানে—এটা—

ক্লিয়া : (হেসে) না। ভয় নেই। আপনারা যাকে মদ বলেন, এ তা নয়।

শঙ্কর : কিন্তু, কেমন যন—নেশার মতোই লাগছে। পুজোর সময়ে সিদ্ধির শরবৎ খেয়েছি—খানিকটা সেইরকম।

ক্লিয়া : সেইরকম ভালো লাগবে, কিন্তু ক্ষতিকর কিছুই এতে নেই। বিশ্বাস করতে

পারেন। পরে কোনো শারীরিক অস্বস্তিও একেবরেই হবে না—যেরকম আপনাদের মদে বা সিদ্ধিতে হয়ে থাকে।

[ক্লিয়া নিজের পাত্রের জন্য হাত বাড়ালো। তার কব্জিতে একটা দাগ দেখতে পেলো শঙ্কর।]

শঙ্কর : ওটা কিসের দাগ?

[ক্লিয়া চট করে পাত্র নিয়ে হাত টেনে নিলো। এই প্রথম যেন তাকে একটু অপ্রস্তুত হতে দেখা গেলো।]

ক্লিয়া : কী?

শঙ্কর : আপনার কব্জিতে ঐ দাগটা—লম্বা কাটা দাগের মতো?

ক্লিয়া : ও কিছু না। এমনি একটা কাটা দাগ।

শঙ্কর : না, মানে—ওমেরী—ইয়ে, মিস্টার ওমেরীরও ডান হাতের ঠিক ঐখানটায়—প্রথম দিনেই দেখেছিলাম—অবিকল ঐরকম একটা দাগ—

ক্লিয়া : (প্রায় লজ্জিত) ওটা একটা টিকের দাগ। একরকম রোগের প্রতিষেধক। আমাদের সবাইকে আসবার আগে এই টিকে নিতে হয়েছে।

শঙ্কর : কী রোগ?

ক্লিয়া : ছেড়ে দিন ও কথা।

[ক্লিয়া তার হাতের পাত্র থেকে দীর্ঘ এক চুমুক খেলো। শঙ্করও খেলো। ক্লিয়া আবার খেলো।]

শঙ্কর : আমি বড়ো বেশি প্রশ্ন করে ফেলেছি। আপনি বোধহয় ভাবছেন—লোকটা আচ্ছা অভদ্র তো—

ক্লিয়া : না শঙ্করবাবু। আমি তা মোটেই ভাবিনি। আপনার একটা প্রশ্নও অন্যায় প্রশ্ন নয়। আমার উত্তর দিতে না পারাটাই অন্যায় বরং। আমি তার জন্য ক্ষমা চাইছি।

শঙ্কর : না না, ছি ছি—কী বলছেন? উত্তর দিতে ইচ্ছে না থাকলে দেবেন কেন?

ক্লিয়া : আমাব ইচ্ছের প্রশ্ন নয় শঙ্করবাবু। উত্তর দিতে বাধা আছে।

[ক্লিয়া আবার চুমুক দিলো কায়লিনের পাত্রে]

শঙ্কর : আমাকে বারণ করে আপনি যে অতো তাড়াতাড়ি খাচ্ছেন?

ক্লিয়া : (হেসে) এ প্রশ্নটার নির্ভয়ে উত্তর দিতে পারি। আমার অভ্যেস আছে। একটু বেশিই অভ্যেস আছে—নেশা বলতে পারেন।

[শঙ্কর হেসে এক চুমুক খেলো। চুলের মধ্যে একবার হাত চালালো। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো।]

শঙ্কর : আমার—আমার খুব হাল্কা লাগছে। চারিদিকটা মনে হচ্ছে যেন ভাসছে। হাওয়ায় ভাসছে।

[শঙ্কর পাত্র তুলে মুখে দিতে গেলো। ক্লিয়া তার হাতের উপর হাত রেখে বাধা দিলো। শঙ্করের হাত শিউরে উঠে স্থাণু হয়ে গেলো। তার বিস্মিত চোখ ক্লিয়ার হাতের দিকে। ক্লিয়া শঙ্করের হাত থেকে আলগোছে পাত্রটি নিয়ে নামিয়ে রাখলো। শঙ্কর হাত নামাতে ভুলে গেলো, হাত যেন অবশ হয়ে গেছে ক্লিয়ার স্পর্শে। ক্লিয়ার মুখে একটা গভীর সহানুভূতির ছায়া।]

ক্লিয়া : শঙ্করবাবু।

[হঠাৎ সুরেশ্বরের উচ্চস্বর বাইরে থেকে এসে ঘরের স্বপ্ন খান খান করে দিলো]

সুরেশ্বর : (নেপথ্যে) কবিরাজ!

শঙ্কর : (চমকে) কে?

সুরেশ্বর : (নেপথ্যে) কবিরাজ?

শঙ্কর : সুরেশ্বর।

ক্লিয়া : আপনার—বন্ধু?

শঙ্কর : হ্যাঁ, বাল্যবন্ধু।

ক্লিয়া : কবিরাজ কেন?

শঙ্কর : সুরেশ্বর আমাকে কবিরাজ বলে। আমি ডাক্তারি পড়ি অথচ কবিতা ভালোবাসি—তাই।

সুরেশ্বর : (নেপথ্যে) কবিরাজ!

শঙ্কর : (ব্যস্ত হয়ে উঠে) তা—আপনি—

ক্লিয়া : (উঠে) আমি যাচ্ছি—

শঙ্কর : কিন্তু—

ক্লিয়া : (হেসে) আবার আসবো।

[পানপাত্র দু'টি নিয়ে ক্লিয়া চলে গেলো। শঙ্কর বারান্দায় গেলো।]

শঙ্কর : (চেঁচিয়ে) আয়। উঠে আয়।

[শঙ্কর ভিতরে এলো। উৎকণ্ঠিতভাবে চেয়ার ঘুরিয়ে বসালো, খুঁজতে লাগলো—ক্লিয়ার উপস্থিতির আর কোনো সাক্ষ্য আছে কিনা। সুরেশ্বর এলো।]

আয় আয়, বোস। আজ সকালেই পৌছেছিস?

সুরেশ্বর : না। কাল।

শঙ্কর : কাল এলি না কেন তবে?

সুরেশ্বর : আমার মুখ তো তুই কলকাতায় প্রায় রোজই দেখিস। কাল মোহনপুরের লোকদের শ্রীমুখ দেখাচ্ছিলাম।

শঙ্কর : তুই বললি ষষ্ঠীপুজোর আগে আসবি না—

সুরেশ্বর : কারণ আছে বৎস, কারণ আছে। যখন আসবো না বলেছি, তখনো কারণ ছিল, যখন এসেছি, তখনো বিশেষ কারণে এসেছি।

শঙ্কর : কী কারণ?

সুরেশ্বর : উঁহু। অতো সহজে বলে ফেললে ফুরিয়ে যাবে। বিরাট কারণ—রয়ে-সয়ে বলতে হবে। আপাতত এটা ধর।

[হাতের মোটা বইটা শঙ্করকে দিলো]

শঙ্কর : কী এটা?

সুরেশ্বর : ব্রাউনিং। তোর জন্য এনেছি।

শঙ্কর : আমার জন্যে? সে কী রে? এ তো খুব দামী বই মনে হচ্ছে—

সুরেশ্বর : ব্রাউনিং খুব দামী কবি।

শঙ্কর : না, কিন্তু তুই এতো খরচা করে—

সুরেশ্বর : আমি এখন চাকরি করি, ভুলে গেছিস?

শঙ্কর : তাই বলে—আমাকে?

সুরেশ্বর : দেখ, ডাক্তার শেলী কীট্‌স পড়ে, দেখেছি মধ্যে মধ্যে। কিন্তু মিল্টন, শেক্সপীয়ার, এমন কি চসার পর্যন্ত পেলে পড়ে ফেলে—এমন ডাক্তার বিরল।

শঙ্কর : (হেসে) প্রথমত, আমি ডাক্তার এখনো হইনি। দ্বিতীয়ত, ইংরেজি কাব্যের ভূত আমার ঘাড়ে চাপিয়েছিস—তুই নিজে।

সুরেশ্বর : সেইজন্যেই তো খরচা করে ব্রাউনিং কিনতে হোলো। মর‍্যাল ওবলিগেশন। হ্যাঁরে, তোর এখানে চায়ের ব্যবস্থা আছে?

শঙ্কর : না।

সুরেশ্বর : তুই অ্যাদ্দিন কলকাতায় থেকেও মানুষ হলি না। টী বোর্ডের প্রচারের দৌলতে পাড়াগাঁয়ে পর্যন্ত চা খাচ্ছে আজকাল।

শঙ্কর : দাদার ওখানে ব্যবস্থা আছে, যাবি?

সুরেশ্বর: যাবো। যথাসময়ে যাবো। তার আগে অনেক প্রশ্ন আছে।

শঙ্কর : কী প্রশ্ন?

সুরেশ্বর : প্রথম প্রশ্ন—উনি কে?

শঙ্কর : (থতমত খেয়ে) কে?

সুরেশ্বর : শঙ্কর, বাংলায় একটা প্রবাদ আছে— The right thing is to sink and then drink water.

শঙ্কর : কী বাজে বকছিস?

সুরেশ্বর : কবিরাজ কবিরাজ বলে চেঁচাচ্ছিলাম ঊর্ধ্বমুখী হয়ে। সাড়াই নেই। হঠাৎ দেখি—"Behold, the east! And Juliet is the sun!"

শঙ্কর : তুই তো সর্বত্রই জুলিয়েট দেখিস!

সুরেশ্বর : দেখি আর কই? খুঁজি বলতে পারিস।

শঙ্কর : তোর সেই ব্রাহ্ম মহিলার সঙ্গে আলাপ কদ্দুর এগুলো?

সুরেশ্বর : কথা ঘোরাচ্ছো বৎস? বাংলায় আরো একটা প্রবাদ আছে— Fish cannot he covered by spinach.

শঙ্কর : আরে fish থাকলে তো ঢাকার প্রশ্ন উঠবে।

সুরেশ্বর : নেই মানে? মৎসকন্যা—স্বচক্ষে দেখেছি বৎস। বারান্দার পাঁচিলের জন্যে মাছের ল্যাজটা দেখা গেলো না।

শঙ্কর : ও, ঐ বারান্দা দিয়ে যেতে দেখেছিস তো? তাই বল। ও ঐ ভাড়াটেদের একজন, নিচে গিয়েছিলো বোধহয়।

সুরেশ্বর : নিচে?

শঙ্কর : হ্যাঁ, রান্নাঘর তো নিচে—

সুরেশ্বর: রান্নাঘর?

শঙ্কর : হ্যাঁ, কলও নিচে তো—

সুরেশ্বর : কল?

শঙ্কর : হ্যাঁ, মানে জলের কল।

সুরেশ্বর : অর্থাৎ আমাকে বলছিস—oil your own spinning wheel?

শঙ্কর : যাঃ। তুই একেবারে—

সুরেশ্বর : বুঝেছি। তোমার stomach থেকে কথা বার করতে সময় লাগবে। তবে আমার কাহিনীটা আগে শোনাই।

শঙ্কর : তাই শোনাও। আমার কোনো কাহিনী নেই।

সুরেশ্বর : আচ্ছা, সে দেখা যাবে। আপাতত শোনো। ভালো করে খাটটা চেপে ধরো। মূর্ছা যেও না। আমি—বিলেত যাচ্ছি।

শঙ্কর : (লাফিয়ে উঠে) বিলেত! বলিস কী? কবে?

সুরেশ্বর : তিন মাসের মধ্যে।

শঙ্কর : আই. সি. এস. পড়তে?

সুরেশ্বর : আই. সি. এস.।

শঙ্কর : সুরেশ্বর, তুই—কিন্তু তুই যে বলছিলি, তোর বাবা—

সুরেশ্বর : হ্যাঁ, গত বছর অবধিও ভাবতে পারেননি বাবা। কিন্তু এই বছরে অভ্রের চালানে নাকি এতো লাভ হয়েছে—এই দু'দিন আগে, চিঠিতে সব লিখেছিলেন বাবা। চিঠি পেয়েই ছুটে চলে এলাম।

শঙ্কর : সত্যি, সুরেশ্বর—আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে। তোর এতোদিনের ইচ্ছে—

সুরেশ্বর : শোন। পরীক্ষা দিয়েই তোর কিন্তু যাওয়া চাই।

শঙ্কর : যাঃ। আমি কী করে যাবো?

সুরেশ্বর : শিবুদা চেষ্টা করলে—মোহনপুরের সব কারবারই এখন খুব জমজমাট।

শঙ্কর : তা হলেও—

সুরেশ্বর : শুনছিলাম—এ বাড়িটা না কি ভালো দামে বিক্রি হবার কথা আছে?

শঙ্কর : কোত্থেকে শুনলি?

সুরেশ্বর : অনিল বলছিলো। কাল অনিলের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো।

শঙ্কর : (চিন্তিতভাবে) হ্যাঁ, কিন্তু—আশা কম।

সুরেশ্বর : যদি বিক্রি হয়, যাবি তো?

শঙ্কর : জানি না। যেতেও পারি। দাদার মনে মনে ইচ্ছে আছে জানি। কিন্তু—

সুরেশ্বর : তুই pessimistic হয়ে যাচ্ছিস আজকাল। আশাবাদী হ। মোহনপুরের এখন দারুণ দিনকাল। শুনিসনি? When খোদা gives, He gives by piercing ছপ্পড়?

[দু'জনে হেসে উঠলো। আলো নিভে গেলো। শঙ্করের কণ্ঠস্বর]

শঙ্করের কণ্ঠস্বর : সুরেশ্বরের স্ফূর্তি বরাবরই সংক্রামক। তাহার উপর বিলাতযাত্রার সংবাদ আর কায়লিনের প্রভাব। একেবারে যেন মাতিয়া উঠিলাম। বিলাতে দুইজনে কী করিব না করিব এই কল্পনায় সব কিছু ভুলিয়া রহিলাম অনেকক্ষণ। যেন বাড়ি বিক্রয়ের সমস্যা চুকিয়া গিয়াছে, জাহাজে চড়িয়া রওনা হইয়াছি, ওদিকে লন্ডনে বসিয়া সুরেশ্বর উদ্গ্রীব প্রতীক্ষায় আমার অবতরণের দিন গুণিতেছে।

অবশেষে সুরেশ্বর চলিয়া গেলো। ধীরে ধীরে বাস্তবে ফিরিলাম। বাড়ি বিক্রয় করিতে হইলে ভাড়াটিয়াদের তাড়াইতে হইবে। ক্রিয়াকে তাড়াইতে হইবে। ক্রিয়া।

ক্লিয়া আবার আসিল। কায়লিন লইয়া। আবার কথা আরম্ভ হইল। কতো কথা। কায়লিনের নেশায়, ক্লিয়ার কণ্ঠস্বরের নেশায় আস্তে আস্তে ডুবিতে লাগিলাম।

[আলো ফুটে উঠলো। শুধু খাটের কাছটায়, বাকি ঘরটা যেন ছায়ায় ভেসে আছে। খাটে অর্ধশয়ান শঙ্কর, বড়ো চেয়ারে ক্লিয়া। দু'জনেরই হাতে কায়লিনের পাত্র, মুখে আবেশ।]

ক্লিয়া : শঙ্করবাবু।

শঙ্কর : কী?

ক্লিয়া: আপনার ভালো লাগছে?

শঙ্কর : হ্যাঁ। (যেন আপন মনে) খুব ভালো লাগছে। অসম্ভব ভালো লাগছে। এই পৃথিবীতে এতো ভালো লাগা যে সম্ভব—আমি জানতাম না।

[আলো মিলিয়ে গেলো ধীরে ধীরে। অন্ধকারে আবার শঙ্করের কণ্ঠস্বর।]

শঙ্করের কণ্ঠস্বর : পরের দিন। আরো একদিন। আরো সাত দিন। দিনগুলি যেন এক ঘোরের মধ্যে কাটিতে লাগিল। বাড়ি যাই, বৌদির সঙ্গে কথা বলি, খুকি-পল্টুর সঙ্গে খেলা করি, দাদার প্রশ্নের আজেবাজে জবাব দিই, অনিলের সঙ্গে, সুরেশ্বরের সঙ্গে গল্প করি—কিন্তু সব সময়ে, প্রতিটি মুহূর্তে, মন যেন অন্য এক জায়গায় পড়িয়া থাকে। ক্লিয়া কি আজ আসিবে? কখন আসিবে? যদি আজ না আসে? কাল?

[নেপথ্যে পূজার বাজনা ঢাকে বাজতে লাগলো]

পূজা আসিয়া গেল। চারদিন বাড়িতে কাটাইতে হইল। নিমন্ত্রণ রাখিতে হইল, বেড়াইতে হইল, গল্পগুজব স্ফূর্তি হল্লা করিতে হইল। ফাঁক পাইলেই এ বাড়িতে ছুটিয়া আসি। ক্লিয়ার দেখা পাই না। দরজায় তালা।

[বিসর্জনের বাজনা। আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেলো।]

পূজা কাটিয়া গেলো। দাদা বৌদির অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। উদগ্র প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম—কখন ক্লিয়া আসিবে।

[আলো ফুটে উঠলো। শঙ্কর বড়ো চেয়ারে, হাতে বই। হঠাৎ চমকে বারান্দার দিকে তাকালো। দরজা খুলছে। ক্যাঁ—চ। ক্লিয়ার হাত। ক্লিয়ার বাহু। ক্লিয়া। ঘরের দরজায়। শঙ্কর উঠে দাঁড়িয়েছে। ক্লিয়ার মুখে হাসি, আলোয় আলোয় আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। আরো উজ্জ্বল। তারপর সহসা অন্ধকার হয়ে গেলো। শঙ্করের কণ্ঠস্বর।]

ক্লিয়া আসিল। কায়লিন আনিল। নেশা আনিল। আবার পরদিন, আবার আর একদিন। আরও গল্প, আরও কায়লিন, আরও নেশা।

[আলো ফুটে উঠলো। শঙ্কর খাটে অর্ধশয়ান। ক্লিয়া বড়ো চেয়ারে। দু'জনের হাতে কায়লিনের পাত্র। দু'জনেরই চোখ আবিষ্ট।]

ক্লিয়া : শঙ্কর!

শঙ্কর : বলো।

ক্লিয়া : তোমার ভালো লাগছে?

শঙ্কর : হ্যাঁ। (অল্প থেমে) খুব ভালো লাগছে। অসম্ভব ভালো লাগছে—মনে হচ্ছে—মনে হচ্ছে এ ভালো লাগার জন্যে আমি মরতেও পারি।

[ক্লিয়া হঠাৎ শিউরে উঠে চোখ সরিয়ে নিলো]

ক্লিয়া : মরবার কথা এখন বোলো না শঙ্কর। এখনই বোলো না।

শঙ্কর : কেন?

[ক্লিয়া ধীরে ধীরে আবার শঙ্করের দিকে ফিরলো। শঙ্কর সচকিত হয়ে উঠে বসলো।] ক্লিয়া!

ক্লিয়া : বলো।

শঙ্কর : তোমার চোখে জল?

[ক্লিয়া বিষণ্ণ হাসলো। শঙ্করের চোখের সামনেই নিঃসঙ্কোচে চোখের জল মুছে নিলো। ভিজে হাতের দিকে চেয়ে রইলো—খানিকটা বিস্ময়ে, খানিকটা গর্বে।]

ক্লিয়া : হ্যাঁ, শঙ্কর। আমাদের দেশেও লোকে কাঁদে। কিন্তু সে শুধু ভালোর জন্য। গভীর আনন্দের, গভীর অনুভূতির অশ্রু। অপূর্ব সঙ্গীত শুনে, অপরূপ দৃশ্য দেখে—আমাদের চোখে জল আসে।

শঙ্কর : তোমার চোখে—এখন জল এলো কেন?

ক্লিয়া : (থেমে) এ আমার এক নতুন অনুভূতি শঙ্কর। এ অনুভূতির নাম জানতাম, রূপ জানতাম না। কোনোদিন জানতে পারতাম না, যদি এখানে এ সময়ে না আসতাম। যদি—যদি তুমি—এ বাড়িতে—এতো কাছে—না থাকতে।

শঙ্কর : (রুদ্ধশ্বাসে) কী নাম এই অনুভূতির?

[ক্লিয়া পূর্ণ দৃষ্টি রাখলো শঙ্করের মুখে। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিলো।]

ক্লিয়া : সহানুভূতি।

[শঙ্কর এ উত্তরের জন্যে রুদ্ধশ্বাস হয়নি]

শঙ্কর : সহানুভূতি?

ক্লিয়া : হ্যাঁ, শঙ্কর।

শঙ্কর : কার প্রতি সহানুভূতি?

ক্লিয়া : শঙ্কর, আর প্রশ্ন কোরো না!

শঙ্কর : আমার প্রতি?

ক্লিয়া : আমি অনেক কথা বলে ফেলেছি শঙ্কর। আর বলতে পারবো না। এই—এই কায়লিনের নেশা!

[ক্লিয়া পাত্র মুখে তুললো আবার]

শঙ্কর : (ঝুঁকে) তুমি আগে কখনো সহানুভূতি বোধ করোনি কারো জন্যে?

ক্লিয়া : কার জন্য করবো? আমাদের দেশে দুঃখ নেই। যন্ত্রণা নেই। সহানুভূতি কী করে আসবে? কার প্রতি আসবে?

শঙ্কর : (হঠাৎ তীব্র জিজ্ঞাসায়) ক্লিয়া, কোথায় তোমার দেশ?

ক্লিয়া : প্রশ্ন কোরো না শঙ্কর, আমার বলবার উপায় নেই। আমাদের কারো বলার অধিকার নেই—

শঙ্কর : কী হবে বললে?

ক্লিয়া : বললে আর কোনোদিন আমাকে বেরোতে দেবে না দেশের বাইরে—

শঙ্কর : কে বেরোতে দেবে না?

ক্লিয়া : শঙ্কর, ও কথা থাক। অন্য কথা বলো। তোমার ভালো লাগছে?

শঙ্কর : বলেছি তো, এ ভালো লাগার জন্যে আমি—

ক্লিয়া : না না, ও কথা নয়। ও কথা নয়। এই নাও।

[ক্লিয়া শঙ্করের পাত্র এক হাতে তুলে ধরলো তার মুখে। অন্য হাত যেন পরম স্নেহে শঙ্করের কাঁধে জড়িয়ে রাখলো। শঙ্কর পান করলো।]

শঙ্কর : (নেশাগ্রস্তের মতো) আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। যাক। বুঝে দরকার নেই। প্রশ্নে দরকার নেই। আমি জানি তুমি এ জগতের মানুষ নও। কোন্ জগতের মানুষ—জানি না। জানতে চাই না আর। কী হবে জেনে? তুমি তো আছো। এখন আছো।

ক্লিয়া : হ্যাঁ, শঙ্কর। আমি আছি। এখন আছি।

[শঙ্করের নেশার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আলো খানিকক্ষণ আগে থেকেই ধোঁয়াটে রঙিন হয়ে উঠছিলো। সারা ঘর প্রায় অন্ধকার। শঙ্কর আর ক্লিয়া আবছা আলোয় ভেসে ছিল। এখন সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে গেলো। শঙ্করের কণ্ঠস্বর আবার।]

শঙ্করের কণ্ঠস্বর : ক্লিয়া ছিল। তখন ছিল। এখন নাই। (তীব্রস্বরে) কেন যে তখন কায়লিনের নেশায় ক্লিয়াকে ডুবাইয়া সমস্ত কথা ভিতর হইতে ছিঁড়িয়া বাহির করিয়া লই নাই, ভাবিলে এখন মনস্তাপের অন্ত থাকে না। সমগ্র মানবসমাজের কাছে আমার অনুরোধ—যদি কেহ কখনো ক্লিয়ার দেশের মানুষের সন্ধান পান—দেরি করিবেন না। আমার মতো নেশায় মজিয়া থাকিবেন না। সর্বনাশ যদি বন্ধ করিতে চান—দেরি করিবেন না। দেরি করিবেন না। (অল্প পরে) সেদিন আর কী কথা হইয়াছিল, মনে নাই। আর কী ঘটিয়াছিল, জানি না। শুধু মনে পড়ে—ওমেরীর কণ্ঠস্বর—যেন বহুদূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে।

[আলো ফুটে উঠলো। শঙ্কর বিছানায় শুয়ে। শিয়রে বসে আছে ক্লিয়া, তার হাত শঙ্করের কপালে। দরজার কাছে ওমেরী। তার পিছনে হারিয়ন।]

ওমেরী : ক্লিয়া। তুমি জানো—এ সব সম্পূর্ণ আইনবিরুদ্ধ।

হারিয়ন : তোমাকে কি এক মুহূর্ত ভরসা করে চোখের আড়াল করবার উপায় নেই?

ক্লিয়া : কী আসে যায়?—এখানে?

ওমেরী : কী আসে যায়? তুমি জানো না—যে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করাই বেআইনী? চুক্তিপত্রে সই করোনি তুমি আসবার আগে?

ক্লিয়া : কিন্তু ওমেরী—এখানে, এ ক্ষেত্রে, কী এসে যায় আমাকে বলতে পারো? তোমরা খুব ভালো করে জানো—এখানে কোনো ক্ষতি হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। জানো না?

ওমেরী ! আমি শুধু জানি—নিয়ম যখন আছে, মানতে হবে। তুমি নিয়ম ভাঙছো তোমার নিজের দায়িত্বে। যদি বিপদে পড়ো, আমার কাছ থেকে কোনো সাহায্য আশা কোরো না।

[ওমেরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। হারিয়নও। ঘরের আলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিকেলের আলো। ক্লিয়া শঙ্করের কপালে একবার হাত বুলিয়ে উঠতে গেলো, শঙ্কর হঠাৎ তার হাত চেপে ধরে বাধা দিলো।]

ক্লিয়া : (অল্প চমকে) তুমি জেগে আছো?

শঙ্কর : ওরা কী বলে গেলো ক্লিয়া?
ক্লিয়া : কিছু না। ও নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না।
শঙ্কর : কিসের হস্তক্ষেপ? কিসের ক্ষতি?
ক্লিয়া : কিছু না, কিছু না শঙ্কর। তুমি ভেবো না। ঘুমোও। আমি—আসি—
শঙ্কর : তুমি চলে যাচ্ছো?
ক্লিয়া : আবার আসবো।
[হঠাৎ ঝুঁকে আদরের ভঙ্গিতে শঙ্করের গালে একবার হাত রেখে ক্লিয়া পানপাত্র দু'টি হাতে নিয়ে দ্রুত চলে গেলো। বারান্দার দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। শঙ্কর ধীরে ধীরে উঠে বসলো। উঠে দাঁড়ালো। ঘোর আছে এখনো, কিন্তু অস্বস্তি নেই, ক্লান্তি নেই। বারান্দায় গেলো। বন্ধ দরজার দিকে তাকালো। অলসভাবে রেলিং-এ ঝুঁকে দাঁড়িয়েই চমকে উঠলো।]
শঙ্কর : (চেঁচিয়ে) এসো দাদা।
[তাড়াতাড়ি ঘরে এলো। বড়ো চেয়ারটা খাট থেকে দূরে অন্যদিকে ফিরিয়ে বসালো। বিছানাটা সমান করলো। টেবিলে একটা মোটা বই খুলে রাখলো। জানালা পার হয়ে দরজায় এলো শিবলাল।]
এসো—এসো।
শিব : (ঘরে ঢুকে) কী হয়েছে তোর বল তো?
শঙ্কর : কেন, কী?
শিব : খেতে গেলি নে যে?
শঙ্কর : খেতে? কেন, ক'টা বাজে?
শিব : পাঁচটা বেজে গেছে।
শঙ্কর : পাঁচটা?
শিব : তোর একটু দেরি হবে ভেবে আমি খেয়ে দোকানে চলে গেলুম। খুকি, পল্টু তখনো খেতে বসতে রাজি হোলো না। তারপর এইমাত্র তোর বৌদি খবর পাঠালো—তুই যাসনি।
শঙ্কর : না, হোলো কী—সকালে পড়তে বসে দেখলাম, বড়ো পিছিয়ে আছি। খুব চেপে না পড়লে পাস করা যাবে না। তাই—
শিভ : তাই খাওয়াটা বাদ দিতে হোলো।
শঙ্কর : না, যাতায়াতে অনেকখানি সময় যায় তো? আর—
শিব : বটে? যাতায়াতে সময় যায় তো তুই আমার সঙ্গে বাড়ি চল। এখানে থাকতে হবে না তোকে।
শঙ্কর : না না, তা কী করে হয়? এদিকে যে কিছুই এখনো—
শিব : এদিকে আর কিছু হবে না। আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি। আর—কী হবে লোভ করে, বল? ভগবান যা দিয়েছেন আজ অবধি, কম তো নয়? বাড়ি হয়েছে, দু'মুঠো জুটছে দু'বেলা, দেনা যা আছে ও শোধ হয়ে যাবে শিগগিরই, যদি মোহনপুরের এই মরশুম চলে—
শঙ্কর : কিন্তু দাদা—

শিব : না না, ঐ লোভের জন্যে তুই না খেয়ে-দেয়ে এখানে পড়ে থাকবি—সে দরকার নেই। যথেষ্ট হয়েছে।

শঙ্কর : দাদা, বাড়িতে আমার পড়াশুনো হবে না—

শিব : কেন হবে না? আমি তোর বৌদিকে বলে দেবো—খুকি, পল্টু যেন পড়ার সময়ে তোর ঘরে একদম না ঢোকে—

শঙ্কর : না না, খুকি-পল্টুর জন্যে নয়। আমি—আমার—দাদা, আমাকে ডাক্তারি পাস করতেই হবে।

শিব : নিশ্চয়ই করবি। বাড়িতে থেকে ডাক্তারি পাস করা যায় না বলতে চাস?

শঙ্কর : এখানে নিরিবিলিতে—

শিব : এখানে না খেয়ে-দেয়ে অসুখ-বিসুখ বাধালে পড়ার সুবিধে হবে? না না। তুই চল।

শঙ্কর : (শেষ অস্ত্র) দাদা, বড়িটা বিক্রি না হলে বিলেতে পড়ার কোনো আশাই যে থাকে না।

[শিব হঠাৎ চুপ করে গেলো]

শেষ অবধি চেষ্টা তো করতেই হবে? চেষ্টা করেও না হলে সে আলাদা কথা।

শিব : (দ্বিধাগ্রস্ত) কিন্তু তুই—

শঙ্কর : (তাড়াতাড়ি) দাদা, আমাকে এখানেই থাকতে দাও। আমি কথা দিচ্ছি, রোজ দু'বেলা ঠিক সময়ে খেতে যাবো। কথা দিচ্ছি।

শিব : তুই যদি ঐ কথা তুলিস, আমার কিছু বলবার থাকে না। তুই জানিস না, আমার কতো ইচ্ছে তুই নামকরা ডাক্তরা হোস।

শঙ্কর : জানি দাদা।

শিব : তোর রোজগারের জন্যে নয়। এ শুধু—আমার তো লেখাপড়া হোলো না বিশেষ! শুধু লোকের কাছে বুক ফুলিয়ে বলবার লোভ—আমার ভাই—

শঙ্কর : আমি জানি দাদা। আমি ঠিক পাস করবো, ভেবো না।

শিব : না, ও নিয়ে আমার ভাবনা নেই। আমি জানি, তুই পাস করবি। বিলেতেও—ধর যদি এ যাত্রায় বাড়িটা বিক্রি নাই হয়, পরে কোনোদিন—

শঙ্কর : না না, এ যাত্রাও চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা ছাড়লে চলবে কেন?

শিব : তুই যা ভালো বুঝিস।—কিন্তু এখন তো আসবি আমার সঙ্গে? তোর বৌদি ভাবছে।

শঙ্কর : চলো, যাচ্ছি।

[অন্ধকার হয়ে গেলো। শঙ্করের কণ্ঠস্বর।]

শঙ্করের কণ্ঠস্বর : মিথ্যা বলিলাম দাদাকে। প্রবঞ্চনা করিলাম। পড়াশুনা মাথায় উঠিয়াছে। ক্লিয়াকে বাড়ি হইতে বিদায় করার চেষ্টা কল্পনার অতীত। প্রবঞ্চনা করিলাম—শুধু ক্লিয়ার কাছে থাকিবার জন্য। যতোদিন থাকা যায়।

কিন্তু সে প্রবঞ্চনার জন্য দুঃখ নাই। দুঃখ এই—থাকিয়াও কেন কিছু করিলাম না? কেন নেশায় ভুলিয়া রহিলাম? কেন আমি—

কিন্তু সে কথা এখন থাক। দাদার সঙ্গে বাড়ি যাইবার পথে বাজারে গিয়াছিলাম।

দোকানে দাদার কাজ ছিল। আমি রাস্তায় অলসভাবে পায়চারি করিতেছিলাম। ক্লিয়ার চিন্তা মাথা হইতে বাহির হইতেছিল না।

সহসা প্রচণ্ড চমকাইয়া উঠিতে হইল। রাস্তার অন্যপাশে দাঁড়াইয়া এক ভদ্রলোক ফুল কিনিতেছেন। পাশে এক মহিলা। এক নজরে চিনিলাম—ক্লিয়ার দেশের মানুষ। কাপড় পরিবার ধরন, দাঁড়াইবার ভঙ্গি, অঙ্গ সঞ্চালন—সব কিছুতে সেই পরিমিত, সুন্দর, অসাধারণ ছন্দ। ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। ক্লিয়ার দেশের মানুষকে আমি হাজার লোকের ভিড়ের মধ্যে চিনিয়া বাহির করিতে পারি।

সেদিনকার আচ্ছন্ন নেশায় ক্লিয়ার দেশ সম্বন্ধে কৌতূহল স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল। বাজারে ইহাদের দেখিয়া সে কৌতূহল আবার তীব্র হইয়া উঠিল। এরা কারা? কোন্ দেশ হইতে দলে দলে মোহনপুরে আসিয়া জুটিতেছে? কেন জুটিতেছে? শুধু কি শহরের শোভা উপভোগ করিতে?

দলে দলে? মাত্র তো দু'জনকে দেখিলাম ক্লিয়াদের বাদ দিয়া? তবু দলে দলেই মনে হইল। কারণ ইহাদের দেখামাত্র বিদ্যুতের ঝলকের মতো একটি উপলব্ধি মনে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। যাহারা পঁচিশে অক্টোবরের মধ্যে বাড়ি কিনিতে চায় তাহারা নিশ্চয়ই—হ্যাঁ নিঃসন্দেহে, তাহারাও—ক্লিয়ার দেশের মানুষ। এতো নিশ্চিতভাবে অনুভব করিলাম যে, কয়েকদিন পরে দাদা যখন তাহাদের লইয়া আসিলেন, আশ্চর্য হই নাই।

[শঙ্করের কণ্ঠস্বর হঠাৎ থেমে গেলো। আলো ফুটলো। বিকেলের আলো। শিবলাল ঘরে ঢুকছে, সঙ্গে একজন মহিলা ও একটি পুরুষ। শঙ্কর দাঁড়িয়ে। মহিলাটি বয়স্কা, কিন্তু চেহারার বাঁধুনিতে প্রকৃত বয়স আন্দাজ করা দুষ্কর। মনে হয়, ভদ্রমহিলা চিরকাল নিজের ইচ্ছেমতো সব কিছু পেতে অভ্যস্ত। ভদ্রলোক শান্ত, অপেক্ষাকৃত তরুণ, সুপুরুষ। হাতে একটি ছোট চৌকো বাক্সের আকারের বস্তু। দু'জনেই নিঃসন্দেহে ক্লিয়া-ওমেরীর স্বজাতি।]

শিবলাল : আসুন—আসুন। এই আমার ভাই—শঙ্করলাল। কলকাতায় মেডিকেল কালেজে পড়ে, ফাইন্যাল ইয়ার। শঙ্কর, এঁরাই বাড়িটা কিনতে চাইছিলেন।

হলিয়া : (হেসে) কিনতে চাইছিলাম নয়, এখনো কিনতে চাই। (শঙ্করকে) আমার নাম হলিয়া। আমার ভাই ক্লেফ্। কথাবার্তা আরম্ভ করবার আগে একটা কথা জানতে চাই। আপনাদের অতিথিরা কেউ বাড়ি আছেন?

শঙ্কর : না। তিনজনেই বেরিয়ে গেছেন। সকালেই।

হলিয়া : ভালো কথা। (ক্লেফ্কে) ওটা তাহলে তুমি শঙ্করবাবুর কাছেই রেখে যাও। দেখা-সাক্ষাৎ এখন কম হওয়াই ভালো। (শঙ্করকে) আমরা শিবলালবাবুর কাছে সব কথা শুনলাম। বাড়ি আমাকে বিক্রি করতে আপনাদের আপত্তি নেই, শুধু ওদের কাছে আপনারা চুক্তিবদ্ধ, এই তো সমস্যা?

শিব : হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঠিক তাই! আমরা অনেক--

হলিয়া : আপনারা অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পঁচিশ তারিখের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দিতে ওরা রাজি নয়। এই তো?

শিব : আজ্ঞে হ্যাঁ; আজ তেইশ তারিখ হয়ে গেলো—

হলিয়া : সেই ব্যবস্থাটা যদি আমরা করে দিতে পারি, তাহলে আর কোনো সমস্যা থাকবে না তো?

শিব : না, তাহলে তো বেঁচে যাই।

শঙ্কর : কী ব্যবস্থা?

হলিয়া : ক্লেফ্।

[ক্লেফ্ হাতের বাক্সটা টেবিলে নামিয়ে পকেট থেকে একটা ছোট চৌকো রূপালি জিনিস বার করে হলিয়াকে দিলো]

এইটা বাড়ির কোনো জায়গায় খুব ভালো করে লুকিয়ে রেখে দিন, যাতে কিছুতেই খুঁজে না পাওয়া যায়। বারো ঘণ্টার মধ্যে আপনাদের অবাঞ্ছিত অতিথিরা আপনাদের মুক্তি দিয়ে যাবেন। আমি কালকেই পুরো টাকা চুকিয়ে বাড়ি কিনে নেবো।

শঙ্কর : (জিনিসটা হাতে নিয়ে) কী এটা?

হলিয়া : ওটা যাই হোক, ওতেই কাজ হবে।

শঙ্কর : যদি কোনো ক্ষতি—

হলিয়া : কারো কোনো ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই।

শঙ্কর : তবু এতে কী হবে, সেটা তো জানা দরকার?

হলিয়া : কেন শঙ্করবাবু? জেনে কী করবেন?

শিব : হ্যাঁ, ঠিক। কী দরকার শঙ্কর? যা বলছেন করলে যদি ঝামেলা চুকে যায়—

শঙ্কর : না দাদা, জানা দরকার বৈকি? যদি ধরো বোমা-টোমা কিছু হয়—

[হলিয়া হো হো করে হেসে উঠলো]

হলিয়া : বোমা? না না, ওরকম কুৎসিত কিছু নয়। তাছাড়া, বোমায় বাড়িটা উড়ে গেলে আমার কিনে লাভ কী শঙ্করবাবু?

শঙ্কর : বাড়ি না উড়ুক, কোনো লোকের যদি—

হলিয়া : যেখানে লোকে কখনো যায় না, সেখানে লুকিয়ে রাখুন। নিচের তলায় কোথাও।

শঙ্কর : কিন্তু—

শিব : না না শঙ্কর, অতো ভাববার কিছু নেই। এঁরা নিজেরা এসেছেন, বলছেন— আমরা তো কোনো ব্যবস্থাই করতে পারলাম না।

শঙ্কর : কিন্তু দাদা—

শিব : না না, আর কিন্তু নেই। দে, ওটা আমায় দে!

[শঙ্করের হাত থেকে বস্তুটা নিয়ে শিবলাল ছুটলো নিচে]

হলিয়া : আপনি তো এখানেই থাকেন?

শঙ্কর : হ্যাঁ।

হলিয়া : আমার একটা উপদেশ মানুন। আজ রাত্রে এখানে থাকবেন না।

শঙ্কর : কেন?

হলিয়া : থাকলে খুব ক্ষতি নেই। তবে দাদার বাড়িতে থাকলে আরামে থাকবেন।

শঙ্কর : আপনি কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আমার এসব—এসব ষড়যন্ত্র ভালো লাগছে না।

হলিয়া : (উচ্চহাস্যে) ষড়যন্ত্র করে যদি পঁচিশ হাজারে এই বাড়ি বিক্রি করা যায়, তাহলেও না?

[শঙ্কর চুপ করে গেলো]

(নরম স্বরে) শঙ্করবাবু, মিথ্যে ভয় করছেন। আমার কথা বিশ্বাস করুন, ঐ জিনিসটায় কারুর কোনো ক্ষতি হবে না।

[শঙ্কর কথা না বাড়িয়ে ঘরের আলো জ্বালালো]

শঙ্কর : একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

হলিয়া : নিশ্চয়ই। বলুন?

শঙ্কর : আপনারা কোন্ দেশ থেকে এসেছেন?

হলিয়া : সে নাম বললে আপনি চিনতে পারবেন না।

শঙ্কর : তবু শুনি?

হলিয়া : না শঙ্করবাবু, মাপ করবেন। ও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না।

শঙ্কর : আমি জানতাম। এ প্রশ্নের উত্তর আপনারা কেউ দেন না।

হলিয়া : (হেসে) ওদেরও প্রশ্ন করে দেখেছেন তাহলে?

শঙ্কর : হ্যাঁ, দেখেছি। আচ্ছা, আর একটা প্রশ্ন। আপনার হাতের ঐ কাটা দাগটা কিসের?

হলিয়া : (অপ্রস্তুত হেসে) একটা টিকে।

শঙ্কর : কী রোগের টিকে?

হলিয়া : সে একটা রোগ। আপনি নাম শোনেননি।

শঙ্কর : (স্থিরকণ্ঠে) ভূগোলে অবশ্য আমার জ্ঞান কম। কিন্তু আমি মেডিক্যাল কলেজের ফাইন্যাল ইয়ারের ছাত্র।

হলিয়া : হ্যাঁ, সে তো বললেন আপনার দাদা। বেশ কয়েকবার বললেন।

শঙ্কর : তবু মনে করেন আমি রোগটার নাম শুনলে বুঝবো না?

হলিয়া : (একটু থেমে) অনেক রোগ আছে যার এখনো কোনো নাম নেই। অর্থাৎ—

[শিবলাল ঘরে এলো]

শিব : ব্যস! লুকিয়ে ফেলেছি।

হলিয়া : ভালো করে লুকিয়েছেন তো?

শিব : ও এমন জায়গায় রেখেছি, তিনদিন খুঁজলেও পাবে না।

হলিয়া : তবে আর ভাবনা নেই—

[হঠাৎ সকলে চমকে উঠলো। সিঁড়ি থেকে ক্লিয়ার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। গান গাইছে ক্লিয়া—"come hider, love, to me"।]

ক্লেফ্ : ক্লিয়া?

হলিয়া : হ্যাঁ। ক্যান্টারবেরী ওর মাথা থেকে এখনো বেরোয়নি দেখছি।

[ক্লিয়া জানালায়]

ক্লিয়া : আরে! হলিয়া!

[ক্লিয়া দরজায় এলো]

ক্লেফ্! কী সৌভাগ্য আমাদের! শিবলালবাবু, নমস্কার। তারপর, মোহনপুরে কতোদিন তোমাদের?

[ক্লিয়ার কথার সুরে মনে হয় সম্পর্কটা সুবিধের নয়]

হলিয়া : (মধুর হেসে) কাল এসেছি। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম তোমাদের অভিনন্দন জানিয়ে যাই।

ক্লিয়া : কিসের অভিনন্দন?

হলিয়া : মোহনপুরের সেরা বাড়ি জোগাড় করে ফেলেছো।

ক্লিয়া : (তৃপ্ত হেসে) তোমরা কোথায় উঠেছো?

হলিয়া : আমাদের কি আর তোমাদের মতো কপাল ভাই? হিলটপ হোটেলে আছি।

শি :, শঙ্কর : (একসঙ্গে) হিলটপ হোটেল!

হলিয়া : হ্যাঁ, হিলটপ। আর আমাদের মতো লোকের ঐ যথেষ্ট। কী বলো ক্লিয়া?

ক্লেফ্ : ভালো কথা, ক্লিয়া। সেরিন এইটা পাঠিয়েছে তোমার জন্য।

[বাক্সটা তুলে ক্লিয়ার হাতে দিলো]

ক্লিয়া : (উৎসাহে) সেরিন! কতোটা করেছে তারপর?

ক্লেফ্ : বেশ খানিকটা। বললো—প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

ক্লিয়া : প্রায় শেষ? কী রকম লাগলো তোমার?

ক্লেফ্ : আশ্চর্য সৃষ্টি, কোনো সন্দেহ নেই। ষোলো'শ চৌষট্টি, বেশির ভাগ!

হলিয়া : ষোলো'শ চৌষট্টি? কোথায়?

ক্লিয়া : লন্ডন, আর কোথায় হতে পারে বলো?

হলিয়া : ও, হ্যাঁ হ্যাঁ! আমার ভাই সাল-তারিখ অতো মনে থাকে না, তা সেরিন এখানেও আসবে শুনেছিলাম?

ক্লিয়া : এখানে না এসে পারে?

ক্লেফ্ : (হেসে) হ্যাঁ, এমন সুযোগ সেরিন ছাড়বে?

[ক্লিয়া হঠাৎ সচেতন হয়ে শঙ্করের দিকে তাকালো]

ক্লিয়া : আপনাদের নিশ্চয়ই এ সব আলোচনা ভালো লাগছে না।

[শিবলাল অপরাধী বিবেক নিয়ে গোড়া থেকেই অস্বস্তিতে ছিল]

শিব : না—হ্যাঁ, কী হয়েছে? মানে, আপনারা—আমাকে যেতে হবে, সন্ধে হয়ে এলো—নমস্কার। ইয়ে—শঙ্কর, খেতে যাস, সময়মতো—

শঙ্কর : (হঠাৎ) দাদা, আমি—আজ রাত্রে আর যাবো না। আমার অনেক কাজ বাকি।

শিব : সে কী?

শঙ্কর : না দাদা, তুমি ভেবো না, আমি এখানেই খেয়ে নেবো।

শিব : (থেমে) আচ্ছা। কাল যাস কিন্তু দুপুরে।

শঙ্কর : হ্যাঁ, যাবো।

[শিবলাল চলে গেলো]

হলিয়া : আমরাও চলি। বাড়িটা খুব পেয়ে গেছো ক্লিয়া। আমি ছবি দেখেছি—'পরের' ছবি। আঁচড়টি পড়েনি। আশ্চর্য যোগাযোগ! লীজটা বেচবে না কি ক্লিয়া?

ক্লিয়া : (হেসে) তোমার মাথা খারাপ হয়েছে?

হলিয়া : যদি ভালো দাম পাও? ধরো—অভিষেকের সামনের সারি—

ক্লিয়া : কিছুতেই না। তাছাড়া, অভিষেকের ব্যবস্থা আমাদের করা আছে।

হলিয়া : তোমরা করিৎকর্মা লোক। যাক গে, ভেবে দেখো তবু। শঙ্করবাবুকে দিয়ে খবর পাঠাতে পারো, যদি মত বদলায়।

ক্লিয়া : কোনো সম্ভাবনা নেই হলিয়া। ও কথা ভুলে যাও।

হলিয়া : তবু বলে রাখলাম। চলি শঙ্করবাবু। আমার উপদেশটা মনে রাখবেন।

[হলিয়া আর ক্লেফ্ চলে গেলো]

ক্লিয়া : কী উপদেশ?

শঙ্কর : (একটু থেমে) কিছু না। তোমরা কী নিয়ে কথা বলছিলে?

ক্লিয়া : এমন কিছু নয়। দেশের খবরাখবর।

শঙ্কর : ওটা কী?

ক্লিয়া : (বাক্সটায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে) এ এক আশ্চর্য গভীর সৃষ্টি।

শঙ্কর : সৃষ্টি? ঐ বাক্সটা?

ক্লিয়া : এটা নয়। এটা একটা যন্ত্র। সেই অমর সৃষ্টিকে ধরে রাখবার, প্রকাশ করবার যন্ত্র।

শঙ্কর : গ্রামোফোন?

ক্লিয়া : হ্যাঁ, খানিকটা তাই। শুধু—থাক ও কথা। হলিয়ার এই বাড়িটার দিকে খুব নজর, না?

শঙ্কর : হ্যাঁ।

ক্লিয়া : কী বলছে ও?

শঙ্কর : (অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে) বাড়িটা কিনতে চাইছে।

ক্লিয়া : ও।

শঙ্কর : তোমাদের চুক্তির মেয়াদ ফুরোবার আগেই কিনতে চায়।

ক্লিয়া : তাই তো চাইবে।

শঙ্কর : কেন বলতে পারো?

ক্লিয়া : না শঙ্কর।

শঙ্কর : তার মানে—বলবে না?

[ক্লিয়া চুপ করে রইলো]

(আপন মনে) অনেক টাকা দেবে বলেছে। টাকাটা—দাদার খুব দরকার।

[ক্লিয়ার চোখে গভীর সহানুভূতি]

বিক্রি না হলে—দাদা খুব দমে যাবেন।

ক্লিয়া : (ধীরে ধীরে) বিশ্বাস করো শঙ্কর--তোমাদের—কিছু আসবে যাবে না। শেষ অবধি। বিশ্বাস করো।

শঙ্কর : আমি তোমার কথা—তোমাদের কথা—এক বর্ণ বুঝতে পারি না ক্লিয়া!

ক্লিয়া : আমি কায়লিন নিয়ে আসি।

[শঙ্কর কিছু বলবার আগেই ক্লিয়া চলে গেলো। শঙ্করের মাথায় সেই ছোট রূপোলি বস্তুটার চিন্তা। শঙ্করের কণ্ঠস্বর।]

শঙ্করের কণ্ঠস্বর : ক্লিয়া কায়লিন আনিতে গেলো। কায়লিন আর স্পর্শ করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, কিন্তু বারণ করিবার সময় পাইলাম না। আমার মনে তখন

একটিমাত্র চিন্তা—সেই ছোট রূপালি বস্তু। কী বস্তু জানি না, কিন্তু ভয়াবহ কিছু, এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। (শঙ্কর অস্থিরভাবে সারা ঘর ঘুরছে) ইহারা কোন্ দেশের লোক জনি না, জানিবার উপায় নাই। কিন্তু নিশ্চয়ই সে দেশ আমাদের তুলনায় অনেক অগ্রসর। হয়তো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে ইংরাজ বা জার্মানদের অপেক্ষাও অগ্রসর। ক্লিয়াকে বলিব? না। দাদা বিপদে পড়িবেন, দাদাই তো বস্তুটি লুকাইয়া রাখিয়াছেন। আমাকেই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। (শঙ্কর পায়চারি থামিয়ে দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়ালো) যেমন করিয়া হোক খুঁজিয়া বাহির করিয়া বাড়ি হইতে দূরে ফেলিয়া দিতে হইবে। যেমন করিয়া হোক।

[শঙ্কর প্রায় ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে চলে গেলো। এক মুহূর্ত পরে ক্লিয়া এলো, হাতে পানপাত্র।]

ক্লিয়া : শঙ্কর।

[পাত্র দু'টি রেখে বারান্দায় গিয়ে দেখলো। ফিরে এসে বসলো। তারপর উঠে টেবিলে রাখা যন্ত্রটার কাছে এলো। হাত দিলো আস্তে আস্তে। অন্ধকার হয়ে গেলো। শঙ্করের কণ্ঠস্বর।]

শঙ্করের কণ্ঠস্বর : অনেক খুঁজিলাম। পাইলাম না। কী জানি হয় তো সন্ধানে যথেষ্ট মনোযোগ ছিল না। দাদার কথা ভাবিতেছিলাম। অনেক কথা ভাবিতেছিলাম। ক্লিয়ার কথা, ক্লিয়ার গানের কলি, ক্লেফ্ ও ক্লিয়ার দুর্বোধ্য কথাবার্তা, কায়লিন, পঁচিশ হাজার, ক্যান্টারবেরী, কলেজের পরীক্ষা, বিলাত, কব্জির কাটা দাগ—কতো কথা যে তালগোল পাকাইয়া মস্তিষ্কে নাগরদোলার চর্কিপাক খাইতেছিল, তার হিসাব নাই। সেই চর্কিপাকে যে দোতলা হইতে ভাসিয়া আসা সুর মিশিয়াছে—খেয়াল করি নাই।

[শঙ্করের কণ্ঠস্বরের শেষ দিকে এক অদ্ভুত ঐকতানের ঝঙ্কার আরম্ভ হয়েছে। তার ছন্দ সুর কিছুই পরিচিত সঙ্গীতের সঙ্গে মেলে না। আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। শুধু বাজনা নয়, তাব সঙ্গে নানারকম শব্দের তরঙ্গ, নানারকম কণ্ঠস্বর মিশে আছে। সব মিলিয়ে যেন এক প্রচণ্ড সর্বব্যাপী যন্ত্রণার আর্তি।]

আশা ছাড়িয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছিলাম, সেই ভীষণ সঙ্গীতের ঝঙ্কার প্রায় টলাইয়া দিলো। এ কি সঙ্গীত? না, আর্ত চিৎকার?

ঘরের দরজায় আসিয়া থামিয়া দাঁড়াইলাম। ঘরের বাতি ক্লিযা নিভাইয়া দিয়াছে। নতুন পাওয়া যন্ত্রটির কাছে বসিয়া তন্ময় হইয়া সেই ভয়াবহ ঐকতানে ডুবিয়া আছে। সামান্য এক আলোয় তাহাকে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ধীরে ধীরে আসিয়া ক্লিয়ার পাশে দাঁড়াইলাম। তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

জানালাটা যেন আর নাই। দেওয়ালটাও অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে এক কুয়াশার কুণ্ডলীতে। সে কুণ্ডলী যেন অসংখ্য সচল ছায়ামূর্তির আকার। স্পষ্ট ছবি নয়—শুধু আকার। গতিশীল আকার একের পর এক কুয়াশার গতিশীল কুণ্ডলীতে ভাঙিয়া গড়িয়া পাক খাইয়া, শব্দের সঙ্গীতের আর্তনাদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া এক সর্বব্যাপী চরম সর্বনাশ ফুটাইয়া তুলিতেছে। আর সেই

সর্বনাশের কুণ্ডলীপাকে সমগ্র মানবের বেদনাবিদ্ধ ছটফটানি, যন্ত্রণাবিকৃত আর্ত চিৎকার—ছায়ানৃত্যে-শব্দে-সঙ্গীতে মূর্ত হইয়া এক কালান্তক ধ্বংসের সর্বগ্রাসী ভীষণতায় পৃথিবী ডুবাইতে বসিয়াছে।

আর—সেই সর্বনাশা শব্দদৃশ্য তন্ময় হইয়া উপভোগ করিতেছে—ক্লিয়া! ক্লিয়া! অমর শিল্পীর অমর সৃষ্টির আবেদনে মুগ্ধ সমঝদার—ক্লিয়া!

[শব্দ-সঙ্গীতের ঝঙ্কার ক্রমেই উচ্চগ্রামে উঠে চলেছে, শঙ্করের কণ্ঠস্বরও তীব্রতর হয়ে উঠেছে মাত্রা রেখে। সব শেষে শঙ্করের আর্ত চিৎকার যেন শব্দ-সঙ্গীতেরই চবম ঝঙ্কার হয়ে বেজে উঠলো। তারপরেই আকস্মিক নীরবতা। আলো ফুটে উঠলো। টেবিলের কাছে নতজানু শঙ্করের শক্তিহীন দেহ তুলে ধরবার চেষ্টা করছে ক্লিয়া।]

ক্লিয়া : শঙ্কর! শঙ্কর! শঙ্কর!

[শঙ্করের মূর্ছিতপ্রায় দেহকে কোনোরকমে চেয়ারে বসিয়ে ক্লিয়া তার মুখে কায়লিনের পাত্র তুলে ধরেছে।]

শঙ্কর! এই নাও! নাও! শঙ্কর!

[পর্দা বন্ধ হয়ে গেলো]

তৃতীয় অঙ্ক

[শঙ্কর সেই চেয়ারেই বসে। ক্লিয়ার হাতের পানপাত্র তার মুখে। দীর্ঘ কয়েকটি চুমুক দিয়ে শঙ্কর মাথা তুললো।]

ক্লিয়া : শঙ্কর? ভালো বোধ করছো?

[শঙ্কর ঘাড় নাড়লো, তারপর, উঠে দাঁড়ালো।]

উঠো না!

[শঙ্কর খাটে গিয়ে বসলো দু'হাতে মাথা রেখে। ক্লিয়া দু'টি পানপাত্র নিয়ে শঙ্করের কাছে গেলো।]

শঙ্কর!

[শঙ্কর মাথা তুললো]

আর একটু খাবে?

শঙ্কর : না।

[ক্লিয়া শঙ্করের পাত্র নামিয়ে রাখলো। নিজের পাত্র মুখে নিয়ে অনেকখানি খেলো। তারপর বসলো শঙ্করের কাছে, বড়ো চেয়ারে।]

(বাক্সটা দেখিয়ে, ভাঙা গলায়) এই—সেই সৃষ্টি?

ক্লিয়া : (আড়ষ্ট কণ্ঠে) আমার অন্যায় হয়েছে শঙ্কর। তুমি ফিরে আসতে দেরি করছিলে। আমি—আমি লোভ সামলাতে পারলাম না। ভাবলাম—একটু দেখি—সেরিনের নতুন রচনা। তারপর আরম্ভ করে ডুবে গেছি, একবারে খেয়াল নেই।

শঙ্কর : এ কী—ক্লিয়া? সেরিনের এই সৃষ্টি? এ কিসের প্রকাশ?

ক্লিয়া : সেরিন চায়—সারা পৃথিবীর, সমস্ত মানুষের, যুগে যুগে—শঙ্কর! তুমি জানো—বলবার আমার উপায় নেই।

[শঙ্করের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ক্লিয়ার পানপাত্র তুলে তার মুখের কাছে ধরলো।]

শঙ্কর : আচ্ছা, বোলো না। এই নাও।

[ক্লিয়া হাসলো। পান করলো। আবার শঙ্কর পানপাত্র তার হাতে দিয়ে উঠে জানলার কাছে গেলো। ক্লিয়া চেয়ারে এলিয়ে বসে আছে।]

এবারকার শরৎ ভারি সুন্দর, না?

ক্লিয়া : (অর্ধনিমীলিত চোখে) অপূর্ব! (পান করলো)

শঙ্কর : এমন সুন্দর শরৎ বোধহয় কখনো কোথাও হয়নি।

ক্লিয়া : না, সব মিলিয়ে এতো ভালো সময়—খুব কম এসেছে।

শঙ্কর : ভালো সময়! সময়! তোমার কায়লিন খুব ভালো লাগে, না ক্লিয়া?

[ক্লিয়া হেসে আবার পান করলো]

তোমার কায়লিন খাওয়া দেখতে আমার খুব ভালো লাগে।

ক্লিয়া : (আর এক চুমুক খেয়ে) তুমি কোথায়?

শঙ্কর : তোমার পেছনে।

[ক্লিয়া হাত তুলে ধরলো। শঙ্কর এগিয়ে এসে দু'হাতে হাতটা ধরলো। ক্রিয়া আবার পান করলো।]

ক্লিয়া : তুমি খাবে না?

শঙ্কর : দাও।

[ক্লিয়া অন্য হাতে পাত্রটা তুলে শঙ্করকে দিলো। শঙ্কর হাতে রাখলো, কিন্তু খেলো না। ক্লিয়া আর এক চুমুক খেলো।]

ক্লিয়া?

ক্লিয়া : উঁ?

শঙ্কর : তোমার ভালো লাগছে?

[ক্লিয়া হাসলো]

ক্লিয়া : আমি তো ভালো লাগাবার জন্যই এখানে এসেছি। তোমার ভালো লাগছে?

শঙ্কর : (থেমে) না।

[ক্লিয়া উঠে বসে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো]

ক্লিয়া : কেন শঙ্কর?

শঙ্কর : আমি বুঝতে পারছি না বলে। তুমি বলছো না বলে।

[ক্লিয়া আবার সামনের দিকে তাকালো। শঙ্করের হাতে চাপ দিলো একবার।]

ক্লিয়া : আমার বলতে ইচ্ছে করে শঙ্কর। কিন্তু নিয়ম নেই যে। একেবারে নিয়ম নেই।

শঙ্কর : কিসের নিয়ম?

ক্লিয়া : শঙ্কর, প্রশ্ন কোরো না।

[শঙ্কর হঠাৎ ক্লিয়ার হাত ছেড়ে দিয়ে টেবিলের কাছে গেলো। উৎকণ্ঠিত ক্লিয়া উঠে

বসে তাকালো।]

শঙ্কর!

[শঙ্কর ফিরলো। ক্লিয়া হঠাৎ হেসে দু'হাত বাড়িয়ে দিলো। গেয়ে উঠলো সেই এক কলি বিচিত্র গান।]

Come hider, love, to me !

[শঙ্কর হঠাৎ চমকে উঠলো। শঙ্করের কণ্ঠস্বর।]

শঙ্করের কণ্ঠস্বর : এক ধাক্কায় স্মৃতির রুদ্ধদ্বার খুলিয়া গেলো। ক্যান্টারবেরী মাথা হইতে বিদায় হয় নাই। সেরিনের সৃষ্টির ভীষণতায় চাপা পড়িয়াছিল সাময়িকভাবে। ক্লিয়ার গানের ঐ বিচিত্র কলি সহসা যেন বিদ্যুতের আলোয় অনেক কিছু পরিষ্কার করিয়া তুলিল। কিন্তু সে—সে যে বড়ো অসম্ভব! অবিশ্বাস্য!

ক্লিয়া : (আবার গেয়ে) Come hider, love,to me.

[শঙ্কর আবার ক্লিয়ার পিছনে এসে তার হাত ধরলো। পানপাত্র তুলে দিলো মুখে। ক্লিয়া পান করলো]

শঙ্কর : (স্থির কণ্ঠে) ক্যান্টারবেরীর শরৎ কি এর চেয়েও সুন্দর ক্লিয়া?

ক্লিয়া : (আবিষ্ট সুরে) ক্যান্টারবেরীতে শরৎ নয়, বসন্ত। হিমেল হাওয়া, কিন্তু উজ্জ্বল। কী উজ্জ্বল দিনগুলি! কচি পাতায় সবুজ হয়ে উঠেছে ধূসর গাছের মাথা। আর রঙ। ফুলের রঙ। রঙের ছড়াছড়ি।

শঙ্কর : আর গান?

ক্লিয়া : হ্যাঁ, গান। সমস্ত লোকের মুখে ঐ নতুন গান।

শঙ্কর : নতুন?

ক্লিয়া : Come hider, love, to me.

[শঙ্কর ক্লিয়ার হাত ছেড়ে অন্যদিকে চলে গেলো। তার চোখ বিভ্রান্ত। উত্তেজিত।]

শঙ্কর!

[শঙ্কর ক্লিয়ার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো]

শঙ্কর : কবে ঐ গানটা শুনেছো ক্লিয়া? কবে—কোন সালে ঐ গানটা নতুন ছিল? লোকের মুখে মুখে ফিরতো?

ক্লিয়া : (ঘোর কাটছে) শঙ্কর!

শঙ্কর : গানটা আমি চিনি ক্লিয়া। আমি জানি কবে ঐ গান নতুন ছিল। ক্যান্টারবেরীর বসন্ত। চসারের পার্ডনার ঐ গান গেয়েছে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে। তুমি ক্যান্টারবেরী কবে গিয়েছিলে ক্লিয়া? কবে? কোন্ সালে?

ক্লিয়া : (উঠে দাঁড়িয়েছে) শঙ্কর!

শঙ্কর : ছ'শো বছর। ছ'শো বছর আগের চারণ-কবি চসার। তুমি চসারকে দেখেছো?

[ক্লিয়া ধীরে ধীরে বসলো আবার]

ক্লিয়া : এই কায়লিন। কায়লিনের নেশা।

শঙ্কর : ক্লিয়া! ক্লিয়া! বলো! আমি যা বলছি—তা সত্যি?

ক্লিয়া : হ্যাঁ, সত্যি। কেউ বিশ্বাস করে না। সেইটাই আমাদের সুবিধে যখন আমরা বেড়াতে বেরোই। আগের যুগের মানুষের কাছে এ ভ্রমণ অবিশ্বাস্য। আমরা

তাই নিরাপদে ঘুরতে পারি।

[শঙ্করের শরীর অবশ হয়ে এলো। ক্লিয়ার কথা শোনবার আগেও যেন অবিশ্বাসের আশ্বাস ছিল। এখন অসম্ভবের চূড়ান্ত উপলব্ধি তাকে টলিয়ে দিলো। ক্লিয়া উঠে এলো শঙ্করের কাছে।]

আমি জানি—মানা শক্ত। বিশ্বাস করা শক্ত। আমাদের যুগের মানুষ ছোটবেলা থেকে জানে, কিন্তু তোমরা—শঙ্কর! খাও!

[শঙ্করের হাতে কায়লিনের পাত্র দিলো! শঙ্কর দীর্ঘ এক চুমুক খেয়ে নিজেকে শক্ত করলো। তাকে আরো জানতে হবে।]

শঙ্কর : তোমরা—তোমরা ভবিষ্যতের মানুষ?

ক্লিয়া : না, শঙ্কর। আমাদের কাছে তোমরা অতীতের মানুষ।

শঙ্কর : আমরা—অতীত?

ক্লিয়া : হ্যাঁ, শঙ্কর। আমাদের কাছে তোমরা অতীত। ক্যান্টারবেরীর বসন্ত, মোহনপুরের শরৎ—সব অতীত। অতীতের বাছা বাছা সময়। আমরা বেড়াতে আসি। বাছা বাছা যুগে বাছা বাছা দেশে বেড়াতে আসি। না, ঠিক বেড়াতে নয়। তীর্থদর্শনে। ঐতিহাসিক সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে আসি। শ্রদ্ধা জানাতে আসি।

শঙ্কর : ঐতিহাসিক! আমরা—ইতিহাস!

ক্লিয়া : আর তিনদিন পরে আমাদের যাবার কথা রোমের এক শীতে। তোমাদের সময় থেকে এগারোশো ছাব্বিশ বছর আগে। রাজা শার্লামেনের অভিষেক।

শঙ্কর : আর তিনদিন পরে—তুমি চলে যাবে?

ক্লিয়া : যেতে তো আমাকে হবেই শঙ্কর।

শঙ্কর : কিন্তু—তিনদিন পরে? আর থাকতে পারো না?

[ক্লিয়ার চোখে গভীর সহানুভূতি। প্রায় দুঃখ। আস্তে আস্তে চোখ ফিরিয়ে নিলো সে।]

ক্লিয়া : আর থেকে লাভ নেই শঙ্কর। কোনো লাভ নেই।

শঙ্কর : (তিক্ত স্বরে) না। কোনো লাভ নেই। শার্লামেনের অভিষেক বাদ দেবে কেন? মোহনপুরে কী আছে?

ক্লিয়া : শার্লামেনের অভিষেকের জন্য নয় শঙ্কর, বিশ্বাস করো! সে অভিষেকে যেদিন ইচ্ছে যাওয়া যায়। শুধু—এখানে থেকেও—(হঠাৎ প্রায় আর্তস্বরে) ওঃ! শঙ্কর! শঙ্কর!

[ক্লিয়া দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লো]

শঙ্কর : ক্লিয়া! কী হয়েছে ক্লিয়া? কী হয়েছে? বলো।

ক্লিয়া : (মুখ না তুলে) না! না! জানতে চেও না! আমি বলতে পারবো না!

শঙ্কর : (তীব্রস্বরে) ক্লিয়া, তুমি মোহনপুরে কেন এসেছো? কেন? কী আছে এখানে? কোন্ শার্লামেন, কোন্ চসার, কোন্ তীর্থ এখানে আছে ক্লিয়া? কেন এসেছো?

ক্লিয়া : (প্রায় চিৎকারে) শঙ্কর, চুপ করো। প্রশ্ন কোরো না! আমি বলতে পারবো না! কিছুতেই বলতে পারবো না।

শঙ্কর : কেন? তোমাদের সেই নিয়ম? আর যদি বেরোতে না দেয়—সেই ভয়?

ক্লিয়া : না, তা নয়, তা নয় শঙ্কর! আমি পারবো না বলতে! তুমি সব জানবে—কিন্তু আমি কিছুতেই—কিছুতেই বলতে পারবো না তোমাকে।

শঙ্কর : ক্লিয়া!

[ক্লিয়া লাফিয়ে উঠে শঙ্করকে টেনে এনে খাটে বসালো। পাশে হাঁটু গেড়ে বসে এক হাতে শঙ্করকে জড়িয়ে ধরে অন্য হাতে কায়লিনের পাত্র তুলে ধরলো তার মুখের কাছে।]

ক্লিয়া : শঙ্কর! শঙ্কর! ভুলে যাও! ভুলে যাও এসব কথা! আমি যা বলেছি, তুমি যা জেনেছো—সব ভুলে যাও। শুধু মনে করো—আমি এক ভিন-দেশের মেয়ে—তোমার কাছে এসেছি—তোমাকে চিনেছি—তোমাকে—তোমাকে ভালোবেসেছি—

শঙ্কর : ভালোবেসেছো?

ক্লিয়া : হ্যাঁ, শঙ্কর! হ্যাঁ! ভালোবেসেছি। জানি এর কোনো মানে হয় না—কোনো—কোনো মানে হয় না—তবু বলতে দাও! ডুবতে দাও! এই দু'দিন! ডুবে যাও! ডুবতে দাও শঙ্কর। (প্রায় চিৎকার করে) খাও শঙ্কর, খাও। ডুবে যাও! ডুবে যাও শঙ্কর!

[শঙ্করকে প্রায় জোর করে খাওয়ালো। আলো কমে আসছে।]

শঙ্কর : (বিহ্বলভাবে) ক্লিয়া—

ক্লিয়া : (ফিসফিস করে) কথা বোলো না। খাও। আরো খাও। ডুবে যাও। আমাকে ডুবতে দাও।

[শঙ্কর আবার খেলো। সম্পূর্ণ অন্ধকার। অন্ধকারে ক্লিয়ার কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে আসছে।]

ডুবে যাও। ডুবতে দাও।

শঙ্করের কণ্ঠস্বর : ডুবিয়া গেলাম। ক্লিয়া ডুবিল কি না জানি না, আমি ডুবিয়া গেলাম। কায়লিনের নেশায় ক্লিয়ার কোলে ডুবিয়া রহিলাম। ভুলিয়া রহিলাম। সর্বনাশের কিছুই জানিলাম না। কিছুই করিতে পারিলাম না।

[একটা একটানা ঝিল্লীধ্বনির মতো শব্দ শুরু হয়েছে। কেমন যেন গা ছমছম করা শব্দ।]

কতক্ষণ ডুবিয়া ছিলাম জানি না। সহসা একেবারে সোজা উঠিয়া বসিলাম। গভীর রাত। ক্লিয়া নাই। অন্ধকার। অন্ধকারে সারা ঘর জুড়িয়া এক অদৃশ্য তরঙ্গ। ভয়ের তরঙ্গ! এক নামহীন পরিচয়হীন অজানা ভয় সমস্ত ঘর, সমস্ত বাড়ি তরঙ্গে তরঙ্গে ডুবাইয়া দিতেছে। এতো তীব্র শ্বাসরোধ করা ভয় যে এমনভাবে সারা শরীর মন আচ্ছন্ন করিয়া দিতে পারে—কখনও ভাবিতে পারি নাই। হৃৎপিণ্ডটাকে কে যেন বরফের মতো ঠাণ্ডা হাতে ক্রমাগত চাপিয়া ধরিতেছে, প্রতিটি স্নায়ু টানিয়া টানিয়া ধরিতেছে। সারা দেহ ভয়ের তরঙ্গের প্রতিটি হিমেল স্পর্শে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। সে এক অহেতুক, অকারণ, অস্বাভাবিক ভীতির যন্ত্রণা—প্রচণ্ড শারীরিক যন্ত্রণা অপেক্ষাও অসহনীয়।

[অল্প আলো ফুটেছে। শঙ্করকে দেখা যাচ্ছে—খাটের প্রান্তে আড়ষ্ট হয়ে বসা। দরজা

বন্ধ। হঠাৎ এক ধাক্কায় দরজা খুলে গেলো। ওমেরীর ছায়ামূর্তি দরজায়।]

ওমেরী : (দাঁতে দাঁত চেপে) শঙ্করবাবু। জেগে আছেন?

শঙ্কর . (কোনোরকমে) হ্যাঁ, কী?

[ওমেরী ঘরে এসে আলো জ্বাললো। ওমেরীর মুখের মাংসপেশী টান হয়ে আছে।]

ওমেরী : (বিকৃত গলায়) একটা 'সোরানিক্' কেউ লুকিয়ে রেখেছে এ বাড়িতে। কোথায় আছে সেটা—আপনি জানেন?

শঙ্কর : সোরানিক?

ওমেরী : (অধৈর্য কণ্ঠে) ধরুন একটা যন্ত্র। ছোট চৌকো রূপোলি একটা জিনিস।

শঙ্কর : (চমকে উঠে দাঁড়িয়ে) ছোট চৌকো—?

[শঙ্করের চমক থেকে সবই বুঝলো ওমেরী। কাছে এসে বলিষ্ঠ দু'হাতে শঙ্করের কাঁধ চেপে ধরলো।]

ওমেরী : কোথায় আছে, শিগ্‌গির বলুন!

শঙ্কর : এ সব—সেই ছোট জিনিসটার কাজ?

ওমেরী : আঃ! সময় নষ্ট কোরো না! কোথায় আছে বলো!

ওমেরী : কিছু জানো না?

শঙ্কর : শুধু জানি—নিচে—একতলায় কোথাও—

ওমেরী : (চাপা হিংস্র স্বরে) হলিয়া! হিংসুটে শয়তান!

ক্লিয়া : (নেপথ্যে আর্তকণ্ঠে) ওমেরী। শিগ্‌গির খুঁজে বার করো—আমি আর পারছি না।

ওমেরী : চলো আমার সঙ্গে নিচে! খুঁজে বার করতে হবে যেমন করে হোক!

শঙ্কর : আমি—আমি দাঁড়াতেই পারছি না—

ওমেরী : (ঝাঁকানি দিয়ে) আলবাৎ পারবে! ঢুকতে গিয়েছো যখন যন্ত্রটা, খুঁজেও বার করতে হবে।

শঙ্কর : (ওমেরীর হাত ছাড়িয়ে, চিৎকার করে) তুমি খোঁজো গে! ও যন্ত্র তোমাদের দুনিয়ার, আমার নয়!

[ওমেরীর কঠিন চোখ শঙ্করের উপর এসে পড়লো]

ওমেরী : (চাপা কঠিন স্বরে) আমাদের দুনিয়ার কতোখানি খবর রাখো তুমি?

[শঙ্কর জবাব দিলো না]

(দরজার কাছে গিয়ে) ক্লিয়া!

ক্লিয়া : (নেপথ্যে) কী?

ওমেরী : এখানে এসো।

[ক্লিয়া এলো। হারিয়নও। দু'জনেই সোরানিকের ক্রিয়ার কাতর।]

তুমি আবার নেশা করে বেশি কথা বলেছো?

[ক্লিয়া মাথা নিচু করে রইলো]

এই যদি কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হয়, তোমার বেরোনো চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে যাবে।

ক্লিয়া : (হঠাৎ উদ্ধতভাবে) আমি স্বীকার করছি আমার অন্যায় হয়েছে। কিন্তু আমার বেরোনো তুমি বন্ধ করতে পারবে না। যদি সেরিন বলে।

হারিয়ন : সেরিনই তোমার মাথাটা খেয়েছে!

ওমেরী : (সংযত কণ্ঠে) আমি জানি এ ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতি কিছু হবে না। কিন্তু কায়লিনের ঝোঁকে তুমি অন্যত্রও বেশি কথা বলবে না তার কী মানে আছে? আমাকে সেরিনের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

হারিয়ন : (কেঁপে উঠে) আগে সোরানিকটা খুঁজে বার করো ওমেরী! দোহাই তোমার!

ক্লিয়া : আর নইলে বেরিয়ে চলো—ছেড়ে দাও এ বাড়ি। হলিয়া নিক!

হারিয়ন : ছেড়ে দেবো! তোমার মাথা খারাপ? সব্বাইকে নেমন্তন্ন করে?

ওমেরী : আঃ থামো। শঙ্কর, এখন পারবে?

[শঙ্কর প্রাণপণ চেষ্টায় উঠে দাঁড়ালো। বেরিয়ে গেলো ওমেরীর সঙ্গে। ক্লিয়া খাটে উপুড় হয়ে পড়লো। হারিয়ন দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইলো। অন্ধকার হয়ে গেলো। শঙ্করের কণ্ঠস্বর।]

শঙ্করের কণ্ঠস্বর : খুঁজিয়া পাইলাম আমিই। হয় তো আগে অনেক স্থানে খুঁজিয়াছিলাম বলিয়াই এতো তাড়াতাড়ি পাওয়া সম্ভব হইল। ওমেরী নিঃশব্দে বস্তুটি লইয়া উপরে তাহার ঘরে চলিয়া গেলো। কয়েক মুহূর্ত পরে সহসা সেই অসম্ভব ভয়ের তরঙ্গ বন্ধ হইয়া গেলো। চারিদিক হাল্কা হইয়া আসিল।

[আলো জ্বললো। ক্লিয়া উঠে বসলো। ওমেরী নীরবে এসে একটা চেয়ারে বসলো। ক্লান্ত শঙ্কর এসে দরজায় দাঁড়ালো। সকলের চোখ তার দিকে। ওমেরী গম্ভীর। হারিয়ন ভাবলেশহীন। ক্লিয়া উদ্বিগ্ন।]

শঙ্কর : (ওমেরীকে) বলো এখন—আমাকে নিয়ে কী করতে চাও।

ওমেরী : (স্থির কণ্ঠে) কিছুই করবার দরকার নেই। শুধু একটা কথা দিতে হবে। তুমি যা জেনেছো, আর কাউকে বলবে না।

শঙ্কর : বললে বিশ্বাস করবে কেউ?

ওমেরী : করুক না করুক, তুমি বলবে না। বেশিদিন নয়, দু'টো দিন। পঁচিশ তারিখ রাত দু'টো অবধি। তারপর কাকে কী বললে, না বললে আমাদের কিছু যায় আসে না।

ক্লিয়া : (আহত স্বরে) ওমেরী!

[ওমেরী ক্লিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসলো]

ওমেরী : আচ্ছা, বেশ। (শঙ্করকে) আসলে পঁচিশ তারিখ রাত দু'টোর পর আমরা চলে যাবো। তাই আমাদের আর কিছু আসবে যাবে না তার পরে। রাজি?

শঙ্কর : রাজি না হলে কী করবে?

ওমেরী : রাজি না হলে যা করবো তা তোমার পক্ষে সুখকর হবে না।

ক্লিয়া : শঙ্কর, রাজি হও!

ওমেরী : (একটু নরমস্বরে) তোমাকে কষ্ট দিতে আমরা চাই না। আমাদেরও দোষ আছে। পুরো বাড়িটা দখল নেওয়া উচিত ছিল আমাদের, তাহলে তোমাকে এ অবস্থায় পড়তে হোতো না। তুমি কথা দাও কাউকে বলবে না, আমি কথা দিচ্ছি—তোমাদের বাড়ি বিক্রি না হবার লোকসান খানিকটা পূরণ করে দেবো। যদি চাও।

['যদি চাও' কথাটায় আবার জোর। ক্লিয়া আহত দৃষ্টিতে ওমেরীর দিকে তাকালো, কিন্তু শঙ্কর তা দেখতে পেলো না।]

শঙ্কর : (অল্প থেমে, ক্লান্তভাবে) বেশ। কথা দিচ্ছি। (ঘরে এসে বসলো)

ওমেরী : আর একটা কথা। হলিয়া আবার কোনো বদমায়েসি করবার চেষ্টা করলে দয়া করে জানিও। তোমার নিজের আরামের খাতিরেই জানিও।

[ওমেরী চলে গেলো। হারিয়নও। ক্লিয়া—শঙ্করের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে দরজার দিকে গেলো।]

শঙ্কর : ক্লিয়া।

ক্লিয়া : কী শঙ্কর?

শঙ্কর : পঁচিশ তারিখ রাত দু'টোর পর তুমি চলে যাবে?

[ক্লিয়া কাছে এসে শঙ্করের দুই গালে হাত রেখে মুখটা তুলে ধরলো। গভীর দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকালো। তারপর ছেড়ে দিয়ে জানালায় গিয়ে দাঁড়ালো—বাইরের দিকে চেয়ে।]

ক্লিয়া : ভোরের আলো ফুটে উঠছে শঙ্কর। একটু পরে শরতের আকাশের গাঢ় নীল ঝলমল করে উঠবে। চব্বিশে অক্টোবর। তারপর রাত আসবে। তারায় ভরা রাত। তারপর আবার ঝলমলে শরতের দিন। পঁচিশে অক্টোবর উনিশশো ছাব্বিশ। শরতের শেষ দিন।

শঙ্কর : শেষ দিন?

ক্লিয়া : (না শুনে) এক আশ্চর্য শরতের শেষ।

[ধীরে ধীরে শঙ্করের দিকে ফিরলো]

এই দু'টো দিন আমি তোমার কাছে থাকবো। সারাদিন। যতোক্ষণ সম্ভব। তার বেশি আমার কিছু করবার নেই শঙ্কর। তার বেশি আমার কিছু দেবার নেই। পাবার নেই।

[শঙ্কর উঠে দাঁড়ালো। অন্ধকার হয়ে গেলো আস্তে আস্তে। অন্ধকারে শঙ্করের কণ্ঠস্বর।]

শঙ্করের কণ্ঠস্বর : দু'টি দিন! দু'টি আশ্চর্য দিন। আজ চরম সর্বনাশের গভীরে ডুবিয়াও সেই দু'টি দিন ভুলিতে পারি নাই। একটি জীবন সার্থক করিতে ঐরকম দু'টি দিনই যেন যথেষ্ট। কিন্তু তবু—একটি জীবন তো নয়? তাই এ কাহিনী লিখিয়া যাইতেছি। পঁচিশে সারাদিন ওমেরী ও হারিয়নের মধ্যে চাপা উত্তেজনা। এমন কি ক্লিয়ার মধ্যেও। দিন যতই গড়াইয়া রাত্রের দিকে যাইতেছে, উত্তেজনা ততই বাড়িতেছে। কেহ বাহির হয় নাই। ক্লিয়া প্রায় সর্বদাই আমার ঘরে ছিল। ওমেরী বা হারিয়ন যেন দেখিয়াও দেখে নাই।

রাত্রে অতিথি আসিবে জানিতাম। ক্লিয়ার জগতের মানুষ—নিমন্ত্রিত অতিথি। দুপুরে মুটের মাথায় ভাড়া করা চেয়ার টেবিল আসিয়াছে প্রচুর। কিন্তু সন্ধ্যা পার হইয়া গেলো। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়া গেলো। কেহ আসিল না। এক সময়ে ক্লিয়া ভিতরে গেলো দরজা খোলা রাখিয়া। বারান্দার একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া দেখিলাম—ভিতরের বারান্দায় সারি সারি চেয়ার পড়িয়াছে। সামনে ছোট ছোট টেবিলে কায়লিনের পাত্র। সব চেয়ার রাস্তার দিকে মুখ করিয়া বসানো, যেন প্রেক্ষাগৃহের একসারি আসন। রাস্তায় ওপাবের বাড়িগুলিতে কী যে দেখিবার আছে, বুঝিলাম না।

[আলো জ্বললো। জানলাটা বন্ধ। শঙ্কর বারান্দায় দাঁড়িয়ে খোলা দ্বারপথে ভিতরের বারান্দার দিকে তাকিয়ে আছে। এবার ঘরে এলো। তার কিছুক্ষণ পরে এলো ক্লিয়া। হাতের পানপাত্র দু'টি ঘরে রেখে দরজাটা বন্ধ করে দিলো।]

শঙ্কর : আবার কায়লিন?

ক্লিয়া : (হেসে) আজ সারাদিন তো খাওনি?

শঙ্কর : তুমি খেয়েছো অনেক।

ক্লিয়া : আমি না খেয়ে পারি না। আজ তো আরোই পারছি না।

শঙ্কর : কেন?

ক্লিয়া : আজ যে তোমার সঙ্গে আমার শেষ দিন।

শঙ্কর : কথা ছিল—ও কথা তোলা হবে না।

ক্লিয়া : সত্যি। ভুলে গিয়েছিলাম।--খাও।

শঙ্কর : না।

ক্লিয়া : খাও শঙ্কর। আর তো কোনোদিন—না না, আবার ভুলে গেছি। ও কথা বলবো না।

[শঙ্কর খেলো অল্প। ক্লিয়াও খেলো।]

শঙ্কর : তোমাদের অতিথিরা কখন আসবে?

ক্লিয়া : আর কিছুক্ষণ পরে।

শঙ্কর : এখন কতো রাত?

ক্লিয়া : প্রায় বারোটা।

শঙ্কর : আর কয়েক মিনিট তাহলে।

ক্লিয়া : কী?

শঙ্কর : আর কয়েক মিনিট পরে তুমি ভিতরে চলে যাবে। তারপর—

ক্লিয়া : শঙ্কর! এবার তুমি ভুলে যাচ্ছো।

[শঙ্কর বিষণ্ণ হাসলো। কায়লিন মুখে তুললো। ক্লিয়াও।]

শঙ্কর : তোমাকে ছেড়ে আমার বাকি জীবন যে কীভাবে কাটবে, আমি জানি না।

ক্লিয়া : শঙ্কর!

শঙ্কর : আমি জানি। এসব কথার কোনো মানে হয় না। তোমার জগৎ আলাদা। তোমার আমার জগতের মধ্যে কতো হাজার বছরের ব্যবধান, জানি না। কিন্তু তবু—এই ক'টা দিনে আমার জীবনের মানে যেন বদলে গেছে। এক এক সময়ে মনে হয়—কেন তোমার সঙ্গে দেখা হোলো? কিন্তু পরের মুহূর্তেই ভাবি—দেখা না হলে জীবনের সত্যিকারের স্বাদ অজানা হয়ে থাকতো। সে ক্ষতি সহ্য করার থেকে তোমার চলে যাওয়ার কষ্ট সহ্য করা ভালো।

ক্লিয়া : শঙ্কর!

শঙ্কর : কী?

ক্লিয়া : শঙ্কর! তুমি—পরে—আমার অপরাধ—ক্ষমা করতে পারবে?

শঙ্কর : কী বলছো ক্লিয়া? কী অপরাধ?

ক্লিয়া : (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) না। কিছু না। আমি আশা করবো না। সে অধিকার নেই আমার।

শঙ্কর : কী বলছো তুমি?

ক্লিয়া : কিছু না শঙ্কর। তুমি—আমাকে একটা কথা দাও।

শঙ্কর : কী?

ক্লিয়া : আজ রাতে বাড়ি ছেড়ে বেরিও না।

শঙ্কর : এতো রাতে কোথায় বেরোবো?

ক্লিয়া : জানি। তবু বললাম। যদি ইচ্ছে হয়, তবু বেরিও না। বেরোলে—তোমার ক্ষতি হতে পারে। সে আমি দেখতে পারবো না।

শঙ্কর : কী সব বলছো তুমি ক্লিয়া?

ক্লিয়া : জানি কিছু যাবে আসবে না—শেষ পর্যন্ত। কিন্তু তবু তুমি বেরিও না। বাড়িতে থেকো। কথা দাও।

শঙ্কর : কথা দিচ্ছি, কিন্তু—

ক্লিয়া : না, আর 'কিন্তু' না। খাও।

[দু'জনেই কায়লিন পান করলো]

আর একবার।

শঙ্কর : না, আর না।

ক্লিয়া : আর একবার শঙ্কর, শেষবার।

[শঙ্কর আর ক্লিয়া একসঙ্গে আবার খেলো। শঙ্কর বড়ো চেয়ারে এলিয়ে বসে। তার চোখ বুজে এসেছে। ক্লিয়া অল্পক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইলো। তারপর ধীরে ধীরে পাত্র দু'টি নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।]

শঙ্কর : (চোখ তুলে) ক্লিয়া—

ক্লিয়া : চুপ। উঠো না। আমি এক্ষুনি আসছি।

[শঙ্কর চোখ বুজলো। ক্লিয়া পাত্র দু'টি নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলো। শঙ্কর একবার নড়ে উঠলো। অস্ফুট কণ্ঠে কী বলে আরো এলিয়ে বসলো। ঘুমে ঢলে আসছে সে। ক্লিয়া খালি হাতে ফিরে এলো। দরজায় এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দেখলো। তারপর নিঃশব্দ চরণে শঙ্করের পিছনে এসে দাঁড়ালো। শঙ্করের কপালে চুলে হাত বুলিয়ে দিলো।]

শঙ্কর : (কষ্টে চোখ খুলে) ক্লিয়া—

ক্লিয়া : হ্যাঁ, শঙ্কর। আমি, আছি। তুমি ঘুমোও। ঘুমোও। আমি আছি।

[শঙ্করের চোখ বুজে গেলো আবার]

(মৃদু স্বরে) ঘুমোও। ঘুমোও শঙ্কর। আমি আছি। এখনো আছি। ঘুমোও।

[ক্লিয়া আস্তে আস্তে গিয়ে বাতি নিভিয়ে দিলো। বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। ফিরে চাইলো। নিদ্রিত শঙ্করকে এক মুহূর্ত দেখে দরজার পাল্লা টেনে বন্ধ করে দিলো। প্রায় অন্ধকারে শঙ্করের অস্পষ্ট মূর্তি। অল্পক্ষণ পরে শঙ্করের কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।]

শঙ্করের কণ্ঠস্বর : আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া রহিলাম। জানিলাম না কখন ক্লিয়া গেলো। জানিলাম না সর্বনাশের মুহূর্ত আমার নিদ্রিত নিশ্বাসের স্পন্দনে স্পন্দনে আগাইয়া আসিতেছে, নিঃশব্দচরণে, আমার সুপ্তির অন্তরালে, আমার সুখস্বপ্নের কুয়াশার অন্তরালে, চরম সর্বনাশের মুহূর্ত—

[সহসা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে সারা বাড়ি কেঁপে উঠলো। ঝনঝন করে কোথায়

যেন কাঁচ ভেঙে পড়লো। নিদ্রিত শঙ্কর চেয়ার সমেত ছিটকে মাটিতে পড়ে গেলো]

শঙ্কর : ওঃ! ক্লিয়া! ক্লিয়া! কী হোলো? ক্লিয়া?

[শঙ্কর অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে উঠলো। দু'বার বাতি জ্বালাবার চেষ্টা করলো। পারলো না। হাল ছেড়ে দরজার কাছে গেলো। একটানে দরজা খুলে ফেলে এক গগনভেদী আর্তনাদ করে পিছিয়ে এলো।

খোলা দরজা দিয়ে যা দেখা যাচ্ছে তার সঙ্গে আগের দৃশ্যপটের কোনো মিল নেই। রাস্তার ও পাশের বাড়িগুলি কোন্ মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সারা শহর দেখা যাচ্ছে, দিগন্ত অবধি। আর সেই দিগন্তবিস্তৃত শহর—জ্বলছে। আগুনের লক্ষ লক্ষ শিখা সমস্ত শহর ঘিরে এক সর্বনাশা তাণ্ডবনৃত্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শরতের নীল আকাশ লাল হয়ে উঠেছে আগুনের আভায়। শরতের সাদা মেঘ কালো হয়ে উঠেছে ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে। তখনই দূর থেকে ভেসে আসছে শহরের আর্তস্বর। ক্রমে সে সমবেত আর্তস্বর মেঘের গর্জনের মতো আকাশ-বাতাস ছাপিয়ে জ্বলন্ত শহরের ধ্বংসের গর্জনের সঙ্গে মিলে এক প্রচণ্ড ভীষণ শব্দদৃশ্যে শঙ্করকে মুহ্যমান করে দিলো। সেরিনের অমর সৃষ্টি যেন মূর্ত হয়ে উঠলো চোখের সামনে। সব ছাপিয়ে আবার শঙ্করের বোবা আর্তনাদ।

টলতে টলতে শঙ্কর বারান্দায় গেলো। বারান্দার বন্ধ দরজায় সজোরে ধাক্কা মারতে লাগলো।]

শঙ্কর : ক্লিয়া! ক্লিয়া!

[তারপর মনে পড়ায় টান দিয়ে দরজা খুলে ফেললো। বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইলো ভিতরের দিকে। তাকে ধরে নিয়ে এলো ক্লিয়া, ঘরে এনে বসিয়ে দিলো কোনোরকমে বড়ো চেয়ারটায়।]

ক্লিয়া : শঙ্কর! শঙ্কর!

শঙ্কর : (আর্তস্বরে) ও কী ক্লিয়া? ও কী?

ক্লিয়া : শঙ্কর, চুপ করো। বোসো, আমি কায়লিন আনি—

শঙ্কর : না, তুমি বলো। ও কী? ও কী

ক্লিয়া : উল্কাপাত। ছোট একটা উল্কা। তুমি ভেবো না শঙ্কর, আমাদের কিছু হবে না। এ বাড়ির কিছু হয়নি।

শঙ্কর : দাদা? দাদার কী হয়েছে? বৌদি? খুকি? পল্টু?

ক্লিয়া : শঙ্কর!

শঙ্কর : বলো! বলো! ওরা—ওরা কী—

ক্লিয়া : ওরা—ওরা বেঁচে আছে—

শঙ্কর : (অবিশ্বাসী চিৎকারে) বেঁচে আছে? ঐখানে?

[ক্লিয়া মাথা নিচু করলো]

ক্লিয়া। ওঃ! সুরেশ্বর! অনিল! ওঃ! ক্লিয়া—ক্লিয়া, তুমি জানতে। তুমি জানতে, তবু আমাকে বলোনি। সাবধান করে দাওনি! ওঃ!

ক্লিয়া : অতীত কী করে বদলাবো শঙ্কর? আমি জানতাম—কিন্তু উল্কাপাত কী করে ঠেকাবো?

শঙ্কর : (চিৎকার করে) সাবধান করা যেতো! শহর খালি করে দেওয়া যেতো!

ক্লিয়া : কিন্তু শঙ্কর—অতীতের কোনো ঘটনায় যে আমাদের হস্তক্ষেপ করবার উপায় নেই! আমরা—

শঙ্কর : (পাগলের মতো) তোমরা মজা দেখতে এসেছো। ঐ অতো লোক বারান্দায় সারি দিয়ে বসে মজা দেখছে। কায়লিনের পেয়ালা হাতে থিয়েটার দেখছে—

ক্লিয়া : শঙ্কর!

[শঙ্কর একটা চিৎকার করে প্রচণ্ড ধাক্কায় ক্লিয়াকে ঠেলে সরিয়ে দিলো। তারপর দু'বার টলে নিজেও পড়ে গেলো মূর্ছিত হয়ে। শহরের আগুন, শহরের আর্তনাদ আবার যেন তীব্র হয়ে উঠলো। তারপর পর্দা বন্ধ হয়ে সব কিছু আড়াল করে দিলো। আর্তনাদ থেমে এলো।

পর্দা খুললো আবার ধীরে ধীরে। ক্লিয়া নেই। খাটে শঙ্করের নিস্পন্দ দেহ লম্বা হয়ে পড়ে আছে। দরজা-জানালা বন্ধ। টেবিলের কাছে চেয়ারে, দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে বসে একজন পুরুষ। সামনে একটা বাক্স, তা থেকে যেন হাল্কা একটা আলোর দ্যুতি বেরুচ্ছে। লোকটির কানে ইয়ারফোনের মতো যন্ত্র। সঙ্গীতের তালে তালে তার মাথা দুলছে। মাঝে মাঝে খসখস করে কী সব লিখছে। সেরিন—তার অমর সৃষ্টির কাজে তন্ময়।

শঙ্কর নড়ে উঠলো। একটা অস্ফুট যন্ত্রণাবিকৃত আওয়াজ। সেরিন ঘুরে বসলো। ধারালো চেহারা। ওমেরীর মতো লম্বা-চওড়া নয়, কিন্তু মুখে বুদ্ধি আর ব্যক্তিত্ব জ্বলজ্বল করছে।]

সেরিন : তুমি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছো শঙ্কর। অনেকখানি কায়লিন খেয়েছিলে।

শঙ্কর : (বিহ্বলভাবে) কায়লিন?

সেরিন : হ্যাঁ। তুমি অজ্ঞান হয়ে যাবার পর ক্লিয়া তোমাকে অনেকখানি কায়লিন জোর করে খাইয়ে রেখে গেছে।

শঙ্কর : ক্লিয়া? ক্লিয়া কোথায়?

সেরিন : ওদের এখন রোমে থাকার কথা. শার্লামেনের অভিষেক।

শঙ্কর : ও, হ্যাঁ—হ্যাঁ। ক্লিয়া চলে গেছে। ওরা সবাই চলে গেছে। এখানকার খেল খতম হয়ে গেছে। তুমি রয়ে গেলে কেন?

সেরিন : আমার এখানে কাজ আছে। সুন্দর শরৎ, বসন্ত বা শার্লামেন-চসারে আমার উৎসাহ নেই।

শঙ্কর : বুঝেছি। তুমি—সেরিন, না!

সেরিন : হ্যাঁ আমি সেরিন।

শঙ্কর : তোমার রচনা আমি শুনেছি। দেখেছি। খানিকটা।

সেরিন : হ্যাঁ, খানিকটা। যেটুকু লণ্ডনের অগ্নিকাণ্ড থেকে নিয়েছিলাম। ষোলো'শ চৌষট্টি। ওখানে শেষ নয়। শেষ করবার চেষ্টা করছি।

শঙ্কর : ও। এই উল্কা—এই সর্বনাশ—তোমার দরকার ছিল, না? তোমার সৃষ্টির জন্য?

[শঙ্কর ওঠবার চেষ্টা করলো. কিন্তু যন্ত্রণায় কাতরে উঠতে হোলো।]

সেরিন : উঠো না।

শঙ্কর : আমি—কতোক্ষণ ঘুমিয়েছি?

সেরিন : চারদিন।

শঙ্কর : চারদিন!

সেরিন : হ্যাঁ। আমি তোমাকে জাগাইনি ইচ্ছে করে। আমি জানতাম—এ বাড়িটার কিছু হবে না। অন্তত আগুনে কিছু হবে না।

শঙ্কর : অন্তত আগুনে—? তাহলে আরো কিছু বাকি আছে?

সেরিন : (শান্ত স্বরে) আমি শিল্পী। ধ্বংস আর বিধ্বস্ত মানুষ আমার রচনার বিষয়বস্তু। তাই আমি রয়ে গেছি এখানে। অন্যরা ভ্রমণবিলাসী। ওরা এসেছিলো শরতের শোভা উপভোগ করতে। উল্কাপাতের দৃশ্য দেখতে। তারপরে যা বাকি থাকে, তাতে ওদের উৎসাহ নেই। কিন্তু আমার সেইটাই দরকার। আমার রচনার জন্য।

শঙ্কর : কী সেটা?

সেরিন : (অল্প থেমে) মহামারী।

শঙ্কর : মহামারী?

সেরিন : হ্যাঁ, কিন্তু সে কথা এখন থাক।

শঙ্কর : (ভালো করে না বুঝে) এই উল্কাপাতেও তোমার রচনা শেষ হয়নি? মহামারীও চাই?

সেরিন . মহামারীতেও শেষ হবে না। আর একটা সময়, আর একটা জায়গা বাকি রইলো।

শঙ্কর : কোথায়?

সেরিন : কী হবে সে কথা জেনে?

[সেরিন কলমের জন্য হাত বাড়ালো]

শঙ্কর : (হঠাৎ আঙুল দেখিয়ে) ঐ যে—তোমরা কব্জিতেও ঐ কাটা দাগ। ক্লিয়ারও ছিল। সক্কলের ছিল। ওরা বলতো—টিকের দাগ।

সেরিন : হ্যাঁ, টিকে! এখানকার রোগ যাতে কেউ আমাদের যুগে নিয়ে যেতে না পারে, তাই।

শঙ্কর : কী রোগ?

সেরিন : তুমি নাম শোনোনি। এর আগে পৃথিবীতে এ রোগ হয়নি কখনো। এখানেই এর শুরু। ঐ উল্কাতে এর মূল।

শঙ্কর : (অন্যমনস্কভাবে) ও!

[সেরিনের কথা শঙ্করের মাথায় যেন ভাল করে ঢুকছে না। সে যেন অন্য কিসে মন বসাবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ জোর করে উঠে বসলো।]

হয়েছে। পেয়েছি। এতোক্ষণ ভাবতে চেষ্টা করছিলাম। এইবার পেয়েছি। তোমরা—তোমরা তো ইতিহাস বদল করতে পারো, না? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারো। শুধু নিয়ম নেই। আইনে বাধে। তোমাদের—সই করে আসতে হয়। কিন্তু পারো। পারো না?

সেরিন : (কলম রেখে) হ্যাঁ, পারি। শক্ত। এবং করা একেবারে নিষিদ্ধ। কিন্তু সম্ভব। পারা যায়, কিন্তু করি না। অতীত যদি বদলাতাম, আমাদের বর্তমানও যে বদলাতো। এখন যে যুগে আছি, সেটা ঠিক এরকম থাকতো না। তাই বদলাই না। আমাদের

বর্তমান নিয়ে আমরা সুখী। অন্য কোনোরকম আমরা চাই না।

শঙ্কর : (উত্তেজিত সুরে) কিন্তু তোমরা পারো। তোমাদের ক্ষমতা আছে। তোমরা ইচ্ছে করলে এই ধ্বংস, সর্বনাশ, দুঃখ-যন্ত্রণা মুছে দিতে পারতে—বন্ধ করতে পারতে—

সেরিন : (শান্ত ধীর কণ্ঠে) এ সব ধ্বংস, সর্বনাশ, দুঃখ-যন্ত্রণা অনেকদিন আগে পার হয়ে গেছে শঙ্কর। ঘটে গেছে।

শঙ্কর : (উত্তেজিত চিৎকার) কিন্তু—এখন? এই বর্তমান? এটা তো ঘটে যায়নি?

সেরিন : (অল্পক্ষণ চেয়ে থেকে) হ্যাঁ, শঙ্কর। 'এখন'-ও। এই বর্তমানও। ঘটে গেছে। অনেকদিন আগে।

[শঙ্কর হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে রইলো। বুঝছে। তবু যেন মাথায় ঢুকছে না। সেরিন উঠে এগিয়ে এলো।]

ভেবো না শঙ্কর। শুয়ে থাকো। বিশ্রাম করো। কষ্ট কম হবে তাহলে।

শঙ্কর : কষ্ট? এই—এই যন্ত্রণার কথা বলছো? সারা শরীরে এই যন্ত্রণা—

সেরিন : শুয়ে পড়ো।

শঙ্কর : ওঃ (ভেবে) সেই রোগ, না? যে রোগের এখনো কোনো নাম নেই। তাই না? বুঝেছি। (আর ভেবে) আশ্চর্য! তুমি মহামারী বললে—তবু তখন বুঝতে পারিনি। এইবার বুঝেছি।

সেরিন : শোও শঙ্কর। শুয়ে থাকো।

শঙ্কর : তাই ক্লিয়া বলেছিলো—কিছু আসবে যাবে না—শেষ অবধি। হ্যাঁ, তাই তো। তাই এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপে কোনো ক্ষতি ছিল না।

[শঙ্কর অল্প অল্প হাসতে শুরু করেছে, হিস্টিরিয়ার হাসি।]

কোনো ক্ষতি ছিল না। ক্লিয়া নির্ভাবনায়—হিহি—(হঠাৎ থেমে) আচ্ছা—আচ্ছা, এই উল্কায়—কতো লোক মরেছে বলতে পারো? তুমি তো জানো নিশ্চয়—

সেরিন : উল্কাপাতে বেশি লোক মরেনি। আট'শো-র মতো।

শঙ্কর : ও! বেশি নয়। আট'শো। মাত্র আট'শো। (আঙুলে গুণে) দাদা, বৌদি, খুকি, পল্টু, সুরেশ্বর, অনিল, অনিলের বৌ, অনিলের—

সেরিন : শঙ্কর! শুয়ে পড়ো।

শঙ্কর : মাত্র আট'শো। আর—আর এই—মহামারীতে?

সেরিন : এ সব কথা কেন জানতে চাইছো?

শঙ্কর : বলো না? (আবার হাসি) কিছু তো—কিছু তো আসবে যাবে না! আমি জানলে—কিছু আসবে যাবে?

সেরিন : মহামারীতে শেষ অবধি মারা গিয়েছিলো প্রায় আড়াই হাজার।

শঙ্কর : আড়াই হাজার? এসব তোমাদের—ইতিহাসে লেখা আছে, না? আড়াই হাজার। মাত্র আড়াই হাজার। আট'শো—মাত্র। (হঠাৎ চেঁচিয়ে) এতেও তোমার সঙ্গীত রচনা শেষ হবে না? আরো দরকার?

সেরিন : (অল্প থেমে, স্থির কণ্ঠে) হ্যাঁ, শঙ্কর। আরো দরকার। মোহনপুর নামে একটা অখ্যাত শহরে একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগে আট'শো লোক মরেছে। মহামারীতে

মরেছে আড়াই হাজার। মানুষের ধ্বংসের ইতিহাসে এটা কি খুব বেশি?

শঙ্কর : আরো বেশি চাই?

সেরিন : তোমার সময় থেকে উনিশ বছর পরে এই পৃথিবীরই এক জায়গায় এক মুহূর্তে দু'লক্ষ লোক মরেছিলো।

শঙ্কর : (রুদ্ধশ্বাসে) দু'লক্ষ? এক মুহূর্তে?

সেরিন : হ্যাঁ, দু'লক্ষ। তারপরেও বছরের পর বছর ধরে কতো লোক রোগে মরেছিলো, অন্ধ বিকলাঙ্গ পঙ্গু হয়ে বেঁচেছিলো—তার হিসাব আমার মনে নাই।

শঙ্কর : এ কি ভূমিকম্প?

সেরিন : না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়। মানুষের সৃষ্ট ঘটনা।

শঙ্কর : অসম্ভব!

সেরিন : তোমার বিশ্বাস হবার কথা নয়।

শঙ্কর : সে কোথায়?

সেরিন : জাপান। হিরোশিমা। ৬ই আগস্ট, উনিশ শো পঁয়তাল্লিশ। ঐখানে আমার রচনার শেষ।

শঙ্কর : (চিৎকার) দু'লক্ষ লোক এক মুহূর্তে মরে যাবে—তুমি—তোমরা দেখতে আসবে—সঙ্গীত রচনা করবে—ঠেকাবে না? বন্ধ করবে না?

সেরিন : (ধৈর্যে) মরে 'যাবে' নয় শঙ্কর। মরে 'গেছে'! অনেকদিন আগে।

[শঙ্কর বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। তারপর তার নির্জীব দেহ লুটিয়ে পড়লো খাটে। সেরিন দাঁড়িয়ে রইলো। অন্ধকার হয়ে গেলো আস্তে আস্তে। মঞ্চের শঙ্করের কণ্ঠস্বর—হাঁপানোর আওয়াজ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।]

শঙ্কর : আঃ—আঃ—আমি—আমি—বলবো! বলে যাবো! আমি—লিখ্—লিখে যাবো! জানিয়ে যাবো স্-সবাইকে! আমি যদি—যদি-জানতাম—কোনোরকমে জানতে পারতাম—হয় তো—ঠেকাতাম—বন্ধ করতাম—কোনোরকমে। কিম্বা—কিছু একটা করতাম—ওদের ধরে—জোর করে—বাধ্য করতাম—যাতে—যাতে—এতো যন্ত্রণা—এতো হোতো না—কিছু একটা—ওঃ!

[অস্পষ্ট আলোয় শঙ্কর উঠে দাঁড়াচ্ছে। পড়ে গেছে। সেরিন নেই।]

আমি—লিখে যাবো! আমি—আমি জানাবো—সবাইকে জানাবো! এবার—কিছু হবে না! এখন—এখনকার মানুষদের—কিছু হবে না! কিন্তু পরে—পরে কোনোদিন—ভবিষ্যতে—

[শঙ্কর বুকে হেঁটে গিয়ে টেবিল ধরে ওঠবার চেষ্টা করছে। তার যন্ত্রণাবিদ্ধ কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে উঠছে। পর্দা বন্ধ হতে আরম্ভ করছে।]

পরে—পরে কোনোদিন—পরে কোনোদিন—

আরম্ভ ঃ ৫ই মার্চ, ১৯৬৬
শেষ ঃ ৮ই মার্চ, ১৯৬৬
এনুগু, নাইজেরিয়া

যদি আর একবার

মুখবন্ধ

একটা ইংরিজি নাটক থেকে আরম্ভ করবার প্রেরণা পেয়েছিলাম। কাহিনী, চরিত্র, কবিতার ছন্দে লেখা সবই আমার নিজস্ব।

বাদল সরকার

যদি আর একবার

চরিত্রলিপি

(মঞ্চাবতরণ অনুযায়ী)

সত্যসিন্ধু শেঠ	হোটেলের ম্যানেজার
ব্রজলাল চৌধুরী	হোটেলের ভৃত্য
রতিকান্ত সান্যাল	সরকারী অফিসার
সঞ্জয় ঘোষ	লেখক
বনলতা রায়	চাকুরে
করুণা	রতিকান্তর স্ত্রী
অতসী	সঞ্জয়ের স্ত্রী
বুড়ো জিন	সমুদ্রের অপদেবতা

প্রথম অঙ্ক
প্রথম দৃশ্য

[নিচু পাঁচিলে ঘেরা এক টুকরো চওড়া বারান্দা। তার একপাশে বাড়ির ভিতরে যাবার পথ। অন্য পাশে একফালি বাগান। বারান্দা আর বাগান থেকে আলাদাভাবে একটা রাস্তায় পড়া যায়, সেটা গেছে সমুদ্রে। বারান্দায় খান দুই হাল্কা টেবিল, খান পাঁচেক চেয়ার। বাগানে একটা বেদিমতো বসবার জায়গা, বারান্দা থেকে সেটা সহজে নজরে পড়ে না।
সত্যসিন্ধু এসে দাঁড়ালো মঞ্চের সামনের দিকে, আলাদা আলোয় উজ্জ্বল। দর্শকদের অভিবাদন জানালো।]

সত্য : সুধীজন,
চারুশীলা মহিলা ও বিচক্ষণ মহোদয়গণ,
নাটকের আরম্ভেই করি নিবেদন,
অধমের নাম—সত্যসিন্ধু শেঠ।
পেশা— কোনোমতে ভরা পেট।
নিবাস— যখন যেখানে জোটে অন্নের আশ্বাস। বর্তমানে
গেড়েছি শিকড় এইখানে। বঙ্গ উপসাগরের কূলে
কতিপয় ঘর তুলে নির্মিত হয়েছে এক মনোরম অতিথি-নিবাস।
খাস কলকাতা হ'তে
যদি চলে যেতে চান সমুদ্রে সৈকতে
বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষায়, হাওয়া বদলের অভিলাষে,
কর্মক্লান্ত মনটাকে তাজা করে আনার প্রয়াসে,
তবে নিন. লিখে নিন, আসল ঠিকানা—
নেপচুন হ্যাপী লজ, ব্রজপুর-অন-সী, ব্রজপুর থানা।
এ হোটেলে আমি. সত্যসিন্ধু শেঠ—ম্যানেজার।
আজ্ঞে? হোটেলটা কার?
ইয়ে, মানে— সে কথা এখন থাক।
দেখা যাক—
হোটেলের বারান্দায়, বাগানের কোণে
কী কাহিনী, এ নাটক বোনে।
[যেতে গিয়ে ফিরে এলো]
ওহো, সরি! ভুলেছি আসল কথাটাই—
এ নাটক গাঁজাখুরি, এর কোনো মাথামুণ্ডু নাই।
[চলে গেলো। আলো ফুটলো। ভোরের আলো। সত্য এলো বারান্দায়। সমুদ্রের দিকে চেয়ে যুক্তকরে নমস্কার জানালো।]

প্রণাম বরুণদেব। নেপচুন, তোমাকে প্রণাম।
সূর্যদেব, গাত্র তোলো, হয়েছে সময়।
[আলো বাড়লো। সূর্যদেব কথা রেখেছেন।]
ধন্যবাদ সূর্যদেব। তোমাকেও প্রণাম জানাই।
বসুন্ধরা, মা জননী, নমস্কার নিও।
ব্রজ! ব্রজ!
[দেবতার সাড়া এলো না। সত্য ফিরে তাকালো ভিতরের দিকে।]
ব্রজ! ওরে ব্রিজলাল!
বলি অ্যাই হতচ্ছাড়া ব্রজের দুলাল!

ব্রজ : (ভিতর থেকে) জী হুজুর মালিক সরকার!

সত্য : (দর্শকদের) শুনলেন? বিনয়ের অবতার!
বেটা হদ্দ কুঁড়ে, পাকা চোর, অতিশয় পাজি!
[ব্রজ এলো]

ব্রজ : (দাঁত বার করে) সীয়ারাম সীয়ারাম, সেলাম বাবুজি।

সত্য : বলি, ক'টা বাজে?

ব্রজ : সাড়ে পাঁচ। চুল্লি আঁচ হোয়ে গেলো।

সত্য : চায়ের কী হোলো?

ব্রজ : পানি আছে চুল্লিপর।

সত্য : তিন নম্বর দিদিমণি গেছে সেই ভোরে!
এসেই এখনি
চা কই চা কই করে মাথা খাবে তোর!

ব্রজ : নহীঁ নহীঁ, তিন লম্বর দিদিমণি মাথা নহীঁ খাবে।
আচ্ছা দিদি, সাঁচ্চা দিদি,
আট আনা বকশিস দিলো কাল।

সত্য : সে কি! তোকে?

ব্রজ : হাঁ সাব, হমাকে!
না তো কি খোঁদির মাকে দিবে?

সত্য : তোকে যে বকশিস দেয়, তাকে আমি দেবতুল্য মানি!
বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীস্ট, অন্নপূর্ণা তিনি।

ব্রজ : নহীঁ নহীঁ, ওন্নপূর্ণা কেনো হোবে?
তিন লম্বর হোলো মিস্ বনলতা রায়।
আপ বোড়ো ভুলে যান নাম!

সতা : তাই বটে। আভি যাও, করো গিয়ে কাম।
চা বানাও, কুঁড়ের সর্দার—

ব্রজ : জী সরকার। পানি হ্যায় চুল্লিপর।
[পাঁচিলে বসে খৈনি বার করলো। রতিকান্ত সান্যাল এলো ভিতর থেকে। পরিধানে পায়জামা, মূল্যবান ড্রেসিং গাউন। হাতে পাইপ।]

সত্য : নমস্কার, মিস্টার সান্যাল।
ব্রজ : (উঠে) সেলাম হুজুর, সীয়ারাম।
সত্য : এতো ভোরে আজ?
রতি : হ্যাঁ, না, মানে— ভেঙে গেলো ঘুম।
সত্য : কেন কেন? অসুবিধে ছিল না তো কিছু?
রতি : না না, অসুবিধে কিছু নেই, এমনি উঠেছি।
মনে হোলো সী-সাইডে ভোরেই তো ভালো?
[সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলো]
ব্রজ : বিলকুল খাঁটি বাৎ সাব।
মিস্ রায় ওহি লিয়ে হররোজ
ভোরে ভোরে চোলে যান নহানেকে লিয়ে।
রতি : (সত্যকে) এক কাপ চা কি পাওয়া যাবে?
সত্য : নিশ্চয় নিশ্চয়! ব্রিজলাল—
ব্রজ : সীয়ারাম! পানি হ্যায় চুল্লিপর!
[ভিতরে ছুটলো]
সত্য : ঘরেও কি চা পাঠিয়ে দেবো? মিসেস সান্যাল—
রতি : (শশব্যস্তে) না না, ওঠে নি এখনো,
না তোলাই ভালো। কাল রাতে
ঘুমোয়নি ভালো করে। ইয়ে, মানে, আপনি কি
রোজই এতো ভোরে—?
সত্য : (হেসে) হ্যাঁ, আমার তো বহু কাজ সকালেই। যাই দেখি, মালিটার সাড়া নেই। কী যে করে সব!
[বলতে বলতে বাগানে নেমে চলে গেলো। রতিকান্ত সমুদ্রের দিকে ফিরে কী যেন খুঁজতে লাগলো। তারপর ফিরে নিজের পোশাকটা খেয়াল করে তাড়াতাড়ি ভিতরের দিকে গেলো। সঞ্জয় বেরেচ্ছিলো, প্রায় ধাক্কা লাগলো। তার পরিধানে পায়জামা পাঞ্জাবি, খুব পরিষ্কার নয়।]
রতি : ওঃ এক্সকিউজ মি—
সঞ্জয় : আরে, রতিকান্তবাবু! আপনার
এতো ভোরে ওঠার অভ্যেস, জানা ছিল না তো?
রতি : না না, অভ্যেস কোথায়? আজই শুধু—
আপনি যে এতো তাড়াতাড়ি?
সঞ্জয় : তাড়াতাড়ি বলে তাড়াতাড়ি? চার ঘণ্টা আগে!
রতি : কী ব্যাপার?
সঞ্জয় : ঘটনাটা স্যার
অতীব বিস্ময়কর বলা যেতে পারে।
অসম্ভবও বলা চলে প্রায়।
রতি : মিরাক্‌ল্?

সঞ্জয় : তাও বলা যায়।
আসল কারণখানা খুলে বলি তবে
জুৎ করে বসে।
[রতিকান্তকে বসাবার চেষ্টা করলো]

রতি : ইয়ে। আপনি বসুন,
এখুনি আসছি আমি। মানে এই
পোশাকটা ছেড়ে রাখি—

সঞ্জয় : কেন কেন? বেরুবেন না কি?

রতি : না। হ্যাঁ, ঐ—মানে, সমুদ্রের ধারে—
সময়টা মন্দ নয়, সূর্যোদয়—

সঞ্জয় : সূর্যোদয়? কই? কই? কোনোদিন দেখি নি জীবনে!
[সমুদ্রের দিকটায় গেলো পরম আগ্রহে]

রতি : উদয় অবশ্য এতোক্ষণে
গেছে চুকে। তবু যাকে বলে—

সঞ্জয় : চুকে গেলো? যাচ্চলে!
এবারও তাহলে ফস্কে গেলো?
এতো ভোরে বিছানা ছেড়েও?
তবে আর বাকি জীবনেও হবে না কখনো।
আয়ু আর কতোটুকু বাকি?

রতি : না না, সে কী?

সঞ্জয় : আর কী, বলুন? ছত্রিশ বসন্ত হোলো পার,
বাকি আর কতো দিন?

রতি : অন্তত ছত্রিশ আরো—

সঞ্জয় : তাও যদি হয়, ক'টা দিন ওঠা হবে তার
ভুতুড়ে এ ভোররাতে? ক'টা দিন তারও
মনে রবে আকাশে তাকাতে? আবার ধরুন—
পুবের আকাশটারও দেখা পাওয়া চাই!
ইয়ে—সূর্য তো পুবেই ওঠে, না?

রতি : (হেসে) তাই তো শুনেছি।

সঞ্জয় : হ্যাঁ, শোনা কথা। জীবনের অধিকাংশ কানে শোনা,
চাক্ষুষ হোলো না দেখা অনেক কিছুই।
[সিগারেট বার করলো]

রতি : আচ্ছা, আমি—ইফ্ ইউ পারমিট্—

সঞ্জয় : হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয় নিশ্চয়! পোশাক চড়িয়ে নিন।
[রতি ভিতরের দিকে গেলো]
আমিও না হয় ঘুরে আসি আপনারই সাথে।
[রতি থমকে গেলো]

সূর্যোদয়
নাই হোলো দেখা? তবুও প্রভাতে
সমুদ্রের তীরে পদচারণায়
স্বাস্থ্যলাভ। কী বলেন?

রতি : হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো ভালো কথা। মানে ইয়ে, যাকে বলে—

সঞ্জয় : আপত্তি নেই তো কোনো?

রতি : (কাষ্ঠ হেসে) না না, আপত্তি কিসের? ভালোই তো, ভালোই তো, তবে কিনা,
গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে যদি—
মানে, বিনা চায়ে বেরুনোটা—

সঞ্জয় : মহাপাপ, মহাপাপ! খাঁটি কথা বলেছেন।
বিনা চায়ে বেরুনো তো দূরে থাক,
বিছানা ছাড়াই মহাপাপ! বসে যান রতিকান্তবাবু, তিন কাপ
পর পর খেয়ে
প্রায়শ্চিত্ত করি। (হেঁকে) বাবা ব্রিজলাল! তড়িঘড়ি চা-পানি বুলাও!
বসুন, কী হোলো আপনার?

রতি : হ্যাঁ, না, মানে— পোশাকটা ছাড়া দরকার—

সঞ্জয় : চা খাবার আগে?
না না, রতিকান্তবাবু! পাতকের ভার
আরো বাড়াবেন? রীতি নীতি ধর্মজ্ঞান
সবই হারাবেন? তা ছাড়া ধরুন—
আপনার এ গাউন, এ তো খোদ
চায়েরই পোশাক?

[ব্রজলাল এলো। হাতে ট্রেতে টী পট কাপ ডিশ]

এই তো, এই তো ব্রিজলাল,
বেঁচে থাক বাবা। ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক।

ব্রজ : সেলাম হুজুর, সীয়ারাম।

সঞ্জয় : রাম রাম, সেলাম সেলাম। সকালে মেলেই চোখ
কেন তোর পেলাম না দেখা
অমৃতের ভাণ্ড হাতে?

ব্রজ : বাবুসাব, এ রোকোম ভোর রাতে
কখনো তো আপনিকে দেখেছি না? তাই—

সঞ্জয় : সে কথা পরম সত্য। তোর দোষ নাই,
আমারই বিভ্রম।
[ব্রজ এর মধ্যে দু' কাপ চা ঢেলে এদের টেবিলে দিয়েছে। বাকি স
টেবিলে।]
(রতিকে) গৃহিণী কি সুখস্বপ্নে মজ্জমান?

রতি : (হেসে) জানি না স্বপ্নের কথা। ঘুমে মজ্জমান,

এটুকুই জানি। আপনার?

সঞ্জয় : আমারও তদ্রূপ।

[ব্রজ দু' কাপ চা ঢেলে নিয়ে ভিতরের দিকে যাচ্ছে দেখে সগর্জনে]

এই! কোথা যাস?

ব্রজ : (ঘাবড়ে) মেমসাব? আপনির, হুজুরের— ?

সঞ্জয় : কোনো হুজুরের মেমসাব
এখনো ওঠে নি! রাখ্! রেখে দে এখনি কাপ!

ব্রজ : জী হুজুর। ম্যানেজারসাব
কুনখানে জানেন বাবুজি?

রতি : ওদিকে, বাগানে।

[ব্রজ এক কাপ চা টেবিলে রেখে অন্য কাপটা নিয়ে বাগানে নেমে চলে গেলো]

সঞ্জয় : খেয়েছিলো বেটা! হতভাগা এটাও জানে না—
যতোক্ষণ গৃহিণী ঘুমোন, ধরণীতে শান্তি থাকে।
খুলে বলি আপনাকে—
আজ যে সঞ্জয় ঘোষ শেষরাতে ছেড়েছে বিছানা,
একমাত্র হেতু তার, জানা—
ঘরণীর বাক্যমুক্ত ধরণীকে কী রকম লাগে।
আগে কোনোদিন
প্রিয়ার সুকণ্ঠ ছাড়া ভেঙেছে যে ঘুম—
এ কথা পড়ে না মনে।
এ অবশ্য ব্যক্তিগত কথা, একান্ত নিজস্ব আমাদের।
মিসেস সান্যাল, যতোদূর দেখি—
অতি শান্ত, মধুর স্বভাব। তাই নয়?

রতি : (হেসে) দূর থেকে তাই মনে হয়।

সঞ্জয় : (দীর্ঘশ্বাসে) আমার পত্নীর কণ্ঠসুধা
দূরে দূরান্তরে প্রচারিত রতিকান্তবাবু।

রতি : আপনি লেখক। এক্সাজারেশন
করেছেন ধর্মজ্ঞান।

সঞ্জয় : আমার পত্নীর গুণপনা—
যতোই অত্যুক্তি করি, নাগাল পাবে না।

[ব্রজ খালি হাতে ফিরে ভিতরে চলে গেলো]

রতি : আচ্ছা, মিস্টার ঘোষ, যদি কিছু না মনে করেন—

সঞ্জয় : মনে আমি কিছুই করি না
গৃহিণীর কাংস্যকণ্ঠ ছাড়া। নির্ভয়ে বলুন
যা আছে বলার।

[সত্য এর মধ্যে কাপ হাতে নিঃশব্দে এসে বাগানে বসেছে। ওরা দেখে নি।]

রতি : বলছিলাম কী—

এই যে বলেন বার বার
আপনার স্ত্রীর কথা, এ কি সিরিয়াস?

সঞ্জয় : তবে কী ভাবেন আপনি? পরিহাস?

রতি : গোড়ায় ভেবেছি তাই। অনেকেই দেখি—
এ রকম ঠাট্টা করে বলে। আসলে গভীর প্রেম।

সঞ্জয় : (গম্ভীরভাবে) অনেকের কথা
অনেকেই জানে। আমি শুধু জানি এই—
অতীতের একখানি ভুলে
জীবনের কাজ ছারখার হয়ে গেছে।

রতি : তার মানে?

সঞ্জয় : পরিহাস? পরিহাস বিধাতার।
ঐ ক্ষুরধার রসনার সাথে
যদি অমি বদ্ধ না হতাম
বিবাহবন্ধনে চিরজীবনের মতো—
সঞ্জয় ঘোষের নাম অন্যভাবে লেখা হোতো তবে
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে। আপনার কাছে
জানাতে সঙ্কোচ নেই, আমার যা আছে আজ,
তাই নিয়ে ব্রজপুরে সমুদ্রবিলাস
দুঃসাহসী কাজ। তবু কেন
এসেছি জানেন? আটটি বছর ধরে একটানা
গঞ্জনার ঠেলা খেয়ে।

রতি : কী গঞ্জনা?

সঞ্জয় : দারিদ্র্যের। তার মতো মহামূল্য মেয়ে
আমাকে বিবাহ করে কী যাতনা সয়,
কী দারিদ্র্যে অর্থকষ্টে কাটায় জীবন—
এই কথা। এই একমাত্র কথা প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায়।
অথচ মজাটা এই—
এই একই গঞ্জনার চাপে
লেখার বারোটা বাজে, উপার্জনও পরিমাপে কমে।

রতি : (অল্প থেমে) তার মানে, ওঁর সাথে বিয়েটা না হয়ে
যদি আপনার—

সঞ্জয় : হয় নি, হয় নি বিয়ে, করেছি আমিই!
হওয়া তো অন্যের হাতে, নিয়তির মতো।
আমিই করেছি বিয়ে বেছে বেছে দেখে শুনে
প্রেমে পড়ে গেছি ধরে নিয়ে। এ আমারই ভুল।
যা তার মাশুল—এতোদিন আমিই দিয়েছি,
আরো দিতে হবে বহুদিন।

কিন্তু সরি, কী বলছিলেন?

রতি : বিশেষ কিছুই নয়, শুধু
ইচ্ছে হয় জানবার—
কেমন ওয়াইফ পেলে আপনার কেরিয়ার,
মানে—অ্যাজ এ রাইটার—
সাক্‌সেস্ হোতো?

সঞ্জয় : মাই গড্! রতিকান্তবাবু,
এটা কি প্রশ্ন হোলো?
শূন্য ঘর শূন্য ঘর। ঘরণীবিহীন
স্ত্রীচরিত্রবিবর্জিত পবিত্র আশ্রম--চিরকুমারের বাসা,
নিশ্ছিদ্র শান্তিতে ঠাসা একার সংসার!
লেখকের একমাত্র স্বপ্ন এই, লক্ষ্য এই,
বাঁচবার লেখবার উপায়ও এই! তবু ক্ষণিকের ভুলে
কতো শত লেখকের মৃত্যু হয় আরম্ভেরও আগে,
সরস্বতী ভাগে—মনসার দুর্বাক্যের বিষে।

রতি : এর তবে সমাধান কিসে?

সঞ্জয় : সমাধান? কিছু নেই। একবার ভুল হলে
গতি নেই আর। শুধু এই বকবক—
যতটুকু হাল্কা হয় ভার।

রতি : আপনি লেখক, আপনার
আলাদা প্রবলেম। আমি চাই—
সত্যকার প্রেম। একা থেকে ব্যাচেলার জীবনযাপন—
সে আমার নয়।

সঞ্জয় : সে তো অতি ন্যায্য কথা। আপনি তো
ব্যাচেলার নন? দুঃখ নেই।

রতি : দুঃখ সেই কারণেই!

সঞ্জয় : মানে?

রতি : ভগবান জানে, স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যের কোনো গাফিলতি
কখনো ঘটে নি। গৃহিণীর মর্যাদার ক্ষতি
আমা হতে কখনো হবে না।
তাতে যদি তিলে তিলে মৃত্যু হয়,
তা হলেও নয়।

সঞ্জয় : দাঁড়ান, দাঁড়ান!
তবে কি বলতে চান— মিসেস সান্যাল— ?

রতি : দেখুন মিস্টার ঘোষ, আপনার কাছে
আমার নিজস্ব কথা কিছু যদি কন্‌ফাইড করি,
আশা করি—

সঞ্জয় : বিলক্ষণ! আপনার বিশ্বাসের কোনো অমর্যাদা—

[রতিকান্ত হঠাৎ চমকে উঠে দাঁড়ালো। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে সমুদ্রের দিক থেকে বনলতা এলো। সদ্যস্নাতা, হাতে আধভিজে কাপড়ের ব্যাগ। সঞ্জয়ও উঠে দাঁড়ালো।]

রতি : নমস্কার মিস রায়। স্নান হয়ে গেলো?

সঞ্জয় : নমস্কার নমস্কার।

বনলতা : সর্বনাশ!

রতি : কেন কেন?

সঞ্জয় : আমাদের নমস্কারে আপনার সর্বনাশ কিসে?

বনলতা : নমস্কারে নয়। আবির্ভাবে। এ কী সারপ্রাইজ?
এতো ভোরে যুগল উদয়? অথচ একটু আগে
স্বচক্ষে দেখেছি সান্‌রাইজ!
পুবেই উঠেছে সূর্য, পশ্চিমে তো নয়?

সঞ্জয় : দেখেছেন সূর্যোদয়?

বনলতা : আমি তো রোজই দেখি! আজ বুঝি
আপনাদের পালা?

[চা ঢালতে গেলো]

সঞ্জয় : (দুঃখে) কই আর হোলো মিস্ রায়?
ফস্কে গেলো আজও।

রতি : ও চা-টা তো ঠাণ্ডা একেবারে!
দাঁড়ান, দেখছি আমি—

বনলতা : যথেষ্ট গরম, ব্যস্ততার কিছু নেই।

রতি : না না, তা কি হয়? ব্রিজলাল! ব্রিজলাল!

[মহা ব্যস্ত হয়ে ভিতরে চলে গেলো]

বনলতা : কাণ্ডটা দেখুন! অবশ্য এ চা-টা
ঠাণ্ডা হয়ে গেছে সত্যি, তবু মিছিমিছি—

সঞ্জয় : আপত্তিটা কী? এই ফাঁকে আমাদেরও
দু'পাত্র উষ্ণতা যদি জোটে?

বনলতা : আপনি ভীষণ স্বার্থপর। অতসী কোথায়?

সঞ্জয় : এখনো নিদ্রায় মগ্না। স্বার্থপর কেন?

বনলতা : লেখকেরা স্বার্থপরই হয়।

সঞ্জয় : আই সী, জাতেরই দোষ।
হায় রে সঞ্জয় ঘোষ, কেন যে লেখক হতে গেলি?

[রতিকান্ত এলো]

রতি : চা আনছে ব্রিজলাল— দু' মিনিট।
ওটা রেখে দিন।

বনলতা : থ্যাঙ্ক ইউ। করুণাও ওঠে নি এখনো?

রতি : যতোদূর জানি— তাই।

সঞ্জয় : নেপচুন হ্যাপী লজে আপনার মতো
এমন জাগ্রতা দেবী আর কেউ নাই।

বনলতা : (হেসে) কী দেবী? শ্মশানকালী?

সঞ্জয় : তোবা তোবা, তাই কি বলেছি?

রতি : গেছেন সঞ্জয়বাবু। সাহিত্যিক ফ্লোর্‌ড্‌!

সঞ্জয় : তা কী করে হয়? আমি তো ফ্লোরেই আছি বরাবর
চিৎ হয়ে শুয়ে।
[সিগারেটের প্যাকেট খুললো, একটাও সিগারেট নেই]
অন্তঃসারশূন্য এই প্যাকেটটার মতো।

রতি : তবু ইন দ্য ব্যাট্‌ল অফ্‌ উইট—
মিস্‌ রায়ের জিৎ।

সঞ্জয় : মেয়েদের বরাবরই জিৎ। ইয়ে—
দু' পাঁচ মিনিট যদি মাপ করে দেন,
সিগারেট কিনে আনি। বুদ্ধির গোড়ায় কিছু ধোঁয়া দিয়ে ফের
ব্যাট্‌লের চেষ্টা করা যাবে।
[সঞ্জয় চলে গেলো। বনলতা রতিকান্তর দিকে তাকালো। রতিকান্ত আগে থেকেই বনলতার দিকে চেয়ে ছিল গভীর দৃষ্টিতে।]

রতি : বনলতা!

বনলতা : বলো।

রতি : আর একটা দিন কেটে গেলো।

বনলতা : আর একটা দিন।

রতি : এসে গেলো ফেরার সময়। ফেরা।
কিন্তু কোথা?

বনলতা : কলকাতা। ছুটির মেয়াদ শেষ।

রতি : তবু গত সন্ধ্যার রেশ
রয়ে যাবে, যতো দূরে যাই,
যতো কাজে নিজেকে ডোবাই এ ছুটি ফুরোলে।

বনলতা : গত সন্ধ্যার
এতোই কি দাম? যে শূন্যতা
হাসিমুখে সহ্য করে চলো, তার কতোটুকু
ভরাবার শক্তি রাখি? আমি শুধু
শুনে যেতে পারি, চেষ্টা করি বোঝবার।

রতি : ঐ শোনাটুকু, ঐ বোঝা, ফীল করা,
নীরব সিম্‌প্যাথি— এ যে কতোখানি দামী,
কী করে জানাবো আমি? এই শূন্য জীবনের
গুটিকয় মুহূর্তের দান যেটুকু পেলাম—

তার জন্য রয়ে যাবো চিরঋণী!

বনলতা ছি ছি, ও কথা বোলো না।
শুধু কি দিয়েছি? পাই নি কি কিছু?

রতি : তোমায় কী দিতে পারি? আমার লোনলিনেস্ দিয়ে
তোমাকে ডিস্টার্ব্ করি শুধু।

বনলতা কাল সন্ধ্যার পর
এই কথা শোনালে আমাকে?

রতি : আমার যে দুর্বিষহ ভার
তার চাপে রিক্ত হয়ে আছি। কী দেবো তোমায়?

বনলতা দিও না কিছুই। যা পাবার,
এমনিই পাই, আরো পাবো।

রতি : সবই সহ্য করে গেছি, আজও করি,
তবু মাঝে মাঝে মন
বিদ্রোহে চিৎকার করে ওঠে!
কেন, কেন তোমার সাক্ষাৎ
পাই নি তখন—যখন সময় ছিল?
তোমার আমার মধ্যে যে বাঁধন অনুভব করি—
তার কেন প্রকাশ হোলো না
সঠিক মুহূর্তটিতে? যদি আর একবার
জীবন আরম্ভ করা যেতো—

বনলতা : অতীত আসে না ফিরে। ঠিক ওরকম
আমিও ভেবেছি কতো। বৃথা যতো স্বপ্নবিলাস!
জীবনের পথ বেছে নিতে
একবার ভুল হলে আর গতি নাই।

রতি : সত্যি তাই! একবার ভুল হলে—
[বনলতা মুখে আঙুল দিয়ে থামতে ইসারা করলো। ব্রজ চা নিয়ে এলো।]

ব্রজ : রাম রাম দিদিমণি। চা লায়েছি গরমাগরম।

বনলতা : রাম রাম ব্রিজলাল।
[সত্য এতোক্ষণ পরম উপভোগে শুনছিলো। এখন উঠে এলো বারান্দায়।]

সত্য : আরে, মিস্ রায়? হয়ে গেলো স্নান? সমুদ্র কেমন ছিল আজ?

বনলতা : ভালো, তবে খানিকটা রাফ্।

সত্য : থাক বাবা ব্রিজলাল, আমরাই ঢেলে নেবো 'খন।
তুমি যাও, ব্রেকফাস্ট লাগাও।
[ব্রজ চলে গেলো। সত্য চা ঢালতে গেলো। সঞ্জয় ফিরে এলো।]

সঞ্জয় : এই যে পৌঁছে গেছে চা? বেছে বেছে
কেমন মুহূর্তটিতে আমিও পৌঁছে গেছি, দেখেছেন?

সত্য : আপনি যে এতো ভোরে?

সঞ্জয় : অতি বড়ো মুনি ঋষি,
তাদেরও তো হয়ে যায় পদস্খলন
মাঝে মাধ্যে? আমারও এ তাই, সত্যবাবু।
[সত্য এক কাপ চা এগিয়ে দিলো]
আহা দিন দিন! আপনি দীর্ঘায়ু হোন,
ঘরের ছপ্পড় ফুঁড়ে আসুক বৈভব।
[সবাই চা নিলো]

বনলতা : সত্যবাবু, গাঁয়ে আজ কিসের উৎসব?

সত্য : কে বলেছে?

বনলতা : আমায় বলে নি কেউ, দেখলাম—
দলে দলে এলো সব সমুদ্রের তীরে,
মেয়ে পুরুষের মেলা। ঐ পাশে,
ভিলেজের রাস্তা ঘেঁষে
বুড়ো বকুলের নিচে এসে পুজো দিলো,
সমুদ্রে ভাসালো ফুল, মালা, বেলপাতা—
কিসের এ পুজো?

সত্য : কে জানে কিসের?
এদের তো বারোমাসে ছত্রিশ পরব।

বনলতা : আর গান। গান শুনে মনে হয়—
এ পুজো ভয়ের। যেন কোনো অপদেবতাকে
শান্ত রাখা চাই।

সঞ্জয় : তাই না কি? তবে তো কোনো ফাঁকে
পদ্ধতিটা শিখে নিতে হবে।

বনলতা : আচ্ছা সত্যবাবু, বুড়্ঢাজিন কাকে বলে এরা?

সত্য : বুড়্ঢাজিন? কোথায় শুনলেন?

বনলতা : আমি তো বেড়াই ঘুরে ঘুরে,
গ্রামের লোকের সঙ্গে কথা বলি, কথা শুনি,
ঐ তো আমার দোষ।

রতি : দোষ? শুনুন শুনুন মিস্টার ঘোষ!
এমন যে স্বাস্থ্যকর কিউরিয়সিটি—

বনলতা : বলুন না সত্যবাবু?

সত্য : (ধীরে ধীরে) এরা বলে বুড়্ঢাজিন সমুদ্দুরে থাকে,
সমুদ্রের অপদেবতা সে।
বুড়্ঢাজিন খেয়ালি দেবতা,
দয়ালু দেবতা, মানুষের দুঃখ দেখে
বুক ফাটে তার।
কার কোন্ উপকার করা যায়

তাই খুঁজে খুঁজে ফেরে বছরের একদিন।

বনলতা : বছরের একদিন? কোন্‌দিন?

সত্য : (হেসে) সে কথা জানি না। নইলে আমারও কতো
অপূর্ণ বাসনা ছিল মনে, কিছুই হোলো না তার।

রতি : যতো সব আজগুবি কুসংস্কার, সুপারস্টিশন!

সত্য : সে কথা একশোবার।

বনলতা : বুড়োজিন এতো যদি উপকারী হয়,
গাঁয়ের এ হাল কেন তবে?

সত্য : ওরে বাবা! পাছে উপকার করে বুড়োজিন—
এই ভয়ে বছরের ঐ দিন ওরা সব
কাঁটা হয়ে থাকে ভয়ে, দোবে দিয়ে রাখে খিল।

বনলতা : সে কী? কেন কেন?

সত্য : ওরা বলে— বুড়োজিন
ভালো মনে যাই দিয়ে যাক,
ফল তার ভালো হয় নাকো।

বনলতা : কী রকম? কী রকম?

[হঠাৎ করুণা এলো ভিতর থেকে। কিছুটা উদ্‌ভ্রান্ত।]

করুণা : আরে, সবাই এখানে?
(রতিকে) তুমি— তুমি কখন উঠেছো?

রতি : এই তো এখনি। মানে— কিছুক্ষণ আগে।

করুণা : বনলতা? ইয়ে, অতসী কোথায়?

বনলতা : ঘুমোচ্ছে বোধ হয়। কেন, কী ব্যাপার?

করুণা : ব্যাপার? না, কিছু নয়, এমনি জিজ্ঞেস—
আচ্ছা আমি— আমি দেখি গিয়ে—

সঞ্জয় : (শশব্যস্তে) মিসেস সান্যাল!

করুণা : (চমকে) অ্যাঁ? কী, কী?

সঞ্জয় : আপনি কি— অতসীকে ওঠাতে যাচ্ছেন?

করুণা : আমি? হ্যাঁ না, মানে— কেন, ইয়ে— অতসীর
শরীর কি ভালো নেই?

সঞ্জয় : (নিশ্বাস ফেলে) অতসীর শরীর খারাপ
আমি তো দেখিনি কোনোদিন।

করুণা : তবে?

সঞ্জয় : না কিছু না! যান, তুলে দিন।

বনলতা : কী ব্যাপার বলো দেখি?

করুণা : (কাষ্ঠ হেসে) না না, ব্যাপার কী হবে?

[যেতে গিয়ে ফিরে]

ইয়ে, বনলতা! একটু এসো না ভাই, কথা আছে।

রতি : (বিরক্ত) কী হয়েছে বলো দেখি?
আমরা এখানে এক
ইন্টেরেস্টিং বিষয়ের ডিস্‌কাশন—
করুণা : তবে থাক বনলতা, পরে হবে।
আমি যাই—
বনলতা : (কৌতূহলে) না না, চলো,
কী কথা বলবে বলো, শুনে আসি।
আসছি এখনি।
[করুণা আর বনলতা ভিতরে গেলো]
রতি : আসরটা ভেঙে দিয়ে গেলো!
কখন যে কী খেয়াল চাপে!
সঞ্জয় : (অপমানে) 'রতি-কান্ত-বাবু'।
রতি : কী, বলুন?
সঞ্জয় : (পূর্ব্ববৎ) 'মিস্টার সান্যাল'। 'সত্যবাবু'।
সত্য : আজ্ঞে?
সঞ্জয় : 'মিস্টার'। 'বাবু'। 'আজ্ঞে', 'কী বলুন'।
অথচ ওদের দেখেছেন?
দশদিন গেছে কি না গেছে, এরই মধ্যে—
'বনলতা শোনো ভাই', 'করুণা কোথায়'?
'অতসীটা এখনো ঘুমোয়'?
'চলো ভাই, এসো ভাই, তুলে দিই গিয়ে'!
সত্য : (হেসে) এ কি ঈর্ষা আপনার? না কি রাগ?
সঞ্জয় : কোনোটাই নয় সত্যবাবু। যা ঘটে, যা হয়,
তাই শুধু বলা।
ব্রজ : (ভিতর থেকে, ঘণ্টা বাজিয়ে হেঁকে) বির্কফাস্ট! বির্কফাস্ট!
সত্য : বেটা যেন নিলামের দারোয়ান!
[প্রকাণ্ড এক ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে ব্রজর প্রবেশ]
ব্রজ : বির্কফাস্ট রিডী সাব— হুজুর— বাবুমশাই!
সঞ্জয় : (কানে হাত চাপা দিয়ে) যাই! যাই বাবা, যাই যাই!

দ্বিতীয় দৃশ্য

[আধ ঘণ্টা পরে। করুণা এলো, চাপা উত্তেজনা। পাঁচিলে ঝুঁকে বাগানটা দেখে নিলো এদিক ওদিক। অতসী এলো, সেও উত্তেজিত।]

করুণা : বনলতা কই?
অতসী : আসবে এখনি। ওদিকে নেই তো কেউ?

করুণা : না।

অতসী : দেখি ওরা কতোদূর গেলো।

[সমুদ্রের দিকে তাকালো]

করুণা : দেখা যায়?

অতসী : ঐ তো ওখানে— সমুদ্রের কাছাকাছি প্রায়।
আমার রত্নখানি হাত নেড়ে বক্তৃতায় রত।
ঐ শুধু জানে,
বড়ো বড়ো কথা শুধু মুখের দোকানে!

[বনলতার প্রবেশ। প্রসাধন বেড়েছে এর মধ্যে।]

করুণা : অতসী! অতসী এসো, বনলতা এসে গেছে।

[তিনজনে একটা টেবিল ঘিরে বসলো]

বনলতা : ভালো করে ভেবে দেখো—
সী-বীচে হারায় নি তো কাল?

করুণা : না না অসম্ভব! সমুদ্রের তীরে
গেছি তো বিকেলে কাল? সন্ধেবেলা ফিরে
পরিষ্কার মনে আছে— দেরাজে রেখেছি খুলে।

বনলতা : রাতে আর করো নি তো বার?

করুণা : না না, একেবারে গেছি ভুলে।

অতসী : তারপরে দরোজাটি খুলে রেখে
চলে গেছো খাবার সময়ে দু'জনেই?

করুণা : ঠিক তাই।

অতসী : স্পষ্ট কথা বলি ভাই,
অতোখানি অখেয়ালি হওয়া
ঠিক নয়। খাবার সময়
আমি তো প্রতিটি বেলা দরোজায় তালা দিয়ে যাই।

করুণা : আমি কি ভেবেছি ছাই
এ রকম হতে পারে?

অতসী : আহা, দুনিয়া কি সাধুতে বোঝাই?
বলি তবে শোনো।
আমার বিয়ের আগে, একবার
কোনো এক বিয়েবাড়ি পরে গেছি জড়োয়ার সেট্।
সেট্ মানে— নেকলেস, ব্রেসলেট্, আর
কানে ছিল এক জোড়া দুল।
ভুল হোলো কোন্‌খানে জানো—

বনলতা : কিন্তু অতসী ভাই, এদিকটা ভাবো,
যা কিছু করার আছে, তাড়াতাড়ি করে ফেলা চাই।

অতসী : (বাধা পড়ায় বিরক্ত) তা ভাবো না, ভাবো না বাবা,

আমি কি বলেছি কোনো কথা?
সতর্কতা কী জিনিস আমি শুধু তাই—

বনলতা : (করুণাকে) আমার তো মনে হয় মিস্টার সান্যাল
জানলেই ভালো।

করুণা : ওরে বাবা! তাহলে রক্ষে নেই,
তিনমাস ক্যাট্ ক্যাট্ কথা শোনাবে সে।

বনলতা : না না, কী যে বলো?
অত্যন্ত সিম্প্যাথেটিক—

[করুণা বনলতার দিকে সোজা তাকালো]

করুণা : বনলতা, কতোবার শোনাবো তোমায়—
ইংরিজি জানি না আমি।

বনলতা : ওহো, সরি! মানে ওটা
অতি সাধারণ কথা কিনা? শক্ত কিছু নয়—

করুণা : দুঃখের বিষয়,
সাধারণ ইংরিজিও হয় নি কো শেখা।
পুরোনো বনেদি ঘর,
মেয়েরা ইংরিজি শেখে— ভাবাও দুষ্কর। চাকরি করার
ছিল না তো দরকার কোনো?

বনলতা : (চাপা রাগে হেসে) লেখাপড়া শেখবার
সুযোগ পাওনি— ভালো কথা। তাই নিয়ে
অহঙ্কার কেন?

করুণা : অহঙ্কার করি নি মোটেই—

বনলতা : আর, আমি যে চাকরি করি তাতে
লজ্জার কোনো কিছু নেই।
স্টেনো হয়ে কাজ শুরু করে
আমি আজ পাবলিক রিলেশনে
কোম্পানির সিনিয়র অফিসার।

করুণা : জানি জানি! কতোবার শোনাবে ও কথা?

অতসী : এবার কে নিয়ে এলো বাজে কথা?
যতো দোষ আমারই কেবল?

বনলতা : আমি খালি—

করুণা : যেতে দাও, যেতে দাও ও সব কচালি!
মুখ্যু আমি। কখন কী বলে ফেলি—
ভুলে যাও ভাই! এখন কী করি বলো।

বনলতা : আমি তো বলেছি—

করুণা : সে হবে না ভাই। ওর কাছে বলা যদি যেতো,

তবে আর তোমাদের কাছে
পরামর্শ কেন চাইলাম?

বনলতা : না পেলে তো বলতেই হবে?

অতসী : আলবাৎ পাওয়া যাবে!
চোর কে যে— সে তো পরিষ্কার?

করুণা : কিন্তু ধরো, করেছে পাচার
এরই মধ্যে? নিয়েছে তো রাত্রে কাল—

বনলতা : ডিনার টাইমে। পেয়ে গেছে অনেক সময়
আনডাউটেড্— মানে যাকে বলে—
নিঃসন্দেহ।

অতসী : করুক পাচার। তবু করে দেবে বার
চাপ খেলে পরে।

বনলতা : চাপ দেবে কী রকম করে?
হাতেনাতে পড়ে নি তো ধরা?

অতসী : হাতেনাতে ধরছি দেখো না
ফাঁদ পেতে।

করুণা : ফাঁদ?

অতসী : দেখো শুধু চোখ মেলে— কী করেন চাঁদ।
[অতসী হাতের আংটি খুলে দেখালো। তারপর উঠে বাগানে গেলো। এরাও গেলো। বেদির উপর আংটিটা রেখে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ফিরে এলো অতসী ওদের নিয়ে। ইসারায় বসালো ওদের। নিজে ভিতরের দিকে গিয়ে হাঁকলো।]
ব্রজলাল! ব্রজলাল!

ব্রজ : (ভিতর থেকে) জী হুজুর মেমসাব!

অতসী : বাইরে এসো তো একবার!

ব্রজ : (ভিতর থেকে) হাঁ হাঁ দিদিমণি, আভি আসছি বাহার।

অতসী : (অন্যদের) যা কিছু বলতে হয়, আমি আছি।
তোমরা গল্প করো শুধু। ভাব করো—
কিছুই হয় নি যেন।
[এরা যথাসম্ভব নির্বিকারতার ভাব করলো। কিন্তু কথা বেরুলো না।]
চুপ করে বসে আছো কেন? কথা বলো!

করুণা : কী কথা বলবো বলো?

বনলতা : যা খুশি বলো না তাই—

করুণা : তুমিই করো না শুরু?

অতসী : কী আশ্চর্য! এমনিতে এতো কথা বলো—

করুণা : আমি আর ক'টা কথা বলি? বনলতা—

অতসী : (চাপা গলায়) চুপ! এসে গেছে!
শিগ্‌গির শুরু করো কথা!

করুণা : (হঠাৎ চেঁচিয়ে) জানো বনলতা। আমি আজ, ইয়ে—

[থেমে গেলো। ব্রজর প্রবেশ।]

বনলতা : (উদ্‌ভ্রান্তভাবে) তাই বলছিলাম—
এমন সুন্দর দিন, মানে—
সমুদ্রটা কী যে ভালো লাগছিলো আজ,
মনে কী যে এলো ভাব—
যেন ঠিক— যেন— যাকে বলে—

ব্রজ : সেলাম মেমসাব!

[বনলতার পিঠ ব্রজর দিকে ছিল। আঁৎকে উঠলো কণ্ঠস্বর।]

বনলতা : অ্যাঁ কে? ও, ও তুমি? ব্রিজলাল?

ব্রজ : কী হুকুম বোলেন মেমসাব।

বনলতা : হুকুম? সে আমি নই, আমি নই—

অতসী : আমি ডাকলাম। ইয়ে, ব্রজলাল।
দেখো তো বাগানে গিয়ে—
আংটিটা কোথায় যে খুলে পড়ে গেলো—

ব্রজ : আংটি? সোনেকা ছিল?

অতসী : সোনা না তো কি? পান্না বসানো—

ব্রজ : পান্না ভি ছিল? কুনখানে? গিরলো কুথায়?

অতসী : ঐ তো বাগানে। বেঞ্চিতে বসে বসে তিনজন
এতোক্ষণ কথা বলেছি তো?
কখন যে পড়ে গেছে খুলে—
দেখো না বেরিয়ে?

ব্রজ : হাঁ হাঁ তুরন্ত্ দেখছে।
রোবে তো মিলিবে যাবে ঠিক।
[বলতে বলতে বাগানে নেমে গেলো। করুণা উঠে দেখতে গেলো, অতসী হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিলো। কথা বলতে বললো ইঙ্গিতে।]

করুণা : বনলতা, কী বলছিলে তুমি?

বনলতা : আমি? মানে, ঐ—
ভোরবেলা বীচের উপর সূর্যোদয়,
মানে সানরাইজ্— সে এক অপূর্ব দৃশ্য,
যাকে বলে ম্যাগনিফিসেন্ট,
গ্লোরিয়াস! বুঝেছো করুণা? ও না,
গ্লোরিয়াস মানে— মহিমা, মহিমান্বিত

[আর পেরে উঠলো না, থেমে গেলো।]

অতসী : (তাড়াতাড়ি) হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক!
মহিমই তো নাম? এতোক্ষণে মনে পড়ে গেলো—
মহিম, মহিম, ঠিক!

[এর মধ্যে ব্রজ আংটিটা পেয়েছে। হাতে নিয়ে বারান্দার দিকে চেয়ে ট্যাকে গুঁজে ফেললো। সত্য যে নিঃশব্দচরণে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, সেটা দেখলো না। সত্য একটু হেসে সরে গেলো। ব্রজ আরো খোঁজবার ভান করলো।]

করুণা : (ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে) কে মহিম?

অতসী : (জ্বলন্ত চোখে) কে মহিম? এতোক্ষণ
কী বললাম তবে?

করুণা : (খেয়াল করে) হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ মহিম মহিম!
মহিমই তো! মহিম না?
(আর্ত আবেদনে) বনলতা!

বনলতা : বটেই তো, মহিম মহিম? আমিও তো বরাবরই
বলছি— মহিম!

[তারপর আর কী বলা যায়? কাতরভাবে অতসীর দিকে তাকালো। অতসী উদ্‌ভ্রান্ত খুঁজে যে কথাটি পেলো, সেটা বনলতার দিকে ছুঁড়লো প্রশ্নের সুরে, আঙুল দেখিয়ে— যেন বনলতার দোষ।]

অতসী : সূর্যোদয়?

বনলতা : (বিভ্রান্ত) সূর্যোদয়?

অতসী : (নির্মম) সূর্যোদয় চমৎকার নয়? বীচের ওপর?

বনলতা : (কাতর) সে কথা তো বলেছি একবার?

অতসী : (হিংস্র) ফের বলো! রোজ রোজ ভোররাতে সমুদ্রের ধারে আমরা কি যাই?

করুণা : (আত্মরক্ষার্থে আক্রমণ) যাই? বলো?

বনলতা : (তিক্তস্বরে) গেলে বাঁচা যেতো।

ব্রজ : (চেঁচিয়ে) মেমসাব!

অতসী-বনলতা-করুণা : (আঁৎকে উঠে একসঙ্গে) অ্যাঁ?

অতসী : (সামলে) পাওয়া গেলো, ব্রজলাল?

ব্রজ : নহীঁ তো, নহীঁ তো মেমসাব? বিলকুল নহীঁ।
[উঠে এলো বারান্দায়]

অতসী : সে কী? যাবে কোথা?

ব্রজ : কোতো ঢুঁড়লাম বাগিচায়। উধারে কুথাও নাই।
[সত্য আবার নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে আড়ালে]

অতসী : ঠিক বাৎ?

ব্রজ : বিলকুল ঠিক। আপনিকে বোলি মেমসাব,
হামার আন্দাজ— বাহারে গিরেছে বালুপর।

অতসী : বাহারে যাই নি মোটে, গিরবে কী করে?
বাগিচায় গেছি শুধু, সকালেও দেখেছি আঙুলে।

ব্রজ : তোবে হোতে পারে খুলে
রাখেছেন গোসল-খানায়। ঘাবড়ান মৎ,
আভি দেখিয়ে আসছি হামি—

[ভিতরের দিকে গেলো]

অতসী : (বজ্রকণ্ঠে) ব্রিজলাল! ইধারে আও!
[ব্রজ থেমে গেলো। এরাও চমকে গেলো গলা শুনে।]
ইধারে এগিয়ে আও এক্ষুনি
ভালো যদি চাও।

ব্রজ : মেমসাব—

অতসী : চোপরাও!
আংটিটা এখুনি নিকাল দাও!

ব্রজ : আংটি?

অতসী : শুধু আংটি নয়—

করুণা : আমার কানের দুল—

ব্রজ : দুল?

অতসী : কানকা মাকড়ি! বুঝা নেই?
ন্যাকা সেজে যাতা হ্যায়?
হামলোক সবাইকো বোকা পাতা হ্যায়?
[সত্যর মুখে উপভোগের হাসি]

ব্রজ : দিদিমণি, সচ্‌বাৎ— হনুমান দেওকা কসম—

অতসী : পাপ কাহে বাড়াতা ব্রিজলাল
মিথ্যে বাৎ বলে? আংটিকা ফাঁদ পেতে রাখা ছিল
বাগিচামে। শুধু ঐ মাকড়িকা জন্যে।
[ব্রজ আংটি বার করে টেবিলে রেখে মাটিতে বসে পড়লো। ভেঙে পড়লো নকল কান্নায়।]

ব্রজ : দিদিমণি, অঙ্গুঠা দেখকে
লালচ লাগলো, লিয়ে লিলো,
কসুর হো গয়া দিদিমণি
(কান মলে) আর কভি নহীঁ হোগা,
কিসিকো বতাও মৎ—

অতসী : ঠারো ঠারো! মাকড়িঠো কাঁহা?

ব্রজ : মাকড়ি মালুম নহীঁ,
হামি লিয়েছি না। হনুমান দেওকা কসম—

অতসী : বটে। তবে পুলিস বোলাও! বনলতা!

বনলতা : হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়।
[অনিশ্চিতভাবে বাইরের দিকে এগুলো]

ব্রজ : মেমসাব, শুনিয়ে তো বাৎ—

অতসী : করুণা, জলদি গিয়ে
ম্যানেজারবাবুকো বোলাও। ঠ্যাটামিটা করি দূর--

ব্রজ : (আর্তকণ্ঠে) সবুর সবুর।

[অন্য ট্যাক থেকে দুল বার করে দিলো]

হাঁথ জোড়ি, পাঁও ধোরি দিদিমণি
পুলিস বুলাও মৎ! সব তো দে দিয়া?

অতসী : পুলিস না বোলালেও
ম্যানেজারবাবুকো তো নিশ্চয় বোলেগা।
চোট্টা কাঁহাকা—

বনলতা : হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক! এ সমস্ত থীফ্‌দের
এনকারেজ কখনো কোরো না!

ব্রজ : দিদিমণি, গরিব আদমি—

করুণা : ওঃ! গরিব দেখাতা! চুরি করে করে
গেস্টদের আগেও কি ফাঁক নেহি করা?

অতসী : ঠিক কথা!

ব্রজ : কভি নহীঁ কিয়া দিদিমণি,
এহি পহ্‌লা কসুর। হনুমান—

অতসী : রাখ্ তোর হনুমান। পয়লা কসুর!
তুই বেটা জাত চোর— দেখেই বুঝেছি।
সিঁদকাঠি দিয়ে তোর হাতে খড়ি!

ব্রজ : মেমসাব বিসোয়াস্ যান—
সিঁদকাঠি দেখা নহীঁ কভি।
ক্লাস ফোর লিখাই পড়াই— অংরেজি ভি জানে কুছ্ কুছ্,
ক্যাট ব্যাট ক্লেভার বোয়, রাম হ্যাজ এ নাইস টোয়,
লিটিল গার্ল বিগ বোক্স, ফ্যাট হেন এস্লাই ফোক্স,
টেবিল চিয়ার লুকিং গেলাস—

অতসী : আরে গেলো। কী বলতে চাস?

ব্রজ : বাপুজী মরিয়ে গেলো— ব্যস,
পড়াই খতম হোলো। টুঁড়ে টুঁড়ে ইধার উধার
কাম কভি মিলে, কভি নহীঁ মিলে,
ভুখা থাকি। ভুখা না রহ্‌লে কোই
চোর নহীঁ হোতো, দিদিমণি।

[করুণা বনলতার মুখে সহানুভূতি, অতসীও আগের চেয়ে নরম।]

অতসী : তাই বলে সোনার গহনা?
ছোটখাটো কিছু হলে তবু বোঝা যেত।

ব্রজ : হোয়ে গেলো চুক এক দফা—

অতসী : এক দফা?

ব্রজ : হাঁ হাঁ, দো দফে দো দফে! মগর একঠো বাৎ,
জোড় হাঁথ— বাপুজী বাঁচিয়ে যেতো দো চার বরষ,
বিশ তিশ রূপেয়া রহ্‌তো ঘোরে

বির্জলাল চোর কভি নহীঁ হোতো।
পানের দুকান দিতো একঠো ছোটাসা,
কারবারে বরাবর সাফ মাথা ছিলো। এখুনো ভি
মওকা হোনেসে লগা দিতো পানকা দুকান। মেমসাব,
বিশঠো রূপেয়া যোদি দিয়ে দেন দোয়া করে—

অতসী : ও মা, দেখো দেখো, এ যে উল্টে টাকা চায়!

বনলতা : অডাসিটি
লিমিট ছাড়িয়ে যায় দেখি!

করুণা : কে বলতে পারে?

অতসী : তার মানে? বলার কী আছে?

করুণা : ঠিকমতো সুযোগ না পেলে, কতো মানুষেরই
হয়ে যায় সব গণ্ডগোল। এই তো আমারই দেখো—

ব্রজ : হাঁ হাঁ বোলুন বোলুন, ঠিক বাৎ—

অতসী : থামো তোম! না করুণা, এ সবের
দিও না প্রশ্রয়। পুলিসের হাতে নাও যদি দিতে চাও,
হোটেলে চাকরি এর হবেই ঘোচাতে।

ব্রজ : ফারাক কী হোলো তাতে দিদিমণি?
সে তো একহি বাৎ হোলো! কাম ছুটে গেলো—
ফির ভুখা, ফির চোরি—
তোবে যান, পুলিসই বুলান। ভুখা মেরে
চোরি কেনো কোরাবেন আর? হনুমান দেও,
চোরি ফির না করাও, ভগোয়ান।
[ব্রজ শহীদ হয়ে বসলো। হাত জোড় করে, শূন্যে চোখ রেখে। এরা বিভ্রান্ত।]

বনলতা : (অবশেষে) এই ব্রিজলাল! তুমি যাও,
কাজ করো গিয়ে। ততোক্ষণ
ভেবে দেখি তিনজন!

অতসী : হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভালো।

ব্রজ : জী হুজুর। সীয়ারাম সীয়ারাম।
[ব্রজ ভিতরে গেলো, শহীদী ভাব বজায় রেখে।]

অতসী : কী করবে বলো?

করুণা : গয়না তো পাওয়া গেলো ফিরে। আমি বলি—
কেন আর মিছে গণ্ডগোল?

অতসী : কিন্তু করুণা,
হাতেনাতে চোর ধরে ছেড়ে দেয় কেউ?

বনলতা : অন্ প্রিন্সিপ্‌ল্
ছেড়ে দেওয়া চলে না যদিও, তবে—

করুণা : চাকরিটা খেয়ে দিলে লাভ কিছু হবে?

আমি ভাই মুখ্যু সুখ্যু মেয়ে, যুক্তিতর্ক
বুঝি না কিছুই, শুধু মনে হয়—
চোর হয়ে জন্মায় না কেউ। অবস্থা বিপাকে পড়ে
ও হয়েছে চোর, আমরা হয়েছি সব যার যা হবার।

বনলতা : কিন্তু যদি করো কন্‌সিডার—

অতসী : অবস্থার ফের যদি বলো,
কথাটায় মিথ্যে কিছু নেই। আমাকেই ধরো—
বাবার তো টাকা ছিল, কতো ভালো ভালো
পাত্র জুটেছিলো। তবু কোন্ মতিচ্ছন্নে
ইংরিজিতে এম. এ. দেখে আচ্ছন্ন হলাম
বিদ্যের চমকে, ভগবান জানে! কোন্ চোখে
দেখেছি যে ওকে সে সময়ে—
বাবা-মার উপদেশ ঠেলে, সব ফেলে—
অবস্থাগতিকে
মানুষের কী ভুলই যে হয়!

বনলতা : ইংরিজিতে এম. এ. পাস?
তবু আশা মিটলো না?

অতসী : তখন কি জানি ছাই—
লেখক হবার ইচ্ছে, রোজগারে মতিগতি নাই?

করুণা : বলে নি সে কথা আগে?

অতসী : বলে নি তা নয়। তবে
ছোকরা বয়সে কতো লোক কতো কথা বলে।
ভেবেছি দু'দিন গেলে সখ ঘুচে যাবে,
খেলে সংসারের ঠেলা।

করুণা : লেখাও তো কাজ?

অতসী : লিখে ক'টা টাকা আসে ভাই পোড়া বাংলাদেশে?
তাও যদি সিনেমাতে নিতো কোনো বই!
সিনেমার গল্প লেখা আলাদা ক্ষমতা,
সে মুরোদ কই?

বনলতা : যাই বলো, তবু তো পেয়েছো কালচার—

অতসী : ঝাঁটা মারি কালচারের মুখে! চাল নেই, চুলো নেই,
কালচার ধুয়ে ধুয়ে খাবো! বনলতা, যদি বিয়ে করো,
কালচার ছেড়ে ভাই কারবারি ধোরো।

করুণা : (বাঁকা হেসে) তোমার ও কথা
বনলতা কোনোদিন মানবে না ভাই।

অতসী : না মানলে আমার কি ছাই?
দেখে না শিখলে সব ঠেকে শেখে।

বনলতা : আমার শেখার কিছু নাই।
বিয়ে তো হবে না আর—
করুণা : কপালে কী আছে কার, বলা যায় কিছু?
বনলতা : কপাল মানি না আমি। বিয়ে
করা কি না করা— সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছাধীন।
করুণা : (হঠাৎ জ্বালাধরা কণ্ঠে) হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক, তুমি তো স্বাধীন!
[উঠে অন্যদিকে গেলো]
বনলতা : (চেয়ে থেকে) হিংসে হয়?
করুণা : (ফিরে না তাকিয়ে) হিংসে? ভাবো কী নিজেকে?
[অতসী কী বলতে গেলো, বনলতা ইঙ্গিতে থামিয়ে দিলো তাকে।]
বনলতা : (স্থিরকণ্ঠে) যা বলার বলো না করুণা?
লজ্জা করো কেন?
করুণা : (হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে) নিশ্চয়, হিংসে করি!
তোমার ডিগ্রীকে নয়! অফিসারি চাকরিকেও নয়!
হিংসে করি— স্বাধীনতা, ইচ্ছেমতো অধিকার নিজস্ব জীবনে।
তোমার হারালে দুল নাই কোনো
জবাবদিহির ভয়। ভোরবেলা সমুদ্রের স্নানে
তোমাকে হয় না নিতে কারো অনুমতি। এই হিংসে করি
হিংসে করি এই অধিকার।
বনলতা : করুণা তোমার
কিছু জানা নেই। স্বাধীনতা দেখো, হিংসে করো,
একা থাকা কাকে বলে কিছুই জানো না।
করুণা : আমার যা দাম্পত্য জীবন,
তার চেয়ে একা থাকা শতগুণে ভালো।
বনলতা : (তীব্রস্বরে) যা পেয়েছো জীবনের দান, তার জন্য
ধন্যবাদ দিও বিধাতাকে!
করুণা : জীবনের দান? তুমি কী খবর রাখো? মিসেস সান্যাল
তুমি যদি হতে, দেখতাম—
জীবনের দান নিয়ে কতো বড়ো বড়ো কথা
মুখ দিয়ে বার হয়!
অতসী : তুমি যেন একেবারে ক্ষেপে গেলে দেখি?
এ কথা তো মানো— স্বামীটি তোমার
সরকারি বড়ো অফিসার? কতো তাঁর রোজগার—
করুণা : রোজগার! টাকা! ভুলেও ভেবো না
টাকাতেই সমস্ত অভাব মিটে যায়।
অতসী : টাকাটাই সব নয়, জানি। কিন্তু যদি
ভদ্রভাবে চলাটাও শক্ত হয়, যদি ফেস্ করো

স্টার্ভেশন— মানে, উপবাস যদি—

করুণা : (ঝাঁঝে) স্টার্ভেশন মানে আমি জানি ভাই।
যতোখানি ভান করি রাগের জ্বালায়,
ততোটা মুখ্যু নই। ক্লাস টেনে উঠে তবে ঠেকে গেছি আমি।

বনলতা : এতোদিন বিশুদ্ধ ন্যাকামি
কেন তবে করেছিলে ভাই?

করুণা : তোমার ইংরিজি বুলি শুনে।
তুমি বি. এ. পাস, ইংরিজিতে
বিদ্যের প্রচার করে করে
চমক লাগাতে পারো বিদ্বানের মনে। অল্পবিদ্যা আমি,
আমি কেন সহ্য করি?

বনলতা : এই কী কারণ?

করুণা : (স্থিরকণ্ঠে) আরো আছে।
আমার বিদ্যের ত্রুটি দিয়ে
পতিদেবতার মান প্রতিপদে ক্ষুণ্ণ করি। প্রতিপদে
খোঁটা খেতে হয়, হতে হয় তুলনায় ম্লান,
পাছে ভুলে যাই— মিস্টার সান্যাল আজ আরো বড়ো হোতো
ধনে মানে পদমর্যাদায়, অল্পবিদ্যা স্ত্রীর ভারে
জর্জরিত না হলে জীবন।

বনলতা : (উত্তেজিত) ভুল ভুল— এ তোমার আগাগোড়া ভুল!
হিংসের বাঁকা আয়নাতে,
সব কিছু বাঁকাচোরা দেখো তুমি!

করুণা : (অল্প থেমে, স্থিরকণ্ঠে) বনলতা। ঠিক এই রকমের কথা
আগেও শুনেছি—
অন্য বিদুষীর মুখে। একবারও ভেবো না কো মনে—
তুমিই প্রথম।

বনলতা : (লাফিয়ে উঠে) কী বলছো তুমি?

অতসী : করুণা, করুণা! বনলতা!

করুণা : হিংসে করি আমি— সত্যি কথা। কিন্তু সেটা
এরকম হিংসে নয়। আমি শুধু চাই
যেটুকু বিদ্যে আছে সম্বল করে
কোনো এক নিরুদ্বেগ সাদাসিধে
চাকরির স্বাধীনতা। বিবাহিত জীবনের দাসত্বের অপমান থেকে
মুক্তি চাই শুধু। যে মেয়ের এইটুকু আছে,
তাকে আমি হিংসে করি, তোমাকেও হিংসে করি
এই কারণেই। আমার স্বামীর দুঃখে কতোখানি জোগালে সান্ত্বনা,
কতোখানি হলে আবিষ্কার তার চোখে—

সে নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই!

[করুণা সবেগে ভিতরের দিকে গেলো]

অতসী : আরে আরে, বলে দাও,
চোরটার কী ব্যবস্থা করি?
কী যে সব হয়ে গেলো কথায় কথায়—

করুণা : যা ইচ্ছে করো! আমার গয়না পেয়ে গেছি,
উদ্ধার পেয়ে গেছি দু'কথা শোনার হাত থেকে,
আব কিছু চাই না আমার।

[চলে গেলো ভিতরে]

অতসী : কী যে সব মাথা গরমের দল!

বনলতা : (ফোঁস করে) আমাকে বোলো না! আমি মাথা
গরম করি নি মোটে!

অতসী : করছো এখনই।

বনলতা : নিজের মনের বিষ দিয়ে
করুণা নিজেও কষ্ট পায়,
অন্যকেও ধ্বংস করে যন্ত্রণায় তিলে তিলে।

অতসী : 'অন্যের' খবরে
তোমার কী দরকার বাপু?

বনলতা : আমার অসহ্য লাগে। একজন পেয়েও বোঝে না
কতোখানি পেলো, যা পেয়েছে পায়ে ঠেলে ঠেলে
নষ্ট করে! অথচ হয় তো অন্য কেউ
অপেক্ষায় মরে। হয় তো পাবার কথা তারই
যোগ্যতার কথা যদি ওঠে।

অতসী : কে সে বনলতা?
অন্য কেউ— কে সে অন্য কেউ?

বনলতা : অতসী সেজো না বোকা! আমার সঙ্কোচ নেই আর।
জানি এর মানে নেই কিছু, তবু সত্য স্বীকার করার
সাহসটা রাখি।

[সত্য নীরবে উঠে হাসিমুখে বেরিয়ে গেলো]

অতসী : (অল্প পরে) সব স্বপ্ন। সব মিথ্যে আশা।
জীবনের প্রথমেই গোলমাল হয়ে গেছে সব,
ফেরাবার উপায় তো নেই!
মরুক গে! ব্রিজলাল—

বনলতা : ব্রিজলাল ভুলে যাও। ছেড়ে দাও ওকে।
আমরা সবাই ব্রিজলাল। অতীতের ভুলে
সকলেরই হয়ে গেছে সব গোলমাল।

[টেবিলে রাখা ব্যাগ থেকে কালো চশমা বার করলো]

যাবে? সমুদ্রের ধারে?

অতসী : (উঠে) চলো যাই। করুণাকে ডাকবো না?

বনলতা : তুমি তবে করো ডাকাডাকি! আমি এগোলাম।

[দ্রুত বেরিয়ে গেলো]

অতসী : বাব্বা! মেজাজটা কী?

আধুনিক মেয়েদের খুরে পেন্নাম!

[করুণাকে ডাকবে কি না ভেবে শেষ পর্যন্ত সমুদ্রের দিকে একাই চলে গেলো। সত্য এসে বাগান দিয়ে বারান্দায় উঠলো, চেয়ে দেখলো সমুদ্রের দিকে। তারপর এগিয়ে এলো দর্শকদের দিকে। আবার সে একক আলোয় উজ্জ্বল। মুখে চোখে হাসি। যেন সে আর দর্শকরা নাটকের চরিত্রদের নিয়ে এক মহা কৌতুকের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত]

সত্য : সুধীজন।

চারুশীলা মহিলা ও বিচক্ষণ মহোদয়গণ।
পৃথিবীর পরিক্রমা বন্ধ যদি না হয়, তা হলে
সকালের ভার নেবে দ্বিপ্রহর। সেও যাবে চলে,
অপরাহ্ণ দখল জানাবে, ক্ষণিকের, তারপর
সন্ধ্যা হবে। দিনান্তের দাবি নিয়ে রাত্রির প্রহর
বসে রবে অপেক্ষায়। ক্লান্তিহীন আহ্নিকগতিতে
পৃথিবী অক্লান্ত খাটে দিনগুলি পার করে দিতে;
সভ্যতার ইতিহাস বৃদ্ধ হলে ক্ষতি নাই তার।
ক্ষতি কার? বনলতা? সঞ্জয়-অতসী-করুণার?
ব্রজলাল? রতিকান্ত? অথবা কি আমার আপনার?
ভুলপথে মোড় ঘুরে সবই যদি হাহাকারে ডোবে,
অতীতের প্রতারণা বর্তমান ডোবায় বিক্ষোভে—
তবে কী বা আসে যায় সভ্যতার আয়ুক্ষয় হলে?
পৃথিবী যাক না ঘুরে, দিন আসুক, দিন যাক চলে।

[সত্য থামলো। দূরে মাদলের শব্দ, গ্রামে উৎসবের বাদ্যধ্বনি। ধিতাং তা, ধিতাং তা। সত্যর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন মাদলের তালে মিশে যাচ্ছে।]

কিন্তু না! এখন এসব তর্ক না।
আজকে থাকুক বক্তৃতা, মাদল বাজে ধিতাং তা, ধিতাং তা।
আজকে বাতাস নেশায় চুর, আজকে মাতাল সমুদ্দুর,
সূয্যিমামা যায় টাটে, রাত হোলো যে দিন কাটে,
আকাশ কালো অন্ধকার, তারার চোখে ঠাট্টা কার?
এক্ষুনি চাঁদ উঠবে ঠিক, ঢাকবে আলোয় দিগ্‌বিদিক।
মাদল বলে— 'ধিতাং তা, সামাল সবাই, ঘরকে যা!'
ভয়টা কিসের, ভয়টা কী? দেখতে মজা চাস না কি?
আজকে যে দিন বছরকার, আজকে সে দিন চমৎকার!

[একটা প্রচণ্ড স্ফূর্তিতে সত্যর গলা চড়ছে, নাচ বাড়ছে]

মাদল বাজে ধিতাং তা! জোরসে বাজা ধিতাং তা!
ধিংতি নাতিন ধিতাং তিন! আজ সে কী এক মজার দিন!
ধিংতি নাতিন ধিতাং তিন! আজ সে কী এক দারুণ দিন!
আসবে হেথায় বুড়্ঢা জিন! বুড়্ঢা জিন! বুড়্ঢা জিন!
[ঝম করে ঝাঁঝরের প্রচণ্ড শব্দ। আলো নিভে গেলো। আর একটা আলো উজ্জ্বল করলো বারান্দার পাঁচিলের একটা অংশ। পাঁচিলে গোড়সওয়ারের মতো দু'দিকে পা ঝুলিয়ে বসে আছে— বুড়্ঢাজিন। কয়েক সেকেন্ড। মাদল বেজে চলেছে। বুড়্ঢাজিন স্থির। আরো আলো। সত্যকে দেখা গেলো বারান্দায়, তার চোখ বুড়্ঢাজিনের চোখে। অন্ধকার হয়ে গেলো। মাদলের শব্দ ততোক্ষণে প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[ঝম করে ঝাঁঝরের শব্দ। আলো। বুড়্ঢাজিন আর সত্য একইভাবে পরস্পরের দিকে চেয়ে। মাদল বাজছে আগেকার তালে। বুড়্ঢাজিনের মাথাভরা পাকা চুলের রাশি, মুখভরা সাদা গোঁফদাড়ি। কিন্তু কচি মুখ, কচি দেহ। আসলে সে একটি ছোট্ট ছেলে (অথবা মেয়ে), চুল গোঁফ দাড়ি লাগিয়ে বুড়ো সেজেছে। তার গলা রিনরিনে মিষ্টি আর তীক্ষ্ণ। কথার সুরে শিশুসুলভ চাপল্য আর স্ফূর্তি। তার চলাফেরা ভাবভঙ্গী যেন উচ্ছল নৃত্য— জীবনী-শক্তিতে ভরপুর। তার সব কথাই চিৎকার।]

সত্য : (হাসিমুখে) পৌঁছে গেছো, বুড়্ঢাজিন।
বুড়্ঢা : ধিংতি নাতিন ধিতাং তিন!
সত্য : (মহানন্দে) ঠিক বলেছো বুড়্ঢাজিন।
[বুড়্ঢাজিন তড়াং করে লাফিয়ে নেমে এলো। মাদলের তালে একটা শিশু-তাণ্ডব নাচলো। তারপর একটা টেবিলের উপর লাফিয়ে উঠে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসলো।]
বুড়্ঢা : হোটেলটা কার? শুনতে চাই!
সত্য : তোমার হোটেল! সন্দ নাই।
বুড়্ঢা : হুকুমমতো চলছো কি?
সত্য : এক্কেবারে নেই ফাঁকি।
বুড়্ঢা : ধিতাং নাতিন ধাতিং তা! ক'জন এবার বাসিন্দা?
সত্য : ছ'জন পাবে বুড়্ঢাজিন— তিনটে মেয়ে, পুরুষ তিন।
[বুড়্ঢাজিন লাফিয়ে নেমে একটু নেচে নিলো]
বুড়্ঢা : ধিতাং নাতিন ধিতাং তি! দুঃখ তাদের বড্ডো কি?
সত্য : (আনন্দে) আজগুবি এই বছরটা— দুঃখে পাগল সব ক'টা!
ভাবছে ওদের ছয় জনাই— পেতাম যদি সুযোগটাই,
জীবনটাকে আর একবার সাজিয়ে নিতাম চমৎকার।

[বুড়্ঢাজিন শুনে দুঃখে ফোঁৎ ফোঁৎ কেঁদে উঠলো একবার। হাতের মুঠোয় চোখের জল মুছে আরো খানিক নৃত্য করে এক লাফে চেয়ারে উঠে দাঁড়ালো।]

বুড়্ঢা : ঘুচবে ওদের দুঃখ ঠিক, বুড়্ঢাজিনের শরণ নিক।
বাগানটাতে আজ রাতে বেরিয়ে আসুক জোছ্নাতে।
পায় নি যা সব তাই পাবে, জীবনটাকে শোধরাবে।

সত্য : ধিতাং তিনা ধিতাং তিন! এই না হলে বুড়্ঢাজিন?

বুড়্ঢা : তোমার উপর রইলো ভার— সব ক'টাকে করবে বার।

সত্য : কিচ্ছু তোমার চিন্তা নেই, বাইরে আছে সক্কলেই।

বুড়্ঢা-সত্য : (একসঙ্গে) ধিংতি নাতিন ধিতাং তা!
ধিতাং নাতিন ধিতাং তা!
ধিতাং তা ধিতাং তা ধিতাং তা ধিতাং তা!

[ঝম করে ঝাঁঝর বাজলো। সব অন্ধকার। তারপর ধীরে ধীরে চাঁদের আলোয় বাগান বারান্দা ভরে গেলো। বুড়্ঢাজিন অদৃশ্য। সত্য দর্শকদের দিকে ফিরে]

সত্য : রাতের পৃথিবী রাতের আকাশ রাতের চাঁদ
রাতের বাতাসে পরীরা পেতেছে আজব ফাঁদ
রাতের সাগর জ্যোৎস্নানীল
পুরন্ত ঢেউ দরাজদিল
সোনালি বালির আলিঙ্গনের মেটায় সাধ
রাতের আকাশে হেসে কুটি কুটি রাতের চাঁদ।
রাতের মানুষ নালিশ তোমার স্তব্ধ হোক
রাতের সাগরে ডুবুক তোমার ব্যর্থ শোক
ভুলের মাশুল দিও না আর
শুরু করে দেখো আর একবার
আবার জীবন সাজাক তোমার নতুন চোখ
নতুন অতীত এনেছে রাতের কল্পলোক।

[সত্য গিয়ে সমুদ্রের দিক চেয়ে রইলো। হঠাৎ ঝম করে ঝাঁঝরের শব্দ হোলো দূরে। সত্য বাহুর ভঙ্গীতে আনন্দ প্রকাশ করলো। আর একটা ঝম, সত্য ফিরে হাসিমুখে দু' হাত ঘষতে লাগলো। তৃতীয় ঝম! সত্য হাততালি দিয়ে উঠলো। চতুর্থ ঝম! পঞ্চম! ষষ্ঠ! সত্য আনন্দে প্রায় নাচছে। ষষ্ঠ আওয়াজটা হতে উন্মুখ হয়ে গিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকালো অধীর দৃষ্টিতে। কাকে যেন দেখতে পেলো। মুহূর্তে ফিরে এলো তার ম্যানেজারি ভঙ্গি।]

সত্য : আসুন সঞ্জয়বাবু!
[সঞ্জয় সমুদ্রের দিক থেকে উঠে এলো। হাতে পেট ফোলা ব্যাগ একটা।]
এরই মধ্যে এলেন যে ফিরে?
[সঞ্জয় টেবিলে ব্যাগ রেখে ঝুপ করে বসলো ক্লান্তভাবে]

সঞ্জয় : ভালো লাগলো না। সেই একই বালি,
একই ঢেউ সমুদ্রের জলে।

সত্য : (হেসে) তবু লোকে বলে—চন্দ্রালোকে সমুদ্রের ঢেউ
বালির উপরে বসে দেখা—
এর চেয়ে কাম্য কিছু নেই।
সঞ্জয় : যারা বলে, একা তারা ছিল না নিশ্চয়!
সত্য : মনে হয়—লেখকেরা চিরদিনই একা।
সঞ্জয় : হয় তো বা। হয় তো এ অভিশাপ।
কোনো এক গুরুতর পাপ
ঘটেছিলো জন্মান্তরে।
সত্য : অভিশাপ? কী আশ্চর্য! সাহিত্যবাসরে
এতো খ্যাতি আপনার—
সঞ্জয় : অতি সত্য কথা, সত্যবাবু।
খ্যাতি আর নিঃসঙ্গতা—এরা দুই ভাই।
সত্য : তাই হবে।
সঞ্জয় : তবে মিছে খ্যাতি নিয়ে খোঁচা দেন কেন?
সত্য : অত্যন্ত দুঃখিত।
সঞ্জয় : আপনি তো অবিবাহিত?
সত্য : (হেসে) করবো না অস্বীকার, ঘটনাটা অবিকল তাই।
সঞ্জয় : এ অবস্থার দায়িত্বটা কার?
সত্য : অর্থাৎ?
সঞ্জয় : এ কি স্রেফ নির্জলা বরাৎ? না কি কোনো বিশিষ্ট কারণে
সঙ্গহীন ক্লিষ্টতায় আস্থা রেখেছেন?
সত্য : না না, অবস্থাটা সেরকম নয়।
কারণও বিশেষ নেই। সঙ্গহীনতায়ও
মারাত্মক কোনো ক্লেশ এখনো করি না অনুভব।
সঞ্জয় : সবই কি সম্ভব—বিপুলা এ পৃথিবীতে?
(ঝুঁকে বসে) সত্যবাবু, এখানে নিভৃতে
যদি প্রাণ খুলে আপনাকে দু'টো কথা বলি,
কিছু যায় আসে?
সত্য : অনায়াসে যা খুশি তা বলে যান,
পাঁচকান না হবার দায়িত্ব আমার।
সঞ্জয় : সত্যবাবু, অতীতের অর্বাচীন বুদ্ধিহীনতায়
বিবাহকে দায় মন করে, ধরে নিয়ে সাহিত্যের অন্তরায়,
প্রতিজ্ঞার কঠিন শাসনে
বিবাহবন্ধন থেকে চিরমুক্ত রেখেছি নিজেকে। ভুলে গেছি-
সঙ্গের বন্ধন থেকে শতগুণ কঠিন বাঁধন
নিঃসঙ্গ জীবনে। আজ কেন মনে পড়ে এতো কথা,
বলি তা, শুনুন। বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে

বেরিয়েছি সবে—(আহা কবে গেছে
সে সমস্ত দিন)—একজন এলো এ জীবনে।
উচ্ছল প্রাণের বন্যা দিয়ে
ভেঙে দিয়েছিলো প্রায় প্রতিজ্ঞার মজবুত বাঁধ।
জীবনের অপূর্ব আস্বাদ সেই একবারই—

সত্য : (উঠে) ভেরি সরি! কে যেন আসছে ফিরে—

[সমুদ্রের দিকে গেলো]

সঞ্জয় : কে এলো জ্বালাতে?

সত্য : মিস্টার চৌধুরী যেন, মিসেসের সাথে।

সঞ্জয় : গুড্ গড্! আমার এখন
একেবারে মন নাই মুখোমুখি কথা বলবার! আমি যাই!

[দ্রুতপদে বাগানে নেমে চলে গেলো। উঠে এলো সস্ত্রীক মিস্টার ব্রজলাল চৌধুরী। ব্রজলালের মাথায় দামী টুপি, হাতে দামী ছড়ি, মুখে দামী চুরুট। বস্তুত পুরো চেহারাটাতেই যেন একটা দামী টিকিট মারা। স্ত্রী অতসী মূল্যবান শাড়ি-গহনায় মোড়া—সেটাও যেন ব্রজলালেরই দামের টিকিট]

ব্রজ : নমস্কার মানিজারবাবু! বোসে বোসে দেখছেন চুপ কোরে
পুনমের ওপোরূপ শোভা? কবিতা লেখুন!

[ব্রজ উচ্চহাস্য করলো নিজের রসিকতায়]

সত্য : (হেসে) আসুন আসুন। হোটেলের ম্যানেজার কবে কোন্‌খানে
কবিতার মানে বোঝে? লেখা তো দূরের কথা।

ব্রজ : হাঁ হাঁ ঠিক বাৎ। হামাদের দু'জনেরই
কাম কোরে খেতে হোয়, কবিতার সময় কুথায়?
কী বোলো ওতোসী, তুমার কি মনে হোয়?

অতসী : (ক্লান্তভাবে বসে) সে তো ঠিক।

ব্রজ : বেঠিক কি বোলি হামি কভি? সোব দামী কোথা।
তা না হোলে এতো টাকা
কামাই কী কোরো হোলো? রূপেয়া তো দামী চিজ?
কী বোলেন মানিজারবাবু?

সত্য : দামী বলে দামী? রূপেয়ার বীজ
পুঁতে দিলে গাছ হয়ে রূপেয়া ফলাবে
এমন তো শুনি নি কখনো।

ব্রজ : (উচ্চহাস্যে) শুনো শুনো! মানিজার মজাদার কোথা বোলে বরাবর,
তবু খাঁটি বাৎ।
নেহাৎ বেকার আছে কালেজের লিখাই পড়াই
রূপেয়া কামাই যোদি নাই হোয় কুছ্।

অতসী : দু'চার বছর
কলেজে পড়েছি আমি। সেটা যে বেকার

তাতে প্রশ্ন নেই।

ব্রজ : (উচ্চহাস্যে) এই দেখো—পরিবার
গোসা হোয়ে গেলো! হামি কি তুমার কোথা বলি?
বুঝলেন মানিজার—কারবার নিয়ে থাকি,
সময় ছিলো না বাকি কালেজে পড়ার।
কিন্তু বরাবর ছিলো মোনে—
বৌ হোবে কালেজের পাস।
আর হোতে হোবে খাস বনেদি ঘোরের।
বেহারে ঢুঁড়েছি ঢের এ রোকম মেয়ে,
কুথা পাবো? তার চেয়ে বঙ্গালিই ভালো—
মোনে হোলো শেষে। বাংলাদেশে
হোলো তো অনেক সাল? বোন্ধুরা বোলে—
বির্জলাল বঙ্গালি বনিয়ে গেছে।

অতসী : (উঠে) আমি যাই। শুয়ে পড়ি গিয়ে—

ব্রজ : কেনো কেনো? রাত তো হোয় নি খুব?

সত্য : শরীর আছে তো ভালো? সমুদ্রে ডুব
বেশি দিয়েছেন না কি?

ব্রজ : আরে না না, ফাঁকি
দিবার মতলব তাড়াতাড়ি।

অতসী : না, আমার মাথা ধরে গেছে ভারি।

ব্রজ : তোবে তো ইখানে আরো ভালো। চাঁদের আলোতে বোসে
খোলা হাওয়া খাবে, মাথা ধোরা পালাবে এখুনি।
মানিজার, দু'বোতল লিমোনেড হোবে?

অতসী : না না লেমোনেড থাক।

ব্রজ : কেনো কেনো, থাক কেনো? খাওয়া যাক। মানিজার—

সত্য : আনছি এখুনি।

[ভিতরে চলে গেলো]

অতসী : খাবো না দিয়েছি বলে! তুমি একা খেও দু'বোতল।

ব্রজ : পাগল হোয়েছো? তুমারই জোন্যে বোলা।

অতসী : আমারই জন্যে—কাঁচকলা!

ব্রজ : কী হোয়েছে বোলো তো তুমার? সারাদিন
লগাতার খিটমিট! এতো টাকা দিয়ে
সী-সাইডে আনলাম চেঞ্জ হোবে বোলে—
মেজাজ যা কোরে আছো—দেখে মোনে হোয়
পয়সাটা জোলে গেলো বিলকুল!

অতসী : তবে চলো—সমুদ্রে হাওয়া খাই গিয়ে।
খরচা উসুল হবে রসিয়ে রসিয়ে!

[ক্রুদ্ধ অতসী দ্রুতপায়ে সমুদ্রের দিকে বেরিয়ো গেলো]

ব্রজ : কী ব্যাপার? আরে শুনো শুনো—

[ব্রজ পেছন পেছন চলে গেলো। সত্য ট্রেতে লেমোনেড গ্লাস ইত্যাদি এনে নির্বিকারভাবে টেবিলে রেখে বাগানের দিকে গেলো সঞ্জয়ের খোঁজে। বনলতা বারান্দায় এলো সমুদ্রের দিক থেকে।]

বনলতা : সত্যবাবু!

সত্য : (ফিরে) এই যে এখানে। কী, বলুন?

বনলতা : ওরা কেউ এসেছে এ দিকে?

সত্য : ওরা মানে—মিস্টার সান্যাল? কই, না তো?

বনলতা : 'পান কিনে আনি' বলে সেই যে গিয়েছে—

সত্য : দেখেছেন—পানের দোকানে?

বনলতা : সেখানেও নেই। এইমাত্র দেখলাম গিয়ে।

সত্য : যদি খুব দরকার থাকে, আমি তবে একবার—

বনলতা : দরকার? না না, দরকার কিছু নেই।
ভালোই হয়েছে। আমি তবে চলে যাই শুতে,
মাথাটা ধরেছে—

সত্য : আপনারও মাথাধরা?

বনলতা : আর কারো আছে নাকি—মাথাধরা?

সত্য : মিসেস চৌধুরী—

বনলতা : বেচারি অতসী।

সত্য : কেন? মাথা ধরে আছে বলে?

বনলতা : দোষটা আসলে
মাথার মোটেই নয়। অতসীর ব্যথাটা কোথায়
সে কথা আমিই বুঝি খালি।
মরুক গে যাক যতো কথার পাঁচালি। যদি দেখা হয়—
দয়া করে জানিয়ে দেবেন—
মাথা ধরে আছে বলে শুতে চলে গেছি।

[ভিতরে গেলো। এর মধ্যে সঞ্জয় বাগানে এসেছিলো। কথা শুনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো, এখন উঠে এলো বারান্দায়।]

সত্য : আসুন সঞ্জয়বাবু, কিছুটা সময়
পাওয়া যেতে পারে নিরিবিলি।

[বলতে বলতে ব্রজ এলো। মেজাজ গরম।]

ব্রজ : এতোখানি সিলি
বঙ্গালি মেয়েরা হোয়, আগে যদি জানতাম তোবে
কোন্ শালা ডোবে এ রোকম ঝুটমুট?

[সবেগে ভিতরে চলে গেলো]

সঞ্জয় : অসভ্য ব্রুট্!

সত্য : আজ্ঞে?
সঞ্জয় : কিছু না। যাক্‌গে!
সত্য : তখন যা হচ্ছিলো কথা—
সঞ্জয় : মুড় চলে গেছে সত্যবাবু। ভাগ্যের ফেরে পড়ে
হয়ে আছি কাবু একেবারে।
[ব্যাগ খুলে একটা বেঁটে চ্যাপ্টা বোতল বার করলো]
হবে না কি—এক পাত্র?
সত্য : (হেসে) আপনিই খান। আমার কেবলমাত্র সাদা জল চলে।
[অন্য টেবিল থেকে লেমোনেডের গ্লাস একটা এনে দিলো]
সঞ্জয় : এও সাদা—বিশুদ্ধ জিন।
সত্য : যে জিন চেপেছে ঘাড়ে, তাকে সামলাতে
তটস্থ রাত্রিদিন। আর জিন হজম হবে না।
সঞ্জয় : (এক চুমুক খেয়ে) তার মানে?
ব্রজ : (ভিতর থেকে হেঁকে) মানিজারবাবু! মানিজার!
সত্য : (চেঁচিয়ে) যাই স্যার। (সঞ্জয়কে) আবার যে পড়ে গেলো বাধা?
সঞ্জয় : যাবেন না, চেঁচাক গে যতো পারে গাধা।
সত্য : (হেসে) ও কথা বলে কি আর হোটেলের ম্যানেজারি চলে?
দেখে আসি, একটু বসুন।
[সত্য ভিতরে গেলো। সঞ্জয় গ্লাস খালি করে আবার ঢালছে, অতসী এলো।]
অতসী : (থমকে) এ কী সঞ্জয়!
[সঞ্জয় চমকে উঠে দাঁড়ালো]
ওটা কী খাচ্ছো তুমি?
সঞ্জয় : এর নাম জিন।
অতসী : ও তো মদ!
সঞ্জয় : (হেসে) 'জিন' কথাটায়
ইংরিজিতে মদই বোঝায়।
হিন্দীতে আছে বটে আরেকটা মানে—
অতসী : (কোমল কণ্ঠে) সবাই তা জানে। আমার প্রশ্ন সেটা নয়।
সঞ্জয় : কী তবে প্রশ্ন বলো?
অতসী : জীবনটা এরকম নষ্ট করো কেন?
সঞ্জয় : নষ্ট যদি করে থাকি, সে তো
বহুদিন আগে ঘটে গেছে। যেদিন তোমাকে
ছেড়ে চলে গেছিলাম—সাহিত্যিক হবো বলে।
অতসী : হয়েছো তো সাহিত্যিক।
সঞ্জয় : হয়েছি তা ঠিক। কিন্তু
হারিয়েছি যতো, পেয়েছি কি ততো ফিরে? একখানি ভুলে—
অতসী : ভুলটা কি একাই তোমার? আমি কি করি নি ভুল

সে সময়? মনে ছিল দারিদ্র্যের ভয়,
বাড়ির তুমুল কাণ্ড, চেঁচামেচি আপত্তির ভীতি।
সে সব স্বীকৃতি
মন খুলে করেছি তো গত তিনদিনে
যখনই পেয়েছি নির্জনে।

সঞ্জয় : দারিদ্র্যের ভয়
হয় তো সেদিন খাঁটি ছিল। আজ
নিয়তির ঠাট্টাটি দেখো! টাকা নিয়ে কী করবো বহু ভেবে ভেবে
অবশেষে জিন কিনে খাই।
অবশ্য তোমার স্বামী যতো টাকা রাখে
তার আমার সিকি ভাগও নাই।

অতসী : আমার পাওনা ছিল এ কথার খোঁচা।

সঞ্জয় : তোমাকে দিই নি খোঁচা, বিশ্বাস করো।
আমি শুধু বারোমাস নিজেকেই খোঁচা দিয়ে যাই।
যতো দুঃখ পাই, জানি সবই আমারই তো দোষ।
যদি সঞ্জয় ঘোষ মিথ্যে এক প্রতিজ্ঞার কবল ছাড়িয়ে
জোর দিয়ে জানাতো সেদিন—
'অতসী, তোমাকে চাই শুধু, আর কিছু
নাও যদি পাই', তবে আজ—

অতসী : তবু মেনে নিতে হবে—প্রতিজ্ঞা তোমার
হয় নি তো একান্ত নিষ্ফলা। সাহিত্যের অচঞ্চলা খ্যাতি—

সঞ্জয় : ভুল ভুল অতি ভুল। সাহিত্যের সাফল্য আমার
আরো ঢের বেশি হোতো, যদি
নিত্যসঙ্গী হয়ে তুমি এতোদিন প্রেরণা জোগাতে।

অতসী : সত্যি তাই মনে করো?

সঞ্জয় : মনে করি? এ আমার ধ্রুবজ্ঞান।
বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।
আজ যে লেখার হাত ক্লান্ত এতো,
মনে আজ এতো অবসাদ, সাহিত্যসৃষ্টির পথে
এই কি সহায়? নিষ্করুণ রিক্ততায়
কল্পনার স্রোতে আজ ভাঁটা পড়ে গেছে।
তাই তো ধরেছি মদ।

অতসী : (দু'হাতে মাথা চেপে বসে) ওঃ! কী ভুল করেছি!

সঞ্জয় : একখানি ভুল
জীবন নির্মূল করে রেখে যায়,
ফেরবার উপায় রাখে না।
[সত্য এসে থমকে দাঁড়ালো। অতসী তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছলো অন্য দিকে ফিরে।]

সত্য : মিসেস চৌধুরী! আপনার স্বামীকে এখনি
অ্যাস্‌পিরিন দিয়ে আমি শুইয়ে রেখেছি, মাথা না কি তাঁর
ভীষণ ধরেছে।

অতসী : তবেই মরেছে! আজ আর শান্তি নেই সারারাত!

সত্য : আপনাকে এই কথা জানাবার হুকুম দিলেন—
ঘুম না কি আসবে না আপনি না গেলে।

অতসী : তবে তো সমস্ত কিছু ফেলে
এখনি ছুটতে হয়। গেলাম সঞ্জয়বাবু।

[অতসী ভিতরে চলে গেলো]

সত্য : আবার আরম্ভ হোক তবে
যে কথায় এতোবার বাধা পড়ে গেলো।

সঞ্জয় : আজ থাক। আজ বড়ো মাথা ধরে গেছে।

সত্য : সে কী? আপনারও? অ্যাস্‌পিরিন—

সঞ্জয় : যেতে দিন যেতে দিন। আমি ঘুরে আসি একবার
সমুদ্রের ধার থেকে।

[বোতল ব্যাগে ভরে সঞ্জয় চলে গেলো। সত্য দু'হাত ঘষে নিঃশব্দে হাসলো। খুব উপভোগ করছে সে। করুণা আর রতিকান্ত এলো সমুদ্রের দিক থেকে। খানিকটা সন্তর্পণে।]

সত্য : এই যে আসুন। আজ রাত
বড়ো চমৎকার। তাই নয়?

করুণা : সত্যি তাই।

রতি : ইয়ে, সত্যবাবু। বনলতা ফিরেছে কি?

সত্য : ফিরেছেন কিছুক্ষণ আগে।
মাথা ধরে গেছে বলে শুয়ে পড়লেন।

করুণা : আহা, তাই নাকি? তাহলে মিস্টার সান্যাল,
তাড়াতাড়ি ঘরে যান।

রতি : মাথা যদি ধরে, এতোক্ষণে তাহলে নিশ্চয়
ঘুমিয়ে পাথর। তাই নয়?

সত্য : মনে হয় তাই।

রতি : তবে আর কাঁচা ঘুম ভেঙে
লাভটা কী হবে? তার চেয়ে কিছুক্ষণ এখানেই বসি।

সত্য : হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ভালো।
এমন চাঁদের আলো আজ! আমি চলি,
বহু কাজ বাকি আছে।

[ভিতরে চলে গেলো]

রতি : তবু ভালো বসা যাবে এখানেই।

করুণা : না না চলো, বাগানেই বসি।

[দু'জনে বাগানে গিয়ে বসলো]

এটা খুব অন্যায় হোলো।
বনলতা রাগ করে শুতে চলে গেলো।

রতি : আমি কী করতে পারি বলো?

[সত্য চুপি চুপি বারান্দায় এসে বসলো]

করুণা : পান কিনে সোজা চলে এলে—

রতি : করুণা, তোমায় একা পেলে
এতো কথা বলবার থাকে—

করুণা : তবু এই লুকোচুরি—

রতি : লুকোচুরি আমার স্বভাবে নাই
একেবারে। নির্বিচারে বলে দিতে চাই—
সত্য বলে মেনেছি যা। কিন্তু সেটা
ওর সহ্য হবে কেন? ওর তো তেমন মন নেই?
কষ্ট থেকে ওকে বাঁচাতেই
আমি কষ্ট পাই সত্য চেপে রেখে।

করুণা : তোমার এ কষ্ট দেখে আমি দুঃখ পাই।
স্ত্রী যদি স্বামীর কথা বোঝবার
ক্ষমতা না রাখে, তার চেয়ে নাই আর ট্র্যাজিক ঘটনা।

রতি : সত্যি তাই।

[সত্য হঠাৎ চমকে ভিতরের দিকে তাকালো। নিঃশব্দে দ্রুত বেরিয়ে গেলো বাইরে। বনলতা বারান্দায় এলো]

করুণা : কী করে যে হোলো এ রকম!
লেখাপড়া কম তো করেনি? বি. এ. পাস;
আমি তো কখনো কলেজের
ডিঙোই নি চৌকাঠ।

রতি : করুণা তোমার মন উন্মুক্ত আকাশ,
উদার দিগন্ত-ছোঁয়া মাঠ।
ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী পেয়ে
বাঙালি মেয়েরা শুধু স্টাইলটা শেখে,
অনুভূতি ভোঁতা হয়ে যায়।

[বনলতা আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছে]

করুণা : না না ছি ছি, এ কথাটা বলা ঠিক নয়। বনলতা
হয় তো একটু বেশি সাজে গোজে। তাই বলে
অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে—এ কথা বলা কি চলে?

রতি : জানি অন্যায়
আমার ও কথা বলা। মনে যাই ভাবি, মুখে
স্ত্রীর নামে কোনো কথা আনতেই

লজ্জায় মরে যাই. তবু সত্যি তাই,
তোমাকে লুকোই আমি সে ক্ষমতা নাই।

করুণা : আমি তো বুঝি না অতোশত,
মুখ্যু মেয়ে আমি। সামান্য চাকরি করে তবু চেষ্টা করি
যাতে কারো বোঝা হয়ে না থাকতে হয়।

রতি · তোমার তো জয় সেখানেই। চরিত্রের জোর
ডিগ্রীতে আসে না কারো। কঠোর সংযমে
জীবনকে যে পেরেছে চ্যালেঞ্জ জানাতে,
তার সাথে কেন যে হোলো না পরিচয়
জীবনের প্রথম প্রভাতে? আজ রাতে
সে কথাই বার বার মনে আসে।

করুণা : তোমাকে নিশ্চয়
বনলতা খুবই ভালোবাসে। তবু মনে হয়—
তোমার গভীর মন বোঝবার
তার কোনো ক্ষমতাই নাই।

[বনলতা হঠাৎ পাঁচিলের কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো]

বনলতা : ঠিক তাই। অতোটা গভীরে ডুবে ডুবে
জল খেয়ে যাওয়া—
এ কী আর যার তার কাজ? এ তোমারই সাজে।

রতি : এ কী, বনলতা। ঘুমোও নি তুমি?

বনলতা : ঘুমোলে যে এতো সব দামী দামী কথা
শোনাই হোতো না? উদার দিগন্ত-ছোঁয়া মাঠ,
উন্মুক্ত আকাশ—পেতাম না কিছুরই আভাস?

রতি : ছি ছি বনলতা। সামান্য ভদ্রতাটুকু ভুলে গেলে?
আড়ি পেতে কথা শোনা অতি নিচু কাজ!

বনলতা · জানি সেটা। তোমরা যে উঁচু মন নিয়ে
লুকিয়ে পালিয়ে আজ এখানে জমেছো,
তাও দেখে শিখতে পারি নি।

করুণা : সত্যিই পারো নি। তোমাকে কষ্টের হাত থেকে
বাঁচাবার এ চেষ্টাকে অপমান করে—

বনলতা : আহা মরে যাই। সত্য চাপা দিতে
তোমাদেরও বড়ো কষ্ট হয়! ভাবলাম—
সে কষ্ট বাঁচাই। উদারতা তোমাদেরই একচেটে নয়।

রতি : বনলতা, কালচার যদি থাকে ছিটেফোঁটা বাকি—

বনলতা : কালচার? বলে কাকে? আমি তো খবর রাখি
স্টাইলের শুধু, এর বেশি শিখি নি কলেজে!
কালচার পাবে সব করুণার কাছে। অভ্যেস আছে তার

চুপি চুপি কালচার বিতরণ করা।

রতি : করুণার নামে
শুনবো না কোনো কথা। দোষ যদি থেকে থাকে কিছু—
সবই তা আমার।

বনলতা : মহানুভবতা
এমন কি দেখেছো করুণা কোনোখানে?
তোমার আগেই যারা এসেছিলো
তারা কিন্তু সকলেই জানে—
কতো উচ্চ মন ওর, কতোটা উদার!

করুণা : মিথ্যে এ কুৎসার
দরকার কিছুই ছিল না বনলতা। তোমার স্বামীকে আমি
কেড়ে নিতে চাই নি কখনো।

বনলতা : কেড়ে নিতে? ছেড়ে দিতে এতো কষ্ট ভেবেছো আমার?
এতোদিনে ছেড়ে দিয়ে নিজেই যেতাম
যে কোনো চাকরি নিয়ে। বিবাহিত জীবনের
যতো সুখ তুমি ভেবে থাকো,
ততোটা মোটেই নেই। পড়ে আছি এই ভেবে শুধু—
সমাজের চোখে ওর আলোমুখ কালো হয়ে যাবে।

করুণা : এতোখানি দয়া?

বনলতা : দয়া নয়, বিবাহের পবিত্র বন্ধন!
বিয়ে করে হয়ে গেছে একমাত্র ভুল
তার শাস্তি সারাটা জীবন।

[বনলতা ছুটে ঘরে চলে গেলো। অল্পক্ষণ চুপচাপ।]

রতি : এতো ভালো দিন গেছে আজ,
এমন সুন্দর রাত, সব
ছারখার করে দিয়ে গেলো।

করুণা : তবু তার অপরাধ ক্ষমা করবার
মহত্ব তোমারই আছে জানি।

রতি : মহত্ব এ নয় তো করুণা,
বিবাহিত পুরুষের দায়িত্বের ভার—
এ তো বইতেই হবে। একমাত্র সান্ত্বনা এই—
প্রাণ খুলে তোমাকে বলার
অধিকার দিয়েছো যে।

করুণা : বলতে যে পেরেছো আমাকে, তাতেই সার্থক আমি,
আর কিছু চাইবার নেই।

রতি : (নিঃশ্বাস ফেলে) চলো গিয়ে বাগানেই বসি।

করুণা : বনলতা—?

রতি : যা হবার হয়েই তো গেলো। দু'চারটে কথা
বলে যদি মনের এ ভার কিছু হাল্কা হয় তাই—

বনলতা : চলো তবে যাই।
[দু'জনে বাগানের ওদিকে বেরিয়ে গেলো। সত্য এলো সন্তর্পণে, মনে হয় কাছাকাছিই লুকিয়ে ছিল। তার মুখে চোখে আনন্দ। মাদলের ধ্বনি আবার ভেসে এলো। সত্য হাতে তালি দিচ্ছে, ঠোঁট নড়ছে তার।]

সত্য : ধিতাং তা ধিতাং তা, ধিতাং তা ধিতাং তা,
ধিংতি নাতিন ধিতাং তিন, ধিতাং নাতিন ধিতাং তিন,
ধিংতি নাতিন ধিতাং তিন, বাজ রে মাদল ধিতাং তিন,
আজকে সে এক মজার দিন, আজ এসেছে বুড়্ঢাজিন।
আজকে এলো বুড়্ঢাজিন! বুড়্ঢাজিন! বুড়্ঢাজিন!
[ঝম করে শব্দ। অন্ধকার। তারপর অন্ধকার-চেরা আলোর রশ্মিতে পাঁচিলে ঘোড়সওয়ার বুড়্ঢাজিন।]
ধিতাং নাতিন ধিতাং তিন, ফের এসেছে বুড়্ঢাজিন।
[আরো আলো। বুড়্ঢাজিন নেচে নিলো খানিক। লাফিয়ে উঠলো টেবিলে।]

বুড়্ঢা : ধিতাং নাতিন ধিতাং তা, যার যেটা চাই পাচ্ছে তা!
কষ্ট কারুর থাকছে না, ধিতাং নাতিন ধিতাং তা।

সত্য : ধিতাং নাতিন ধিতাং তিন, সাবাস বটে বুড়্ঢাজিন।
চাইলো যে যা পাচ্ছে তাই, সাবাস তোমায় সন্দ নাই।

বুড়্ঢা : এই হোটেলের সবাইকার দুঃখ কিছুই নাই তো আর?

সত্য : (মহানন্দে) সেই তো মজা বুড়্ঢাজিন! আবার সবাই শান্তিহীন।
যা পেলো তা রুচছে না, কষ্ট কিছুই ঘুচ্ছে না!

বুড়্ঢা : (ভীষণ রেগে) ধিতাং নাতিন ধিতাং তাই,
খারাপ তোমার মুণ্ডুটাই।
চাইলো যা তা পায় যদি, তাইলে আবার কষ্ট কী?

সত্য : মজার কথা সেইটা তো, পেয়েছে সব 'এইটা' তো।
কেমন যে হয় 'অন্যটা', জানলো না তো কেউ সেটা?

বুড়্ঢা : কারুর ভালো করতে নাই! নেমকহারাম সব ক'টাই!
ধিতাং নাতিন ধিতাং তা, সবাই তোরা চুলোয় যা!

সত্য-বুড়্ঢা : (একসঙ্গে) ধিতাং নাতিন ধিতাং তাক,
সবাই ওরা চুলোয় যাক।
ধিতাং নাতিন ধিতাং তাক, সবাই ওরা চুলোয় যাক।
[দপ করে আলো নিভে গেলো। তারপর চাঁদের আলো আবার। কেউ নেই। বনলতা একটা ভারী স্যুটকেস টানতে টানতে এনে ফেললো বারান্দায়। হাঁপাতে লাগলো রাগে আর পরিশ্রমে।]

বনলতা : যাক গে চুলোয়—সমাজের নিন্দে ভয় যতো!
আর কতো সহ্য করা যায়?

[বসলো। তারপর বাইরেটা দেখলো উঠে গিয়ে। থমথমে নির্জন। ফিরে এলো দ্বিধা নিয়ে।]

এতো রাতে ট্রেন পাওয়া যাবে?

[কে উত্তর দেবে?]

না থাকুক ট্রেন। স্টেশনেই পড়ে থাকা যাবে।

[স্যুটকেসের কাছে গিয়ে আবার থামলো]

না হয় তো সকালেই যাবো।

গোছানো তো রইলোই সব!

[রতি আর করুণা বাগানে এলো কথা বলতে বলতে]

রতি : অসম্ভব জানি। তবু যেন একখানি কবিতার কলি
খালি মনে আসে ঘুরে ফিরে বার বার।

[সাড়া পেয়েই বনলতা স্যুটকেস টানতে শুরু করেছে]

করুণা : বলো—কী সে কবিতার কলি?

রতি : করুণা সান্যাল।

[বনলতা দাঁড়িয়ে গেলো]

করুণা সান্যাল করুণা সান্যাল। যেন চিরকাল এই—

[সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠতেই বনলতার মুখোমুখি]

এ কী!

বনলতা : বলো বলো! 'করুণা সান্যাল করুণা সান্যাল,
যেন চিরকাল'—তারপর?

রতি : কোথায় চলেছো তুমি এতো রাতে?

বনলতা : তাতে কি তোমার কিছু প্রয়োজন আছে?
তুমি করুণার কাছে বসে নাম জপ করো।

রতি : বনলতা, বাড়াবাড়ি অনেক করেছো।
সবেরই তো সীমা আছে—

[ঝম করে ঝাঁঝরের শব্দ। বনলতার হাত ছিটকে কপালে উঠলো, যেন কে হাতুড়ির বাড়ি মেরেছে কপালে।]

বনলতা : সীমা? এ কী— আমি—
আমি— এ কী— তুমি—মিস্টার সান্যাল!

রতি : আবার কী নতুন খেয়াল—

[ঝম! রতিকান্তর হাত কপালে।]

মাই গড। এ কী হোলো?

করুণা : কী হোলো? কী হোলো হঠাৎ?

রতি : করুণা তোমায়—এ কী। আপনি তো—
আপনি তো— মিস্ রায়!

করুণা : মিস্ রায়? ও তো বনলতা, মিসেস সান্যাল!

বনলতা : মিসেস সান্যাল? আমি?

করুণা : আর না তো কে?

[ঝম। করুণার কপালে হাতুড়ি।]

মা গো! আমার কপালে যেন মারলো কে—

বনলতা : হাতুড়ির ঘা?

করুণা : ঠিক তাই, হাতুড়ির বাড়ি!

রতি : আমারও কপালে যেন তারই চোট!

করুণা : কিন্তু তুমি—

বনলতা : সত্যি, আমি—

রতি : না না, তুমি—

করুণা : বনলতা রায়—

বনলতা : মিস্টার সান্যাল—

রতি : করুণা তোমায় যেন—
মিস্ রায়—

করুণা : কী সব স্বপ্ন যেন—
আমি তবে এখানেই ঘুমিয়ে পড়েছি?

বনলতা : স্বপ্ন তো আমিও দেখেছি—

রতি : দাঁড়াও দাঁড়াও, স্বপ্ন নয়!
মনে হয় যেন—

করুণা : আমি যেন বিয়েই করি নি।
চাকরিতে ঢুকেছি কোথায়—

রতি : কী আশ্চর্য, আমিও তো ঐ স্বপ্ন—
আমি আর মিস্ রায় যেন, ইয়ে মানে—(থেমে গেলো)

করুণা : বিবাহিত, তাই নয়?

বনলতা : তাই যেন। কিন্তু সে তো—

রতি : সবুর সবুর। দু'মিনিট। ছেড়ে দিলে গোলমাল
হয়ে যাবে! ভেবেচিন্তে কথা বলা চাই—

করুণা : কোন্ কথা?

রতি : কী কথা হচ্ছিলো ঠিক
হাতুড়ির আঘাতের আগে?

করুণা : তুমি যেন বলছিলে—করুণা সান্যাল—

রতি : এই পাওয়া গেছে!
ভুলে গেলে চলবে না—'করুণা সান্যাল'!
ভুলে গেলে সব গোলমাল।

বনলতা : ভোলার কী আছে আর?
করুণা সান্যাল ও তো বরাবরই?

করুণা : বরাবর? তাই হবে।
(রতিকে) তবে কেন সুর করে এতোবার

'করুণা সান্যাল করুণা সান্যাল' বলে ডাকাডাকি, কবিতার মতো?

বনলতা : কবিতাটা কবিতাই রইলো না আর! হয়ে গেলো
সাদামাটা একখানি নাম। বাঁচা গেলো!

রতি : না না মিস্ রায়! ইয়ে, আপনি তো মিস্ রায়, তাই নয়?

বনলতা : সে রকমই মনে হয়।

করুণা : ঠিক জানো? মিসেস সান্যাল নয়?

বনলতা : (স্বস্তির নিশ্বাসে) না করুণা। মিসেস সান্যাল তুমি, আমি মিস্ রায়।

রতি : আমি তবে কাকে—কার কাছে—?

বনলতা : প্রেম নিবেদন? নিজেরই পত্নীর কাছে,
অনিয়ম কিছুই হয় নি। করুণা, লেগেছে ভালো?

করুণা : ভালো? কিন্তু বনলতা,
স্যুটকেস নিয়ে তুমি কোথা চলেছিলে?

বনলতা : অ্যাঁ? ইয়ে, মানে—স্টেশনে বোধ হয়।

করুণা : কী কারণে?

বনলতা : তাই তো ভাবছি! হয় তো বা—

রতি : এই তো—নিশ্চয়! কেন নয়?
মানে—স্যুটকেস কেন? স্যুটকেস ধরে
এক পা এক পা করে সাবধানে ভেবে যাওয়া চাই!
স্যুটকেস যেন না হারাই!

বনলতা : হারাবে কী করে? আমরা তো রয়েছি এখানে।

রতি : না না, মানে—সে হারানো নয়!
মনে মনে ধরে থাকা। অর্থাৎ কি না—
এই যে জটিল যতো গণ্ডগোল, কে যে কার ইয়ে—

করুণা : (বসে পড়ে) আর কোনো গণ্ডগোল নেই।
আমাকেই করেছিলে বিয়ে। মিসেস সান্যাল, সে আমিই।

রতি : তবে আমি খামোখা তোমায়
অতো সব বোকা বোকা কথা—?

করুণা : খামোখাই বটে। সে কথা বলার ছিল বনলতাকেই—

বনলতা : আমাকেই? হ্যাঁঃ!
এতোদিন ঘর করি, কখনো শুনি নি—

রতি : না না। এই তো বিপদ! এখানেই গণ্ডগোল!
ঘর কি করেছি এতোদিন
আপনার সাথে?

বনলতা : না—হ্যাঁ—কিন্তু—

করুণা : ঘর নয়, করেছিলে প্রেম।

রতি : কার সঙ্গে? বাগানে তো তোমাকেই—
না না, থামো। একখানা কথা ধরো।

'প্রেম'। সেই ভালো—প্রেম। কে করেছে?

করুণা : তুমি।

রতি : কার সাথে?

করুণা : ঐ তো, বনলতার—

বনলতা : না করুণা, আজ রাতে বাগানে যে চাঁদের আলোয়—

করুণা : কেন নয়? স্যুটকেস নিয়ে তবে কেন আমি—?

রতি : স্যুটকেস! স্যুটকেস ধরে থাকো!

করুণা : (বনলতাকে) কি মুশকিল! আমি তো ওর বৌ!

রতি : এই পাওয়া গেছে! এইটারই জবাবটা
দাও দেখি কেউ? কে আমার বৌ?

করুণা : বনলতা।

বনলতা : না, করুণা—

করুণা : না না সে কি, তুমি—আমি—

বনলতা : (একই সঙ্গে) তা না তো কি, আমি—তুমি—

রতি : (চিৎকার করে) ঠিক করে ভেবে বলো একে একে!
(করুণাকে) তুমি বলো আগে, কে আমার বৌ?

করুণা : (দীর্ঘশ্বাসে) আমি। আর কার হবে এ কপাল?

রতি : (বনলতাকে) তুমি বলো, কে আমার বৌ?

বনলতা : (এক গাল হেসে) ঐ যে—করুণা। ঈশ্বরেরও অসীম করুণা আমার উপর।

রতি : (মর্মাহত) তাই। তাই হবে। তবে এতোদিন যাকে
সত্যি বলে ভেবে, জীবনের উপলব্ধি বলে ভেবে
(করুণাকে) মন খুলে তোমাকে বলেছি—
(বনলতাকে) না না, বলেছি তোমাকে—
(হাল ছেড়ে) দু'জনকেই—
তার কোনো গভীরতা নেই? আন্তরিকতার
কোনো চিহ্ন নেই তাতে?

করুণা : আছে আছে। গভীরতা তার
রাস্তার ফাটলে জমা জলের মতন।

রতি : (ব্যথায়) কিন্তু আমি যখন বলেছি,
বিশ্বাস করেছি সারা মনপ্রাণ দিয়ে—

বনলতা : সে কথা সম্পূর্ণ ঠিক।
আন্তরিকভাবে তুমি নিজের মনের গভীরতা
অনুভব করে থাকো।

করুণা : বনলতা, আমরাও কম তো যাই নি?

বনলতা : তাও ঠিক।

করুণা : (চমকে) ও কে? কে ওখানে?

[সঞ্জয় এসে সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছে। অল্প টলছে সে।]

সঞ্জয় : লোকে বলে—সঞ্জয় ঘোষ। পেশায় লেখক।
সাহিত্যের সাধনায় চিরকুমারের ব্রত নিয়ে
শেষে রত সুরার সেবায়।

করুণা : চিরকুমারের ব্রত? আপনার স্ত্রী তো
জলজ্যান্ত বর্তমান!

বনলতা : হ্যাঁ হ্যাঁ, অতসী তো—

সঞ্জয় : হায় দেবী। আপনার কথা যদি সত্যি হোতো।
অতসীকে প্রত্যাখ্যান করে আজ আমার এই হাল।

[অতসীর প্রবেশ]

করুণা : এই যে অতসী। দেখো দেখো, কর্তার তোমার
মাথার কী গণ্ডগোল—

রতি : না না থামো, হয় তো এ আমাদেরই মতো—

অতসী : কার কথা বলছো করুণা? আমার স্বামী তো শুয়ে আছে
মাথাধরা নিয়ে। এতোক্ষণ তারই কাছে বসে—

বনলতা : কী যে আজেবাজে বকো! তোমার স্বামী তো ঐ—

[সঞ্জয়কে দেখালো। অতসী স্তম্ভিত, ভীত।]

অতসী : বনলতা আমি—কখনো তোমার সাথে করেছি কি
খারাপ ব্যবহার? তবে কেন এভাবে আমায়—

সঞ্জয় : কী বা আসে যায়? জানি তুমি মিসেস চৌধুরী, তবু—

রতি-বনলতা-করুণা : (একসঙ্গে) মিসেস চৌধুরী!!

সঞ্জয় : এরা তো জানে না কেউ? অতসী চৌধুরী
আসলে অতসী ঘোষ হোতো,
যদি না মূর্খের মতো জীবনের দান
প্রত্যাখ্যান করে—

রতি : দাঁড়ান দাঁড়ান! মিস্টার চৌধুরী কোন্ জন?
তার সঙ্গে আলাপের
সৌভাগ্য হবে না আমাদের?

[ব্রজলালের প্রবেশ]

ব্রজ : ওতসী, তুমি যে—চোলে এলে বেশ?

রতি : মাই গুড্‌নেস!

ব্রজ : মাফ কোরবেন। হাপনাকে দেখি নাই হামি।
আরে আরে, হাপনারা সোবাই ইখানে?

বনলতা : এ যে—এ যে ব্রজলাল?

ব্রজ : (দাঁত বার করে) হাঁ হাঁ মিসেস সান্যাল,
বির্জলাল চৌধুরীই আছে। চিনে লিতে এতো দেরি কেনো?

করুণা : দেওয়া গিয়েছিলো তবে পানের দোকান?

ব্রজ : পানের দুকান—শুরুতে দিয়েছি একবার।

লোজ্জার কুছু নাই তাতে। কারবার ছোটা থেকে শুরু হোয়
বরাবর। বাজারে হামার দর আজ
ন' লাখেরও কুছুটা উপর।

বনলতা : এতোটা উন্নতি
পানের দোকান থেকে—সিধে পথে?

ব্রজ : (চটে) সিধা না তো বাঁকচুর কিসে? তবু তো ইনকম ট্যাক্স
ফাঁক করে দিলো, প্রায় সোবই দিয়ে দিতে হোলো।

রতি : 'প্রায়' সবই?

সঞ্জয় : কিছুই দেয় নি, সব ব্ল্যাক মানি!
চেনা যায় এক নজরেই।

ব্রজ : দেখুন মিস্টার ঘোষ—

করুণা : বনলতা দেখো দেখো! গোড়াতে সুযোগ পেলে
ব্রজলাল কী দেখাতে পারে!

রতি : আরে আরে, ভেবে কথা বলো!

বনলতা : প্রশ্ন হোলো—গিয়েছে কি চুরির অভ্যেস?

অতসী : বনলতা, এ কী যা তা তুমি—

ব্রজ : শুনে লিন মিসেস সান্যাল—

বনলতা : ব্রিজলাল, এখুনি তো হাতুড়ির বাড়ি খাবে। তার আগে
চটপট বলো দেখি—চুরি কি দিয়েছো ছেড়ে?

করুণা : না কি আরো বড়ো করে—

ব্রজ : (চেঁচিয়ে) কাগজে যা লিখেছিলো
লোহার কোন্ট্রাক্ লিয়ে—ঝুট ছিলো সব!

করুণা : আহা, এই তো বেরুলো!

ব্রজ : (রক্তচক্ষু) কী বেরুলো? আদালতে কুছ্
প্রোমাণ কি হোয়েছিলো?

করুণা : প্রমাণ যেটুকু হোলো, সেটা এই—
আর একবার সুযোগ পেলেই
স্বভাব বদলে যাবে, মানে নেই তার।
চোর যে, সে চোরই রয়ে গেলো।

বনলতা : হোলো আরো বড়ো চোর—দিনেমানে লুঠ!

ব্রজ : (চিৎকার করে) ঝুট ঝুট বিলকুল ঝুট!

অতসী : সবাই কি ক্ষেপে গেলে না কি? আমি—

[ঝম্। হাতুড়ি পড়লো অতসীর কপালে।]

উঃ মা গো!

ব্রজ : কী হোলো? কী হোলো ওতসী?

বনলতা : (আনন্দে) মেমসাব বলো ব্রিজলাল। 'ওতসীর'-র কাল হোলো শেষ!

সঞ্জয় : আমি তো কিছুই—

[ঝম! সঞ্জয় কাহিল।]

আরে আরে! কী রকম হোলো?

ব্রজ : হামি দেখে লিবে! মানহানি কেস ঠুকে দিবে!
চোলো তো অতসী, ঘোরে যাই।

অতসী : এ কী! ব্রিজলাল—তুই?

ব্রজ : আরেব্বাস! 'তুই' বোলে দিলে?

সঞ্জয় : তাহলে অতসী, এতোক্ষণ স্বপ্ন দেখে গেছি?
জীবনসঙ্গিনী হয়ে তুমিই রয়েছো আগাগোড়া?

ব্রজ : আরে আরে!

অতসী : পোড়াকপালের দোষ!

সঞ্জয় : জানো, সে মজার স্বপ্ন এক! আমাকে বিয়ে না করে
তুমি যেন ওর হাতে পড়ে—সে কী মনস্তাপ!

ব্রজ : শাট্ আপ!

অতসী : কী আশ্চর্য, আমিও দেখেছি—
যেন এই চোরটাকে বিয়ে করে—

ব্রজ : (দিশাহারা) ওতসী! ওতসী!

অতসী : থাম্ বেটা! পুলিসে দেওয়াই ছিল ঠিক,
দয়া করে ছেড়ে দিয়ে মাথায় তুলেছি!

ব্রজ : (উদ্‌ভ্রান্ত চিৎকারে) হামি—

[ঝম! হাতুড়ির শেষ ঘা ব্রজর কপালে।]

হামি—হামি—হামি—

[গলা নেমে এলো]

বনলতা : হ্যাঁ ব্রিজলাল, তুমি, তুমি!
গিয়ে থোড়া চা বানাও দেখি?

ব্রজ : (কপালে হাত বুলিয়ে) তাজ্জবকি বাৎ!
নিদ্ হোয়ে গেলো না কি—

অতসী : বক বক করো মাৎ। বলা যা হয়েছে শুনা হ্যায়?

ব্রজ : (বিহ্বলভাবে) হাঁ বোলুন মেমসাব?

সঞ্জয় : কতোবার বলা যায়? চা, চা, গরম চা-পানি!

ব্রজ : হাঁ হুজুর, এই কোরে আনি।

[ভিতরে চলে গেলো]

সঞ্জয় : জানি না কী করে?
সকলেই এক স্বপ্ন দেখে।

রতি : স্বপ্ন নয়, গোলযোগ রয়েছে কোনোখানে!

সঞ্জয় : তার মানে? ম্যাজিক দেখালো না কি কেউ?

করুণা : না কি কোনো পরী এলো বর দিতে
সমুদ্রের ঢেউয়ে চড়ে?

বনলতা : (হঠাৎ কী মনে পড়ায়) পরী? সমুদ্রের ঢেউ?
অতসী : আহা, কী বরই না দিলো!
সঞ্জয় : কেন? ব্রিজলাল ভালো বর নয়?
অতসী : ঐ জানো—বদরসিকতা!
সঞ্জয় : রসিক সে যতো বদই হই, সাহিত্যিক বটে।
অতসী : আহা, সাহিত্যের নামডাকে দিকবিদিক অন্ধকার একেবারে!
সঞ্জয় : নামডাক কতো হতে পারে
বিবাহবন্ধন থেকে মুক্তি পেলে—দেখলে তো স্বপ্নেই সেটা?
রতি : না না স্বপ্ন নয়, নিশ্চয় জটিল কিছু আছে—
বনলতা : (চিন্তিত) আমি যেন পেয়ে গেছি প্রায়—
অতসী : (সঞ্জয়কে) স্বপ্নে তো আরো দেখলাম—নাম হলে কী কী হয়!
সঞ্জয় : আর কিছু না হলেও, টাকা হয়। যে টাকার লোভে
চোরকেও বিয়ে করো তুমি।
অতসী : (ক্রুদ্ধ) আর তুমি? তুমি মদ ধরো!
জিন নিয়ে সারাদিন—
বনলতা : (হঠাৎ চেঁচিয়ে) জিন! বুড়োজিন!
সকলে : (একসঙ্গে) বুড়োজিন?
বনলতা : মনে নেই? আজই তো সকালে
সত্যবাবু শোনালেন? বছরের একদিন
বুড়োজিন বার হয় মানুষের
দুঃখের ঘটাতে অবসান?
রতি : সত্যবাবু! সত্যবাবু কোথায় গেলেন?
এ সমস্ত তারই শয়তানি!
অতসী : ম্যানেজার? ছিল তার ভিতরে ভিতরে এতো?
রতি : বোঝা যাবে সব কিছু! খোঁজা যাক তাকে!
[সকলে 'সত্যবাবু', 'ম্যানেজারবাবু' বলে ডাকতে ডাকতে কেউ ভিতরে, কেউ বাগান দিয়ে চলে গেলো। সত্য এসে সামনে দাঁড়ালো নির্বিকার মুখে।]
সত্য : সুধীজন! চারুশীলা মহিলা ও বিচক্ষণ মহোদয়গণ!
মহামতি রতিকান্ত, ব্রিজলাল এবং সঞ্জয়,
অতসী, করুণা আর বনলতা পেয়েছে সময়
ঠিক রাস্তা বেছে নিতে অতীতের চৌমাথায় ফিরে।
দেখে যদি হিংসে হয়, ব্রজপুরে সমুদ্রের তীরে
নেপচুন হ্যাপী লজ—ঠিকানা তো আগেই দিয়েছি;
বছরে যে একদিন, সে কথাও বলেই নিয়েছি।
পৃথিবীর পরিক্রমা চলবে তো আরো বহুদিন,
সভ্যতার ইতিহাস অসমাপ্ত, এখনো বিলীন
ভবিষ্যৎ অজানার অন্ধকারে। অতীতের ভার

তবু যদি ক্লান্ত করে—বুড়্‌ঢাজিন করুক উদ্ধার।
নাটক আর একটু বাকি, তবু যে এসব কথা বলি,
হেতু তার—আমি আর নেই এতে। নমস্কার, চলি।
[সত্য বাগানে বেদিতে শুয়ে পড়লো। তার মুখে প্রশান্ত হাসি। ডাকতে ডাকতে ভিতর বাইরে থেকে সবাই এসে প্রায় একসঙ্গে তাকে আবিষ্কার করলো।]

রতি-সঞ্জয় : (একসঙ্গে) এই তো এখানে!

বনলতা-অতসী-করুণা : (একসঙ্গে) কই কই কোথায় কোথায়?

ব্রজ : এই যে, ইখানে!

রতি : ঘুমিয়েছে না কি? সত্যবাবু!
[তারপর সবাই সভয়ে পিছিয়ে দাঁড়ালো। নিস্তব্ধতা। সঞ্জয় হাঁটু গেড়ে বসে নাড়ি দেখলো। উঠে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো।]

ব্রজ : সীয়ারাম! সীয়ারাম!

রতি : এ কী পরিণাম!

সঞ্জয় : (অল্প পরে) ভিতরেই নিয়ে যাই?
[পুরুষরা সত্যর দেহ তুলে নিয়ে ভিতরে গেলো, মেয়েরা মাথা নিচু করে অনুসরণ করলো। মাদলের শব্দ। তারপর—ঝম! অন্ধকার। তারপর একক আলোয় উজ্জ্বল বুড়্‌ঢাজিন, পাঁচিলে ঘোড়সওয়ার।]

বুড়্‌ঢা : ধিতাং তা ধিতাং তা, ধিতাং নাতিন ধিতাং তা,
ধিতাং নাতিন ধিতাং তিন, আজকে সে এক মজার দিন!
আসবে যে আজ ছুট্‌কু জিন! ছুট্‌কু জিন! ছুট্‌কু জিন!
[ঝম করে ঝাঁঝরের শব্দ আবার। কে যেন লাফিয়ে পড়লো। আর একটা আলোর রশ্মি। দেখা গেলো আর একটি পাকা চুল-দাড়িওয়ালা শিশু, বুড়্‌ঢাজিনের অপেক্ষাকৃত ছোট সংস্করণ। বুড়্‌ঢাজিন লাফিয়ে নেমে এলো পাঁচিল থেকে। দু'জনে নাচতে লাগলো।]
ধিতাং নাতিন ধিতাং তিন, সত্যসিন্ধু ছুট্‌কুজিন।
ধিতাং তিনা ধিতাং তিন, আজকে সে এক মজার দিন,
আজ এসেছে ছট্‌কুজিন, আজ জুটেছে ডবল জিন!
ধিতাং নাতিন ধিতাং তিন, ধিতাং নাতিন ধিতাং তিন!
[হাত ধরাধরি করে দু'জনে নাচছে। মাদলের শব্দ জোর হয়ে উঠলো ক্রমে। তারপর অন্ধকার ঢেকে দিলো ওদের।]

২রা এপ্রিল থেকে ৯ই এপ্রিল
১৯৬৬

প্রলাপ

মুখবন্ধ

নাটকটির কাঠামোর জন্য আমি একটি বিদেশী নাটকের কাছে ঋণী, যদিও বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক, সংলাপও প্রধানত আমার নিজস্ব। অনেক বছর আগে 'মহানগর' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় নাটকটি প্রকাশিত হয়েছিলো।

বাদল সরকার

প্রলাপ

চরিত্র

(মঞ্চাবতরণ অনুযায়ী)

ফটিক

জ্যোতি

ছায়া

তরুণ

প্রথম দৃশ্য

[মঞ্চ অন্ধকার, সামনে কোনো পর্দা নেই। অন্ধকারে ফটিক ঢুকলো। হোঁচট খেলো। একটা অস্ফুট 'ধ্যাত্তেরি' শোনা গেলো। একটা দেশলাই জ্বালালো বসে পড়া অবস্থাতেই। মঞ্চে আলো ফুটেছে দেশলাই জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে। হাত পুড়ে গেলো। আর একটা বিরক্তিসূচক ভঙ্গী উঠলো। হাতে একতাড়া আলগা কাগজ ছিল, সেগুলো ঘাঁটতে সাজাতে লাগলো। দু'একটা পড়ে গেলো। কুড়োলো। অবশেষে প্রথম পাতা খুঁজে পাওয়া গেলো। দর্শকদের দিকে চেয়ে দাঁত বার করে মাথা ঝুঁকিয়ে দু'টো আঙুল নেড়ে একটা ইয়ারি অভিবাদন জানালো। পড়বার চেষ্টা করলো, কিন্তু আলো কম। এদিক-ওদিক তাকিয়ে আলো খুঁজতে লাগলো। একটা জোরালো আলো পড়লো মঞ্চের একপাশে। খুশি হয়ে সেদিকে যেতে গিয়ে থেমে গেলো। নবাবি মেজাজে ফিরে এসে মাঝখানে দাঁড়ালো। আঙুল নেড়ে আলোটাকে ডাকলো পোষা কুকুর ডাকবার ভঙ্গীতে। আলোটা খানিকক্ষণ কেঁপে, সরে গিয়ে আপত্তি জানিয়ে শেষে যেন হেরে গিয়ে ফটিকের কাছে এলো। ফটিক বিজয়ীর ভঙ্গীতে হেসে জুত করে বসলো।

মঞ্চে কোনো দৃশ্যপট নেই। পেছনে একরঙা পর্দা। ঠিক মাঝখানে একটা তক্তাপোশের আকারের বেদি। ফটিক বসেছে সেখানে। একপাশে একটা বিছানা গোটানো রয়েছে। সামনের দিকে দু'পাশে দু'টো উপুড় করা প্যাকিং বাক্স। পেছনের পর্দা ঘেঁষে ঠিক মাঝখানে একটা ডালাবিহীন প্যাকিং বাক্স। তার ভিতর কী আছে দেখা যাচ্ছে না। ফটিক বিনা ভূমিকায় প্রথম পাতা পড়তে শুরু করলো। একঘেয়ে সুরে। যেন অনেকক্ষণ থেকে পড়ছে এবং মানে না বুঝে পড়ছে।]

ফটিক : "যদি ধরে নেওয়া যায় জীবনের একটা অর্থ আছে, তাহলেও প্রশ্ন উঠতে পারে—জীবনের অর্থ খুঁজে বার করার কোনো অর্থ আছে কি না। তা ছাড়াও প্রশ্ন রয়ে যায়—জীবনটা ব্যক্তিগত না সামগ্রিক। একটি ব্যক্তির জীবনের অর্থ অনুধাবন করলে সমগ্র মানবজাতির জীবনের অর্থ বোঝা যায় কি না। তার থেকে আরো প্রশ্ন ওঠে—মনুষ্য নামক জীবের ব্যক্তিগত অথবা সামগ্রিক কোনো তাৎপর্য আদৌ আছে কি না, না থাকলে কেন নেই, এবং থাকলে তার রূপ ও রূপান্তর কী প্রকার? পৃথিবী শীতল হয়ে যাবার কয়েক লক্ষ বছর পরে তরল জল থেকে কঠিন ভূমিতে জীবনের উত্থান, এককোষ প্রাণীর বহুকোষ প্রাণীতে রূপান্তর, প্রকাণ্ড-দেহ ক্ষুদ্র-মস্তিষ্ক সরীসৃপের ক্ষণস্থায়ী লীলা, লুপ্তি ও সৃষ্টির পরম্পরায় জীবজগতের বিবর্তন, মস্তিষ্কের ক্রমবিকাশ, সম্মুখের পায়ের কার্যকরী ক্ষমতা, পিছনের পায়ে সম্পূর্ণ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠা—"

[ফটিক পড়তে পড়তেই উঠে দাঁড়ালো, কোমর থেকে একটু ঝুঁকে—শিম্পাঞ্জির মতো।]

"—মেরুদণ্ডের নিম্নস্থিত প্রসারের ক্রমবিলুপ্তি এবং শারীরিক—

[হঠাৎ থেমে আবার মন দিয়ে পড়লো]

''—মেরুদণ্ডের নিম্নস্থিত প্রসারের—''

[সচেতনভাবে পিছনে হাত দিয়ে দেখলো। না, প্রসারিত অংশটি নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে দর্শকদেব দিকে তাকিয়ে হেসে আবার পড়তে লাগলো।]

''—মেরুদণ্ডের নিম্নস্থিত প্রসারের ক্রমবিলুপ্তি এবং শারীরিক ঋজুতা—''

[খাড়া হয়ে দাঁড়ালো]

''—লোমশতার হ্রাস, সম্মুখের কর্মক্ষম পদযুগলের পরিবর্তিত ভূমিকা এবং সচেতন বুদ্ধির আদিম সূত্রপাত।''

[ফটিক ভ্রূকুঞ্চিত মুখ তুলে দর্শকদের দিকে তাকালো, তার চোখে বিভ্রান্তি আর বিরক্তি। কী যেন বলতে গিয়ে থেমে আবার পডতে লাগলো। তাড়াতাড়ি, একঘেয়ে সুরে।]

''—পৃথিবীর যৌবনে এবং জীবনের শৈশবে পিথেকানথ্রোপাস ইরেক্টাস্ হোমোসাপিয়েন্ নিওনডার্থাল গুহাবাসী বৃক্ষশাখাবাসী প্রকৃতি-ভীত আত্মরক্ষাপ্রবণ সহজ-প্রবৃত্তি-চালিত জীবনযাত্রার সর্বোচ্চ সোপানে দাঁড়িয়ে সম্মুখের সহজ সরল নিম্নগামী বুদ্ধিদীপ্ত সভ্যতার ঢালুপথের দিকে অজ্ঞানতার কুজ্ঝটিকায় ভারাক্রান্ত চোখে তাকিয়ে মনুষ্য নামধারী—মনুষ্য নামধারী—''

[ফটিক দ্বিতীয় পাতা খুঁজছে প্রাণপণে]

''—তাকিয়ে মনুষ্য—নামধারী—ধারী—ধারী—''

[খুঁজে পেলো]

''মনুষ্য নামধারী স্বল্পায়ু দুর্বলদেহ জীব। সভ্যতার অপ্রতিহত অগ্রগতিতে লাভ হয়েছে—অভিজ্ঞতা, চেতনা, জ্ঞান, কর্মকৌশল, উদ্ভাবন, বুদ্ধিসঞ্জাত তর্ক ও বিশ্লেষণ। ক্ষতি হয়েছে—সহজ বোধশক্তি, কাপট্যবিহীন সারল্য—সারল্য''

—ঠিক কথা!

[ফটিক হঠাৎ মুখ তুলে দু'পা এগিয়ে এলো। তড়বড় করে বলে চললো।]

—ঠিক কথা। পল্টু একদিন তার ভাই বিল্টুকে বললে, ''এই বিল্টু! সারল্য বানান কর দেখি?'' বিল্টু ভেবেচিন্তে বললে, ''তালিব্যি শ য়ে আকার ড-য়ে শূন্য র ল-য়ে ল-য়ে।'' পল্টু বললে, ''আচ্ছা। কাপট্য?'' বিল্টু অনেক ভেবে বললে, ''এটা পারবো না দাদা, বলে দাও।'' পল্টু বললে, ''ওটা খারাপ কথা, তোর এখন জেনে দবকার নেই।'' পল্টু আর তার দুই বন্ধু মিলে মাংস খাবার গল্প হচ্ছে। প্রথম বন্ধু বললে, ''দাদা আর আমি শুধু মাংসের ঝোল দিয়ে মেখে এক সের চালের ভাত খেয়ে ফেলতে পারি।'' দ্বিতীয় বন্ধু বললে ''ও আর কী। আমি আর দাদা সামনে পাঠা বেঁধে রেখে শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে এক সের চালের ভাত ওড়াতে পারি!'' পল্টু বললে—''তবে তো খুব করো! আমি আর বিল্টু এক সের চালের ভাত নিয়ে বসি। বিল্টু একবার ম্যা-অ্যা-অ্যা করে, আমি একগ্রাস খাই, আর আমি ম্যা-অ্যা-অ্যা করি, বিল্টু একগ্রাস খায়।'' পল্টু বললে, ''বিল্টু! বল তো, রামের মার তিন ছেলে, বড়ো ছেলের নাম এককড়ি, মেজো ছেলের নাম দু'কড়ি, ছোট ছেলের নাম কী?'' বিল্টু বললে, ''রাম?'' পল্টু বললে, ''দূর, গাধা কোথাকার! রাম তো বড়ো ছেলে! ছোট ছেলের নাম

হোলো—"লক্ষ্মণ"। বিল্টু বললে, "সে কী দাদা? লক্ষ্মণ তো রামের মা-র ছেলে নয়?" পল্টু বললে, "রামের বাবার ছেলে তো বটে? ওতেই হবে।"

[জ্যোতি ঢুকেছে। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ফটিকের কাণ্ড দেখছে।]

"পল্টু একদিন রাত্তিরবেলা বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে বোঁ-বোঁ করে মোটর বাইক চালাচ্ছে। পেছনে বসে বিল্টু। ওদিক থেকে দু'টো হেডলাইট আসছে দেখে পল্টু বললে, "বিল্টু, ঐ দেখ, দু'টো মোটরবাইক আসছে। আমি দু'টোর মাঝখান দিয়ে বাঁই করে বেরিয়ে যাবো।" খানিক পরে খানায় শুয়ে শুয়ে বিল্টু বললে, "দাদা, এ কী হলো?" পল্টু বললে, "দু'টোর মাঝখানে আর একটা ছিল রে, ব্যাটা লাইট জ্বালায়নি!" পল্টু আর বিল্টু একদিন বসে তেঁতুলবীচি গুণছে—

জ্যোতি : ফটিক!

ফটিক : অ্যাঁ?

জ্যোতি : ওগুলো কি কাজের কথা?

ফটিক : (দাঁত বার করে) জানি না, আসর জমাচ্ছি। জমছে মনে হচ্ছে, চার-পাঁচজন হেসেছে।

[অথবা অবস্থা বুঝে,—"জমছে না, মনে হচ্ছে, কেউ হাসছে না।" কিম্বা—"খুব জমেছে, সব্বাই হাসছে!"]

(দর্শকদের দিকে ফিরে) পল্টু আর বিল্টু বসে তেঁতুলবীচি গুণছে। পল্টু বললে—

জ্যোতি : কতোটা বাকি আছে, খেয়াল রাখো?

ফটিক : তেঁতুলবীচি?

জ্যোতি : কাজ! কাজ! কাজ যখন হাতে নেবে, সেটা সেরে তবে অন্য কথা। আমি এই বুঝি। যে সমস্যাটা হাতে আছে, সেটা উল্লেখ করবে, বর্ণনা করবে, ব্যাখ্যা করবে, বিশ্লেষণ করবে, সমাধান করবে—চুকিয়ে দেবে। তার আগে অন্য কথা নয়।

ফটিক : ঠিক! ঐ কথাটাই—জানো—পল্টু সেদিন বিল্টুকে বলছিলো—

জ্যোতি : পল্টু-বিল্টুর সঙ্গে আমাদের নাটকের কোনো সম্পর্ক আছে?

ফটিক : না, কিন্তু—

জ্যোতি : পল্টু-বিল্টুর কোনো ভূমিকা আছে এ নাটকে?

ফটিক : না, কিন্তু—

জ্যোতি : পল্টু-বিল্টুর সমস্যার সমাধান করা কি এই নাটকের উদ্দেশ্য?

ফটিক : না, কিন্তু—

জ্যোতি : তবে?

ফটিক : পল্টু-বিল্টুর গল্পগুলো খুব জমে।

জ্যোতি : জমে?

ফটিক : জমে, মানে বেশ—ইয়ে হয় আর কি? খুব—

জ্যোতি : সাত মিনিট আগে নাটক শুরু হয়ে যাবার কথা ছিল।

ফটিক : আমি তো শুরু করে দিয়েছি—ঠিক সাত মিনিট আগে!

জ্যোতি : তরুণ এখনো এলো না।

ফটিক : তরুণ তো নিজের প্রবেশ লিখেছে আরো দশ পাতা পরে—

জ্যোতি : আগের বারেও দেরি করে এসেছিলো। প্রত্যেকবার লেট করবে! প্রত্যেকবার!

ফটিক : তা নাটকে যদি ওর প্রবেশ দশ পাতা পরে থাকে—

জ্যোতি : ঐ এক ছুতো তুমি প্রত্যেকবাব দাও!

ফটিক : কারণ ঐ এক কথা তুমি প্রত্যেকবার বলো!

জ্যোতি : আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। শুধু দয়া করে মনে রেখো—বাড়িতে আমার স্ত্রী ভাত নিয়ে বসে আছে।

ফটিক : ও কথাও তুমি প্রত্যেকবার বলে থাকো।

জ্যোতি : হ্যাঁ, বলি। তার কারণ প্রত্যেকবারই আমার স্ত্রী ভাত নিয়ে বসে থাকে। প্রত্যেকবার এই একই ব্যাপার। এই একই কথার চক্র। একই কথা নিয়ে চর্কিপাক। একই কথার চারিপাশে—

[জ্যোতি নিশ্বাস নিতে থামলো। ফটিক সঙ্গে সঙ্গে ধরিয়ে দিলো—]

ফটিক : ঘানির বলদের মতো—

জ্যোতি : —ঘানির বলদের মতো ঘুরপাক খেয়ে যাওয়া। প্রত্যেকবার একই কথা, একই প্রশ্ন, একই উত্তর।

[ফটিক এর মধ্যে পেছনে প্যাকিং বাক্সের কাছে গেছে। সেখান থেকে ধরিয়ে দিলো।]

ফটিক : অথচ কিছুতেই বুঝবে না—

জ্যোতি : অথচ কিছুতেই বুঝবে না—এ প্রশ্নের কোনো মানে নেই, এর উত্তরের কোনো মানে নেই, এ সমস্যার কোনো মানে নেই, এর সমাধানের কোনো মানে নেই, এই নাটকের কোনো মানে নেই, প্রয়োজন নেই, সার্থকতা নেই।

ফটিক : সিগারেট?

[সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিলো। বাক্সে কাগজপত্র রেখে সিগারেট দেশলাই নিয়ে এসেছে।]

জ্যোতি : না! কতোবার বলবো—না! প্রত্যেকবার আমাকে জিজ্ঞেস করবে, প্রত্যেকবার আমি 'না' বলবো, প্রত্যেকবার নিজে ফস্ করে সিগারেট ধরাবে।

[ফটিক ফস্ করে সিগারেট ধরালো]

কী হবে কী হবে না, কী হয় কী হয় না, কী হতে পারে কী হবার নয়—সব জানে! তবু প্রশ্ন করবে, তবু উত্তর শুনবে, তবু তর্ক করবে, বিচার করবে, বুঝতে চাইবে! কিছুতেই মানবে না যে বোঝবার কিচ্ছু নেই।

ফটিক : কে মানবে না?

[উত্তরটা যেন ফটিকের জানা]

জ্যোতি : এই তরুণ। আমাদের নাট্যকার।

ফটিক : (দর্শকদের) এই খবরটা দেওয়া দরকার ছিল—তরুণ এই নাটকটা লিখেছে। তরুণ এখনো আসেনি। (ঘড়ি দেখে) একটু দেরি আছে।

জ্যোতি : (ফটিকের দিকে দৃকপাত না করে) কিছুতেই এই কথাটা মানবে না যে সমস্যার

অস্তিত্ব না থাকলে সমাধানের অস্তিত্ব থাকে না। প্রশ্নের কারণ না থাকলে উত্তরের অর্থ থাকে না। জানে না তা নয়। জানে। কিন্তু মানবে না। জানে, তবু প্রত্যেকবার আপনাদের জ্বালিয়ে মারবে, আমাদের বকিয়ে মারবে, খাটিয়ে মারবে, ভুগিয়ে মারবে—আর বাড়িতে আমার স্ত্রী ভাত নিয়ে বসে থাকবে। আর ফটিক নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়বে।

[ফটিক নাক দিয়ে এক রাশ ধোঁয়া ছাড়লো সঙ্গে সঙ্গে]

(দু'হাত শূন্যে ছুঁড়ে) কেউ বলে দিতে পারে—এ যন্ত্রণা থেকে কবে আমি মুক্তি পাবো?

[ফটিক দর্শকদের কাছ থেকে যেন জবাব আশা করলো। তারপর জ্যোতির দিকে ফিরে—]

ফটিক : জবাব নেই।

জ্যোতি : কী?

ফটিক : বলছিলাম—জবাব নেই।

জ্যোতি : কিসের জবাব?

ফটিক : তোমার প্রশ্নের।

জ্যোতি : কোন প্রশ্নের জবাব আছে?

ফটিক . এই মরেছে, তা আমি কী জানি?

জ্যোতি : যা জানো না তা নিয়ে কথা বলো কেন তাহলে?

ফটিক : আমি কি সেই কথা বলেছি?

জ্যোতি : কী কথা বলেছো তবে?

ফটিক : আমি বললাম—ইয়ে—ঐ—বললাম—বেশ জমেছে কী বলো? হে হে—

জ্যোতি : তোমার মাথা জমেছে।

[ফটিকের হাসি নিভে গেলো]

ফটিক : জমেনি?

জ্যোতি : (আপন মনে) এই আরম্ভটাই সব চেয়ে খারাপ। কিছুতেই জমতে চায় না। এর পরে কথার পিঠে কথা হবে, কথায় কথা বাড়বে, কথার স্রোতে, কথার বন্যায় সব কিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে তলিয়ে যাবে, গড় গড় করে কথা গড়িয়ে যাবে অপ্রতিহত গতিতে—

ফটিক : বন্যা কি গড়গড় করে গড়ায়?

জ্যোতি : (কর্ণপাত না করে) কিন্তু তার আগে? একঘেয়ে কথার চর্কিপাক। আমি কথা জমাবার চেষ্টা করতে থাকবো। আর ফটিক পা দিয়ে সিগারেট ঘষতে থাকবে।
[ফটিক ঠিক সেই মুহূর্তে ফেলে দেওয়া সিগারেটটা পা দিয়ে ঘষছে। যদিও জ্যোতি কোনোবারই দেখে বলছে না]

ফটিক : জ্যোতি!

জ্যোতি : (ফিরে) কী?

ফটিক : না, কিছু না।

জ্যোতি : তবে ডাকলে কেন?

ফটিক : তোমার নামটা ওঁদের জানিয়ে দিলাম।

জ্যোতি : তাতে কী লাভটা হলো?

ফটিক . লাভ নেই, বাঃ?

জ্যোতি : কী লাভ বলো?

ফটিক : লাভের কথা নয়। নামটা জানানো দরকার। চিনিয়ে রাখবার জন্যে। কিন্তু এমন কায়দা করে জানাতে হবে, যাতে দর্শকরা বুঝতে না পারেন যে জানানো হচ্ছে।

জ্যোতি : বটে?

ফটিক : হ্যাঁ, ভালো নাটকে এইটি অত্যন্ত দরকার।

জ্যোতি : এ সব তোমায় কে শিখিয়েছে? তরুণ?

ফটিক : কিছু তরুণ। কিছু আমি আগেই জানতাম। আমার সেজোমামা নাটক লেখেন।

জ্যোতি : ভালো নাটকে আর কী কী দরকার?

ফটিক : সে আছে।

জ্যোতি : কী আছে?

ফটিক : সে আরো অনেক কিছু।

জ্যোতি : কী, বলো না?

ফটিক : এই ধরো—সিন্‌সিনাবি। (পেছনে তাকিয়ে) না, সিন্‌সিনারি ছাড়াও ভালো নাটক হতে পারে। আসবাবপত্র—(চারিদিকে তাকিয়ে) না, আসবাব না হলেও চলে যায়—

জ্যোতি : কী না হলে চলে না—সেইটা বলো।

ফটিক : এই ধরো—ধরো—ধ—রো—

জ্যোতি : ধরে আছি, অনেকক্ষণ থেকে।

ফটিক : (চিন্তিত) না হলে একেবারেই চলে না এমন তো কিছু— (উজ্জ্বল মুখে) ও হ্যাঁ! দর্শক?

জ্যোতি : দর্শক না হলে নাটক হয় না?

ফটিক : কী করে হবে? ঘরের খেয়ে কে ক'দিন নাটক চালাবে বলো?

জ্যোতি : নাটক চালাবার কথা হচ্ছে না। নাটকের কী না হলে চলে না—তাই জিজ্ঞেস করেছি। দর্শক না থাকলে নাটকটা নাটক রইলো না?

ফটিক : তা কী করে বলি? আজকাল তো শুনেছি দর্শক বেশি হলেই নাটকটা বাজে বলে বুঝতে হয়।

জ্যোতি : তবে?

ফটিক : (ভেবে) তবে? আর্টিস্ট?

জ্যোতি : সে তুমি বলবে। আমার সেজোমামা তো নাটক লেখে না। বস্তুত, সেজোমামাই নেই আমার।

ফটিক · তবে কী মামা আছে?

জ্যোতি : যে মামাই থাক, নাট্যকার মামা নেই। অতএব তুমি বলো।

ফটিক : আর্টিস্টই হবে। অভিনেতা-অভিনেত্রী। ধরো দর্শক নেই, অভিনেতা আছে, এটা ঘটতে পারে। কিন্তু দর্শক বসে আছে, অভিনেতা উপস্থিত নেই, এটা কি সম্ভব?

জ্যোতি : হ্যাঁ। রেডিও প্লে-তে অভিনেতা উপস্থিত থাকে না।

ফটিক : তবে কি তুমি বলতে চাও—এক নামগুলো জানিয়ে দেওয়া ছাড়া নাটকে আর কিছুই দরকার নেই?

জ্যোতি : তাও দরকার নেই—প্রোগ্রাম ছাপালে।

ফটিক : আর—অর্থ?

জ্যোতি : অর্থ? বক্স অফিস?

ফটিক : না না—অর্থ! মানে! মিনিং।

জ্যোতি : ঐটেই সব চেয়ে অদরকারী। এই নাটকটা দেখে বোঝো না?

[জ্যোতি বিরক্ত মেজাজে পিছন ফিরে বিছানাটা পাততে লাগলো বেদির উপর। ফটিক মহা চিন্তিত।]

ফটিক : (হঠাৎ) হ্যাঁ। মনে পড়েছে।

জ্যোতি : কী মনে পড়েছে?

ফটিক : সাসপেন্স? সারপ্রাইজ?

[জ্যোতি বিছানা ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।]

জ্যোতি : ঠিক বলেছো। এই যেমন এখন দর্শকরা সাসপেন্সে আছেন—কী মানে দাঁড়াবে এই নাটকটার, কী মানে দাঁড়াবে? এর পর সারপ্রাইজ আসবে—কোনো মানে নেই।

[আবার বিছানা পাততে লাগলো পরিপাটি করে]

ফটিক : (অল্প ভেবে) যাঃ!

জ্যোতি : কী?

ফটিক : ও রকম করে বলছো কেন? সবাই উঠে যাবে যে?

জ্যোতি : (উজ্জ্বল মুখে) সত্যি? (কেউ ওঠেনি দেখে বিরক্তভাবে) বড়ো বাজে কথা বলো তুমি।

[আবার বিছানা পাততে লাগলো। ফটিক মাথা চুলকোতে লাগলো]

—যাক্ গে যা করবার আছে চুকিয়ে দাও তাড়াতাড়ি।

ফটিক : করবার? ও হ্যাঁ! নবকল্লোল!

[ছুটে গিয়ে বাক্স থেকে এক কপি 'নবকল্লোল' তুলে এনে সামনের একটা বাক্সে বসে পড়তে শুরু করলো]

জ্যোতি : আরে? (ফটিকের জবাব নেই) শুনছো?

ফটিক : (হঠাৎ হেসে) হেঃ হেঃ! এটা বেড়ে করেছে তো! দেখো দেখো—

জ্যোতি : (মুখ ফিরিয়ে) দেখেছি।

ফটিক : না না, ছবিটা দেখো। ছবি না দেখলে হিউমারটা বুঝতে পারবে না।

জ্যোতি : (না দেখে) বলছি তো দেখেছি।

ফটিক : সে তো আগের দিন দেখেছিলে। এটা নতুন। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা! বৃদ্ধ ভার্যাকে কী বলছে পড়ে দেখো—

[জ্যোতির নাকের কাছে পত্রিকাটা ধরলো। জ্যোতি ঠেলে সরিয়ে দিলো।]

জ্যোতি : হ্যাঁ, জানি। খুব মজার।

ফটিক : সরি। তুমি কী বলছিলে?
জ্যোতি : কিছু না।
ফটিক : আমি ভুল শুনেছি তাহলে।
[পত্রিকায় মন দিলো]
জ্যোতি : বলছিলাম—যা করবার আছে চুকিয়ে দাও!
ফটিক : তাই তো চোকাচ্ছি এতোক্ষণ ধরে।
জ্যোতি : ভূমিকাটা পড়ে দিয়েছো?
ফটিক : হ্যাঁ। ক —খন!
জ্যোতি : সবটা পড়েছো?
ফটিক : হ্যাঁ। মানে—প্রায় সবটা।
জ্যোতি : প্রায় মানে?
ফটিক : মানে—অনেকটা।
জ্যোতি : অনেকটা?
ফটিক : (স্বীকার করে) খানিকটা।
জ্যোতি : সেটা শেষ করতে হবে না?
ফটিক : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—তবে—(চোখ টিপে) কী দরকার?
জ্যোতি : দরকার নেই?
ফটিক : (কাছে এসে ষড়যন্ত্রের ভঙ্গীতে) তরুণ যদি জানতে না পারে—
[কিন্তু জ্যোতি এসব অন্যায় ব্যাপারে নেই]
জ্যোতি : (ধমকে) যাও, নিয়ে এসো। পড়ে দাও সবটা।
[ফটিক হাল ছেড়ে বাক্সের কাছে গেলো। জ্যোতি চিৎ হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। ফটিক 'নবকল্লোল' রেখে কাগজের তাড়া নিয়ে এলো। খানিকক্ষণ ঘেঁটে প্রথম পাতাটা বার করলো।]
ফটিক : (চিৎকার করে) ''যদি ধরে নেওয়া যায় জীবনের একটা অর্থ আছে''—
জ্যোতি : (মাথা তুলে) ফের গোড়া থেকে শুরু করতে গেলে কেন?
ফটিক : এর গোড়া-আগা বুঝবে কে? ''ব্যক্তিগত—সামগ্রিক—ম্‌ম্‌—উত্থান—রূপান্তর—লীলা—বিবর্তন—অ্যাম্‌—অ্যাম্‌—মেরুদণ্ডের নিম্নস্থিত প্রসারের—'' (পিছনে হাত দিয়ে দেখলো আবার) না! ম্‌ম্‌ম্‌—''ঋজুতা—সূত্রপাত—হোমোসাপিয়েন—মনুষ্য নামধারী—নামধারী—''
[দ্বিতীয় পাতা খুঁজতে লাগল।]
''ধারী—ধারী''—হ্যাঁ! ''স্বল্পায়ু দুর্বলদেহ—লাভ—উদ্ভাবন''—ধুত্তোরি!
[আর একটা পাতা নিয়ে]
''—সন্দেহ নাই। জীবনের প্রকৃত মূল্যবোধ, প্রকৃত সার্থকতা যদি উপলব্ধি না করা যায়, জীবনের অর্থ প্রতিষ্ঠিত করা যদি সম্ভব না হয়—''
জ্যোতি : ও কী? ওটা তো শেষ পাতা?
ফটিক : অ্যাঁ? হ্যাঁ, শেষ পাতা। (তাড়াতাড়ি) ''সম্ভব না হয়, তবে আদিম যুগ থেকে সভ্যতার অপ্রতিহত অগ্রগতি, বুদ্ধিবৃত্তির অচিন্ত্যনীয় বিকাশ, জ্ঞানবিজ্ঞানের

অভাবনীয় প্রসার, সমস্ত কিছুই অ্যাম্ অ্যাম্ অ্যাম্ অ্যাম্ অ্যাম্—(হঠাৎ চিৎকার করে স্পষ্ট উচ্চারণে) আজকের এই নাটকের মূল উদ্দেশ্য।"

[ফটিক সালঙ্কারে অভিবাদন জানিয়ে প্যাকিং বাক্সের দিকে এগুলো নিশ্চিন্ত হয়ে]

জ্যোতি : (মাথা তুলে) কী?

ফটিক : (থেমে গিয়ে) কী?

জ্যোতি : কী মূল উদ্দেশ্য?

ফটিক : এই নাটকের। আজকের এই নাটকের।

জ্যোতি : হ্যাঁ, মূল উদ্দেশ্যটা কী?

ফটিক : (হাঁ করে তাকিয়ে থেকে) তা আমি কী করে জানবো?

জ্যোতি : কী পড়লে তবে এতোক্ষণ?

ফটিক : ভূমিকা!

জ্যোতি : তবে নাটকের মূল উদ্দেশ্যটা বলতে পারছো না কেন?

[ফটিক অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো, যেন জ্যোতির মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান। তারপর হঠাৎ ফিক্ করে হেসে জ্যোতির দিকে দু'পা এগিয়ে এলো]

ফটিক : জানো—পল্টু আর বিল্টু একদিন বসে তেঁতুলবীচি গুণছে—

জ্যোতি : উঃ ভগবান! তুমি যদি থাকতে!

[চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। ফটিক চেয়ে দেখে শেষে সামনে এগিয়ে এসে দর্শকদের বলতে লাগলো।]

ফটিক : বুঝলেন—তেঁতুলবীচি গুণছে! পল্টু গুণে-টুনে বললে, "দেখ তো বিল্টু, এখানে একশোটা আছে কিনা?" বিল্টু খানিক পরে বললে, "ঠিক আছে দাদা।" পল্টু বললে, "একশোটা পেয়েছিস?" বিল্টু বললে, "না, কিন্তু পঞ্চাশ অবধি গুণে দেখলাম ঠিক আছে, বাকি পঞ্চাশটাও তাহলে ঠিক আছে নিশ্চয়ই।"

[গল্প শেষ করেই পেছনে চলে গেলো। বাক্সে কাগজ রেখে 'নবকল্লোল' নিয়ে এসে সামনের একটা বাক্সের উপর বসে পড়তে লাগলো। একটি ছিমছাম মেয়ের প্রবেশ। কেউ ফিরে তাকালো না, মেয়েটির মধুর হাসি আর সুললিত নমস্কার বৃথা গেলো। একটু ইতস্তত করে সে জ্যোতির কাছে গেলো।]

মেয়েটি : এক্সকিউজ মি—

[জ্যোতি শূন্যে চোখ রেখে একইভাবে শুয়ে রইলো। মেয়েটি ফটিকের কাছে গেলো।]

শুনুন। (জবাব নেই) শুনছেন—?

ফটিক : (মুখ না তুলে) শুনছি।

মেয়েটি : (অল্প ঘাবড়ে) মানে, বলছিলাম—(থেমে গেলো)

ফটিক : (একইভাবে) বলুন।

মেয়েটি : ছায়া আজ আসতে পারবে না। তাই—

ফটিক : ছায়া কে?

মেয়েটি : যে আগের দিন পার্ট করেছিলো। সে আজ আসতে পারবে না, তাই তার বদলে আমি এসেছি।

ফটিক : (পত্রিকা থেকে মুখ তুলে) কেন?

মেয়েটি : তার মাথার বাঁ পাশের সামনের দিকটা সকাল থেকে টিপ্ টিপ্ করতে করতে বিকেলের দিকে হঠাৎ দপ্ দপ্ করে—

ফটিক : আমি জিজ্ঞেস করছি—আপনি এসেছেন কেন?

মেয়েটি : পার্ট করতে! মানে—অভিনয় করতে। এই নাটকে।

ফটিক : আপনি কে?

মেয়েটি : আমি ছায়ার বোন।

ফটিক : আপনাকে তো ঠিক তার মতোই দেখতে?

মেয়েটি : হ্যাঁ। আমরা যমজ বোন।

ফটিক : আপনার নাম কী?

মেয়েটি : ছায়া।

ফটিক : তা কী করে হয়?

ছায়া : আমরা একেবারে একরকম যমজ বোন যে!

ফটিক : আগের দিনও আপনি ঠিক এই কথা বলেছিলেন।

ছায়া : আমি বলিনি। ছায়া বলেছিলো। তার আগের দিন আমি বলেছিলাম। আমরা পালা পালা করে আসি।

ফটিক : তা বেশ করেন।

[আবার নবকল্লোলে মন দিলো]

ছায়া : নাটক কখন শুরু হবে?

ফটিক : শুরু হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

ছায়া : সে কী? আমার—আমার মেক্-আপ্ নেওয়া হয়নি যে—

ফটিক : যা হয়েছে ওতেই হবে।

ছায়া : আমি—আমি তা হলে কী করবো এখন?

ফটিক : যা করছেন করে চলুন।

ছায়া : (চাপা গলায়) কিন্তু—আমি তো কিছুই করছি না!

জ্যোতি : (একইভাবে শুয়ে শুয়ে) অজ্ঞানতার একটা সীমা থাকা উচিত।

ছায়া : (চমকে) উনি—ঐ ভদ্রলোক কে?

ফটিক : ওর নাম বলা হয়ে গেছে।

[জ্যোতি হঠাৎ উঠে বসলো]

জ্যোতি : কিছু না করে কোনো মানুষ থাকতে পারে? না ভেবেচিন্তে কথা বলেন কেন?

ছায়া : আপনি ওরকম ভাবে কথা বলছেন কেন?

জ্যোতি : (উঠে দাঁড়িয়ে) আমি যে চিৎ হয়ে শুয়েছিলাম, কিছু করছিলাম না ভেবেছেন?

ছায়া : আপনি কী করছিলেন আপনিই জানেন—

[জ্যোতি দু'পা এগিয়ে এলো। ছায়া পিছিয়ে গেলো।]

কী? কী চান?

জ্যোতি : কিছু না করে থাকতে পেরেছিলাম ভেবেছেন? থাকা সম্ভব?

ছায়া : তা আমি কী করে জানবো?

জ্যোতি : (ধমকে) যান! ওখানে গিয়ে নিজে শুয়ে দেখুন!

[ছায়া ভয় পেয়ে শুতে গেলো। তারপর হঠাৎ সচেতন হয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ালো।]

ছায়া : কী ভেবেছেন আপনি আমাকে?

জ্যোতি : (কড়া গলায়) শুয়ে থেকে দেখুন—কিছু না করে থাকতে পারেন কি না!

ছায়া : (ছিটকে সরে গিয়ে) না! আপনার মতলব ভালো না।

জ্যোতি : (নিজের মনে) লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনে শিম্পাঞ্জির মগজ মানুষের মস্তিষ্কে পরিণত হয়েছে। হয়ে বলছে—আমি তো কিছুই করছি না!

ছায়া : দেখুন—গালাগাল দেবেন না বলছি—

ফটিক : (হঠাৎ মুখ তুলে) গালাগাল দিয়েছে না কি?

ছায়া : দেখুন না? শিম্পাঞ্জি বলছে আমাকে!

ফটিক : ছি জ্যোতি! বিদ্যাসাগর বলে গেছেন না—কানাকে কানা বলিও না, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না—

[কিন্তু জ্যোতি নিজের চিন্তায় মগ্ন, এসব কিছুই শোনেনি]

জ্যোতি : হাজার চেষ্টা করলেও আপনি কিছু না করে থাকতে পারবেন না। আপনার মন কাজ করে যাবে। মানুষের মননশক্তি সর্বদা সক্রিয়। মানুষের মননশক্তি অসাধারণ। অপরিমেয়। বুঝেছেন?

ছায়া : না!

জ্যোতি : (না শুনে) তাই বলে এ কথা ভাববেন না যে মন বস্তুর চেয়ে বড়ো। মানুষের মন বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে—

[ফটিক এর মধ্যে সিগারেট বার করেছে। সে জ্যোতির পেছনে।]

—বস্তুকে ধরতে পারে, ছুঁতে পারে, মুখে দিতে পারে,—

[ফটিক সেই মুহূর্তে সিগারেট মুখে দিয়েছে]

—বস্তুকে নিয়ে যা ইচ্ছে করতে পারে। নড়াতে পারে, সরাতে পারে, ভাঙতে পারে, ছিঁড়তে পারে, জ্বালাতে পারে,—

[ফটিক দেশলাই জ্বেলেছে সঙ্গে সঙ্গে]

—পোড়াতে পারে, জমাতে পারে, গলাতে পারে, ধোঁয়া করে দিতে পারে,—

[ফটিক একমুখ ধোঁয়া ছেড়েছে]

—কিন্তু তবু বস্তুটা বস্তুই থাকবে। রূপান্তর হতে পারে, কিন্তু থাকবে। আপনি দেখলেও থাকবে, আপনি না দেখলেও থাকবে। বস্তুর অস্তিত্ব মননশক্তির প্রভাবনিরপেক্ষ।

ফটিক : (একগাল হেসে) ঠিক কথা! খাঁটি কথা! পল্টু তাই সেদিন বিল্টুকে বলছিল—

ছায়া : পল্টু কে?

জ্যোতি : কে! কে? এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারে কেউ? জবাব জেনেছে মানুষ আজ অবধি? আপনি কে?

ছায়া : আমি? আমি ছায়া!

জ্যোতি : তাতেই প্রশ্নের জবাব হয়ে গেল? তাতেই আপনি কে—সবাই জেনে গেলো? বলতে পারেন—আপনার নাম ছায়া। তার বেশি—

ফটিক : ওর বোনের নামও ছায়া।

জ্যোতি : (ব্যথিত ধৈর্যে) তাতে কি ওর পরিচয় কিছু বেশি প্রকাশ পেলো?

ফটিক : কিছু বেশি তো বটেই! উনি ছায়ার বোন একথাটাও জানা গেলো। যেমন বিল্টুর নাম বিল্টু, আবার বিল্টু হোলো গে পল্টুর ভাই।

ছায়া : পল্টু কে?

ফটিক : বিল্টুর দাদা।

জ্যোতি : নাটক শুরু হয়েছে প্রায় পনেরো মিনিট হোলো। কাজের কথা একটাও হলো না এতোক্ষণে।

ফটিক : তিনটে চরিত্রের পরিচয় দর্শকদের দেওয়া হোলো। সেটা কি কম কথা?

জ্যোতি : আমাদের পরিচয় নিয়ে দর্শকদের কোনো মাথাব্যথা নেই।

ফটিক : কী নিয়ে মাথাব্যথা আছে?

জ্যোতি : জীবনের রূপ নিয়ে। জীবনের সত্য নিয়ে। জীবনের অর্থ নিয়ে।

ছায়া : কোন জীবন? জীবনকুমার? সিনেমার?

ফটিক : না, এ আর এক জীবন, আপনি চেনেন না।

ছায়া : জীবন বোস নামে একজনকে চিনতাম আমি। কবিতা লেখার বাতিক ছিল—

ফটিক : আপনি জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন—

ছায়া : না না—বোস! আমার খুব ভালো করে মনে আছে। আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে থাকতো আগে। রোগা ফর্সা, লম্বা লম্বা চুল—

[বর্ণনাটা এমন যা জ্যোতির চেহারার সঙ্গে অবিকল মেলে]

ফটিক : সে কী! জ্যোতি, তোমার নাম জীবন বোস নাকি?

জ্যোতি : (চিন্তার অতল থেকে) নাম? নামে কী বা হয়? গোলাপে যে নামে ডাকো—গন্ধ তাতে রয়।

ছায়া : (ফটিককে) রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, না?

ফটিক : (গম্ভীরভাবে) না, ডন ব্র্যাডম্যান।

ছায়া : ব্র্যাডম্যান? বাংলা কবিতা?

ফটিক : বাংলায় অনুবাদ করেছেন মেঘনাদ সাহা।

ছায়া : ও।

জ্যোতি : (আবার চিন্তার গভীর থেকে) জীবনের অর্থ আছে কি নেই এ নিয়ে আমি তর্ক করতে চাই না। আমি—

ছায়া : জীবন বোসের যে নেই তা জানি। সপ্তায় একটা সিনেমা—তাই দেখাতে কূলকিনারা পেতো না।

জ্যোতি : আপনি দয়া করে একটু চুপ করবেন?

ছায়া : কেন?

ফটিক : হিয়ার হিয়ার! ভালো প্রশ্ন করেছেন। জবাব দাও জ্যোতি।

জ্যোতি : কারণ আমি আজকের মূল প্রশ্নটায় একটু মন দিতে চাই।

ছায়া : কী প্রশ্ন?

ফটিক : (ফুটবল মাঠের গ্যালারির দর্শকের মতো) গুড্ শট্। ভেরি গুড্ শট্, বাক্ আপ্!

জ্যোতি : আজকের নাটকে যে প্রশ্নটা তুলে ধরা হয়েছে।

ছায়া : কী সেটা?

ফটিক : (তিড়িং করে লাফ দিয়ে) হ্যাট্‌ট্রিক। হোয়া—!

[রুমাল উড়িয়ে, নেচে, মহা হট্টগোল বাধিয়ে তুললো]

জ্যোতি : আঃ ফটিক!

ফটিক : সরি! খেলো! (দর্শকদের) থ্রি নিল।

জ্যোতি : প্রশ্নটা হোলো—জীবনের কোনো অর্থ আছে কিনা। যদিও আমি—

ছায়া : ও, জীবন মানে—ঐ জীবন?

জ্যোতি : অ্যাঁ?

ছায়া : আর অর্থ মানে—'মানে'?

জ্যোতি : তার মানে?

ফটিক : উনি বলছেন—অর্থ মানে 'মানে'।

জ্যোতি : উনি কী বলেছেন আমি শুনেছি ফটিক। আমি শুধু তার মানেটা জানতে চাইছি।

ফটিক : মানে—'মানে'। মানে—টাকা নয়।

জ্যোতি : টাকার কথা কে বলেছে?

ফটিক : (হাল ছেড়ে) কেউ বলেনি। তুমি যা বলছিলে বলো।

জ্যোতি : আমি কী বলছিলাম?

ফটিক . ওঁর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলে—

জ্যোতি : প্রশ্ন—হ্যাঁ! আমি বলছিলাম—এই নাটকটার মূল প্রশ্ন—জীবনের কোনো অর্থ আছে কি না? যদিও আমি বলি—সেটা আসল প্রশ্ন নয়। আসল প্রশ্ন হোলো—অর্থ আছে কি নেই—সেটা খুঁজে বার করবার কোনো অর্থ আছে কি না।

ফটিক : ও সব তো পড়া হয়ে গেছে একবার।

জ্যোতি : (গ্রাহ্য না করে) কিন্তু তরুণ বলে—জীবনের অর্থ যদি—

ছায়া : তরুণ কে?

ফটিক · ও কথাও বলা হয়ে গেছে আগে। আপনি শুধু পুরোনো কথা রিপিট করেন।

ছায়া : বাঃ! কখন বলা হয়েছে?

ফটিক : আপনার প্রবেশের আগে।

ছায়া : তাহলে আমি কী করে জানবো?

ফটিক : সে কথা তরুণকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি কী জানি?

ছায়া : তরুণ কে তাই জানলাম না, তাকে জিজ্ঞেস করবো!

ফটিক : (ঘড়ি দেখে) একটু। একটু সবুর করুন।

ছায়া : কেন?

ফটিক : (ঘোষণা করে) তরুণের প্রবেশ!

[তরুণ হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলো]

তরুণ : এই যে! সবাই তৈরি?

জ্যোতি: (বিরক্ত হয়ে) তৈরি! ওকে জিজ্ঞেস করো তো ফটিক, আমরা যে আঠারো মিনিট আগে নাটক শুরু করে দিয়েছি—সে খবরটা রাখে কি না?

তরুণ : (কর্ণপাত না করে) নাও নাও। দেরি কোরো না, শুরু করো। ফার্স্ট স্লিপে কে আছে? তুমি মিড অফে দাঁড়িয়ে কী করছো? স্কোয়ার লেগ—আর একটু স্কোয়ার—হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যস। আমি বোলিং ওপ্‌ন্ করছি। উইকেট কীরকম?

ফটিক : স্টিকি।

ছায়া : এসব আবার কী?

[তরুণ ছায়াকে এই প্রথম লক্ষ্য করলো]

তরুণ : আপনি এখানে কেন? গ্যালারিতে গিয়ে বসুন—প্লীজ!

ছায়া : (দর্শকদের গ্যালারির দিকে আঙুল দেখিয়ে) গ্যালারিতে? কেন?

তরুণ : কেন মানে? আপনি কি খেলছেন?

ছায়া : খেলছি মানে? খেলবো মানে?

তরুণ : খেলবেনও না, বসবেনও না, পীচের উপর দাঁড়িয়ে থাকবেন?

ছায়া : পীচ?

[ততোক্ষণে ফটিক পেছনের বাক্স থেকে কালো চশমা আর ইলাস্টিক লাগানো কার্ডবোর্ডের আই-শেড নিয়ে এসেছে। আর এনেছে আম্পায়ারের সাদা কোট আর টুপি]

ফটিক : আসুন—এই দিকে।

[বিভ্রান্ত ছায়াকে খাটের উপর বসিয়ে চশমা আর আই-শেড পরিয়ে দিলো]

তরুণ : রেডি?

[তরুণ আর জ্যোতি সামনে দু'পাশে দু'জন। দর্শকদের দিকে মুখ করে। ফটিক একটু পেছনে—মাঝখানে, ছায়াকে আড়াল করে। তার গায়ে কোট, মাথায় টুপি, ভঙ্গী ক্রিকেট আম্পায়ারের। তরুণ বাহুতে বোলিং-এর ভঙ্গী করে—]

মাননীয় ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ!

ফটিক : নো বল।

তরুণ : (ফটিকের দিকে তাকিয়ে, আবার) বন্ধুগণ!

ফটিক : নো বল!

তরুণ: আমাদের আজকের নাটকের মূল উদ্দেশ্যটা কী?

জ্যোতি : প্রশ্ন করছো কেন? তুমি বলে দাও।

তরুণ : (জ্যোতিকে) এ প্রশ্নটা হোলো বক্তৃতার অলঙ্কার।

ফটিক : নো বল।

তরুণ : কেন, নো বল কেন?

ফটিক : সতেরো নম্বর বিধি। বক্তৃতার অলঙ্কারসূচক প্রশ্ন, ছন্দোবদ্ধ উক্তি এবং তালব্য শ, ব ও চ দিয়া আরম্ভ যাবতীয় গালাগালি পূর্ববর্ণিত অর্থে নো বল বলিয়া পরিগণিত হইবে।

তরুণ : কিন্তু—

ফটিক : আঠারো নম্বর বিধি—আম্পায়ারের সহিত তর্ক করা—

তরুণ : আচ্ছা, আচ্ছা ঠিক আছে। (একটু ভেবে আচমকা) জীবন পদ্মপত্রে জল!

[জ্যোতি জবাব দিতে মুখ খুললো]

(হুঙ্কারে) হাওজ্যাট্!

জ্যোতি : আই প্রোটেস্ট! উপমা 'বোল' করেছে!

ফটিক : নট আউট। উনিশ নম্বর বিধি।

তরুণ : মানে?

ফটিক : রুল নাইনটিন।

তরুণ : তুমি কার দিকে, শুনি?

ফটিক : নিরপেক্ষ, নিরপেক্ষ! আম্পায়ারের ডেফিনিশন। প্রথম পাতা।

তরুণ : বুঝেছি। (ভেবে হঠাৎ আবার শুরু করে) যদি ধরে নেওয়া যায় পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একই জাতি, যেহেতু সব মানুষেরই একই রকম পাঁজরের হাড়ের সংখ্যা, পাকস্থলীর গঠন ইত্যাদি, সব মানুষই একই রকম যন্ত্রণা পায়, রোগে ভোগে ইত্যাদি, সব মানুষই নিজের অস্তিত্বটাকে যথাসম্ভব আরামদায়ক এবং সুখকর করার চেষ্টায় সারাজীবন ব্যাপৃত থাকে ইত্যাদি, সব মানুষই পরিণামে একই মৃত্যুর করাল গহ্বরে—

জ্যোতি : কী বলতে চাও কী?

তরুণ : করাল গহ্বরে নিমজ্জিত হয় ইত্যাদি ইত্যাদি, তাহলে বলা যেতে পারে—একজন মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ যাবতীয় মানুষের সুখ-দুঃখকে প্রতিফলিত করে, একজন মানুষের জীবনের অর্থ যাবতীয় মানুষের জীবনের অর্থকে প্রকাশ করে; সুতরাং যদি দেখা যায় একজন মানুষ তার জীবনের চোদ্দ বছর অধ্যয়নের দাসত্বে কাটিয়ে, তিরিশ বছর অর্থকরী প্রচেষ্টার দাসত্বে কাটিয়ে, বারো বছর বৃদ্ধি, বিশ্রাম এবং দু' চারটি বিশিষ্ট অথবা বাহুল্য কাজে কাটিয়ে অবশেষে দারিদ্র্য, হতাশা ও যন্ত্রণার মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে সামগ্রিক বিচারে সেই জীবন তার একার নয়, আমাদের সকলেরই, এবং তার জীবনের অর্থ বিশ্লেষণ করলে আমাদের সকলেরই জীবনের অর্থ—

জ্যোতি : গুষ্টির পিণ্ডি!

ফটিক : ওভার!

তরুণ : আমার কথা শেষ হয়নি। আমরা যদি আজ এই লোকটার জীবনটাকে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখি—

[ছায়া অনেকক্ষণ আগে হাল ছেড়ে দিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে পাউডার বার করে গালে ঘষছিলো]

ছায়া : কোন লোকটার?

তরুণ : (ফিরে না তাকিয়ে, হাত নেড়ে) ঐ যে ঐ লোকটার। আমরা যদি—

ছায়া : কোথায়? কোন্ লোক?

তরুণ : ধ্যাত্তেরি! বলছি তো—ঐ লোকটার—(ফিরে) আরে! গেলো কোথায়?

ছায়া : কে?

জ্যোতি : সেরেছে! কোথায় রেখে এলে তাকে?

তরুণ : আরে, এতোক্ষণ আগাগোড়া আমার সঙ্গে ছিল—

জ্যোতি : শুধু স্টেজে ওঠবার সময় হারিয়ে এলে! হোপলেস!

তরুণ : হারাবো কেন? গেছে কোথাও, এক্ষুনি আসবে।

জ্যোতি : আর এসেছে!

তরুণ : একটু ধৈর্য ধরো না—

জ্যোতি : ধৈর্য? তরুণ, তোমার কোনো ধারণা আছে এতোক্ষণ ধরে কী প্রচণ্ড চেষ্টায় আমরা আসর গরম করছি, জমি তৈরি করছি, আর তুমি লোকটাকে— হোপলেস! হোপলেস! আর বাড়িতে আমার স্ত্রী ভাত নিয়ে বসে আছে।

[ছায়া উঠে এসেছে। কথা বলতে চেষ্টা করছে. সুযোগ পাচ্ছে না।]

ছায়া: এক্সকিউজ মি—

তরুণ : (যেন প্রথম দেখলো) আপনি কে?

ছায়া : সেটাই জানতে চাইছিলাম।

তরুণ : (কড়া গলায়) আপনি নয়, আমি জানতে চেয়েছি—আপনি কে?

ছায়া : না, মানে—আমি ছায়ার বদলে এসেছি। ছায়া আজকে আসতে পারবে না। তার মাথার বাঁ পাশের সামনের দিকটা—

তরুণ : ছায়া কে?

ছায়া : আমার বোন।

তরুণ : আপনার নাম কী?

ছায়া : ছায়া।

তরুণ : এই গপ্পো বিশ্বাস করতে বলেন?

ছায়া : হ্যাঁ, সত্যি—

তরুণ : কী চান আপনি?

ছায়া : আমি কে জানতে চাই।

তরুণ : সে কথা তো আপনিই শোনালেন এইমাত্র।

ছায়া : না, মানে--এই নাটকে আমি কে? আমাকে কী করতে হবে?

তরুণ : এতোক্ষণ কী করছিলেন?

ছায়া : বসেছিলাম।

তরুণ : তাই করুন গিয়ে।

ছায়া : শুধু বসে থাকবো?

ফটিক : পাওডার মাখতেও পারেন।

ছায়া : (গজগজ করে) ছায়া বলেছিলো আমায়—রোজ এই এক ব্যাপার। কেউ বলবে না কী করতে হবে। শুধু এক কথা—যা করছো করে চলো। যা করছি, করে কী করে মানুষ, যদি কী করবার কথা সেটা জানা না থাকে?

জ্যোতি : (ছায়ার দিকে এগিয়ে) শুনুন—

ছায়া : (পিছিয়ে) আপনি তফাতে থাকুন!

জ্যোতি : আমি আপনাকে সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছিলাম—

ছায়া : দিয়ে দেখুন! আমি চ্যাঁচাবো! চেঁচিয়ে লোক জড়ো করবো। আপনার টাইপ জানা আছে আমার—

[জ্যোতি বিরক্ত হয়ে সরে এলো]

জ্যোতি : এর চেয়ে ওর বোন ভালো ছিল।
ফটিক : না, একই রকম।
জ্যোতি : না, ভালো।
ফটিক : না, একই রকম।
তরুণ : প্রত্যেকবার সেই একই কথা। কেন বলতে পারেন?
ছায়া : (চমকে) অ্যাঁ? আমায় বলছেন?
তরুণ : আমি আশাবাদী। প্রত্যেকবার আশা করি—একটা কিছু তফাত হবে! একটু অন্যরকম হবে।
ছায়া : আমার চণ্ডীমামাও ঠিক ঐরকম আশা করতেন, বিয়ের পরদিন থেকে—রোজ। তেরো বছর ধরে সমানে আশা করে করে শেষে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন।
ফটিক : (একগাল হেসে এগিয়ে এসে) পল্টু আর বিল্টু এক সন্ন্যাসীর কাছে হাত দেখাতে গেছে—
জ্যোতি : (হতাশভাবে) এই আবার শুরু হলো।
ফটিক : শোনো না শোনো না, গল্পটা খুব মজার—
তরুণ : ফটিক, প্লীজ!
ফটিক : (খুশি হয়ে তরুণের দিকে চেয়ে) সন্ন্যাসী হাত দেখে-টেখে—
তরুণ : (আরো জোরে) প্লীজ!
ফটিক : অ্যাঁ! বলছি তো। সন্ন্যাসী—
তরুণ : (হুঙ্কারে) প্লীজ!
ফটিক : (অবাক হয়ে) ও, বলতে বারণ করছো?
তরুণ : হ্যাঁ।
ফটিক : (হঠাৎ যেন বুঝতে পেরে) না না, খারাপ কিছু নেই গল্পটায়, (ছায়াকে দেখিয়ে) ওনার সামনে বলা চলে।
তরুণ : (চিৎকার করে) ভালো খারাপ কোনো গল্পই শুনতে চাই না আমি।
ফটিক : না শুনবে, না শুনবে। চ্যাঁচাবার কী আছে? আমি কি জোর করে শোনাতে গেছি নাকি?

[নবকল্লোল নিয়ে বসলো]

তরুণ : আমার মাথা ধরে গেছে।
জ্যোতি : কোন্‌দিন না ধরে?

[তরুণ পকেট থেকে একটা বড়ি বার করলো]

তরুণ : ফটিক একটু জল দিতে পারো?
[ফটিক পত্রিকা রেখে উঠে পেছনের বাক্স থেকে এক গ্লাস জল নিয়ে তরুণকে দিলো। তরুণ ওষুধ খেলো। ফটিক গ্লাস বাক্সে রেখে এসে আবার পত্রিকায় মন দিলো। তরুণ নিজের মাথা ঘাড় নামান জায়গা টিপে দেখতে লাগলো]
আমার যে মাথাই ধরেছে, এ কথা জোর করে বলা চলে না। ব্যথাটা যেন ঘাড়ের কাছে মনে হচ্ছে। এইখানটায়।
ফটিক : (নবকল্লোল পড়ে) খিক্ খিক্।

তরুণ : কিম্বা কোমরে। কিম্বা মাঝামাঝি কোথাও ব্যথাটা—

ফটিক : (জোরে) খিক্ খিক্! খি হি হি—

তরুণ : (চটে) হাসছো কেন? ব্যথাটা হাসির কথা?

ফটিক : অ্যাঁ? খি হি হি—এই দেখো দেখো—

[পত্রিকা দেখাতে উঠতে গেলো]

তরুণ : (শশব্যস্ত) না না, হাসো হাসো! ঐখানে বসে হাসো।

ফটিক : (বসে, অভিমানের সুরে) তুমিই তো জিজ্ঞেস করলে—হাসছি কেন?

তরুণ : আর করবো না, তুমি হাসো।

[ফটিক আবার নবকল্লোলে ডুবলো]

বুঝলে জ্যোতি, এটা আসলে ব্যথা নয় ঠিক।

জ্যোতি : (নিরাসক্ত কণ্ঠে) ভালো কথা।

তরুণ : এটা একটা—একটা অনুভূতি!

জ্যোতি : আচ্ছা।

তরুণ : মনে হচ্ছে যেন—ব্রহ্মতালু থেকে শুরু করে মাথা-ঘাড়-বুক-পিঠ-কোমর—বলতে গেলে সারা শরীরটাই যেন পায়ের কাছে নামবার চেষ্টা করছে।

জ্যোতি : বেশ।

তরুণ : বলতে পারো—পায়ের কাছে কেন?

জ্যোতি : বলিনি।

তরুণ : তার কারণ—পা-টা আছে মাটিতে। মাটি মানে পৃথিবী।

জ্যোতি : ও।

তরুণ : তাহলে বলা যায় সারা শরীরটা পৃথিবীর ভিতর ঢুকবার চেষ্টা করছে। দেখি তো! (হাত তুললো, কষ্টে) এই যে হাতটা তুললাম—

[ফটিক মুখ তুলে উৎসুক দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো]

—এই দেখো (হাতটা ঝুপ করে নেমে এলো) নেমে গেলো। কোনদিকে? পায়ের দিকে। পৃথিবীর দিকে গেলো। জ্যোতি, আমার মাথার উপর তোমার হাতটা রাখো তো।

[জ্যোতি ক্লান্তভাবে এসে তরুণের মাথায় হাত রাখলো]

কিছু অনুভব করছো?

জ্যোতি : করছি।

তরুণ : কী বলো তো?

জ্যোতি : তোমার মাথা।

তরুণ : আমি অনুভব করছি—তোমার হাতটা আমার মাথার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর দিকে যাবার চেষ্টা করছে। সবকিছু পৃথিবীর ভিতরে, পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে যাবার চেষ্টা করে। আমার এই যে আবিষ্কার—

জ্যোতি : তাকে মাধ্যাকর্ষণ বলে।

ফটিক : (সপ্রশংস) আবিষ্কারটা পাবলিশ করে ফেলো।

তরুণ : আবার ঠিক ঐ রকমের আর একটা অনুভূতি—না, ঠিক ওর উল্টো একটা

অনুভূতি—যেন আমার যতো অভিজ্ঞতা, যতো চেতনা সব গিয়ে জমা হচ্ছে—মাথায়, তোমার হাতের ঠিক নিচে। টের পাচ্ছো?

[জ্যোতি বিরক্ত হয়ে হাত সরিয়ে অন্যদিকে চলে গেলো]

পৃথিবীর টান আর মস্তিষ্কের টান। দু'টো উল্টোদিকে। কোথায় এর একটা শেষ হয়ে অন্যটা শুরু হচ্ছে জানি না, শুরু-শেষ আছে কিনা তাও জানি না। শুধু জানি—সবসময়ে, সারাক্ষণ—টানাটানি। পৃথিবী আর মস্তিষ্কের টানাটানির লড়াইয়ে আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি! একেবারে শেষ হয়ে যাচ্ছি।

জ্যোতি : আহা। একে বলে ট্র্যাজেডি! যদি কিছু মনে না করো, একটি ছোট্ট কথা নিবেদন করবো? এই পুরো ট্র্যাজেডিখানা তোমারই সৃষ্টি। স্রেফ তোমার নিজের মগজে তৈরি মালমশলা দিয়ে একখানি কাল্পনিক জেলখানার পাঁচিল তুলে নিজেকে তার ভিতর পুরে ট্র্যাজিক যন্ত্রণা উপভোগ করে চলেছো! তা করো, আপত্তি নেই, কিন্তু আমাদের টানা কেন? এতোগুলি নিরীহ ভদ্রসন্তানকে কষ্ট দেওয়া কেন? আমার স্ত্রীকে ভাত নিয়ে বসিয়ে রাখা কেন?

তরুণ : (উত্তেজিত) ও হো হো! তুমি বলতে চাও নিজেকে যন্ত্রণা দিলে সেটা আর যন্ত্রণা থাকে না? আমি যদি নিজের গায়ে ছুঁচ ফুটিয়ে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করি, তোমার সহানুভূতি হবে না?

জ্যোতি : (নির্দয়ভাবে) না, হবে না।

ফটিক : ভালো কথা মনে পড়লো! পল্টু যেদিন প্রথম ইঞ্জেকশন নিলো, বিল্টু সেদিন—

তরুণ : (জ্যোতির কথায় মর্মাহত) হবে না?

জ্যোতি : না। তোমাকে নিজের গায়ে ছুঁচ ফোটাতে কেউ মাথার দিব্যি দিয়েছে? নিজের ইচ্ছেয় যদি—

তরুণ : ইচ্ছে! ও—ইচ্ছে! না? তুমি ভেবেছো আমি নাটকটা লিখেছি বলেই সব আমার-হাতে? যা ইচ্ছে করবার ক্ষমতা থাকলেই যা ইচ্ছে করা যায়?

জ্যোতি : তোমার সঙ্গে এখন ন্যায়শাস্ত্রের তর্কে ঢোকবার আমার কোনো ইচ্ছে নেই।

তরুণ : ঠিক আছে। তোমার যদি আজগুবি উদ্ভট ধারণা পুষে রাখতে ইচ্ছে হয়, আমার কী? ইচ্ছে! আমি ভগবান, কেমন? যা ইচ্ছে করতে পারি, কী বলো? এই দেখো—ইচ্ছে হলো খাড়া হয়ে দাঁড়ালাম! ইচ্ছে হলো—ডান পা বাড়ালাম। ইচ্ছে হলো—বাঁ পা বাড়ালাম।

ছায়া : এদিকে কেন? ওদিকে বাড়ান না?

তরুণ : (না শুনে) আর এই খাড়া হয়ে দাঁড়াবার ইচ্ছেটা কোথা থেকে এলো? সেটা জানবার দরকার নেই, কী বলো? ডান পা বাড়াতে কেন ইচ্ছে হলো? কেন তার বদলে হামাগুড়ি দিতে ইচ্ছে হলো না? ডিগবাজি খেতে ইচ্ছে হলো না? সেটাও কোনো কাজের কথা নয়, কী বলো?

জ্যোতি : তোমার ইচ্ছে তোমার হাতে?

তরুণ : বাঃ বাঃ, চমৎকার। আমার ইচ্ছে আমার হাতে—চমৎকার! বলি, আমি কে? (ছায়ার মুখোমুখি) আপনি জানতে চান—আপনি কে, অ্যাঁ? পৃথিবীর অন্য কেউ

যেটা জেনে উঠতে পারলো না, সেটা আপনি এক কথায় জানবেন কোন দেবতার বরে, শুনি?

ছায়া . আমার বরের কথা আমি ভাববো, আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

তরুণ : আমি মাথা ঘামাবো না, তবে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কেন—আপনি কে?

ছায়া : আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম—

তরুণ : শুধু! আমি—'শুধু!—জানতে চেয়েছিলাম—মানুষের আদিমতম প্রশ্নটার জবাব! যে জবাব আজ অবধি কেউ সন্তোষজনকভাবে দিতে পারলো না! 'শুধু'!

জ্যোতি : থিয়েটারি চিৎকার করে কাজ তো কিছু এগোবে না?

তরুণ · ইচ্ছে! চেষ্টা করে দেখো না—যা ইচ্ছে তাই করতে পারো কিনা? দুনিয়ার লোক জানে—আমরা যা ইচ্ছে তা করি না! করতে পারি না! যা করবার কথা তাই করি!

ছায়া : আমিও তো সেই কথাই বলছি। আমার কী করবার কথা—সেইটা বলে দিন।

তরুণ : করো না ইচ্ছে! ইচ্ছেমতো নাটকটাকে লেখো না তুমি? আমি ছেড়ে দিচ্ছি এক্ষুনি তোমার হাতে!

জ্যোতি : তুমি যদি ঐ ধরনের কথা বলতে শুরু করো, তাহলে আমার কিছু বলবার নেই। [দু'জনেই উত্তেজিতভাবে ঘুরতে ঘুরতে বিছানার দুই বিপরীত প্রান্তে পৌঁছেছে। দু'জনেরই শুয়ে পড়বার মতলব ছিল। পরস্পরকে দেখে থেমে গেলো।]

তরুণ : সরি। তুমি শোও।

জ্যোতি · তা কি হয়? এখানে সবকিছু তোমার ইচ্ছের ওপর!

তরুণ : বিছানা আমি পাতিনি, তুমি পেতেছো।

জ্যোতি : যে বিছানা পাতবে, বিছানায় তার দখলি সত্ব জন্মাবে—এমন কোনো আইনের ধারা আছে বলে আমার জানা নেই।

তরুণ : অতো কেতাবি কথাবার্তার কোনো প্রয়োজন ছিল না—

জ্যোতি : অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। আমার চরিত্রটা কেতাবি কথা বলার চরিত্র—তোমারই সৃষ্টি।

তরুণ : যাক গে ও কথা। তুমি শোও।

জ্যোতি : আমার শোবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই।

তরুণ : বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই, শুধু গুঁড়ি মেরে বিছানার দিকে এগোচ্ছিলে—

জ্যোতি : তুমিও এগোচ্ছিলে! গুঁড়ি মেরে। তুমি বরং আমার চেয়ে দু'ইঞ্চি বেশি এগিয়ে আছো।

তরুণ : হতেই পারে না। তুমি বেশি এগিয়ে আছো।

জ্যোতি : আজ্ঞে না।

তরুণ : ফটিক!

[ওরা নিজের নিজের জায়গায় ওৎ পেতে রইলো। ফটিক বাক্স থেকে দরজির ফিতে নিয়ে এলো একটা। এনে জ্যোতির দূরত্ব মাপতে শুরু করলো।]

ফটিক : (ছায়াকে) বুঝলেন? এখানে যদি টিকতে চান, একমাত্র উপায় কী জানেন?

ছায়া : কী?
ফটিক : ঘুম।
ছায়া : ঘুম?
ফটিক : ঘুম। নিদ্রা।
ছায়া : তার মানে?
ফটিক : দু'ফুট পৌনে চার ইঞ্চি। চোখ খুলে। আমরা সবাই তাই করি। এদের দেখছেন না।
ছায়া : ওঁরা কি ঘুমোচ্ছেন না কি?
ফটিক : নিশ্চয়ই!
ছায়া : যাঃ!
ফটিক : ঐ তো কায়দা। দেখে বোঝবার জো নেই। বহুদিনের অভ্যেসের ফল।
ছায়া : নড়ছেন, কথা বলছেন—সব ঘুমিয়ে?
ফটিক : রিফ্লেক্স। সব রিফ্লেক্স অ্যাকশন।
ছায়া : সে আবার কী?
ফটিক : যা করবার হাত, পা, জিভ করে যাচ্ছে। মগজ ঘুমোচ্ছে।
ছায়া : যাঃ! তাই হয় নাকি?
ফটিক : হয় বই কি! আপনি খুব লোমহর্ষক একটা খুনখারাপির বই পড়ছেন। পায়ের উপর মশা কামড়ালো। ঠাস করে একটা চড় মারলেন। মশার কামড় হাতের চড়—কিছুই আপনার মগজ টের পেলো না। হয় না এরকম?
ছায়া : হয় বোধহয়।
ফটিক : ঐ হলো রিফ্লেক্স। রিফ্লেক্সগুলোকে জাগিয়ে রেখে ঘুমিয়ে নিতে হবে। যা এরা করছে!
ছায়া : আমি যদি—আমি যদি ওদের কাউকে একটা আলপিন ফুটিয়ে দিই তাহলে কী হবে?
ফটিক : চ্যাঁচাবে। হয় তো রক্তও বেরুবে। সব রিফ্লেক্স। টের পাবে না কিছুই।
ছায়া : আমার বিশ্বাস হয় না।
ফটিক : বেশ তো, আলপিন ফুটিয়ে দেখুন না?
ছায়া : না না—
ফটিক : আচ্ছা, জিজ্ঞেস করে দেখুন, কী জবাব দেয়?
ছায়া : ঘুমোলে জবাব দেবে কী করে?
ফটিক : তবে আর বলছি কী? রিফ্লেক্সে জবাব দেবে। আপনি সাইকোলজি পড়েননি কিছু?
ছায়া : না, ও সব অসভ্য বই আমার বাড়িতে পড়তে দেয় না।
ফটিক : আচ্ছা থাক, না পড়লেন। শুধু জিজ্ঞেস করে দেখুন।
ছায়া : (জ্যোতিকে) ইয়ে, আপনি কি—ঘুমোচ্ছেন?
জ্যোতি : (না নড়ে) বৎসে, আমার অনিদ্রারোগ আছে।
ফটিক : দেখলেন? কী রকম রিফ্লেক্স?

ছায়া : তাহলে—কী করে জানা যাবে—জেগে না ঘুমিয়ে?

ফটিক : জানবার কোনো উপায় নেই। সেই তো মজা।

ছায়া : ও। (ভেবে) আচ্ছা, আপনি জেগে আছেন?

ফটিক : আমি? আমি যদি ঘুমিয়ে থাকি, সেটা কি বলে দেবো? আমি তো বলবো জেগে আছি।

ছায়া : তা ঠিক।

ফটিক : আবার ধরুন, যদি জেগে থাকি. আপনাকে ঠকাবার জন্যে বলতে পারি—ঘুমোচ্ছি। তাই না?

ছায়া : তাও ঠিক। (উজ্জ্বল হয়ে) তার মানে, যা বলবেন তার উল্টো।

ফটিক : হ্যাঁ। তবে যদি আমার রিফ্লেক্সগুলো আমারই মতো লোক ঠাকাবার অভ্যেস পেয়ে থাকে, তবে তারাও উল্টো বলবে। ফলে দু'টো মিলে যা সত্যি তাও দাঁড়িয়ে যেতে পারে।

ছায়া : (নিভে গিয়ে) ও। বুঝলাম।

ফটিক : কী বুঝলেন?

ছায়া : বুঝলাম—বোঝবার উপায় নেই।

ফটিক : একাত্তর সেন্টিমিটার।

ছায়া : অ্যাঁ?

তরুণ : ফুট ইঞ্চিতে কতো?

ফটিক : দু'ফুট পৌনে চার ইঞ্চি।

জ্যোতি : সমান সমান। কী করবে?

তরুণ : টস্ করে দেখো।

জ্যোতি : হেড না টেল?

তরুণ : হেড—নিশ্চয়ই!

জ্যোতি : আমিও হেড।

তরুণ : তাহলে কী করে হবে?

ফটিক : কেন হবে না? ইংরিজি প্রবাদ আছে—দু'টো হেড একটা হেডের চেয়ে ভালো।

ছায়া : (উজ্জ্বল স্বরে) হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জানি—টু হেড্স্ আর বেটার দ্যান ওয়ান—না?

জ্যোতি : এর মধ্যে ইংরিজি প্রবাদ টেনে আনলে কী করতে?

ফটিক : বাংলাও আছে। দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ। কিম্বা—মাথা নেই তার মাথাব্যথা।

তরুণ : (ধমকে) কী বাজে বকছো ফটিক।

[মানবের প্রবেশ। হাতে একটা পাকাচুলের পরচুলা।]

মানব : একটু দেরি হয়ে গেলো—

তরুণ : এই যে! এতোক্ষণে আসা হোলো। কোথায় গিয়েছিলে শুনি?

মানব : বাথরুমে।

জ্যোতি : এতোক্ষণ?

মানব : না, চুলটা হারিয়ে গিয়েছিলো, এতোক্ষণ খুঁজছিলাম।

তরুণ : চুল হারিয়ে গিয়েছিলো? তোমাকে পই পই করে বলে দিয়েছিলাম না—চুল মাথা থেকে নামাবে না একেবারে?

মানব : বাথরুমে যাবার সময় খুলে রেখেছিলাম, তারপরে—

জ্যোতি : শুরু করবে দয়া করে এবার?

তরুণ : হ্যাঁ হ্যাঁ, শুরু করো শুরু করো—

ছায়া : (ফটিককে) ইনি কে?

ফটিক : মানব।

[মানব বিছানার কাছে গিয়ে শুতে গিয়ে থেমে গেলো। ভ্রূ কুঁচকে বিছানাটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। তরুণ আর জ্যোতি মহা ব্যস্ততায় সামনের দিকে নিজেদের দাঁড়াবার জায়গা ঠিক করছে।]

ছায়া : মানে—ওঁর নাম মানব? না, মানুষ মানব?

ফটিক : দুই-ই! (তারপর ভেবে দেখে) আমি যদ্দুর জানি।

ছায়া : আচ্ছা—

[ফটিককে চুপি চুপি কী বললো। ফটিক ভঙ্গীতে জানালো—জবাব তার জানা নেই।]

তরুণ : (দর্শকদের উদ্দেশে) এই যে লোকটিকে আপনারা দেখছেন—

মানব : ফের কে যেন আমার বিছানায় শুয়েছে!

তরুণ : মানব, তুমি—

মানব : প্রত্যেকদিন এই এক ব্যাপার! মানবের পার্ট নিয়ে খেটে খেটে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, খাওয়া নেই ঘুম নেই পার্টটাকে বাগে আনবার চেষ্টা করছি, পার্টটা যাতে ভালো হয় তার জন্যে—

জ্যোতি : মানব. প্লীজ—

মানব : 'প্লীজ'! তুমি করে দেখো না মানবের পার্ট! খুব সোজা মনে করো, না?

জ্যোতি : আমি সে কথা বলিনি—

মানব : এতো খেটে লাভ হোলো কী? বিছানাটা লণ্ডভণ্ড করে রেখে দিলো—

তরুণ : কোথায় লণ্ডভণ্ড?

মানব : হ্যাঁ, তুমি তো ও কথা বলবেই। পার্টটা লেখবার সময় ভেবেছিলে—একটা নিরীহ অভিনেতার ঘাড়ে কী জিনিস চাপাচ্ছো? গলা দিয়ে রক্ত উঠিয়ে ঐ শক্ত পার্ট সে বেচারা তৈরি করবে, আর স্টেজে উঠে দেখবে কী? কোথাকার কোন উটকো লোক এসে তার বিছানাটা হাড়ুল-পাড়ুল করে রেখে দিয়েছে। কেন? কিসের জন্যে? আমি কি যথেষ্ট খাটি না? আমি কি ফাঁকি দিই? আমি কি—

[অভিমানে ক্ষোভে মানবের কেঁদে ফেলার অবস্থা]

তরুণ : মানব, আমরা সবাই জানি তুমি যথেষ্ট খাটো—

জ্যোতি : (চিৎকার করে) তোমরা শুরু করবে!!

[মানব চমকে পিছিয়ে গেলো]

তখন থেকে ভ্যাজর ভ্যাজর—

মানব : (সাহস সঞ্চয় করে) তাই বলে আমার বিছানা—

জ্যোতি: চুপ! চুপ করে শুয়ে থাকো।

[মানব ফোঁৎ ফোঁৎ করে দু'বার নাক টেনে শুয়ে পড়লো ভয়ে ভয়ে। ইচ্ছে থাকলেও কথা বাড়াতে সাহস পেলো না।]

তরুণ : (দর্শকদের উদ্দেশে) উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও—

ফটিক : এই ভদ্রমহিলার একটা প্রশ্ন আছে।

তরুণ : এখন প্রশ্নের সময় নয়!

ফটিক : প্রশ্নটা ভালো ছিলো। তা ছাড়া—

জ্যোতি : ফটিক!

ফটিক : তা ছাড়া উপস্থিত।

তরুণ : 'তা ছাড়া উপস্থিত' মানে?

ফটিক : ভদ্রমহিলা।

তরুণ : ভদ্রমহিলা?

ফটিক : তুমি তো উপস্থিত ভদ্রমহিলা বলে হাঁক ছাড়লে। ইনি ভদ্রমহিলা, এবং উপস্থিত।

জ্যোতি : কী যে বাজে বকছো ফটিক—

ফটিক : বাজে বকছি? ইনি ভদ্রমহিলা নন?

ছায়া : কে বলে নই?

তরুণ : (তাড়াতাড়ি) আচ্ছা আচ্ছা বলুন, কী আপনার প্রশ্ন বলুন।

ছায়া : অ্যাঁ? (হঠাৎ লজ্জা পেয়ে) না, সে কিছু না। ফটিকবাবু এমন করেন—

জ্যোতি : (হাত তুলে) প্রশ্ন।

তরুণ : তোমার আবার কী প্রশ্ন?

জ্যোতি : ফটিকবাবু কেমন করেন—এ প্রশ্নের সঙ্গে নাটকের মূল প্রশ্নের তত্ত্বগত অথবা নীতিগত কোনো সম্পর্ক আছে কি না, এবং যদি বা থাকে—তার আপেক্ষিক গুরুত্ব—

ফটিক : (হাত তুলে) আপত্তি—

তরুণ : উঃ! কী আপত্তি বলো।

ফটিক : ইনি ভদ্রমহিলা হওয়া এবং উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এঁর প্রশ্নের আগে অন্য প্রশ্ন নেওয়া যেতে পারে না। তা ছাড়া জ্যোতি বড়ো লম্বা প্রশ্ন করে।

জ্যোতি : (বিরাট বক্তৃতা ফেঁদে) মাননীয় নাট্যকার! আমি বলতে চাই—

ফটিক : তা ছাড়া আমি 'কেমন করি'—এটা এঁর প্রশ্ন ছিল না।

তরুণ : (ক্লান্তভাবে) কী প্রশ্ন ছিল তবে?

ফটিক : (ছায়াকে) বলুন।

ছায়া : না, আমি পারবো না। বলতে হয় আপনি বলুন।

ফটিক : (মানবকে) এই ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করছিলেন—বাথরুমে যেতে তোমার পরচুলা খুলে রাখবার দরকার হোলো কেন?

[মানব উঠে বসে ছায়ার দিকে তাকিয়ে রইলো এক মুহূর্ত]

মানব : আপনি আপনার চরকায় তেল দিন, আমি আমার চরকায় তেল দেবো।

[বলেই ঝুপ করে শুয়ে পড়লো আবার। ছায়া থতমত খেযে কিছু বলে উঠতে পারলো না।]

তরুণ : (তাড়াতাড়ি) উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ! আমরা আজ এখানে উপস্থিত হয়েছি—এই লোকটির সমস্ত জীবন খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখবার জন্যে—

ছায়া : কেন?

তরুণ : (চমকে) অ্যাঁ?

ফটিক : খুব ভালো প্রশ্ন।

ছায়া : কী দরকার দেখবার?

ফটিক : আরো ভালো প্রশ্ন।

তরুণ : (একটু থতমত খেয়ে, দর্শকদের) প্রশ্ন উঠতে পারে—কেন আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করবো এমন একটা লোককে নিয়ে, যার জীবনটা অসাধারণ দূরে থাক, বলা যায় একেবারে অকেজো আর মূল্যহীন ছিল—

মানব : (মাথা তুলে) সেটা এখনো প্রমাণ হয়নি।

ফটিক : এবং উপরন্তু সে মরে গেছে।

জ্যোতি : ঠিক কথা।

মানব : (উঠে বসে) কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

ফটিক : তা বলুন। আমরা আমাদের কথা বলি।

[মানব শুয়ে পড়লো]

তরুণ : প্রশ্নটা তাহলে এই দাঁড়ালো যে, যতো অখ্যাত, অকেজো আর মূল্যহীনই হোক না কেন, একটি ব্যক্তির জীবনের অর্থ অনুধাবন করলে সমগ্র মানবজাতির জীবনের অর্থ বোঝা যায় কিনা। তার থেকে আরো প্রশ্ন ওঠে—মনুষ্য নামক জীবের ব্যক্তিগত অথবা সামগ্রিক তাৎপর্য—

ফটিক : ও হরি! ও সব কখন পড়ে দিয়েছি আমি! একদম গোড়ায়!

জ্যোতি : আমাকে বলতে দাও।—মানব নামক একটি ব্যক্তি ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে জুলাই জন্মগ্রহণ করেছিলো।

[মানব শুয়ে শুয়ে দর্শকদের উদ্দেশে হাত নেড়ে বুড়ো আঙুল চুষতে লাগলো]

জন্মের পর প্রথম পাঁচ বছর সে সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন অজ্ঞান জীবন যাপন করেছিলো এবং এই সময়টা বলতে গেলে উল্লেখযোগ্য কোনো কাজই সে করেনি।

ফটিক : বুড়ো আঙুল চোষা ছাড়া।

জ্যোতি : ১৯১৮ সালের ৩রা জানুয়ারী তার দায়িত্বপূর্ণ জীবনের আরম্ভ।

[মানব উঠে বসেছে। ফটিক এর মধ্যে বাক্স থেকে প্রকাণ্ড একটা পেন্সিল আর একটা জাবদা খাতা এনে মানবকে দিয়েছে।]

এর পরের চোদ্দ বছর সেই পবিত্র দায়িত্বের ভার বহন করে অবশেষে জীবনেব ক্ষেত্রে তার প্রথম পদার্পণ।

[মানব খাতা-পেন্সিল মাথায় একটু একটু করে উঠে দাঁড়িয়েছিলো। এবার

খাতা-পেন্সিল ফটিককে দিয়ে বকের মতো পা তুলে 'পদার্পণ' করলো। ফটিক খাতা-পেন্সিল রেখে আসতে গেলো।]

এই পদার্পণ থকে যে যাত্রা তার আরম্ভ হলো, তাকেই শুদ্ধ ভাষায় বলা হয়ে থাকে—জীবনযাত্রা।

[মানব ধীরে ধীরে গম্ভীর পদক্ষেপে বিছানাটাকে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করেছে]

বস্তুত, এই জীবনযাত্রার দৈনন্দিন লক্ষ্য—একটি পুরোনো কিন্তু পোক্তভাবে তৈরি প্রকাণ্ড অট্টালিকার তৃতীয় স্তরের—

মানব : (হঠাৎ থেমে) দাঁড়াও দাঁড়াও! তার আগে?

জ্যোতি : তার আগে—কী?

মানব : ছাত্রজীবন?

জ্যোতি : এতোক্ষণ তাহলে কী বললাম?

মানব : ছাত্রজীবনে অসহযোগ আন্দোলন?

জ্যোতি : তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী?

মানব : আমি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম।

জ্যোতি : অর্থাৎ খবরের কাগজে গান্ধীজীর বক্তৃতা পড়েছিলে, গোটা দশ বারো সভায় গিয়েছিলে, দু'টো পুরোনো হাফ-প্যান্ট পুড়িয়েছিলে—

মানব : আমি জেলে গিয়েছিলাম—

জ্যোতি : জেলে!!

মানব : প্রায়!

জ্যোতি : ও, প্রায়!

মানব : আমি জেলে যেতে পারতাম। আমার সহকর্মীরা প্রায় সকলেই—

তরুণ : 'প্রায়ের' কথা থাক। কাজের কথা হোক। জ্যোতি!

[জ্যোতি শুরু করলো। মানব আবার ঘুরতে লাগলো।]

জ্যোতি : বস্তুত এই জীবনযাত্রার দৈনন্দিন লক্ষ্য—একটি পুরোনো কিন্তু পোক্তভাবে তৈরি প্রকাণ্ড অট্টালিকার তৃতীয় স্তরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের একটি চেয়ার। এবং এই জীবনযাত্রার দৈনন্দিন পথ একটি প্রশস্ত রাজপথ যা লর্ড ক্লাইভে আরম্ভ হয়ে নেতাজী সুভাষে শেষ। এই যাত্রার আরম্ভের তারিখ—

[ছায়া এতোক্ষণ বসে বসে ঢুলছিলো। এখন পড়ে যেতে যেতে ধড়মড় করে উঠে বসলো। জ্যোতি বাধা পেয়ে থেমে গেলো]

তরুণ : (অধৈর্য হয়ে) দোহাই আপনার—

ছায়া : (মধুর হেসে) সরি। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ফটিক : ঠিক করেছিলেন। কিন্তু রিফ্লেক্সগুলোকে জাগিয়ে রাখুন। তা না হলে—

তরুণ : ফটিক!

ফটিক : অ্যাঁ?

তরুণ : চুপ করবে?

[ফটিক তরুণের দিকে চেয়ে রইল। হঠাৎ তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, মুখ হাসিতে ভরে গেলো।]

ফটিক : দুই গাঁজাখোর বাজি ধরেছে—কে বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে—

জ্যোতি : উঃ! আবার শুরু হলো পল্টুর গল্প!

ফটিক : পল্টুর গল্প নয় এটা! দুই গাঁজাখোর—

তরুণ : (চিৎকার করে) না!

[ফটিক থেমে গেলো। একটু হাসবার চেষ্টা করে মাথা নেড়ে জানতে চাইলো—সত্যি সত্যি না? তরুণ দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বোঝালো—সত্যি সত্যি না। ফটিক করুণ মুখে সরে গেলো। তরুণের ইঙ্গিতে জ্যোতি আবার শুরু করলো।]

জ্যোতি : এই যাত্রার—

ছায়া : (ফটিককে) তারপর?

[জ্যোতি থেমে গেলো। তরুণ ফিরে তাকালো।]

তরুণ : তারপর মানে?

ছায়া : (ফটিককে) দুই গাঁজাখোর বাজি ধরেছে, তারপর?

তরুণ : শুনুন, এটা গল্প শোনবার জায়গা নয়—

জ্যোতি : সময়ও নয়।

ছায়া : গল্প হচ্ছে যখন, শুনলে কী দোষ?

তরুণ : গল্প হচ্ছে না।

ছায়া : তবে কী হচ্ছে?

তরুণ : জীবনের একটা গুরুতর প্রশ্নের উত্তর জানবার চেষ্টা হচ্ছে।

ছায়া : (অবাক হয়ে) জীবন? গাঁজাখোরের?

ফটিক : মানবের।

ছায়া : উনি—গাঁজা খান?

মানব : (প্রদক্ষিণ থামিয়ে) আপত্তিকর! অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য!

ফটিক : তোমায় বলা হয়নি।

মানব : নিশ্চয় বলা হয়েছে। আমার দিকে তাকিয়ে, আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলা হয়েছে!

ফটিক : উনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তাই গোলমাল করে ফেলেছেন। আসলে আমি যাদের গল্প বলছিলাম, তারা অন্য গাঁজাখোর।

মানব : অন্য গাঁজাখোর! আপত্তিকর! আমি জীবনে কোনোদিন গাঁজা খাইনি, গাঁজা কেমন দেখতে হয়, তাও জানি না—

জ্যোতি : তুমি গাঁজা খাও সে কথা কে বলেছে?

মানব : ঐ ফটিক! আর ঐ ফাজিল মেয়েটা!

ছায়া : আপনি ভদ্রভাবে কথা বলুন!

তরুণ : (চিৎকার করে) আঃ!

[সবাই চুপ করে গেলো। মানব ঘুরতে শুরু করলো। ছায়া বেজার মুখ করে বসলো।]

জ্যোতি, বলো।

জ্যোতি : এই যাত্রার আরম্ভের—

ছায়া : (উঠে) যাত্রা??

তরুণ : হ্যাঁ, যাত্রা। তাতে কী হয়েছে?

ছায়া : তবে যে ছায়া আমাকে বললো—থিয়েটার?

ফটিক : এ সে যাত্রা নয়—

ছায়া : যে যাত্রাই হোক, যাত্রার মধ্যে আমি নেই। আমি থিয়েটার করি। চিরকাল তাই করেছি, চিরকাল করবো।

জ্যোতি : তাই দেখছি।

মানব : আর কতোক্ষণ ঘুরবো?

তরুণ : জ্যোতি তুমি চালিয়ে যাও তো। এবার কেউ বাধা দিলে তাকে দেখে নেবো আমি।

[তরুণের জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ছায়া হঠে এলো। জ্যোতি শুরু করলো।]

জ্যোতি : এ যাত্রার আরম্ভের তারিখ ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই জুলাই। এবং শেষ—তিরিশ বছর এক মাস দশদিন পরে ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর।

ছায়া : ও, ঐ যাত্রা?

[তরুণ আবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালো]

কিন্তু—শেষ কেন?

তরুণ : একটু ধৈর্য ধরে শুনুন, নিজেই জানতে পারবেন।

জ্যোতি : ১৯৬২ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর মানবের জৈবিক শরীরের প্রোটোপ্লাজমের কার্যকরী ক্ষমতা শেষ হলো।

ফটিক : (ছায়াকে) মানে—মানব পটল তুললো।

জ্যোতি : এবং স্বভাবতই ঐ একই দিনে মানবের তথাকথিত দায়িত্বপূর্ণ জীবনযাত্রারও অবসান।

মানব : (হঠাৎ থেমে) আপত্তি। 'তথাকথিত' কথাটায় আমার আপত্তি আছে।

তরুণ : হ্যাঁ জ্যোতি, তথাকথিত এখনই বলা চলে না।

জ্যোতি : বেশ, বলবো না। ঐ একই দিনে নেতাজী সুভাষ স্ট্রীটের পুরোনো পোক্ত অট্টালিকায় তেতলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পচা পুরোনো কাগজের জঞ্জালের ভ্যাপসা দুর্গন্ধের মধ্যে গুবরে পোকার জীবনযাত্রার অবসান।

মানব : (প্রবল আপত্তিতে) গুবরে পোকা! এ চলবে না! কিছুতেই চলবে না। তুমি—তুমি ঈশ্বরের সৃষ্ট একজন মানুষকে গুবরে পোকার সঙ্গে তুলনা করবে?

জ্যোতি : গুবরে পোকাও ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব, যদি তাই ধরো।

মানব : তাই বলে গুবরে পোকা? অসম্ভব!

ছায়া : (ফটিককে) গুবরে পোকার ওপর অতো রাগ কেন? গুবরে পোকার কী অপরাধ?

ফটিক : ঠিক কথা। গুবরে পোকা তো নিজের দোষে গুবরে পোকা হয়নি?

ছায়া : বেচারা কেষ্টর জীব—

ফটিক : হ্যাঁ। গুবরে পোকা বলে কি মানুষ নয়?

ছায়া : তারও বাপ-মা আছে—
ফটিক : সুখ-দুঃখ সাধ-আহ্লাদ আশা-নিরাশা আছে—
ছায়া : আমার তো মনে হয়—পৃথিবীতে প্রত্যেক জীবের একটা কাজ আছে। নইলে ভগবান তাকে সৃষ্টি করলেন কেন?
ফটিক : একশোবার। আমরা যদি গুবরে পোকা হতাম, কী ভাবতাম?
ছায়া : যে যার নিজের কাজ করে যাক। তা সে মানুষই হোক আর—
ফটিক : গুবরে পোকাই হোক।
ছায়া : রবীন্দ্রনাথ তো বলেই দিয়েছেন—জীবে দয়া করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।
ফটিক : ঠিক। শেকস্‌পীয়ারও বলে গেছেন—দাও টু ব্রুটাস!
ছায়া : ব্রুটাস মানে?
ফটিক : ল্যাটিন কথা। গুবরে পোকার ল্যাটিন নাম।
ছায়া : শেক্‌স্‌পীয়ার ল্যাটিন জানতেন?
ফটিক : না বোধহয়। আমি হয়তো লয়েড জর্জের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছি।

[অন্যদের এতোক্ষণ বাকরোধ হয়ে গেছিলো, এইবার তরুণ ফাটলো।]

তরুণ : ফটিক!!
ফটিক : (সঙ্গে সঙ্গে) নো বল!
তরুণ : তুমি থামবে কি না?
ফটিক : আমি আবার কী বললাম?
জ্যোতি : (তরুণকে) আমি তোমায় গোড়া থেকে বলে আসছি—এরকমভাবে হবে না।
তরুণ : তুমি তো গুবরে পোকা বলে সব মাটি করে দিলে।
জ্যোতি : গুবরে পোকার উপর ওর এমন অহেতুক বিতৃষ্ণা আছে—তা আমি কেমন করে জানবো?
ছায়া : কারো কারো থাকে ওরকম। আমার রাঙাপিসীমা মাকড়শা দেখলেই ঝাঁটা বার করতেন।
জ্যোতি : দেখুন, আপনার রাঙাপিসীমা কিংবা মাকড়শা—কোনোটার সঙ্গেই এ নাটকের কোনো সম্পর্ক নেই।
ছায়া : (রেগে) না! যতো সম্পর্ক শুধু গুবরে পোকার সঙ্গে!

[মানব তড়াক করে লাফিয়ে খাটের উপর দাঁড়ালো]

মানব : (ক্ষেপে) আর একবার গুবরে পোকার নাম শুনলে আমি স্টেজ থেকে লাফিয়ে পড়বো!
তরুণ : মানব! মানব!

[তরুণ, জ্যোতি মানবকে ধরাধরি করে নামালো]

ছায়া : (ফটিককে) এ একরকম মনের রোগ, না?
তরুণ : জ্যোতি তোমার আরম্ভটাই ভুল হয়ে গেছে। অতো সাধারণভাবে জীবনটাকে দেখাচ্ছো কেন? আরো বিশেষভাবে দেখানো দরকার।
জ্যোতি : যথা?

তরুণ : এই লোকটা পাঁচ বছর বুড়ো আঙুল চুষেছে, চোদ্দ বছর লেখাপড়ার গুঁতো খেয়েছে, তিরিশ বছর চাকরির যাঁতা পিষেছে—এ তো হাজার হাজার লোকের কাহিনী? আমি যা চাইছি তা হোলো একটা বিশেষ লোকের জীবন বিশেষভাবে পরীক্ষা করে বিশেষভাবে বুঝে সামগ্রিক জীবনটাকে সাধারণ ভাবে বুঝতে।

জ্যোতি : ওর জীবনে যদি 'বিশেষ' কিছু না ঘটে থাকে, তা হলে আমি কোত্থেকে—

মানব : কে বলে ঘটেনি?

জ্যোতি : কী ঘটেছে বলো?

মানব : অনেক কিছু। আমার সমস্ত জীবনটাই ঘটনাবহুল।

জ্যোতি : কী রকম ঘটনা, দু'একটা নমুনা শুনি।

মানব : আমি—আমি স্বপ্ন দেখেছি! ভালোবেসেছি!

জ্যোতি : স্বপ্ন দেখাটা ঘটনা নয়।

মানব : বিয়ে করেছি!

জ্যোতি : ও হ্যাঁ, বিয়ে। (দর্শকদের) মানবের জীবনের একটা বিশেষ ঘটনা। ১৯৩৫ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় তিনশো ছিয়াত্তরজন প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী এবং অজ্ঞাতসংখ্যক বালক-বালিকার উপস্থিতিতে বিনোদিনী নাম্নী এক পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকার সঙ্গে এই লোকটির বিবাহ নামক একটি সম্পর্কের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে মানব অথবা বিনোদিনী কারুরই কোনো বক্তব্য ছিল না, থাকলেও তা শোনা হোতো না, এবং থাকা না থাকায় কারো কিছু এসে যায় না। এর পরে বাইশ বছর প্রচলিত নিয়মের দাসত্ব করে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিনোদিনী মারা যায় এবং মানব হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

মানব : (চিৎকার করে) মিথ্যে কথা! তরুণ, ওকে ফিরিয়ে নিতে বলো ও কথা—

তরুণ : সত্যি জ্যোতি, তুমি—

জ্যোতি : বিনোদিনী মারা যায় এবং মানব হাঁপ ছেড়ে বাঁচে না।

ছায়া : (ফটিককে) আচ্ছা, 'ভালোবেসেছি' বললেন যেন মনে হোলো?

ফটিক : না, ও আপনার মনের ভুল।

মানব : কী?

ফটিক : না, কিছু না। ইনি শুনেছেন—তুমি না কি ভালোবেসেছো। তাই বলছিলাম ভুল শুনেছেন।

মানব : কে বলেছে? ভালোবাসিনি আমি? তরুণ!

জ্যোতি : নিশ্চয়। তিনশো ছিয়াত্তরজন নরনারী লুচি, ছ্যাঁচড়া, বেগুন ভাজা, মাছের কালিয়া খেয়ে তোমার ভালোবাসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো, না বেসে যাবে কোথায়?

ছায়া : আমি সে ভালোবাসার কথা বলিনি।

জ্যোতি : তবে কী বলেছেন?

ছায়া : উনি বললেন—ভালোবেসেছি, বিয়ে করেছি, তাই ভাবলাম—লাভ ম্যারেজ না কি?

জ্যোতি : না না, সে সব কিছু না।

ফটিক : না জ্যোতি, তা ঠিক বলা যায় না। যতোদূর জানি, বারোশো টাকা লাভ হয়েছিলো ম্যারেজে।

মানব : সেটা আসল কথা নয়।

জ্যোতি : না। আসল কথা আসলে কিছুই নেই। বিয়েটা ওর জীবনে একটা অবশ্যম্ভাবী দুর্ঘটনা—হাম অথবা চিকেন পক্সের মতো। ওর হাত ছিল না তাতে।

মানব : তরুণ! তুমি কথা দিয়েছিলে—আন্তরিকভাবে সত্য বিচার করবে—

জ্যোতি : কোনটা মিথ্যে বলা হয়েছে? তোমার হাত ছিল?

মানব : সে কথা নয়। বিবাহের পবিত্র বন্ধনকে তুমি চিকেন পক্সের সঙ্গে তুলনা করবে?

ফটিক : মানব ঠিক বলেছে। চিকেন পক্স বড়ো জোর মাসখানেক ভোগায়। আর মানব বিয়ে করে ভুগেছে ধরো—বাইশ বছর।

মানব : মিথ্যে কথা!

ফটিক : বাইশই তো বললো জ্যোতি। বাইশ নয়?

মানব : হ্যাঁ বাইশ, কিন্তু—

ফটিক : তবে?

মানব : ভুগেছে বললে কেন? ভোগার কথা এলো কোত্থেকে? তরুণ!

জ্যোতি : ভোগা মানে ভোগ করা। কথাটায় অন্যায় কিছু তো দেখছি না?

মানব : ভুগেছে আর ভোগ করেছে—এ দু'টো কথার মানে কি এক?

জ্যোতি : মাননীয় নাট্যকার। আমরা কি জীবনের অর্থ বিচার করছি, না ভোগের অর্থ?

ফটিক : ভোগের কথা যদি বলো, তবে পল্টু-বিল্টুর মোহনভোগ খাবার গল্পটা বলতে হয়—

তরুণ : না, হয় না! তুমি থামো! সমস্ত গোলমাল করে ফেলছো তোমরা। মূল কথা হচ্ছে এই একটা লোক ১৯১২ সালে জন্মেছে, ১৯৬২ সালে মারা গেছে। এই দু'টো তারিখের মাঝখানে পঞ্চাশ বছরের ফাঁকে কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে; তার কিছু নিয়মমাফিক, কিছু আকস্মিক, এবং সব ক'টা একেবারে তুচ্ছ। কিন্তু—

মানব : একেবারে তুচ্ছ?

তরুণ : মানব, তুমি যদি সব কথাতেই বাধা দিতে থাকো তা হলে রাত কাবার হয়ে যাবে কাজ শেষ করতে।

জ্যোতি : এবং মনে রেখো—আমার স্ত্রী ভাত নিয়ে বসে থাকবে।

ছায়া : যদি একেবারেই তুচ্ছ হয়, তা হলে এ নিয়ে এতো মাথা ঘামানো কেন?

তরুণ : (চিৎকার করে) তার কারণ এই পঞ্চাশটা বছর এ 'ছিল'! সেটা ভুলে গেলে চলবে কেন? একটা আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় জন্মেছে, সেই দুর্ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে মরেছে। কিন্তু মাঝখানের সময়টা ওর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায়? ঐ পঞ্চাশ বছর ও 'ছিল'। আপনি মানলেও ছিল, না মানলেও ছিল।

ছায়া : আমি কি 'ছিল না' বলেছি?

তরুণ : এবং যতো তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর ঘটনা দিয়ে এই পঞ্চাশটা বছর ঠাসা থাক না কেন, একমাত্র ঐ ঘটনাগুলোই এই লোকটার জীবনের অর্থ প্রকাশ করতে পারে। ঐ

ঘটনাগুলো ছাড়া আমাদের হাতে আর কিছুই নেই যা দিয়ে আমরা—

ছায়া : তা বেশ তো, ঘটনাগুলো হোক না? তখন থেকে তো শুধু কথাই হচ্ছে—

ফটিক আপনি ওর ফুলশয্যাটা এই স্টেজের উপর দেখতে চান না কি?

ছায়া : তা কেন? আমি বলছি—শুধু কথা দিয়ে নাটক জমানো যায় না। অ্যাকশন চাই।

ফটিক : অ্যাকশন? আমি একটা ডিগবাজি খাবো?

মানব : এরকম করে তোমরা কোনোদিন আমার জীবনেব অর্থ বুঝতে পারবে না।

জ্যোতি : তোমার জীবন নয়, মানবের।

মানব : ঐ হোলো। আমিই তো মানবের পার্ট করছি, না কি?

তরুণ : কীরকম করলে তোমার জীবনের অর্থ বুঝতে পারবো বলো?

মানব : ঘটনাগুলোই সব চেয়ে বড়ো কথা নয়।

তরুণ : কোনগুলো বড়ো কথা তবে?

মানব : স্বপ্ন। আদর্শ। চিন্তা। জিজ্ঞাসা। অভিজ্ঞতা। চেতনা।

জ্যোতি : (তরুণকে) এ সব কী বলছে ও?

মানব : ঠিক কথা বলছি। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম—

জ্যোতি : মানব।

মানব : অ্যাঁ?

জ্যোতি : মানব স্বপ্ন দেখেছিলো, তুমি না।

মানব : আচ্ছা তাই। মানব স্বপ্ন দেখেছিলো—পৃথিবীতে সে একটা দাগ রেখে যাবে। স্পষ্ট একটি আঁচড়ের দাগ। কল্পনা করো—ঝিমঝিমে মাঝরাত। গাছের পাতার শিরশির শব্দ। ঝিঁঝিঁ পোকার ঐকতান। দূরে শেয়ালের ডাক। থেকে থেকে চৌকিদারের হাঁক। মাটির দেওয়ালের গা ঘেঁষে বিছানাহীন ভাঙা তক্তাপোশ। তার উপর বসে সামনে কেরোসিনের কুপি রেখে ধোঁয়াটে আলোয়—মানব—ভূগোল পড়ছে। ব্রহ্মদেশের জলবায়ু আর ভেনিজুয়েলার উৎপন্ন দ্রব্য আয়ত্ত করছে একমনে, চোখের ঘুম তাড়িয়ে, মেরুদণ্ডের টনটনানি অগ্রাহ্য করে। কারণ তার ভিতরের চোখ স্বপ্ন দেখছে—যেন এক অপ্রতিহত মানব জীবনের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে, ধাপের পর ধাপ ভেঙে—

[প্রত্যেকের দৃষ্টি তার দিকে অনুভব করে মানব থেমে গেলো]

জ্যোতি : (ধৈর্যে) তোমার শেষ হয়েছে?

মানব : আমি তোমাদের বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম—

তরুণ : কাজের কথায় আসা যাক। ফটিক! উক্তি।

[ফটিক বাক্সের দিকে গেলো]

ছায়া : উক্তি?

তরুণ : উক্তি! কথাবার্তা। বক্তব্য। আপনি কি এখানে মজা দেখতে এসেছেন?

ছায়া : ও, ডায়ালোগ?

জ্যোতি : আপনি বাংলায় বললে বোঝেন না?

ছায়া : নাটক তাহলে শুরু হবে এইবার?

তরুণ : নাটক বহুক্ষণ শুরু হয়ে গেছে। আপনি দয়া করে আর একটু মন দিতে চেষ্টা করুন।

[ফটিক কাগজের তাড়া এনে তরুণকে দিলো। তরুণ কিছু কাগজ জ্যোতির হাতে দিলো। জ্যোতি তার কিছু মানবকে দিলো। মানব কিছু দিলো ফটিককে, এবং ফটিক খান দুই ছায়াকে।]

রেডি? মানবের বাবা।

জ্যোতি : (কাগজ পড়ে) "আমার যতোটুকু সাধ্য ছিল আমি করেছি। আর তো তোমার পড়াশুনোর খরচ যোগাবার আমার সামর্থ্য নেই!'

তরুণ : মানবের বন্ধু।

ফটিক : "যতো দিন না বিদেশী শাসকের দাসত্বশৃঙ্খল থেকে দেশমাতাকে উদ্ধার করা যায়, ততোদিন সরকারি গোলামখানায় লেখাপড়া করা বিশ্বাসঘাতকতার সামিল।"

তরুণ : সরমা। (সাড়া নেই) সরমা!

ছায়া : (চমকে) কে, আমি?

তরুণ : বলুন, তাড়াতাড়ি!

ছায়া : আমার তো মনে হয় আমিই। আর যখন কোনো মেয়ে নেই এখানে—

তরুণ : পড়ুন, পড়ুন!

ছায়া : আমি?

জ্যোতি : তবে কে?

ছায়া : আমিও তো তাই বলছি। আর যখন—

তরুণ : আপনি পড়বেন?

ছায়া : হ্যাঁ, এই যে—

"হায় প্রভু! নিয়তির এ কী পরিহাস? ভাগ্যহীনা অবলার--"

এ সব কী?

তরুণ : (কাগজ বদলে) ভুল হয়েছে। ওটা অন্য নাটক। এবার পড়ুন।

ছায়া : "জানলাটা খুলে দাও মানব।"

মানব : এটার আমি কী মানে দাঁড় করাবো?

তরুণ : তোমার যা ইচ্ছে দাঁড় করাতে পারো।

মানব : এ পার্ট করা অসম্ভব।

তরুণ : মানবের সেকথা মনে হয়নি। আর কোনো প্রশ্ন আছে?

জ্যোতি : না, আর কোনো প্রশ্ন নেই ওর। তুমি চালিয়ে যাও।

তরুণ : "মানব শুনেছিস? লীলার বিয়ে ঠিক হয়েছে বাইশে আশ্বিন, খুব ভালো পাত্র"।

ছায়া : লীলা কে?

মানব : আমার প্রথম প্রেম।

ফটিক : তোমার প্রথম—কী?

জ্যোতি : ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর থেকে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে সাতান্নো সেকেন্ড করে মাসে গড়পড়তা তেইশ দশমিক

চার দিন মানব লীলাকে মুগ্ধ হয়ে নিরীক্ষণ করেছিলো। সাক্ষাৎ কোনো আলাপ হয়নি।

মানব : আলবাৎ আলাপ হয়েছিলো!

জ্যোতি : মানব, ঘটনা যদি বানাতে শুরু করো—

মানব : স্কুল থেকে ফেরার পথে শিবমন্দিরের বাঁহাতি মোড় ঘুরে মল্লিকদের বাগানের পাশের মেঠো রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একদিন—

জ্যোতি : ১৯২৯, আঠাশে ফেব্রুয়ারি।

মানব : বুড়ো বটগাছের শিকড়ে হোঁচট খেয়ে হাত থেকে বই খাতা পড়ে গেলো—

জ্যোতি : যে গাছের আড়ালে মানব রোজ দাঁড়িয়ে থাকতো—

মানব : রোজ মোটেই নয়!

জ্যোতি : না, রবিবার আর ছুটির দিন বাদে।

ছায়া : আঃ, বলতে দিন না?

মানব : (ছায়ার দিকে চেয়ে কৃতজ্ঞভাবে) হাত থেকে বই খাতা সব পড়ে গেলো।

ছায়া : তারপর?

মানব : বুড়ো চাকর ভজুয়া বকতে বকতে বই কুড়োতে লাগলো। লীলাও ঝুঁকে দাঁড়ালো বই কুড়োতে। আর সেই মুহূর্তে—সেই আশ্চর্য ঝুঁকে পড়া মুহূর্তে আমার সারা দেহে, সারা মনে সে যে কী এক অপূর্ব আবেগ বিদ্যুতের ঝলকের মতো—

জ্যোতি : আবেগের কথা হচ্ছিলো না মানব।

মানব : আমি বিচার-বিবেচনা ভুলে, সমাজ-সংসার ভুলে, অতীত-ভবিষ্যৎ ভুলে, একলাফে এগিয়ে এসে চাইল্ডস ইজি গ্রামারখানা তুলে ধরলাম! লীলা—লীলা—

জ্যোতি : আঁতকে উঠে মাগো বলে চিৎকার করে উঠলো।

মানব : হ্যাঁ, কিন্তু তারপর? তারপর?

জ্যোতি : তুমিই বলো।

মানব : তারপর সে হাসেনি? কথা বলেনি?

ছায়া : কী বললো?

মানব : বললো—"হঠাৎ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।"

ছায়া : তারপর?

মানব : তারপর আমার হাত থেকে বইটা নিলো। আমার হাত থেকে। নেবার সময়ে আমার হাতের সঙ্গে তার হাতটা—

জ্যোতি : (তিরস্কারের স্বরে) মানব!

মানব : (ঢোক গিলে) ছুঁয়ে যেতে যেতে গেলো না। কিন্তু বইটা নিয়ে সে আবার হাসলো। হেসে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে গেলো। সে— সে যে কী সুন্দর হাসি! সে যে কী অপরূপ হাঁটা—

তরুণ : আঃ মানব! যতো সব বাজে কথায় ঢুকছো।

মানব : বাজে কথা? প্রথম প্রেম বাজে কথা? মানবের সে সময়কার ডায়রি যদি দেখো—

জ্যোতি : মানবের—কী??
মানব : ডায়রি।
জ্যোতি : তাই বলো। আমি শুনলাম—ডায়রি।
মানব : ডায়রিই তো বলেছি।
জ্যোতি : (তাকিয়ে থেকে) ডায়রি?
মানব : হ্যাঁ হ্যাঁ, ডায়রি!
জ্যোতি : মানবের?
মানব : না তো কার?
জ্যোতি : তুমি অন্য কারো সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছো।
মানব : বাঃ বাঃ! আমার জীবন আমি অন্য কারো সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবো?
ফটিক : ওরকম হয়। আমি একবার বিয়েবাড়িতে আমার চটির সঙ্গে আর একজনের পাম্প শু গুলিয়ে ফেলেছিলাম।
মানব : ফটিক, বাজে কথা ছাড়ো—
ফটিক : হ্যাঁ সত্যি! আমার অনেকদিনের চেনা চটি—তিন বচ্ছর সমানে দেখে আসছি, তবু—
মানব : (জ্যোতিকে) তুমি তরুণকে জিজ্ঞেস করো। মানব মারা যাবার পর তার টিনের কালো তোরঙ্গটায় চারখানা বাঁধানো খাতা পাওয়া গিয়েছিলো—
তরুণ : কাঁচা হাতের কিছু অসংলগ্ন লেখা পাওয়া গিয়েছিলো বটে—
মানব : কাঁচা হোক পাকা হোক—ডায়রি বাদ দিয়ে মানবের জীবন বোঝবার চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম!
তরুণ : এটা বাড়াবড়ি হয়ে গেলো না?
মানব : বাড়াবাড়ি?
তরুণ : যেটাকে ডায়রি বলছো, সেটার কোনো গুরুত্ব নেই মানবের জীবনে। লিখতে পাবে না, অথচ লিখে চলে, এ অনেকেই করে থাকে।
জ্যোতি : বর্তমান নাট্যকারকেই দেখো না!
তরুণ : কী??
মানব : কিন্তু—
ফটিক : তা ছাড়া মানবের হাতের লেখাও ভয়ানক খারাপ ছিল।
তরুণ : তুমি মানবের হাতের লেখা নিয়ে গবেষণা না করে নিজের পার্টটা বলবে?
ফটিক : হ্যাঁ। (কাগজ দেখে) "মানবের মৃত্যু"—
মানব : মৃত্যু??
ফটিক : অ্যাঁ? (আবার কাগজ দেখে) হ্যাঁ, মৃত্যুই তো। ম-য়ে ঋ, ত-য়ে য-ফলা হস্‌সু—
মানব : মৃত্যু কী? জীবনটা কিছুই দেখা হোলো না এখনো—
তরুণ : আঃ মানব! গোড়ার কথা গোড়ায় সারতে দাও, উল্টোপাল্টা কোরো না। রেডি?
ফটিক : অন্ ইয়োর মার্ক! গেট! সেট! গো!!

[মানব লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো]

জ্যোতি : (দর্শকদের) একটা ঘর কল্পনা করুন। দৈর্ঘ্য বারো ফুট চার ইঞ্চি, বিস্তার দশ ফুট ছ' ইঞ্চি, উচ্চতা দশ ফুট সাড়ে তিন ইঞ্চি, কড়িকাঠের নিচে ন'ফুট সাড়ে ছ'ইঞ্চি। দেওয়াল পনেরো ইঞ্চি পুরু, ইঁটের, চুন বালির গাঁথুনি, সাদা চুনকাম। খাট—ছ'ফুট তিন ইঞ্চি বাই তিন ফুট ছ'ইঞ্চি। বিছানায়—যথাক্রমে জাজিম, তোষক, অয়েল ক্লথ, বোম্বাই চাদর, দু'টো বালিস, ফুলকাটা বালিসের ওয়াড়, ভবিষ্যৎ মৃতদেহ এবং কল্কার কাজ করা কাঁথা। একটি দরজা, দু'টি জানালা, একটি আলমারি, একটি টেবিল, দু'টি আস্ত চেয়ার, একটি ভাঙা চেয়ার।

তরুণ : তারিখটা—?

জ্যোতি : একুশে সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ। সময়—অনিশ্চিত, তবে রাত দু'টো থেকে তিনটের মধ্যে, রাত্রির মৃত প্রহর, যখন জীবনের ঘাট ছেড়ে প্রাণের তরণী মরণের গহন নদীর অন্ধকার স্রোতে ভেসে যাবার জন্য ছটফট করতে থাকে।

তরুণ : মৃত প্রহর। একটি ছিন্নপ্রায় সূত্রে দোদুল্যমান জীবন।

ফটিক : মাকড়শার মতো।

জ্যোতি : বক্তব্য পরিষ্কার, আবহাওয়া তৈরি, উপমাও যথেষ্ট মেশানো হয়েছে। (চেঁচিয়ে) আলো! লাইট!

[মঞ্চের আলো বদলালো যথাযথ ভাবে]

তরুণ : অন্ধকার রাত। মৌন পৃথিবী। কালো আকাশে সাংখ্যাহীন আলোকবিন্দু। ছ'টি সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নিস্তব্ধ প্রকোষ্ঠ। ঘড়ির অনির্বার স্পন্দনে কালের ঘোষণা। বিজলি বাতি নিষ্ক্রিয়। লণ্ঠনের মৃদু আলোর আকর্ষণে একটি বুদ্ধিহীন পতঙ্গের পাখার ছটফটানি। অয়েল ক্লথ আর চাদরের উপরে, আধময়লা কাঁথার নিচে অসমান নিশ্বাসের অস্পষ্ট আওয়াজ। বাতির তেল ফুরিয়ে আসছে। আলোর অনুজ্জ্বল শিখা কাঁপছে। পতঙ্গের পাখা কাঁপছে। সময়ের অমোঘ ঘোষণার ছন্দে ছন্দে বাতাস কাঁপছে, আলো নিভে আসছে, দপদপ করছে, নিভে আসছে, দপদপ করছে, নিভে গেলো! অন্ধকার। পতঙ্গ অন্ধকারে অদৃশ্য। বাইরে খাদ্য-অন্বিষায় ব্যস্ত ইঁদুরের মৃদু পদশব্দ। ঘরে কোনো পরিবর্তন নাই। অন্ধকার থেকে অন্ধকার। নিস্তব্ধতা থেকে নিস্তব্ধতা। শুধু ঘর থেকে একটা কিছু বেরিয়ে চলে গেছে। মানব মারা গেছে।

[এক মুহূর্ত স্তব্ধতা]

ছায়া : তারপর?

[যেন চটকা ভেঙে আলো জ্বলে উঠলো আগের মতো। মানব উঠে বসে একটা সিগারেট ধরালো।]

শেষ হয়ে গেলো?

জ্যোতি : উঃ! এর চেয়ে ওর বোন কম বোকা ছিল।

ফটিক : না, একই রকম।

জ্যোতি : না, কম।

ফটিক : না একই রকম।

জ্যোতি : না, কম।

ছায়া : (ফটিককে) আচ্ছা, কিসে মারা গেলেন?
ফটিক : বিছানায়।
ছায়া : না না, কী রোগ?
ফটিক : জীবন।
ছায়া : জীবন বলে কোনো রোগ আছে নাকি?

[জ্যোতি ততোক্ষণে বাক্স থেকে চশমা আর স্টেথোস্কোপ নিয়ে এসেছে। চশমা পরে স্টেথোস্কোপ বসিয়েছে ধূমপানরত মানবের ব্রহ্মতালুতে।]

জ্যোতি : মৃত্যুর প্রধান কারণ কার্ডিয়াক ফেলিওর। ক্রনিক ম্যালনিউট্রিশন আর কিডনির ডিস্অর্ডার থেকে সূত্রপাত।
ছায়া : তাই বলুন। (ফটিককে) আপনি বললেন—জীবন!
ফটিক : কী আসে যায়?
জ্যোতি : আমরা কেউই সম্পূর্ণ সুস্থ নই। মানুষের জীবন অসংখ্য ব্যাধি এবং জৈবিক বিশৃঙ্খলার লীলাক্ষেত্র।
ফটিক : খাঁটি কথা।
জ্যোতি : মানুষের শরীর একটা অতি সূক্ষ্মভাবে সাজানো প্রাকৃতিক যন্ত্র, যা প্রতি মুহূর্তে বহির্ভূত শক্তির আঘাতে অল্প অল্প করে প্রতিনিয়ত পঙ্গু হয়—
তরুণ : ওতেই হবে।
জ্যোতি : আর এই পঙ্গুতা আর বিশৃঙ্খলার সর্বশেষ আরোগ্য—মৃত্যু।
তরুণ : আমি বলেছি—ওতেই হবে।

[জ্যোতি চশমা আর স্টেথোস্কোপ রাখতে গেলো]

ছায়া : ভীষণ একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে। কিছুই কি ঘটবে না?
ফটিক : আমার ডিগবাজি খাবার প্রস্তাবটা ভেবে দেখবেন।
তরুণ: চালিয়ে যাও।
মানব : লাভ নেই। মেজাজ পাচ্ছি না।
তরুণ · কিসের মেজাজ?
মানব : মরবার মেজাজ। মরে যাবার ফিলিংস্ আসছে না একদম। ঐ জন্যে অ্যাকটিংটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমাকে যদি একটি সঙ্গত কারণ দেখাতে পারো—
তরুণ : মরবার?
মানব : না না, তা বলছি না—
তরুণ : তোমাকে আমি বুঝি না বাবা। মানব পঞ্চাশ বছর ধরে মরলো, আর তুমি পাঁচ মিনিট মরেই এমন কাণ্ড শুরু করেছো, যেন—
মানব : আমি শুধু মানব সম্বন্ধে আর একটু ভালো করে জানতে চাইছি—
জ্যোতি : জন্ম—২৫শে জুলাই ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ, উচ্চতা পাঁচ ফুট সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি, নাক খাঁদা, চোখ ঘোলাটে, কান অতিরিক্ত বড়ো—
মানব : এ সব কথা নয়—
জ্যোতি : আমি পুরো একটা বর্ণনা দিচ্ছিলাম, যাতে ভালো করে জানতে পারো—
মানব : আমি জানতে চেয়েছি আমি কী। উচ্চতা জানতে চাইনি।

[জ্যোতি মানবের পাশে বসে তার কাঁধে হাত রাখলো, শিশুকে বোঝাবার ভঙ্গীতে]

জ্যোতি : মানব, বাবা, তুমি অ্যারিস্টট্‌ল্ পড়েছো?

মানব : তার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক ?

জ্যোতি : কান্ট্?

মানব : দেখো—

জ্যোতি : শোপেনহাওয়ার? সার্ত্‌র্?

মানব : দেখো, আমি সাধাসিধে লোক—

জ্যোতি : 'আমি কী'—এই প্রশ্নটা নিয়ে হাজার দুই বছর ধরে পণ্ডিতেরা মাথা ঘামিয়ে এসেছেন। দ্য প্রবলেম অফ্ আইডেন্টিফিকেশান। অসংখ্য উত্তর বার করেছেন তাঁরা, তার একটাও সন্তোষজনক নয়। একটু কষ্ট করে যদি আলিপুরে ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে গিয়ে ক্যাটালগ ঘাঁটো—

মানব : তুমি খুব ভালো করে জানো আমি কী বলতে চাইছি!

জ্যোতি : (উঠে) অত্যন্ত দুঃখিত। কয়েক লাইন পিছিয়ে গিয়ে প্রশ্নটা আর একবার করবে?

মানব : আমি জানতে চাইছি—আমি মানুষটা কী রকমের?

জ্যোতি : ঠিক। তুমি তোমার পরিচয় জানতে চাইছো। তোমার সমস্যাটা আমি বুঝি। তুমি যখন বেঁচে ছিলে, জীবনে তোমার একটা ভূমিকা নিশ্চয়ই ছিল। ভূমিকাটা কী ছিল, এবং তোমার অস্তিত্ব কী ভাবে কতোখানি সে ভূমিকা পালন করেছে—এই খবরটা তুমি জানতে চাও, তাই না? আমরা সবাই তা জানতে চাই। (দর্শকদের দিকে হাত নেড়ে) ওরা সবাই তা জানতে চায়। ওরা সবাই বসে অপেক্ষা করছে একটা চূড়ান্ত ক্লাইম্যাক্সের জন্য, নাটকের চরম মুহূর্তের জন্য, যখন একটা তীব্র আলোর চকিত ঝলসানিতে একটা সত্যের আভাস মনকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য সান্ত্বনা দেবে। রাত্রে ভাত খেয়ে শুতে যাবার আগে মনে মনে বলতে পারবে—ব্যাপারটা তাহলে এইরকম।

মানব : কোন্ ব্যাপার?

জ্যোতি : জীবন।

মানব : আমি শুধু জানতে চাইছি—

জ্যোতি : তুমি শুধু জানতে চাইছো, ওরা শুধু জানতে চাইছে, আমরা সবাই শুধু জানতে চাইছি, এমন কি ঐ যে সরল নিষ্পাপ ফুটফুটে মেয়েটি ওখানে বসে বসে ঘুমোচ্ছে—সেও শুধু জানতে চাইছে। সেও ঐ একই প্রশ্ন করছে—আমি কে! অর্থাৎ ও নিজে কে? জেগে হয়তো প্রশ্ন করে না, কিন্তু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে করছে। ঘুমন্ত মনের বারান্দা, সুড়ঙ্গ, অলিগলিতে ও একই সঙ্গে বিভিন্ন বিপরীতমুখী পথে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, একই সঙ্গে অনেকগুলো বন্ধ দরজায় প্রজাপতির মতো ডানা ঝাপটে মরছে, দরজা খুলছে না। এসব কথা ভাবলে দুঃখ হয়।

ফটিক : হ্যাঁ, ঠিক কথা। কড়া নাড়ছি, দরজা খুলছে না—সে বড়ো খারাপ লাগে।

মানব : তুমি আসল কথায় আসবে?

জ্যোতি : আসল কথা? ও হ্যাঁ। তুমি জানতে চাও তুমি কী ধরনের মানুষ। কী ক্ষেত্রে?

মানব : ক্ষেত্র? ক্ষেত্র কিসের?

জ্যোতি : কী ক্ষেত্রে তোমার পরিচয় জানতে চাও? শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক, জৈবিক, জৈব-রাসায়নিক, সামাজিক, সংখ্যাতাত্ত্বিক না আধ্যাত্মিক? সেটা বলো।

মানব : আমি একজন সিধে লোক—

জ্যোতি : তুমি একজন গণ্ডমূর্খ!

মানব : আমাকে অপমান করবার তোমার কোনো অধিকার নেই।

জ্যোতি : একটা নতুন কথা বলেছো। বাংলা বাক্যসম্পদে একটা মৌলিক দান—"আমাকে অপমান করবার তোমার কোনো অধিকার নেই!"

মানব : জেনে রেখো—

জ্যোতি : এবং তুমিও জেনে রেখো—জ্যোতিষশাস্ত্র, পরকীয়া প্রেম, আধুনিক নাটক, মালা সিন্‌হা, কাঁঠাল পচে যাওয়া—প্রত্যেকটা ঘটনারই একাট ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে। তোমার মহামূল্যবান ঘটনা মানবেরও আছে।

মানব : আমি—

জ্যোতি : কিছু কারণ স্পষ্ট—কিছু অস্পষ্ট, সব কারণই গুরুত্বহীন। এ নিয়ে এতো ঝামেলা করবার দরকার কী?

মানব : আমি তোমার সঙ্গে একমত নই।

জ্যোতি : তুমি একমত হলে কি না হলে তাতে আমার কচু আসে যায়! আমার এখন বিশ্রাম দরকার। একঘণ্টা ধরে সমানে চালিয়ে গেছি, আর ভালো লাগছে না। তোমার আর কোনো প্রশ্ন থাকলে ওকে জিজ্ঞেস করো (তরুণকে দেখালো)। ধরে নিতে পারো আমার প্রস্থান হয়ে গেছে।

[জ্যোতি বাক্স থেকে মোটা একটা বই নিয়ে একদিকে গিয়ে পিছন ফিরে বসলো। সম্পূর্ণ উদাসীন। ছায়া ঘুম ভেঙে উঠে সশব্দে হাই তুললো। ফটিক মুখের সামনে তুড়ি দিলো]

ছায়া : ফটিকবাবু।

ফটিক : বলুন।

ছায়া : আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, না?

ফটিক : হ্যাঁ, সাবধান কিন্তু।

ছায়া : কেন?

ফটিক : ঘুমোলে অনেক সময় চরিত্র বদলে যায়। রিফ্লেক্সগুলোকে ঘুমোতে দেবেন না একেবারে।

[ফটিক দু'চারটে বৈঠক দিলো। তরুণ এতোক্ষণ গভীর চিন্তায় ডুবে ছিল। হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো।]

তরুণ : কিন্তু এর অস্তিত্ব ছিল!

ছায়া : অ্যাঁ?

ফটিক : আপনাকে বলছে না।

ছায়া : আমার দিকে তাকিয়ে আছেন যে?

ফটিক : আপনার দিকে নয়। আপনার ভেতর দিয়ে ওদিকে।

ছায়া : আমার ভেতর দিয়ে—?

তরুণ : প্রশ্ন উঠতে পারে—এ লোকটা আমাদের কাছে কী? এর বাজে একঘেয়ে জীবনটা কচলে কচলে আমরা কয়েক ফোঁটা রস নিঙড়ে বার করবার চেষ্টা করছি কী করতে?

ফটিক : খুব ভালো প্রশ্ন।

তরুণ : (তীব্রভাবে) কিন্তু আমরা যদি একে নিয়ে মাথা না ঘামাতাম, তবু তো এ থাকতো! তবু এ জন্মাতো, বাঁচতো, মরতো। তবু পঞ্চাশ বছর একমাস সাতাশ দিন ধরে এর ফুসফুসে হাওয়া ঢুকেছে. হাওয়া বেরিয়েছে। সেটা কিছু না? ওর মনের কথা ভাবো। মাথার চামড়ার নিচে খুলির নিচে, এক হাজার দু'শো গ্রাম নরম ল্যাদলেদে পদার্থ, হাঁড়িতে বন্দী দৈত্যের মতো পঞ্চাশ বছর ধরে জীবনের কাজ করে গেছে—সেইটার কথা ভাবো! সেইটাই আসল কথা! অন্য কিছু নয়: হাইড্রোজেন বোমা, আমেরিকান গম, পাকিস্তান, ফ্যামিলি প্ল্যানিং—কিছু নয়! ঐখানে তুমি বন্দী, আমি বন্দী। ঐখানে তুমি 'তুমি', আমি 'আমি'। তোমার সঙ্গে কথা বলতে পাবি, ভাব করতে পারি, তোমার প্রেমে পড়তে পারি—

[ছায়া চমকে উঠলো। তরুণের চোখ এখন ঘটনাচক্রে তার দিকে।]

ছায়া : অ্যাঁ!

তরুণ : —তুমি আমি এক পার্টির মেম্বার হতে পারি, একসঙ্গে লেকে ডুবে মরতে পারি—(ছায়া দু'পা পিছিয়ে গেলো) কিন্তু তবু তুমি 'তুমি' থাকবে, আমি 'আমি' থাকবো! তুমি আমি দু'জনেই বন্দী থাকবো, এইখানে (নিজের কপালে আঙুল দেখিয়ে)—এই এক হাজার দু'শো গ্রাম নরম পদার্থের মধ্যে, খুলির পাঁচিল ঘেরা জেলখানায়।

[ফটিক মহোৎসাহে হাততালি দিয়ে উঠলো। জ্যোতিও দিলো। যেন ফুটবল মাঠ।]

আজ যে মানব নামক একটা মৃত ব্যক্তির তুচ্ছ জীবন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি তার একমাত্র কারণ—মাথার খুলির মধ্যে বন্দী আর একটা মানুষের জীবনের আসল সত্যটা খুঁজে বার করা। এই পাঁচিলের আড়ালটা ভেঙে সরিয়ে দেবার চেষ্টা, অন্তত আর একটা মানুষের—তা সে যতো তুচ্ছ মানুষই হোক! তা যদি না করতে পারি, তবে সামগ্রিক মানুষের রূপ কোনোদিনই বুঝে উঠতে পারবো না! এই জেলখানায় একা একা বন্দী অবস্থায় জীবন কাটিয়ে যেতে হবে।

ফটিক : (শুধু জেলখানাটাই বুঝেছে) হ্যাঁ, সে বড়ো বিচ্ছিরি!

ছায়া : কে জেলে যাবে?

ফটিক : মানব।

মানব : (চটে) দেখো, থিয়েটার করতে এসেছি বলে—

তরুণ : (হঠাৎ ফেটে পড়ে) থিয়েটার জাহান্নমে যাক! বাড়ি যাও তুমি!

জ্যোতি : তরুণ, শোনো—

তরুণ : তুমিও বাড়ি যাও! সবাই বাড়ি যাও! ওদের সবাইকে চলে যেতে বলো।

ফটিক : ওরা যাবে কেন? পুরো টিকিট কিনেছে—

তরুণ : পর্দা ফেলে দাও!

জ্যোতি : পর্দা নেই—তার ফেলবো কী?

তরুণ : বুঝতে পারছো তাহলে? বুঝতে পারছো? বন্দী! বন্দী! বন্দী! আমরা সবাই বন্দী! ওরা সবাই বন্দী! কারো কোথাও যাবার উপায় নেই!

ছায়া : (ফটিককে) তরুণবাবু অমন ক্ষেপে গেলেন কেন?

ফটিক : মাথার দোষ।

[এরপর খুব তাড়াতাড়ি কথা চলবে]

জ্যোতি : আমি বুঝতে পেরেছি—

তরুণ : কচু বুঝেছো!

মানব : কী বুঝেছো?

ফটিক : বুঝিয়ে বলো—

জ্যোতি : কীরকমভাবে বোঝাবো ভাবছি—

তরুণ : ঘণ্টা বোঝাবে!

ফটিক : যা হয় বলো না, আমরা বুঝে নেবো---

জ্যোতি : মনে করো, কী যেন বলে-- ?

ফটিক : ধরো একটা ইয়ে—

তরুণ : দোহাই তোমাদের!

ফটিক : সেই কথাই তো হচ্ছিলো—

মানব : (কানে হাত চাপা দিয়ে চিৎকার করে) তোমরা আমাকে পাগল করে দিচ্ছো!

জ্যোতি : (বিজয়ী) অ্যাই! এইটাই আসল কথা!

ফটিক : এই কথাটাই এতোক্ষণ খুঁজছিলাম!

তরুণ : মানব!

[মানব দর্শকদের মধ্যে লাফিয়ে পড়বার ঠিক আগের মুহূর্তে তরুণ তাকে ধরে ফেললো। টেনে এনে বিছানায় বসালো। মানব দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলো]

জ্যোতি : এটা অবশ্য ঘটনাটার একটা দিক মাত্র।

ফটিক : হ্যাঁ, আদ্ধেকটা হোলো শুধু।

তরুণ : ইন্টারমিশন।

ছায়া : ইন্টার—কী?

ফটিক : ইন্টার—চা।

ছায়া : চা? লাভলি!

ফটিক : চলুন যাই।

ছায়া : চলুন।

[ফটিক ছায়াকে নিয়ে চলে গেলো]

জ্যোতি : (মানবকে) তোমার হয়েছে কী? তুমি তো বেঁচে আছো, না কী?

[জ্যোতি বেরিয়ে গেলো। তরুণ মানবকে হাত ধরে উঠিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলো। মঞ্চের আলো নিভে গেলো।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[জ্যোতি আর ফটিক একসঙ্গে ঢুকলো। মঞ্চের মাঝামাঝি আসতে হঠাৎ মঞ্চের আলো জ্বলে উঠলো। দু'জনেই চোখে হাত চাপা দিলো। ফটিক অন্য হাত নেড়ে আলো তাড়াতে চেষ্টা করতে লাগলো।]

জ্যোতি: বড় বেশি আলো।

ফটিক : হ্যাঁ। যাচ্ছে না।

জ্যোতি : কী যাচ্ছে না?

ফটিক : আলো। যতো তাড়াচ্ছি, ততো আসছে।

জ্যোতি : ফুটো আছে বোধহয়।

ফটিক : ফুটো?

জ্যোতি : আকাশে।

ফটিক : (উপরে তাকিয়ে) আকাশে?

জ্যোতি : লণ্ঠনটা জ্বালো না?

ফটিক : কোন্ লণ্ঠন?

জ্যোতি : কালো লণ্ঠনটা। যেটায় অন্ধকার জ্বলে।

[ফটিক বাক্স থেকে একটা কালো লণ্ঠন নিয়ে এলো]

ফটিক : (দর্শকদের) এ খেলাটার জন্যে আপনাদের একজনের সাহায্য দরকার। এখানে কাশীর মহামহোপাধ্যায় কেউ আছেন? কাশীর মহামহোপাধ্যায়? নেই? আচ্ছা, কারুর পঞ্চম পক্ষের স্ত্রী? পঞ্চমপক্ষের স্ত্রী কেউ আছেন? মোগলসরাইয়ের উকিল? মোগলসরাইয়ের উকিলের ভগ্নিপতি? শালা? তাও নেই? রেঞ্জার্সের লটারি জেতা কেউ আছেন এখানে? বোম্বাই হাইকোর্টের কোনো জাজ্? প্যাসেঞ্জার জাহাজের সেকেন্ড মেট্? 'তুফান মেল' চিত্রের কোনো অভিনেতা? অভিনেত্রী? (জ্যোতিকে) আশ্চর্য! কোন্ থিয়েটারে যায় এরা সবাই? (আবার দর্শকদের) গরুচোর কেউ আছেন? ব্যাঙ্ক ডাকাত? ফাঁসির জহ্লাদ? রাঁচি ফেরৎ উন্মাদ? নেই? (একটু থেমে) দেশলাই আছে কারো কাছে? দেশলাই? (দেশলাই পেয়ে) ধন্যবাদ।

[ফটিক লণ্ঠন জ্বাললো। কালো লণ্ঠন, তাই মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেলো প্রায়। অস্পষ্টভাবে দেখা গেলো ফটিক সাবধানে লণ্ঠনটা পেছনে রাখলো। ফিরে আসছে, দপ করে মঞ্চের আলো আবার জ্বলে উঠলো]

জ্যোতি : (লণ্ঠনের দিকে চেয়ে) যাঃ! নিভে গেলো।

ফটিক : মরুক গে। ঘোড়া পিটিয়ে গাধা করা যায় না। এই যে আসুন—

[দেশলাই ফেরৎ দিয়ে দিলো]

জ্যোতি : ফটিক!

ফটিক : উঁ?

জ্যোতি : ওরা কোথায়?

ফটিক : মানব কান্নাকাটি করছে আর তরুণকে কী সব বোঝাচ্ছে।

জ্যোতি : তরুণ কী করছে?

ফটিক : বসে বসে বুঝছে। (থেমে) মানবের পরচুলা আবার হারিয়ে গেছে।

জ্যোতি : বাঁচা গেছে। (একটু ভেবে) আর একজন ছিল না?

ফটিক : আর একজন?

জ্যোতি : হ্যাঁ, মনে হচ্ছে যেন আর একজন কে ছিল। ঐখানটা বসে ঘুমোচ্ছিলো আর থেকে থেকে ঘুম ভেঙে বোকা বোকা প্রশ্ন করছিলো।

ফটিক : ও, সেই—মেয়েমতো?

জ্যোতি : হ্যাঁ হ্যাঁ—মেয়েমতো!

ফটিক : ছায়া।

জ্যোতি : হ্যাঁ, ছায়া—(থেমে) ছায়া? (ফটিক ঘাড় নাড়লো) ঠিক জানো?

ফটিক : হ্যাঁ হ্যাঁ। ওর বোনের নামও ছায়া।

জ্যোতি : বোনের নামও ছায়া?

ফটিক : হ্যাঁ।

জ্যোতি : দু'জন ছিল?

ফটিক : না, একজন। বোন আসেনি।

জ্যোতি : কোন বোন আসেনি?

ফটিক : ছায়া আসেনি।

জ্যোতি : তবে কে এসেছে?

ফটিক : ছায়া।

জ্যোতি : (অল্পক্ষণ চেয়ে থেকে) মরুক গে! সে কোথায়? বাড়ি চলে গেছে?

ফটিক : না, সে একটু ইয়ে—এক্ষুনি আসবে।

জ্যোতি : তা আমরা দু'জনে এখানে বসে কী করবো?

ফটিক : তরুণ বললো—টাইম হয়ে গেছে, তোমরা শুরু করে দাও, আমি যাচ্ছি।

জ্যোতি : কী শুরু করবো?

ফটিক : যা হয় করো।

জ্যোতি : আমার যা হয় করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই।

ফটিক : তাহলে এঁরা কি বসে থাকবেন?

জ্যোতি : তুমি পল্টু-বিল্টুর গল্প বলো, যদি ওঁদের বসিয়ে রাখতে না চাও।

ফটিক : তাহলে তো ভাবনাই ছিল না। কিন্তু তরুণ বলেছে পল্টু-বিল্টু ছাড়া যা হয় করো। তা নইলে আর তোমাকে বলি?

জ্যোতি : (ভেবে) আচ্ছা একটা ধাঁধা বলছি, জবাব দাও।

ফটিক : অঙ্কের ধাঁধা হলে ওঁদের জিজ্ঞেস করো। (দর্শকদের দেখিয়ে দিলো)

জ্যোতি : না না, অঙ্ক নয়—

ফটিক : ও, তাহলে বলো।

জ্যোতি : এই পৃথিবীতে একরকম জীব আছে, যা নিজের চেয়ে দুর্বল প্রাণীকে খালি হাতে মারে, নিজের চেয়ে শক্তিশালী প্রাণীকে যন্ত্র দিয়ে মারে, তাদের কাউকে খায়,

কাউকে শুধু মারবার সুখে মারে, অথচ নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে দয়ালু প্রাণী মনে করে। বলতে পারো, জীবটি কী?

ফটিক : (ভেবে) বড়ো শক্ত ধাঁধা। আর একটু আঁচ দাও না?

জ্যোতি : এই জীবটি প্রায়ই খেতে না পেয়ে মরে, কিন্তু পৃথিবী ছেড়ে চাঁদে যাবার চেষ্টা করে। সে ডাঙায় ছোটে, আকাশে ওড়ে, জলের নিচে নামে, কিন্তু বিছানায় শুয়ে মরতে চায়।

ফটিক : (ভেবে) শামুক?

জ্যোতি : শামুক কী করে হবে?

ফটিক : জানি না। আর একটা ধাঁধা শুনেছিলাম, তার উত্তর ছিল শামুক।

জ্যোতি : এটার উত্তর শামুক নয়।

[ফটিক কী বলতে মুখ খুললো]

ঝিনুকও নয়।

ফটিক : আমি ঝিনুক বলছিলাম না।

জ্যোতি : তবে কী বলছিলে?

ফটিক : জিজ্ঞেস করছিলাম—পারলে কী প্রাইজ?

জ্যোতি : প্রাইজ নেই।

ফটিক : তবে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী?

জ্যোতি : মাথা ঘামিও না তাহলে।

[জ্যোতি পেছন দিকে রওনা হোলো]

ফটিক : ভাই জ্যোতি—

জ্যোতি : (থেমে) কী?

ফটিক : আমার মনে হয় এ নিয়ে এতো হৈ-চৈ করবার মতো কিছু নেই।

[সিগারেট বার করলো]

জ্যোতি : কী নিয়ে?

ফটিক : তর্কের খাতিরে ধরা যেতে পারে—জীবন।

জ্যোতি : আমার তর্ক করবার কোনো ইচ্ছে নেই।

[গিয়ে বই নিয়ে এলো]

ফটিক : (আগের দর্শককে) দেশলাইটা আর একবার দেবেন? (দেশলাই নিয়ে, সিগারেট বাড়িয়ে) সিগারেট? (আবার টেনে নিয়ে) ও না, আপনাদের তো এখানে খাওয়া বারণ। (নিজে সিগারেট ধরিয়ে দেশলাই ফিরিয়ে দিলো। তারপর ধোঁয়া ছেড়ে—) সব মিলিয়ে শেষ অবধি তিনটে জিনিসে এসে দাঁড়ায়।

[জ্যোতি বই নিয়ে বিছানায় বসেছে]

জ্যোতি : কী দাঁড়ায়?

ফটিক : জীবন।

জ্যোতি : কোথায় এসে দাঁড়ায়?

ফটিক : যেখানেই দাঁড়াক, জিনিস তিনটে। প্রবেশ করা, প্রস্থান করা আর প্রবেশ ও প্রস্থানের মাঝখানের সময়টা কোনোরকমে ভরে দেওয়া। (একটু ভেবে) কী দিয়ে

ভরবে, তাতে কিছুই যায় আসে না। কিছু একটা করে চলবে, এটা ঠিক। কিছু না করে থাকা অসম্ভব। (ভেবে) এটা খুব দামী কথা বলেছি।

[জ্যোতি শুধু চেয়ে রইলো]

একটু দাঁড়াও।

জ্যোতি : দাঁড়াবো কেন?

ফটিক : ও, বসে আছো? তাহলে একটু বোসো। (উইংসের কাছে গিয়ে কী সব নির্দেশ দিলো। মঞ্চের আলোটা বদলালো) এইবার ঠিক হয়েছে। (ফিরে এসে) হ্যাঁ, বলো।

জ্যোতি : কী বলবো?

ফটিক : যা বলবার আছে বলো।

জ্যোতি : আমার কিছু বলবার নেই।

ফটিক : (চেয়ে থেকে) নেই?

জ্যোতি : না।

ফটিক : (আর একটু থেমে) তাহলে বোলো না।

[জ্যোতি শুয়ে পড়লো চিৎ হয়ে। ফটিক দর্শকদের দিকে এলো চিন্তিত মুখে ধোঁয়া ছেড়ে]

আজ কতো তারিখ?

জ্যোতি : জানি না।

ফটিক : কাল কতো তারিখ ছিল?

জ্যোতি : তাও জানি না।

ফটিক : কালকের তারিখটা জানতে পারলে আজকেরটা বার করা যেতো।

[ছায়ার প্রবেশ]

এই যে, আপনি এসে গেছেন? বাঁচালেন!

ছায়া : কেন?

ফটিক : আমি আর কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। শেষ অবধি ভাবছিলাম—সিনেমার কথাই তুলবো নাকি!

ছায়া : আপনি বুঝি খুব সিনেমা দেখেন?

ফটিক : হ্যাঁ, দেখি।

ছায়া : কী ছবি দেখেন? বাংলা না ইংরিজি?

ফটিক : দুই-ই। হিন্দী-ভি দেখি।

ছায়া : হিন্দী ছবি আপনার ভালো লাগে?

ফটিক : কেন লাগবে না?

ছায়া : আমারও ভালো লাগে। গল্পগুলো অবশ্য আজগুবি। কিন্তু বেশ জমাটি, বেশ—বেশ—

ফটিক : এন্টারটেনিং?

ছায়া : হ্যাঁ, ঠিক। অবশ্য কেউ কেউ বলে—ইয়ে—

ফটিক : এস্‌কেপিস্ট?

ছায়া : হ্যাঁ হ্যাঁ, এস্‌কেপিস্ট। কিন্তু এস্‌কেপিস্ট হলে ক্ষতি কী? সিনেমায় তো আনন্দ পেতে যাওয়া, তাই নয়? এমনি তো অনেক জ্বালা-যন্ত্রণা আছে, আবার পয়সা দিয়ে সিনেমায় গিয়ে দুঃখ পাবার কী মানে হয়?

ফটিক : কোনো মানে হয় না।

ছায়া : অবশ্য ট্র্যাজেডিও যে সবসময় খারাপ লাগে, তা নয়। সত্যিকারের ভালো ট্র্যাজেডি—যা নাড়া দিতে পারে, কাঁদাতে পারে, মনে—মনে—

ফটিক : মনের গভীরে স্পর্শ করতে পারে—

ছায়া : মনের গভীরে স্পর্শ করতে পারে—সেরকম ট্র্যাজেডি তো জীবনেরই অংশ, তাই না? সেটা তো—সেটা তো—

ফটিক : রিয়েলিজ্‌ম?

ছায়া : হ্যাঁ, রিয়েলিজ্‌ম। জীবনে যা হয় সত্যি সত্যি, তা জানবো না বলে চোখ বুঁজে বসে থাকলে তো চলবে না?

ফটিক : কী করে চলবে?

ছায়া : ঐজন্যেই আমার থিয়েটার করতে ভালো লাগে। থিয়েটার তো জীবনের আয়না, না?

ফটিক : তাই তো শুনি।

ছায়া : থিয়েটারকে বাদ দিয়ে জীবন হয় না। মানে—জীবনকে বাদ দিয়ে থিয়েটার হয় কখনো?

ফটিক : কী করে হবে?

ছায়া : অবশ্য আজকাল এতো সব বাজে নাটক বেরিয়েছে—যার কোনো মাথামুণ্ডু নেই! আধুনিক নাটক! যেন নতুন কিছু করবার জন্যেই করা।

ফটিক : সস্তা স্টান্ট আর কী!

ছায়া : ঠিক বলেছেন। অবশ্য এইরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতেই আগামী যুগের নাটক বেরিয়ে আসবে একদিন। আপনার তাই মনে হয় না?

ফটিক : অবিকল। আপনি এ নিয়ে অনেক ভেবেছেন দেখছি?

ছায়া : (খুশি হয়ে) আমি ছোটবেলা থেকেই সিরিয়াস প্রকৃতির। মানুষ হয়ে জন্মেছি, অথচ শাড়ি, গয়না, ফিল্মস্টার ছাড়া কিছু ভাববো না, সেটা কি ঠিক?

ফটিক : না, মোটেই ঠিক না।

ছায়া : অনেক মেয়ে তাই করে।

ফটিক : তাই তো দেখি।

ছায়া : আমার ওসব ভালো লাগে না। আমি বোধহয় একটু অন্যরকম।

ফটিক : আপনি একেবারে অন্যরকম।

ছায়া : অথচ দেখবেন, যারা এসব নিয়ে বেশি ভাবে, তাদেরই সাজপোশাক একেবারে বাজে! শুধু চটকদার রঙ, কিছুর সঙ্গে কিছু ম্যাচ করে না।

ফটিক : আশ্চর্য! সত্যি তাই!

ছায়া : পয়সা খরচ করলেই সাজ হয় না। টেস্ট থাকা চাই। রুচি বলে তো একটা জিনিস আছে?

ফটিক : নিশ্চয়ই, রুচি খুব বড়ো জিনিস।
ছায়া : এই শাড়িটা দেখুন। খুব বেশি দাম নয়, কিন্তু বেমানান কিছু দেখাচ্ছে?
ফটিক : চমৎকার দেখাচ্ছে।
ছায়া : জামাটার সঙ্গে ম্যাচ করেনি?
ফটিক : দারুণ ম্যাচ।
ছায়া : আর চটিটা দেখুন? ব্যাগটা? কোথাও চোখে লাগছে?
ফটিক : খুব ভালো লাগছে।
ছায়া : অথচ কোনোটাই খুব দামী নয়। আসলে ভাবা দরকার। কোনটার সঙ্গে কোনটা যায় একটু ভেবে দেখতে হয়। আলমারি খুললাম, আর হাতের কাছে যা পেলাম টেনে নিয়ে পরে ফেললাম, তা বললে তো হয় না?
ফটিক : কেমন করে হবে?
ছায়া : ফটিকবাবু! আমাদের দু'জনের মতের খুব মিল আছে, না?
ফটিক : আমি আপনার সঙ্গে একেবারে একমত।
ছায়া : আপনার সঙ্গে কথা বলে সুখ আছে, সত্যি!
ফটিক : কাল বিকেলে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ মেট্রোর সামনে আসুন না? কথা বলা যাবে।
ছায়া : কাল? কাল পারবো না। পরশু করুন।
ফটিক : বেশ, পরশু।
ছায়া : আর মেট্রোর সামনে ও সময়ে বড়ো ভিড়।
ফটিক : আচ্ছা, টাইগারের সামনে আসুন।
ছায়া : আর সাড়ে পাঁচটা বড়ো তাড়াতাড়ি হয়ে যায়।
ফটিক : পৌনে ছ'টা?
ছায়া : হ্যাঁ, পৌনে ছ'টায় হয়। আমায় কিন্তু ন'টার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে।
ফটিক : আমি ন'টার মধ্যে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবো।
ছায়া : পাঁচ-দশ মিনিট দেরি হলে অবশ্য কিছু আসে যায় না।
ফটিক : আচ্ছা, পাঁচ-দশ মিনিট দেরিই করবো।
ছায়া : ঐ কথা রইলো তাহলে?
ফটিক : ঐ কথা রইলো।

[মানব আর তরুণ কথা বলতে বলতে ঢুকলো। তরুণের হাতে কাগজ। মানবের মাথায় পরচুলা]

মানব : শুধু একটু সহানুভূতি, আর কিছু চাই না আমি।
তরুণ : (কাগজ সাজাতে সাজাতে) আচ্ছা।
মানব : আর একটু সহৃদয়তা।
তরুণ : আচ্ছা, আচ্ছা।
মানব : আর একটু আন্তরিকতা।
তরুণ : (মুখ তুলে) আচ্ছা! আর কিছু?
মানব : না। (তরুণ কাগজে মন দিলো) আর একটু ভদ্র ব্যবহার—
তরুণ : (অধৈর্যে) আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা! হয়েছে?

মানব : আমি এমন কিছু বেশি চেয়েছি?

তরুণ : হ্যাঁ।

মানব . অ্যাঁ?

জ্যোতি : যতো সব পুরোনো বস্তাপচা একঘেয়ে কথা।

[উঠে বই রাখতে চলে গেলো]

মানব : আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি না!

জ্যোতি : আমার সৌভাগ্য।

ফটিক : (হঠাৎ খেয়াল করে) আরে ঐ তো! চুল খুঁজে পেয়েছো দেখছি।

মানব : (মুখ খিঁচিয়ে) বেশ করেছি!

ছায়া : কোথায় ছিল?

মানব : (কটমট করে তাকিয়ে) আপনার মাথায়।

ছায়া : (মাথায় হাত দিয়ে) আমার মাথায়?

মানব : (তরুণের কাছে গিয়ে) তরুণ!

তরুণ : হুঁ।

ছায়া : (ফটিককে) আমার মাথায়—বললো কেন?

ফটিক : ভুল বলেছে। মাথার গোলমাল।

মানব : তরুণ!

তরুণ! হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনছি, বলো না!

মানব : আমাকে যা কথা দিয়েছো রাখবে তো?

তরুণ : আচ্ছা।

মানব : ভালো করে বলো।

তরুণ : কী ছেলেমানুষি করছো?

মানব : ওদের সামনে বলো।

তরুণ : কী বলবো?

মানব : আমাকে যে কথা দিয়েছো—রাখবে।

তরুণ : তোমাকে যে কথা দিয়েছি রাখবো, হয়েছে?

মানব : বলো—মানবের জীবন-বিচারে আমার যথাসাধ্য সহানুভূতি থাকবে—

তরুণ : সহানুভূতি থাকবে।

মানব : সহৃদয়তা থাকবে—

তরুণ : সহৃদয়তা থাকবে।

মানব : কাগজগুলো রেখে একটু আন্তরিকভাবে বলো তরুণ—

তরুণ : আন্তরিকতা থাকবে! আর কী চাও তুমি বলতে পারো?

[মানবের মুখ কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠলো]

দোহাই তোমার, আবার কান্না শুরু কোরো না! কান্না আমার একেবারে বরদাস্ত হয় না!

মানব : সত্যি বলছি—আমার জীবনের একটা অর্থ ছিল। একটা উদ্দেশ্য ছিল। তোমরা সবাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করছো—আমার জীবনটা বাজে, অর্থহীন,

অকেজো—কিন্তু তা নয়, তা নয়! আমার জীবন বৃথা কাটেনি! আমার জীবন স্বীকৃতির দাবি রাখে!

তরুণ : (প্রায় চিৎকারে) আচ্ছা!!

মানব : (ঢোক গিলে) ঠিক আছে, আরম্ভ করো।

[তরুণ কাগজ সাজাতে লাগলো]

ফটিক : (ছায়াকে) চলুন, চা খেয়ে আসি।

ছায়া : এখন কী করে যাবো? ইন্টারভ্যাল তো হয়ে গেছে?

ফটিক : তা হোক। এখানে আমাদের 'প্রস্থান' লিখেছে তরুণ।

ছায়া : প্রস্থান? একেবারে?

ফটিক : না, পরে 'প্রবেশ' আছে। সে আমি ঠিকসময়ে বলে দেবো আপনাকে।

ছায়া : চলুন।

[ফটিক আর ছায়া চলে গেলো]

তরুণ : (দর্শকদের) আমরা জানি—

মানব : আমি কোথায় বসবো?

তরুণ : যেখানে তোমার ইচ্ছে।

মানব : না কি দাঁড়ানোই ভালো? (তরুণ রেগে মুখ খোলা মাত্র) না, বসি।

[খাটে বসলো]

তরুণ : আমরা জানি—১৯১২ সালে এই লোকটার জন্ম, ১৯৬২ সালে মৃত্যু। এই দু'টো দেওয়াল নিজের নিজের জায়গায় পোক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এই দুই দেওয়ালের মধ্যে যে ব্যবধানটা—সেটা বায়বীয়। তার আকার আয়তন, তার বিভিন্ন তরঙ্গের গতিবিধি, তীব্রতা, দিকনির্দেশ—অতো সহজে করা যায় না।

মানব : তবু করতে হবে।

তরুণ : তবু করতে হবে। প্রশ্ন হোলো—কী পদ্ধতিতে করলে—

মানব : যদি প্রথম থেকে এক এক করে ধরা যায়—

তরুণ : (ফিরে) বিশ্লেষণটা তুমি করবে, না আমি?

মানব : তুমি, বাঃ! তোমার নাটক।

তরুণ : তবে কথা বোলো না।

মানব : আচ্ছা।

তরুণ : আর খ্যাচর-খ্যাচর করে মাথা চুলকিও না।

মানব : এই চুলটায় ভয়ানক চুলকোয় যে!

তরুণ : খুলে রাখো তাহলে।

মানব : কী করে খুলবো? আমার চুল তো!

[তরুণ বিরক্ত হয়ে চুলে টান দিলো। চুল খুললো না]

তরুণ : ঠিক আছে, রাখো তাহলে।

মানব : কিন্তু চুলকোচ্ছে যে?

তরুণ : তবে চুলকোও! যা খুশি তাই করো!

মানব : যা খুশি তাই করতে পারলে এমন চুল লাগাতাম যেটায় চুলকোতো না।

তরুণ : (একবার তাকিয়ে নিয়ে) যদি প্রথম থেকে ঘটনাগুলো এক এক করে ধরা যায়—

জ্যোতি : কী করতে চাইছো তুমি?

তরুণ : খুব সরল সাধারণ একটি কাজ। এই লোকটির জীবনের অর্থটা বুঝতে চাইছি। এই একটি লোকের, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের নয়। শুধু একটি মানুষ। চাওয়াটা অন্যায় হচ্ছে খুব?

জ্যোতি : নাঃ। না, খুব সরল ব্যাপার। আগেও অবশ্য চেষ্টা করেছো তুমি—

তরুণ : হ্যাঁ, করেছি। প্রত্যেকবার ভেস্তে গেছে। কিন্তু এবার প্রায় পেয়ে গেছি—

মানব : তরুণ, তুমি ওকে কথা বলতে দিও না।

জ্যোতি : আমার কথা বলবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই।

তরুণ : (আরম্ভ করলো) প্রথমে ঘটনাগুলো—

[তরুণ জ্যোতির দিকে একবার তাকিয়ে আবার শুরু করলো]

তরুণ : প্রথমে ঘটনাগুলো বিচার করে দেখা যাক। জন্ম, আমরা জানি—উনিশশো—

জ্যোতি : কতোবার যে জন্মাবে মানব!

তরুণ : (জোর দিয়ে) ১৯১২ সালের ২৫শে জুলাই। বাংলাদেশের গণ্ডগ্রাম, অর্ধদরিদ্র পরিবার। পিতা অর্ধশিক্ষিত, জেলা শহরে চাকুরে। লেখাপড়া—গ্রামের পাঠশালা, মহকুমা শহরের মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়, জেলা শহরের উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, ম্যাট্রিকুলেশন, কলকাতার কলেজে ইন্টারমিডিয়েট, বি-এ ক্লাস। পিতার অসামর্থ্য এবং অসহযোগ আন্দোলনের যৌথ কারণে পড়া বন্ধ, জনৈক প্রভাবশালী আত্মীয়ের সুপারিশে সদাগরী অফিসে আসন লাভ, কেরানির জীবন, এবং মৃত্যু। এই গেলো ঘটনা।

মানব : সে কী?

তরুণ : কোন্‌টা ভুল বলেছি?

মানব : এই শুধু?

তরুণ : আর কী?

মানব : প্রেম?

তরুণ : (দর্শকদের) গ্রাম্য বাল্যপ্রেম। কিছু চিন্তা, দ্বিধা, ভয়, আনন্দ, ভোগান্তি—সব মিলিয়ে ভিজে ভিজে একটা ফ্যাকাসে দাগ। বালিকার নাম লীলা, পরবর্তী জীবনের ছয় সন্তানের জননী হয়েছে, তারস্বরে বেস্কার চেঁচামেচি করে পারিপার্শ্বিককে আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করেছে, সূতিকারোগে ভুগেছে, এবং পরিশেষে মারা গেছে।

মানব : পরবর্তী জীবনে কী হয়েছে, তার সঙ্গে প্রথম প্রেমের কী সম্পর্ক?

জ্যোতি : প্রেম নয়—ছাগব্যাধি। একতরফা এবং নিষ্ফলা।

মানব : তুমি কি আমাকে ছাগল বলতে চাইছো? তা যদি হয়ে থাকে—

তরুণ : ঝগড়া না করে আর কিছু বলতে পারো তো বলো।

মানব : আদর্শ?

তরুণ : আদর্শটা ঘটনা নয়, তবু বলি। (দর্শকদের) বাবার চেয়ে বেশি পরীক্ষা পাস

করবার ইচ্ছে, বেশি টাকা রোজগারের লোভ, কিছু একটা খেল দেখিয়ে পিঠ চাপড়ানি আর হাততালি পাবার আকুতি—

মানব : এই তোমার কথা রাখা হচ্ছে তরুণ?

তরুণ : আমি তো প্রাণপণ চেষ্টা করছি—

মানব : রাজনৈতিক আদর্শের উল্লেখই করলে না তুমি—

তরুণ : ও হ্যাঁ, ভুলে গেছি। (দর্শকদের) কলকাতার কলেজে বি.এ. পড়বার সময়ে দেশের জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে কিছু একটা করবার একটা ঐকান্তিক ইচ্ছা সাময়িকভাবে ছিল বটে। ইচ্ছেটা বিশেষ কোনো কাজে রূপান্তরিত হয়নি।

মানব : হয়নি মানে? আমি কলেজ ছেড়েছিলাম—

তরুণ : এমনিতেও ছাড়তে হোতো। টাকার অভাবে।

মানব : আমি প্রত্যেকটা সভা, প্রত্যেকটা শোভাযাত্রায়—

তরুণ : আটটি সভা, তিনটি শোভাযাত্রা, একটি প্রভাতফেরি—যেবার ঠাণ্ডা লেগে গলা বসে গিয়ে তিনদিন তুমি কথা বলতে পারোনি।

মানব : ঠাণ্ডা লেগে গলা বসাটাই ঘটনা? আর কোনো ঘটনা নেই? পুলিসের লাঠি-চার্জের মধ্যে অনিলদা 'বন্দেমাতরম' বলে চিৎকার করে উঠলো, তখন আমি প্রাণপণ শক্তিতে 'বন্দেমাতরম' বলে চেঁচাইনি? আমার চোখের সামনে অনিলদাকে পুলিসে ধরে নিয়ে যায়নি? দীপেশকে ধরেনি? সাধন, যতীশদা, হারাধনদা—এদের সব্বাইকে ধবে নিয়ে জেলে দেয়নি?

তরুণ : যতীশদা বা হারাধনদার জেলে যাওয়াটাকে যদি তোমার জীবনের ঘটনা বলে চালাতে চাও—

মানব : আমিও সেদিন জেলে যেতে পারতাম—

তরুণ : দুর্ভাগ্যক্রমে পারোনি শেষ পর্যন্ত। চাকরি পাবার পর সেকথা ভেবে আরামের নিশ্বাস ফেলেছো। ১৯৪৭-এর পর সেকথা ভেবে আফশোষ করেছো।

মানব : এই তোমার সহানুভূতি? এই তোমার সহৃদয়তা? আন্তরিকতা?

তরুণ : যা ঘটেনি, তাই ঘটেছে বললে কিছু এগোবে?

মানব : জেলে যাওয়াটাই মানুষের জীবনের চরম সার্থকতা নয়—

তরুণ : নিশ্চয়ই নয়। আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

জ্যোতি : ঠিক যেমন জেলের বাইরে থাকাটাও জীবনের চরম সার্থকতা নয়।

মানব : জেলের বাইবেও মানুষের অনেক কিছু করবার আছে—

জ্যোতি : মাননীয় নাট্যকার। আমরা কি মানুষের কী করণীয়—তাই জানতে চাইছি?

তরুণ : না। মানব কী করেছে, তাই।

মানব : অনেক কিছু করেছি।

জ্যোতি : তরুণ বোধহয় ভাত খাওয়া, দাড়ি কামানো, মাথা চুলকোনো—এসব করার কথা বলছে না।

[মানব মাথা চুলকোচ্ছিলো, তাড়াতাড়ি হাত নামিয়ে নিলো]

মানব : সে কথা তোমাকে ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না। আমি জানি!

জ্যোতি : জানো? শুনে সুখী হলাম।

মানব : তরুণ জানতে চাইছে—আমি অর্থপূর্ণ কী করেছি? তাই না তরুণ?
জ্যোতি : কিছু করোনি।
মানব : আলবাৎ করেছি!
জ্যোতি : কী করেছো বলো?
মানব : আমার ভগ্নিপতি যখন থাইসিসে পড়ে চাকরিটা খোয়ালো—
জ্যোতি : থাইসিস্ নয়, প্লুরেসি।
মানব : —তখন আমি মাসের পর মাস তাদের সাহায্য করিনি? বিনোদিনীর গয়না বাঁধা দিয়ে দেনা করিনি তাদের জন্যে? এ কাজের অর্থ নেই?
জ্যোতি : যে অর্থ আমরা খুঁজছি, তা নেই।
মানব : তুমি—তুমি জানো—কতো বড়ো প্রলোভন সে সময়ে আমি দমন করেছিলাম? তুমি জানো?
জ্যোতি : জানি। তবু তুমিই বলো।
মানব : একটি কলমের আঁচড়ে তিনশো টাকা পেতে পারতাম! ধরা পড়বার কোনো ভয় ছিল না—
জ্যোতি : দু'শো—তিনশো নয়।
মানব : দু'শো আর তিনশোয় তফাৎ কী?
জ্যোতি : তফাৎ—একশো টাকা।
মানব : আমি বলছি—নীতিগত তফাৎ কী? সব দেনা শোধ হয়ে যেতো। গয়না ছাড়িয়ে আনতে পারতাম একদিনে। সংসারের—
জ্যোতি : ফর্দটা থাক এখন। কী করেছো সেইটা বলো।
মানব : করিনি!
জ্যোতি : আমিও তো সেই কথাই বলছি। করোনি।
মানব : করিনি মানে—অন্যায় করিনি! ঘুষ নিইনি! প্রলোভন জয় করেছি! মাসের পর মাস গলাব রক্ত উঠিয়ে খেটে তিলে তিলে দেনা শোধ করেছি, তবু—এটা কাজ নয়? এটা ঘটনা নয়? এর কোনো অর্থ নেই? এই সততা, এই বিবেকবুদ্ধি, এই নীতিবোধ—
তরুণ : মানব, তুমি আমাদের মূল প্রশ্নটাকেই বুঝে উঠতে পারছো না—
মানব : কে বলে পারছি না? একজন সৎ নিষ্পাপ খাঁটি মানুষের আদর্শ, স্বপ্ন, দুঃখ, বেদনা—
তরুণ : আদর্শ, স্বপ্ন, দুঃখ, বেদনা! (দর্শকদের) তাহলে দেখা যাচ্ছে—'ঘটনা' আর কিছু নেই।
মানব : আমি আপত্তি করছি। আরো অনেক ঘটনা—
জ্যোতি : আপত্তি করা আর পরচুলো চুলকোনো ছাড়া আর কিছু তোমার করবার নেই মানব?
মানব : আমি পরচুলো চুলকোচ্ছি না মোটেই। পরচুলোর নিচে মাথাটা চুলকোচ্ছি।
জ্যোতি : এটা কি রসিকতা করবার সময়?
মানব : কে রসিকতা করেছে?

তরুণ : আঃ থামো! তাহলে দেখা গেলো—ঘটনা আর কিছু নেই! কারণ আদর্শ, স্বপ্ন, দুঃখ, বেদনা—এগুলো ঘটনা নয়।

মানব : (তীব্র স্বরে) কিন্তু আমার সহপাঠীরা বলতো—মানব খুব ভালো ছেলে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সহকর্মীরা বলতো—মানবের আন্তরিকতার তুলনা হয় না। অফিসের সবাই বলতো—মানববাবু খাঁটি লোক। উপরওয়ালা বলতো—মানব নির্ভরযোগ্য। বন্ধুরা বলতো—মানবের মনটা খুব ভালো। এ সমস্ত এমনি এমনি হয়েছে? এর পেছনে কোনো ঘটনা ছিল না বলতে চাও?

তরুণ : মানব। উত্তেজিত হোয়ো না—

মানব : (আরও চিৎকারে) তোমরা শুধু কতকগুলো তারিখ আর শুকনো তথ্য তুলে ধরে, সেগুলোকে বিকৃত করে, হাস্যকর করে, আমার জীবনটাকে একটা নিষ্ঠুর ঠাট্টায় দাঁড় করাচ্ছো! এ আমি সহ্য করবো না, কিছুতেই সহ্য করবো না—

[জ্যোতি গিয়ে মানবকে কী বলতে গেলো, কিন্তু মানব রুখে দাঁড়ালো]

ঠাট্টা! বিদ্রূপ! ব্যঙ্গ! তোমাদের এখনকার জীবনে আর কিছু নেই! কোনো মূল্যবোধ নেই, কোনো নীতি নেই, আস্থা নেই, আশা নেই—শুধু ঠাট্টা! জীবনকে তোমরা ঠাট্টা করে দমিয়ে রাখতে চাও! মানুষকে তোমরা ঠাট্টা করে একটা তুচ্ছ অপরিণত জানোয়ারে দাঁড় করাতে চাও! আমাকে শিখণ্ডী খাড়া করে তোমরা মানুষকে, জীবনকে চরম অপমান করতে চাও বিশ্লেষণের নাম করে!

জ্যোতি : (বিরক্তভাবে) দর্শকদের হাততালি কুড়োবার চেষ্টা।

মানব : আমি পৃথিবীকে ঢেলে সাজাইনি, সমাজকে বদলাইনি, নতুন ধর্ম প্রচার করিনি, রাজ্যজয় করিনি, লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করবার অস্ত্র আবিষ্কার করিনি—কিন্তু আমি একজন সৎ, খাঁটি, শান্ত, জনপ্রিয় মানুষ ছিলাম! সেইটাই আমার জীবনের অর্থ, আমার জীবনের উদ্দেশ্য, আমার জীবনের মূল্য!

তরুণ : তোমার নয়, মানবের।

মানব : (চিৎকার করে) আমি মানব! আমি চিরকালের সর্বস্থানের মানব! আমি চিরমানব!

জ্যোতি : আহা বেশ। আরো বলো।

মানব : (জ্যোতির দিকে ঘুরে) যাই বলো, যতো ঠাট্টাই করো, মানুষ গুবরে পোকা হবে না! কিছুতেই না!

[মানব পাগলের মতো মঞ্চের পেছনদিকে পায়চারি করতে লাগলো]

তরুণ : বলেছিলাম! ঐ গুবরে পোকা বলেই তুমি সব নষ্ট করে দিলে—আজকেও!

জ্যোতি : আমারই দোষ। আমি জেনে নিইনি গোড়ায়—কোন্ কোন্ পোকা ওর অপছন্দ।

তরুণ : একে দিয়ে আর কিচ্ছু হবে না। একেবারে আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে।

জ্যোতি : ব্যাপারটাকে তাহলে আজকের মতো চুকিয়ে ফেলা যাক।

তরুণ : চোকাও।

জ্যোতি : হে চিরমানব—

মানব : (থেমে, চিৎকার করে) আবার ঠাট্টা! আবার ঠাট্টা!

জ্যোতি : না, ঠাট্টা নয়! খুব গম্ভীরভাবে তোমাকে একটা প্রশ্ন করছি—
মানব : তুমি দূর হয়ে যাও! তুমি—তুমি বেরিয়ে যাও!
জ্যোতি : তরুণ 'প্রস্থান' না লিখলে আমার বেরুবার উপায় নেই।
মানব : তবে চুপ করে থাকো! তরুণ! ওকে চুপ করতে বলো!
জ্যোতি : আমি তো চুপ করেই ছিলাম। তুমি ক্ষেপে গিয়ে তরুণকে থামিয়ে দিলে, তাই আমাকে কথা বলতে হচ্ছে।
মানব : (তরুণকে) না, ওকে চুপ করতে বলো! যা বলবার তুমি বলো।
তরুণ : তাহলে শান্ত হয়ে বোসো।
মানব : (করুণ আবেদনে) কিন্তু তরুণ, একটু—সামান্য একটু সহানুভূতি—
তরুণ : আমি চেষ্টা করবো—
মানব : আর সহৃদয়তা—
তরুণ : আর আন্তরিকতা, বুঝেছি। তুমি চুপ করে বোসো, আমি আর একবার চেষ্টা করে দেখি।

[ফটিক আর ছায়া ঢুকে দাঁড়িয়ে গেলো]

মানব : (পায়চারি করতে করতে) আমি বসতে পারছি না।
তরুণ : নিজের ওপর দখল যদি না রাখতে পারো—
মানব: নিজের ওপর সম্পূর্ণ দখল আছে আমার! নইলে হাঁটছি কী করে? ঘুরছি কী করে? ইচ্ছে করলে এক পায়ে দাঁড়াতে পারি। দেখতে চাও?
তরুণ : দেখবার জন্যে মরে যাচ্ছি, তা নয়।
মানব : এই দেখো! এই দেখো এক পায়ে দাঁড়িয়েছি। নিজের উপর দখল নেই বলতে চাও?
ফটিক : এবার অন্য পা-টা তোলো?
মানব : (ফটিকের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে) দুনিয়াতে এক ধরনের লোক আছে, যাদের জীবনের উদ্দেশ্য শুধু আমাদের মতো মানুষকে ঠাট্টা করা। কেন ঠাট্টা করে জানো? কারণ আমাদের এমন কিছু আছে, যা তারা বুঝতে পারে না।
জ্যোতি : কী আছে?
মানব : নীতি। বিশ্বাস। আদর্শ। (জ্যোতির দিকে ফিরে) তুমি কথা বোলো না। তোমার কোনো কথার জবাব দেবো না আমি!
ফটিক : জ্যোতি, আবার ক্ষেপিয়েছো ওকে?
জ্যোতি : আমি না। তরুণ।
তরুণ : আমি ক্ষেপিয়েছি?
জ্যোতি : না তো কে? সমস্ত ব্যাপারটা কার আইডিয়া, শুনি? মানবের জীবনের অর্থ নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল ছিল না, কারণ আমি বরাবরই জানি—কোনো অর্থ নেই।
মানব : আবার! আবার!
জ্যোতি : মানব বলতে আমি মানুষ বোঝাতে চেয়েছি।
মানব : মানুষের জীবনের কোনো অর্থ নেই?

জ্যোতি : না নেই। তুমি একটু আগে ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছিলে—

মানব : ষাঁড়!!

জ্যোতি : —মানব সৎ, মানব খাঁটি, মানব ভালো! কী করে জানলে? না—মানবের বন্ধুরা বলেছে, সহকর্মীরা বলেছে। অর্থাৎ মানবের চারপাশে মুষ্টিমেয় যে ক'টা মানুষ ছিল—একমাত্র তাদের চেতনায় মানবের অস্তিত্বের মূল্য, মানবের জীবনের অর্থ। এই প্রকাণ্ড বিশ্বে একটা গ্রাম, গোটা দু'তিন শহরের অংশ! এই সীমাহীন সময়ের মধ্যে কয়েকটা অকিঞ্চিৎকর বছর। মানুষ নামে এ চারশো কোটি প্রাণীর মধ্যে বিশ-পঞ্চাশ কি বড়ো জোর এককোটি প্রাণী—তারও কিছু মরে গেছে, কিছু শিগগিরই মরবে। এই তো মানব? না কী? মানবের জীবনের, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানবের জীবনের—এইটুকুই তো অর্থ?

তরুণ : কিন্তু সামগ্রিকভাবে মানবজীবন ধরলে—

জ্যোতি : এরই সমষ্টি। এরই যোগফল।

তরুণ : যোগ করলে কি যোগফলে গুণগত পরিবর্তন ঘটে না?

ছায়া : (ফটিককে) যাঃ! অঙ্ক শুরু হয়ে গেলো। যোগ, গুণ—

ফটিক : হ্যাঁ, ওর মধ্যে ঢুকে কাজ নেই।

জ্যোতি : (তরুণকে) তাই যদি মনে করো, তবে সমগ্রকে ধরে বিশ্লেষণ করো না কেন? একটা সাধারণ তুচ্ছ মানুষের একঘেয়ে অর্থহীন জীবন ঘেঁটে ঘেঁটে কেন এতোগুলো লোকের সময় নষ্ট করছো?

ফটিক : যদি মানুষের জীবনের কোনো অর্থ না থাকে, তবে মানুষের সময় নষ্টেরই বা কী অর্থ থাকতে পারে?

তরুণ : এই!! অর্থ আছে এই কারণে যে—যার সময় নষ্ট হচ্ছে সে এখনো বেঁচে! তার এখনো অস্তিত্ব আছে! যেমন মানবের ছিল একদিন।

মানব : নিশ্চয় ছিল। একশোবার ছিল! আমি প্রমাণ করে দেবো!

তরুণ : ও কী? তোমার হাতে কী ওটা?

[মানব কখন গিয়ে বাক্স থেকে একটা বাঁধানো খাতা নিয়ে এসেছে]

মানব : আমার ডায়রি। "সাতাশে জানুয়ারী, ১৯৩১"—

[মানব বিছানায় বসলো]

তরুণ : তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? রাখো ওটা।

মানব : আসল সত্য এইখানে আছে। শোনো—"সাতাশে জানুয়ারী, ১৯৩১, আজ সারা সন্ধ্যা গঙ্গার তীরে বসিয়াছিলাম। মনে কতো কথা উদয় হইতেছিল। শিশুকাল হইতে ভাবিয়া আসিতেছি—মানুষের মতো মানুষ হইতে হইবে। ভগবান আমাকে নিশ্চয়ই বিনা প্রয়োজনে সৃষ্টি করেন নাই। আমার জীবনে নিশ্চয়ই তাঁহার কোনো মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার আছে।"

ছায়া : সিদ্ধ?

মানব : "কী সেই উদ্দেশ্য? কতো ভাবিলাম। কূলকিনারা পাইলাম না।"

জ্যোতি : কূলকিনারা থাকলে তো পাবে?

মানব : দাঁড়াও, এটা না, এটা না! পরে আছে। এই যে—"চৌঠা ডিসেম্বর ১৯৪৫।

জীবনের একটি মহৎ উদ্দেশ্য আজ পূর্ণ হইয়াছে। ভগবানের অসীম করুণা। শেষ দেনাটুকু শোধ করিয়া আজ বিনোদিনীর গহনাগুলি ছাড়াইয়া—" না না, এটাও না! এই যে, পেয়েছি! "কাল রাত্রে এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিলাম। যেন এক দাড়িগোঁফবিশিষ্ট জটাধারী সন্ন্যাসী আসিয়া বলিতেছেন—মানব ওঠ্, তোর কাজ শেষ হয়েছে—তোর কাজ"—আমি—আমি—

[মানব হঠাৎ দু'হাতে মাথা রেখে কেঁদে উঠলো]

আমাকে কেউ বুঝতে পারলো না। কেউ না।

তরুণ : মানব, কান্না শুরু কোরো না! কান্না আমার সহ্য হয় না বলেছি তোমাকে! মানব!

মানব : (ক্রন্দনবিকৃতকণ্ঠে) আমি শুধু চাই—আমাকে তোমরা—বোঝো—

ফটিক : (কাছে এসে) শোনো, শোনো মানব। কবি বলে গেছেন—"তুমি কার কে তোমার বলে জীব কোরো না ক্রন্দন—"

মানব : (পূর্ববৎ) বেশ করবো—ক্রন্দন করবো—তোমার তাতে কী?

ফটিক : ছি মানব। কবি আরো বলেছেন—

মানব : সরে যাও তুমি! চলে যাও এখান থেকে—

ছায়া : ফটিকবাবু, ঐটা বলুন না? ঐটায় কাজ হবে বোধহয়—

ফটিক : কোন্‌টা?

ছায়া : ঐ যে—হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী

[ফটিক মানবকে গেয়ে শোনাতে শুরু করলো]

ফটিক : হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী-ঈ-ঈ-ঈ-

[ছায়াও ধরলো। দু'জনে দ্বৈত সঙ্গীত।]

ফটিক-ছায়া : নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব, ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভ জটিল—

[গানের আড়ালে মানবের গোঙানি শোনা গেলো। সব ছাপিয়ে তরুণের চিৎকার।]

তরুণ : ওঃ! ভগবান!

[ফটিক সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিয়ে আবৃত্তি শুরু করলো]

ফটিক : তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছো বারে বারে, দয়াহীন সংসারে—

ছায়া : তারা বলে গেলো ক্ষমা করো সবে, বলে গেলো ভালোবাসো—

ফটিক : অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো।

ছায়া : তারপর কী যেন?

ফটিক : (ভেবে) উদ্ধত যতো শাখার শিখরে রডোডেনড্রন গুচ্ছ।

তরুণ : (হুঙ্কার ছেড়ে) ফটিক!

ফটিক : (সঙ্গে সঙ্গে) নট আউট! (তারপর তরুণের মারমুখী চেহারা দেখে) না না, আউট আউট—

[সরে গেলো। ছায়াকেও ইশারায় ডেকে নিলো।]

তরুণ : মানব, তোমার কান্না থামবে?

মানব : (ফোঁপাতে ফোঁপাতে) আমাকে—শুধু একটু বোঝো—

তরুণ : আচ্ছা আচ্ছা, বুঝবো, কিন্তু তুমি—

মানব : ওদের—ওদের সবাইকে—বুঝিয়ে দাও—

তরুণ : কী বোঝাবো?

মানব : কেন আমি—কেন আমি বেঁচেছি—ওদের—বলো—বুঝিয়ে দাও।

তরুণ : আচ্ছা আচ্ছা, তুমি থামো। স্থির হয়ে বোসো। আমি আর একবার চেষ্টা করে দেখি।

ফটিক : চু-উ-উ-উ-উ—কপাটি-কপাটি-কপাটি—(তরুণের জ্বলন্ত চোখ দেখে) মোর! (সরে এলো)

[তরুণ দর্শকদের দিকে ফিরলো। মানব কিছুটা শান্ত। ফটিক বাক্স থেকে তোয়ালে এনে দিয়েছিলো, মানব চোখ মুছেছে। সকলের চোখ তরুণের দিকে। তরুণ চিন্তা করছে। এক মুহূর্ত সকলে চুপ, নিথর।]

তরুণ : এইখানে একটা লোক বসে আছে, যে একদিন—একদিন—

[হঠাৎ হাল ছেড়ে চড়া গলায় বলে চললো]

চুলোয় যাক। এইখানে বসে আছে একটা হাড়ের খাঁচায় খাড়া রাখা মাংসপিণ্ড! তার চুড়োয় আছে একটা ছোট্ট যন্ত্র, তার নাম মস্তিষ্ক। তার মধ্যে, সেই নরম ল্যাদলেদে আবর্জনার মধ্যে একটা ছোট্ট প্রাণী বসে আছে, একটা অন্ধ প্রাণী। মাছির বাচ্চার মতো—বসে আছে আর যন্ত্রণা ভোগ করছে। কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না, কেউ দেখতে চাইছে না, চাইবার কোনো কারণও নেই। সেই প্রাণীটির নাম—বেদনা; এবং কারো কাছে তার কোনো অর্থ নেই, মূল্য নেই, কিচ্ছু নেই! কারণ সেটা সব সময়েই—অন্য মানুষের বেদনা।

[মানবের সারা দেহ থর থর করে কাঁপছে। তরুণ ছাড়া বাকি সবাই তাকে ঘিরে ধরলো।]

ফটিক : আরে আরে, দেখো—এর কী হোলো দেখো—

ছায়া : মানববাবু, ওরকম করছেন কেন?

জ্যোতি : কী, হোলো কী ওর?

তরুণ : আমার এ না করে উপায় ছিল না। (ফিরে চেঁচিয়ে) মানব, তুমি থামবে?

ছায়া : সারা শরীর অতো কাঁপছে কেন?

ফটিক : ম্যালেরিয়া মনে হচ্ছে।

তরুণ : (চেঁচিয়ে) ওকে বিদায় করো!

ফটিক : ছিঃ তরুণ। দয়ামায়া থাকা উচিত। আমরা হাজার হোক মানুষ তো?

ছায়া : লবঙ্গ খেলে কোনো কাজ হবে মনে হয়? (ব্যাগ খুললো) সুপুরিও আছে।

জ্যোতি : মানব, কী লাগবে বলো।

ফটিক : হাওয়াটা ছাড়ো। জামার বোতামগুলো আলগা করে দাও।

ছায়া : একটু জল আনবো?

[মানব মুখ তুললো আস্তে আস্তে]

জ্যোতি : থামো থামো, কিছু বলবে বোধহয়—

ফটিক : বলো বলো, এখানে সবাই তোমার বন্ধু, সঙ্কোচ কোরো না—যা ইচ্ছে হয় বলো—

মানব : শ্ শ্—শ্ শ্ শ্—শালা!!
তরুণ : (চিৎকার করে) বলছি ওকে বিদায় করো!
ফটিক : আহা তরুণ, ব্যস্ত হোয়ো না—
ছায়া : ওকে এ অবস্থায় যেতে বলা যায় না—
জ্যোতি : কিন্তু কী হয়েছে না বললে আমরা কী করতে পারি?
ছায়া : আর একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন না?
জ্যোতি : লাভ কী? ঐ এক কথাই বলবে।
ফটিক : কিম্বা হয়তো আরো খারাপ কোনো কথা।
ছায়া : তবে কী করবেন?
ফটিক : জ্যোতি!
জ্যোতি : কী?
ফটিক : রোগটা ধরতে হবে।

[ফটিক বাক্স থেকে চশমা আর স্টেথোস্কোপ নিয়ে এলো। স্টেথোস্কোপটা জ্যোতি নিলো, চশমাটা ফটিক। দু'দিকে দাঁড়িয়ে রোগীকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। রোগী কেঁপে চললো।]

জ্যোতি : হুম্।
ফটিক : হুম্।

[ধীরে ধীরে প্রদক্ষিণ করতে লাগলো মানবকে]

জ্যোতি : এদিক থেকেও একইরকম দেখাচ্ছে।
ফটিক : আমিও সেটা লক্ষ্য করেছি।
জ্যোতি : বাঁচবে মনে হয়?
ফটিক : হুম্। চট করে কিছু বলাটা ঠিক নয়। আবো দেখতে হবে। তবে—চিরকাল বাঁচবার আশা খুব কম। আপনারও কি তাই মত?
জ্যোতি : আপনার সঙ্গে আমি যে ঠিক একমত নই, তা নয়। একটা নির্দিষ্ট সময়ের বেশি বাঁচা শক্ত।
ফটিক : ঠিক। তা ছাড়া—
জ্যোতি : তাছাড়া?
ফটিক : মরে যদি যায় একবার, তাহলে—(থেমে গেলো)
জ্যোতি : হ্যাঁ, বলুন?
ফটিক : তাহলে আর বাঁচা সম্ভব বলে—আমার তো অন্তত মনে হচ্ছে না।
জ্যোতি : বলছেন? তা হতে পারে। রোগটা কিছু ডায়াগ্নোজ্ করছেন?
ফটিক : করছি মনে হচ্ছে, তবে—আপনি আগে বলুন।
জ্যোতি : তা কি হয়? আপনি বয়োবৃদ্ধ। বয়সের দাম বুদ্ধির চেয়ে বেশি।
ফটিক : আমার মনে হচ্ছে—বাঁ কাঁধের কনভালশনটা ডান কাঁধের কনভালশনের থেকে যেন কিছুটা বেশি।
জ্যোতি : উঁ? হুম। অল্প। অল্প বেশি। এটা সিগ্নিফিকেন্ট মনে হয়?
ফটিক : বিনা কারণে কিছুই হয় না।

জ্যোতি : গুড লর্ড! বিনা কারণে কিছু হতে পারে কখনো?
ফটিক : ওয়েল?
জ্যোতি : ওয়েল—
[দু'জনে চোখ হাত মুখের ভঙ্গীতে পরামর্শ করলো। তারপর—]
ফটিক : আমার কলীগ্ আর আমি একমত যে—
জ্যোতি : এক সেকেন্ড! হেরৎজগ এফেক্টটার কথা ভেবেছেন?
ফটিক : মাই গড্! ঠিকই তো? এফেক্টটা প্রুভ্‌ড্। দু'শো বাইশটা শুয়োরের উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে—
জ্যোতি : কিন্তু একটা কথা।
ফটিক : কী বলুন তো?
জ্যোতি : শুয়োরের কাঁধ কাঁপা কি সম্ভব?
ফটিক : কেন?
জ্যোতি : শুয়োরের কাঁধ কি আছে?
ফটিক : যেটুকু আছে সেটুকুই কেঁপেছে। হেরৎজগ এফেক্ট নইলে হোলো কী করে?
জ্যোতি : অবশ্য, অবশ্য।
[দু'জনে আড়ালে পরামর্শ করতে গেলো। মানব দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে। তার কাঁধ কেঁপে চলেছে।]
তরুণ : ওদের অনেক সময় লাগবে মনে হচ্ছে।
ছায়া : হ্যাঁ। (একটু থেমে) তরুণবাবু, আপনি সিনেমা দেখেন?
তরুণ : (অবাক হয়ে) অ্যাঁ?
ছায়া : কী দেখেন? বাংলা না ইংরিজি?
তরুণ : কিছুই দেখি না বলতে গেলে।
ছায়া : ও (থেমে) হিন্দী?
তরুণ : কী হিন্দী?
ছায়া : হিন্দী সিনেমা?
তরুণ : না।
ছায়া : না দেখাই ভালো। বেশ এস্‌কেপিষ্ট অবশ্য, কিন্তু আসলে যাকে বলে—এন্টারটেনিং।
[দুই ডাক্তার ফিরে এলো]
জ্যোতি : আমার কলীগ্ আর আমি একমত।
তরুণ : মতটা কী?
জ্যোতি : রোগীর আত্মার জয়েন্টটা আল্‌গা হয়ে গেছে।
ছায়া : ই স্ স্ স্! তাহলে কী হবে?
ফটিক : অপারেশন ছাড়া গতি নেই।
জ্যোতি : ঘাবড়াবার বিশেষ কিছু নেই। মনে হয় ঠিক জায়গায় আবার বসিয়ে দেওয়া যাবে।
ফটিক : যদি আমাদের লাক্ ভালো হয়।

জ্যোতি : রোগীর লাক্ বলুন।

[দু'জনে আস্তিন গুটিয়ে এগোলো]

ছায়া : এইখানেই অপারেশন করবেন না কি?

জ্যোতি : তবে কোথায় করবো?

ছায়া : রক্ত দেখলেই যে আমার মাথা ঘোরে?

ফটিক : রক্ত পড়বে না।

জ্যোতি : রেডি?

ফটিক : রেডি।

জ্যোতি : (মানবকে) একটুও লাগবে না। কিচ্ছু ভয় নেই। রিল্যাক্স করুন। স্বপ্নগুলো আল্‌গা করে দিন। আদর্শটা অতো টান করে রাখবেন না। আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো ছেড়ে রাখুন। নীতিটায় অতো জোর দেবেন না। মূল্যবোধগুলো নরম থাকে যেন। সব টেনশনের ফলে হয়েছে। টেনশন আর প্রেসার।

ফটিক : টান আর চাপ। রিল্যাক্স করুন।

জ্যোতি : আপনার মনে হয় আপনি এ জগতে ঠিক খাপ খান না, তাই না? মনে হয় আপনার ভিতরে আলাদা কিছু আছে। এ সব টেনশনের জন্যে মনে হচ্ছে। আল্‌গা দিন, চাপ সরিয়ে দিন। আপনি একটা বিরাট যন্ত্রের ছোট্ট একটা স্ক্রু। ছোট্ট একটা স্ক্রু। সেই কথা ভাবুন। রি—ল্যাক্স।

[দু'জনে মানবকে আড়াল করে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে। তারপর উঠে আস্তিন খুলতে লাগলো।]

অপারেশন—

ফটিক : সাক্সেস্‌ফুল।

জ্যোতি : পেশেন্ট—

ফটিক : ভালো হয়ে গেছে।

[মানবকে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিলো]

ছায়া : (অল্প থেমে) এইখানেই কি শেষ?

[ফটিক জ্যোতি ডাক্তার নয় আর]

ফটিক : (সপ্রশংস দৃষ্টিতে ছায়ার দিকে চেয়ে, জ্যোতিকে) তবে? খুব বোকা নয় তো?

তরুণ : এবার তাহলে গুছিয়ে ফেলা যাক। কী বলো?

জ্যোতি : আমি তো সে কথা অনেকক্ষণ আগে থেকেই বলছি! আমার স্ত্রী ভাত নিয়ে বসে আছে।

ফটিক : ভাতটা একটু পরে রাঁধতে বলে দাও না কেন?

জ্যোতি : বোকার মতো কথা বোলো না ফটিক। পরে ভাত রাঁধলে বসে থাকবে কী নিয়ে?

তরুণ : নাও নাও। বক্তব্যগুলো সেরে নাও। জ্যোতি, তুমি শুরু করো।

জ্যোতি : আমি? বেশ। (একটু চিন্তা করে) একটা ছোট আয়না যদি মুখের সামনে ধরো, কী দেখবে? মিষ্টি হাসি, সুন্দর পাওডার মাখা চেহারা, টেরিকাটা চুল। এদিকে হয়তো আয়নার বাইরে, একই সময়ে, একটা হাত নির্বিকার চিত্তে পশ্চাৎ

চুলকোচ্ছে। এখন যদি একটা সত্যিকারের বড়ো আয়না নাও, যাতে সমস্তটাই দেখা যায়—কোনটাকে আসল ছবি বলবে? সুন্দর সাজানো চেহারাটাকে? না, হাতের অশালীন ভঙ্গীর চুলকোনোটাকে? দু'টোই তো সত্যি! আমাদের এই এক স্বজাতি ঘটনাচক্রে জন্মে গিয়েছিলো। একটা একঘেয়ে শোচনীয় জীবন পঞ্চাশ বছর ধরে বয়ে চলেছিলো, আবার সেই জীবনটাকেই সুন্দর করে সাজাতে চেষ্টা করেছিলো! তারপর একদিন মরে গেলো।

তরুণ : কোন চেহারাটা সত্যি ছিল তার?

জ্যোতি : কী আসে যায়? আজ তাকে টেনে এনে এই স্টেজের মাঝখানে খাড়া করা হয়েছে এক সন্ধের আমোদ জোগাতে—তার মরা হাড়ের বাদ্যি শুনিয়ে। আমরা কী করলাম?

ফটিক : হেসে খুন হলাম।

জ্যোতি : তাই তো হবার কথা! তা ছাড়া আর কী করার আছে? তার জীবনটা তো ঠাট্টাই ছিল। যেমন আমাদের জীবনও হবে একদিন। মরে গেলে।

ছায়া : কী সব বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি কথা!

তরুণ : ফটিক, তুমি বলো।

ফটিক : (চিন্তা করে) পল্টু একদিন চায়ের দোকানে বসে বন্ধুদের এক মজার গল্প শোনাচ্ছে। ভীষণ হাসির গল্প। ঠিক সেইসময়ে বিল্টু পাশের বাড়ির সাততলা ছাত থেকে লাফিয়ে পড়বার তাল করছে। পল্টু গল্প বলতে বলতে হেসে খুন। একটু দূরে শব্দ—ধপ্‌-প্লাৎ। পল্টু শুনতে পেলো না। গল্পের আসল হাসিটা সেই সময়ে। অ্যাম্বুলেন্স এলো, বিল্টুর থেঁৎলানো দেহটাকে তুলে নিলো, চায়ের দোকানে গল্প শেষ করে পল্টু তখন হেসে গড়িয়ে পড়েছে।

ছায়া : তা, পল্টু তো জানে না যে—

ফটিক : ঠিক তাই। আমরা জানি না। তাই হাসতে পারি।

জ্যোতি : (তরুণকে) এবার তুমি।

তরুণ : (ধীরে ধীরে) ১৯১২ সালের ২৫শে জুলাই একটা লোক জন্মেছিলো। একটা আশ্চর্য ঘটনা। ১৯৬২ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর লোকটা মরেছিলো। আরো আশ্চর্য ঘটনা। নিমতলা শ্মশানের পুরোনো খাতা ঘাঁটলে তার নামটা হয়তো খুঁজে পেতে পারো। সব থেকে আশ্চর্য ঘটনা কী জানো? এই লোকটা, ঠিক আমাদের মতো, নিজেকে সত্যি ভাবতো, জ্যান্ত ভাবতো।

[এক মুহূর্ত স্তব্ধতা]

জ্যোতি : (ছায়াকে) আপনার কিছু বক্তব্য আছে?

ছায়া : যাই বলুন, আমাদের কথাই যদি ওঠে, আমরা কিন্তু বেঁচে আছি।

তরুণ : ঠিক।

জ্যোতি : ঠিক।

ফটিক : ঠিক।

জ্যোতি : (অল্প পরে দর্শকদের) তাহলে—এই হোলো ব্যাপার।

ফটিক : জ্যোতি, এসো।

[জ্যোতি আর ফটিক মানবের দেহ চ্যাংদোলা করে তুলে বেরিয়ে গেলো। তরুণ মানবের ডায়রিটা নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছে।]

ছায়া : আমি এখন যেতে পারি?

তরুণ : অ্যাঁ? হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। নাটক শেষ হয়ে গেছে।

[ছায়া চলে গেলো। তরুণ আরো দু'একটা পাতা উল্টে হঠাৎ সশব্দে ডায়রিটা বন্ধ করে বিছানায় ফেলে কোনোদিকে না তাকিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলো। মঞ্চের আলো ধীরে ধীরে নিভে গেলো।]

———

ত্রিংশ শতাব্দী

মুখবন্ধ

১৯৬৬ সালে পূর্ব নাইজেরিয়ার রাজধানী এনুগু শহরে চাকরি করার সময়ে লাইব্রেরি থেকে একটা বই এনে পড়েছিলাম। বইটির নাম—Formula for Death : $E=MC^2$, লেখক একজন ফরাসি সাংবাদিক, তিনি আমেরিকা আর জাপান ঘুরে পারমাণবিক বোমা সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে বইটি রচনা করেছিলেন, তারই ইংরিজি অনুবাদ এটা।

বইটি আমায় প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিলো, অনুবাদ করার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু অনুবাদ আমার আসে না, তাই মঞ্চায়নের কথা না ভেবে নাটকের চেহারাতেই দাঁড় করিয়েছিলাম। তখন প্রচলিত মঞ্চে অভিনয় করতাম, নাটকের চেহারা আর দৈর্ঘ্য সেই অনুযায়ী ছিল। 'বহুরূপী' পত্রিকায় সেটা প্রকাশিত হয়েছিলো।

আমরা প্রথম অভিনয় করেছিলাম অঙ্গন মঞ্চে, ফলে যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। কিছু ভূমিকা বাদ গেছে। সেই সংক্ষিপ্ত রূপটাই এখানে প্রকাশিত হোলো।

একটা আশ্চর্য কাকতালীয় ব্যাপারে আমাদের প্রথম অভিনয় হয়েছিলো ১৯৭৪ সালের ৬ই অগাস্ট, হিরোশিমায় বোমা ফেলার দিন।

এখানে উল্লেখযোগ্য-নাটকের শেষ ক'টা পংক্তি নিয়েছি জঁ-পল সার্ত্র-এর একটি নাটক থেকে।

ত্রিংশ শতাব্দী

চরিত্রলিপি

(মঞ্চাবতরণ অনুযায়ী)

শরৎ চৌধুরী	বাংলার অধ্যাপক
সাধন ব্যানার্জি	পদার্থবিদ, শরতের বন্ধু
টমাস ফেরেবী	আমেরিকান বিমানবাহিনীর লেফ্‌টেনান্ট কর্নেল
মিসেস ইথারলী	আমেরিকান বিমানবাহিনীর পাইলট মেজর ইথারলীর স্ত্রী
ডক্টর আরাতা ওসাদা	হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
ডক্টর মিচিহিকো হাচিইয়া	জাপানী চিকিৎসক
এনেমন কাওয়াগুচি	জাপানী এঞ্জিনীয়ার
সাঞ্জিরো মাসুদা	জাপানী জাহাজের নাবিক
প্রফেসর অ্যালবার্ট আইনস্টাইন	বৈজ্ঞানিক

[অভিনেতারা দর্শকের আসনে বা আসনের কাছাকাছি ছড়িয়ে বসে আছে। শরতের ভূমিকার অভিনেতা এলো নাট্যগোষ্ঠীর মুখপাত্র হয়ে। ঘরের এক কোণে একটি কাঠগড়ার মতো রেলিং দেওয়া প্লাটফর্ম। পাশে দর্শকের সারির পিছনে একটি অলিন্দ--সেটাও অভিনয়ক্ষেত্র।]

শরৎ : আজ...,* ... আজ থেকে... বছর আগে মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় আরম্ভ হয়েছিলো। কেউ বলে সে অধ্যায় আলোর, কেউ বলে অন্ধকারের। আজ থেকে... বছব আগে, ১৯৪৫ সালের ৬ই অগাস্ট, মানুষের তৈরি পারমাণবিক বোমায় মানুষের শহর হিরোশিমা ধ্বংস হয়েছিলো।

সেই ঘটনার এতো বছর পরে আজ আমরা 'ত্রিংশ শতাব্দী' নাটক উপস্থিত করছি। এ নাটকের মূল প্রশ্ন—আমেরিকার বোমায় জাপানের শহর হিরোশিমা ধ্বংস হয়েছে, এ ব্যাপারে আমাদের মতো সাধারণ ভারতবাসীর কোনো দায়িত্ব আছে কি? আমরা তো যুদ্ধও বাধাইনি, বোমাও ফেলিনি!

১৯৬৬ সালে লেখা হয়েছিলো এই নাটক। তখনকার থেকে প্রশ্নটা অনেক তীব্র হয়ে উঠেছে ১৯৭৪ সালের ১৮ই মে, যেদিন রাজস্থানের মরুগর্ভে ভারতবর্ষের অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হোলো।

আবার এ বছর ১৯৯৮ এর ১১ ও ১৩ই মে পরপর পাঁচটি অ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হোলো একই জায়গায়। তাই মনে হয়—আজও এ নাটকের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব কমেনি, বরং বেড়েছে।

এ নাটক সুন্দর নয়। সুন্দরভাবে এ নাটক কী করে করা যায়, আমরা জানি না। আমাদের সে ইচ্ছাও নেই। চরিত্র অনুযায়ী চেহারা, বয়স, সাজসজ্জা—কিছুই আমরা ব্যবহার করিনি। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হোলো—নাটকের মূল প্রশ্নটাকে আপনাদের সামনে তুলে ধরা। অভিনয়ের দুর্বলতা বা প্রযোজনার ত্রুটি মার্জনা করতে বলছি না আপনাদের, কিন্তু তার জন্য মূল প্রশ্নটা থেকে যেন দৃষ্টি সরে না যায়, এইটুকু অনুরোধ।

[শরৎ গেলো কাঠগড়ায়, পিছন ফিরে দাঁড়ালো। হাতের মুঠোটা মাইক হয়ে মুখের সামনে।]

হ্যালো টেস্টিং। টেস্টিং। ওয়ান টু থ্রি ফোর—শুনতে পাচ্ছেন? আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো হ্যালো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স—

[সাধন এসেছে। দর্শকদের উদ্দেশ করে কথা বলছে।]

সাধন : শরৎ চৌধুরী। বাংলা সাহিত্যের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। বর্তমানে উন্মাদ।

শরৎ : হ্যালো হ্যালো ওয়ান টু থ্রি ফোর—ও. কে.?

সাধন : অধ্যাপক। সদাগরী অফিসের কেরানিও হতে পারতো। এঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার—

অভিনয়ের দিনের তারিখ

তাও। মোট কথা ভদ্রলোক! বাঙালি ভদ্রসন্তান। আপনার মতো। আমার মতো।

শরৎ : ত্রিংশ শতাব্দী, শোনো। শোনো! আমার কথা শোনো। বিংশ শতাব্দীর কথা শোনো। ত্রিংশ শতাব্দীর মানুষ—আমার কথা শোনো। বিংশ শতাব্দীর মানুষের কথা শোনো।

সাধন : আমি বিজ্ঞানের ছাত্র—ফিজিসিস্ট। বাংলার অধ্যাপকও হতে পারতাম। শরতের মতো। আপনার মতো। বাঙালি ভদ্রসন্তান।

শরৎ : আমার নাম শরৎ চৌধুরী। আমি বিংশ শতাব্দীর মানুষ।

সাধন : আমার নাম সাধন ব্যানার্জি। আমি বিংশ শতাব্দীর মানুষ। আমি উন্মাদ নই। এখনো নই। কোনোদিনই বোধ হয় হবো না।

শরৎ : আমি বিংশ শতাব্দীর মানুষ। আমি আসামী। আমাকে তোমরা কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছো। বিংশ শতাব্দীকে তোমরা কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছো।

সাধন : আপনাদের মধ্যে কেউ কি উন্মাদ আছেন? শরতের মতো? বোধ হয় নেই আমিও উন্মাদ নই। উন্মাদ হওয়া অতো সোজা নয়।

শরৎ : বিংশ শতাব্দী অভিযুক্ত। আমি বিংশ শতাব্দী।

সাধন : পাঁচ বছর আগে শরৎ উন্মাদ হয়েছে। আমি ছিলাম সেদিন। সাত বছর বিদেশে কাটিয়ে আমি সেদিন এসেছিলাম। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে!

শরৎ : শোনো। ত্রিংশ শতাব্দী শোনো। আমি নির্দোষ। আমার শতাব্দী নির্দোষ! আমার এই বিকৃত বিকলাঙ্গ কুৎসিৎ শতাব্দী নির্দোষ!

সাধন : কী হয়েছিলো সেদিন? পাঁচ বছর আগের সেই রাতে কী হয়েছিলো? জানেন আপনারা? জানেন কেউ? জানতে চান?

শরৎ : ত্রিংশ শতাব্দীর মানুষ! সুন্দর মানুষ! সুন্দর শতাব্দীর সুন্দর মানুষ!

সাধন : বিচার করেছিলাম। শরৎ আর আমি।

শরৎ : আমার বিকৃত বিকলাঙ্গ চেহারা দেখে আমাকে বিচার কোরো না!

সাধন : বিচার। মানুষের বিচার। শরৎ অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ জোগাড় করেছিলো।

শরৎ : আমার শতাব্দীরও সুন্দর হতে পারতো, যদি না—

সাধন : (শরৎকে) শরৎ!

[শরৎ থেমে গেলো। হাত নেমে গেলো তার।]

বিচার। পাঁচ বছর আগের গল্প। আজকের গল্প। শরৎ চৌধুরীর উন্মাদ হবার গল্প। শুনতে চান আপনারা? জানতে চান? (ডেকে) তোমরা আছো?

[কোরাস মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিচ্ছে]

কোরাস : আমরা আছি।

সাধন : তোমরা সাক্ষী?

কোরাস : আমরা সাক্ষী।

সাধন : কিসের সাক্ষী?

কোরাস : হিরোশিমার। নাগাসাকির। বিকিনির। সারা পৃথিবীর। বিংশ শতাব্দীর।

[শরৎ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। উন্মাদ নয় সে এখন। পাঁচ বছর আগের শরৎ।]

সাধন : শরৎ!

শরৎ : অবাক হয়ে গেলি?

সাধন : অবাক হওয়ারই তো কথা।

শরৎ : কেন?

সাধন : তোর আমার মতো বঙ্গসন্তানের তো অ্যাটামবোমা নিয়ে মাথা ঘামাবার কথা নয়?

শরৎ : মাথা ঘামাবার কথা। তবে ঘামায় না বেশির ভাগ বাঙালি।

সাধন : তুই ঘামাচ্ছিস কেন?

শরৎ : বলছি। তার আগে একটা কথা বল তো?

সাধন : কী কথা?

শরৎ : আমেরিকার লোক জাপানের হিরোশিমায় অ্যাটমবোমা ফেলেছে এতে তোর আমার কি কোনো দায়িত্ব নেই?

সাধন : কী দায়িত্ব বল?

শরৎ : যতো পাপ সব আমেরিকার—বোমা ফেলেছে বলে? যত পাপ সব জাপানের—যুদ্ধ বাধিয়েছে বলে?

সাধন : বলে যা।

শরৎ : আমেরিকার সব মানুষ দায়ী নয়, দায়ী কিছু মানুষ। জাপানেরও তাই। ভারতবর্ষেরও কিছু লোক অবস্থাগতিকে ঐ একই পাপ করবে না—এ কথা কেউ বলতে পাবে?

সাধন : করবেই—এ কথা বলা বেশি সহজ।

শরৎ : তাহলে?

সাধন : অর্থাৎ দায়িত্বটা—মানুষের?

শরৎ : হ্যাঁ, মানুষের।

সাধন : তুই মানুষের বিচার করতে চাস?

শরৎ : বিচার? কী করে করবো? আমিও তো মানুষ।

সাধন : তুই তো কোনদিন অ্যাটমবোমা ফেলবি না?

শরৎ : কে বলতে পারে? তুই ফিজিসিস্ট। অবস্থাগতিকে তুই কোনোদিন অ্যাটমবোমা তৈরি করতে সাহায্য করবি না—জোর করে বলতে পারিস?

সাধন : না, পারি না।

শরৎ : আমি মানুষের বিচার করছি না। কিন্তু মানুষকে কাঠগড়ায় খাড়া করছি। সে মানুষ আমি নিজেই! আমিই আসামী, আমিই উকিল, আমিই সাক্ষী, আমিই জাজ, আমিই জুরী। আমি। তুই। আরো অনেকে। সবাই। সব মানুষ।

[গিয়ে কাল্পনিক কাগজপত্র নিয়ে এলো কাঠগড়ার কাছ থেকে]

এই যে—এই সব। দলিল, প্রমাণ, এভিডেন্স। হিরোশিমা। নাগাসাকি। বিকিনি। আসলে সারা পৃথিবী। আমি হিরোশিমা দিয়ে শুরু করছি।

সাধন : কতোদূর এগিয়েছিস?

শরৎ : বেশি নয়, তবে যথেষ্ট। যদি চাস, আজ রাত্রেই বিচার শুরু করা যায়। আমি একা পেরে উঠছিলাম না।

সাধন : কেন?

শরৎ : (একটু থেমে) ভয়ে।

সাধন : কিসের ভয়?

শরৎ : একেব পর এক যখন সাক্ষ্য আসবে, প্রমাণ আসবে, তখন যদি দাঁড়াতে না পারি? যদি—(থেমে গেল)

সাধন : যদি—কী?

শরৎ : কিছু না। তুই রাজি আছিস?

সাধন : তুই যেন প্ল্যানচেটেব প্রস্তাব করছিস মনে হচ্ছে?

শরৎ : প্ল্যানচেটই তো। মানুষ নামানো কি ভূত নামানোর থেকে সোজা ভেবেছিস? কী? রাজি?

সাধন : তোকে দেখে মনে হচ্ছে—তুই নিজেকে কাউন্সেল ফর দ্য প্রসিকিউশন করে ফেলেছিস একেবারে।

শবৎ : হয় তো। তুই ডিফেন্সের কাউন্সেল থাকিস।

সাধন : তা হবে না। ডিফেন্সের দায়িত্ব তোর নেই? শুধু প্রসিকিউটই করবি?

শরৎ : (একটু থেমে) আমি ডিফেন্সের পক্ষে কিছু খুঁজে পাই না।

সাধন : শরৎ!

শরৎ : জানি। ও রকম ধমক আমিও নিজেকে দিয়ে থাকি প্রায়ই। ভয় করিস না।

সাধন : তুই যদি বলিস ভয়ের কিছু নেই, তা হলে ভয় করবো না।

শরৎ : তা বলতে পারবো না। শুধু বলতে পারি—ভয় করে কোনো লাভ হবে না।

সাধন : (একটু থেমে) আচ্ছা। ভয় করবো না।

[শরৎ চলে গেলো কাঠগড়ায়, তার আগের ভঙ্গীতে দাঁড়ালো।]

(দর্শকদের) ভয় করাই ভালো ছিল বোধ হয় আমাদের। শরৎ হয় তো উন্মাদ হোতো না তাহলে। অন্তত সেই রাত্রে হোতো না। আপনাদের কারো ভয় আছে? এ গল্প শুনতে ভয় আছে? ভয়ের কিছু নেই বোধ হয়, কারণ আমি উন্মাদ হই নি। আপনারাও হবেন না।

শরৎ : (নিচু গলায়) হ্যালো টেস্টিং, টেস্টিং, ওয়ান টু থ্রি ফোর—

[সাধন শরতের কথার উপরেই বলে চলেছে। শরতের গলা ক্রমে চড়ছে, সাধনেরও।]

সাধন : **শরৎ পাগল হয়েছে। কিন্তু আমি হই নি। হাজার হাজার লাখ লাখ কোটি কোটি লোক পাগল হয় নি। আপনাদের ভয় নেই—আপনারা থাকতে পারেন। দেখতে পারেন! শুনতে পারেন! ভয় নেই—ভয় নেই—আপনারা কেউ উন্মাদ হবেন না। উন্মাদ হওয়া অতো সোজা নয়। আমরা যদি সবাই উন্মাদ হতে পারতাম, তাহলে এই বিকৃত বিকলাঙ্গ কুৎসিৎ শতাব্দী—**

সাধন, শরৎ : **(সমস্বরে) এই বিকৃত বিকলাঙ্গ কুৎসিৎ শতাব্দী। এই বিকৃত বিকলাঙ্গ কুৎসিৎ**

শতাব্দী। এই বিকৃত বিকলাঙ্গ কুৎসিৎ শতাব্দী। এই বিকৃত বিকলাঙ্গ কুৎসিৎ শতাব্দী-ঈঈঈ।

[হঠাৎ আলো নিভে গেলো, অথবা সবাই একসঙ্গে উপুড় হয়ে পড়লো। আলো জ্বললে শরৎ আর সাধন মুখোমুখি। সাধন বসে, শরৎ দাঁড়িয়ে।]

সাধন : তোর কাগজপত্র তো সব এলোমেলো দেখছি। কোথা থেকে শুরু করবি?

শরৎ : কী আসে যায়? এক জায়গা থেকে শুরু করলেই হোলো।

সাধন : সেটা কী রকম হবে?

শরৎ : ছউই আগস্ট ১৯৪৫ সকাল আটটা বেজে পনেরো মিনিট—একটা মুহূর্ত! সেই মুহূর্তে অনেক কিছু আরম্ভ, অনেক কিছু শেষ। যা আরম্ভ তা এখনো শেষ হয় নি। যা শেষ তা আরম্ভ হয়েছে মানব সভ্যতার জন্মদিনে। কী আসে যায়—কোথা থেকে শুরু করলাম তাতে?

সাধন : তবু একটা সঙ্গতি—

শরৎ : সঙ্গতি? হিরোশিমার?

সাধন : আচ্ছা বেশ, তাই হোক। (একটা কাগজ নিয়ে) টিনিয়ন দ্বীপ।

শরৎ : টিনিয়ন দ্বীপ। প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানা অ্যাটল্‌স্‌-এর মাঝখানে একটি ছোট্ট দ্বীপ।

সাধন : (কাগজ দেখে) আমেরিকান বেস্‌।

শরৎ : হ্যাঁ, যুদ্ধশিবির। এয়ার-কন্ডিশন করা ব্যারাকস্‌, কলের জল, সিনেমা, সুইমিং পুল, হাসপাতাল, খেলার মাঠ— এক কথায় তিরিশ হাজার লোকের এক আধুনিক আমেরিকান শহর। তৈরি করেছিলো সমুদ্রের মৌমাছিরা।

সাধন : সে আবার কী?

শরৎ : সী বীজ্‌। যুক্তরাষ্ট্র নৌবহরের কনস্ট্রাকশন ব্যাটালিয়নের নাম।

সাধন : মরুক গে।

শরৎ : হ্যাঁ, মরুক গে। কে তৈরি করেছে সেটা আসল কথা নয়। আসল কথা—একটা আওয়াজ। একটা একঘেয়ে ঘরঘরে আওয়াজ—প্রতিদিন, প্রতিরাত্রে।

সাধন : কিসের আওয়াজ?

শরৎ : আমেরিকান বোমারু প্লেন। হয় উঠছে, না হয় নামছে। বিরাম নেই। প্রত্যেকের অভ্যেস হয়ে গেছে সেই একঘেয়ে ঘরঘরে আওয়াজ। যেন টিনিয়ন দ্বীপ ঐ আওয়াজ নিয়েই জন্মেছে।

সাধন : তারপর?

শরৎ : তারপর হঠাৎ একদিন—আওয়াজ বন্ধ। টিনিয়নের আকাশ নিস্তব্ধ বহু মাস পরে। প্রত্যেকের কানে নিস্তব্ধতার ভার। কোনো প্লেন উড়ছে না, কন্ট্রোল টাওয়ার বন্ধ করে দিয়েছে সব যাত্রা। অনেকক্ষণ পরে অনেক দূর থেকে আবার ভেসে এলো—সেই পরিচিত ঘরঘর ধ্বনি। হাজার হাজার উৎসুক চোখ ছুঁয়ে একখানি প্রকাণ্ড নিঃসঙ্গ উড়োজাহাজ এসে নামলো বিমানবন্দরে। একখানি প্রকাণ্ড হলদে রঙের বাক্স নামলো উড়োজাহাজের গর্ভ থেকে।

সাধন : কাব্য করছিস মনে হচ্ছে।

শরৎ : ঠিক। বাংলার মাস্টারের দোষ। কাব্যের কিছু নেই। ঐ হলদে বাক্সটায় ছিল দ্বিতীয় পারমাণবিক বোমা। প্রথমটা এসেছিলো দিনকতক আগে—যুদ্ধজাহাজে।

সাধন : (কাগজ দেখে) ইউরেনিয়াম টু-থার্টিফাইভ?

শরৎ : ইউরেনিয়াম টু-থার্টিফাইভ।

সাধন : (কাগজ পড়ে) বি-টোয়েন্টিনাইন। টোয়েন্টিয়েথ্ এয়ারফোর্স। গ্রুপ ফাইভ ও নাইন। লেফ্টেনান্ট কর্নেল পল টিবেট্স্। নেভী ক্যাপ্টেন উইলিয়াম পার্সন্স্। মেজর টমাস ফেরেবী। মেজর ক্লড ইথারলী। গ্রুপ ক্যাপ্টেন চেশায়ার, মেজর সুইনি, মেজর হপকিন্স্—কে তোমার প্রথম সাক্ষী।

শরৎ : ফেরেবী!

সাধন : ডাকো।

শরৎ : (ডেকে) লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফেরেবী!

[ফেরেবী এসে কাঠগড়ায় দাঁড়ালো। দাঁড়াবার ভঙ্গী ঋজু, স্থির, সামরিক। কণ্ঠস্বর ভারি, সুরের বাহুল্যবর্জিত, উচ্চারণ স্পষ্ট, দ্বিধাহীন।]

নাম?

ফেরেবী : টমাস ফেরেবী?

শরৎ : পরিবার?

ফেরেবী : স্ত্রী, চারটি ছেলেমেয়ে।

শরৎ : ১৯৪৫ সালের আগস্টে আপনি কোথায় ছিলেন?

ফেরেবী : টিনিয়ন।

শরৎ : তখন লেফটেন্যান্ট কর্নেল হয়েছিলেন?

ফেরেবী : না। মেজর।

শরৎ : হিরোশিমার জন্যে প্রোমোশন?

ফেরেবী : (জোর দিয়ে) হিরোশিমার 'পরে' প্রোমোশন।

শরৎ : আচ্ছা, 'পরের' কথা এখন থাক। আপনাকে মেজর ফেরেবী বলে সম্বোধন করলে আপত্তি আছে?

ফেরেবী : (কাঁধ ঝাঁকিয়ে) টমাসও বলতে পারেন।

শরৎ : টমাস? না থাক। মেজর ফেরেবী, ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি আপনাকে একটা বিশেষ কাজের ভার দেওয়া হয়েছিলো। ঠিক কি না?

ফেরেবী : হ্যাঁ, ঠিক।

শরৎ : অ্যাটম বমের সম্ভাব্য লক্ষ্যস্থল নির্বাচন করবার ভার?

ফেরেবী : অ্যাটম বমের অস্তিত্ব তখন আমি জানতাম না।

শরৎ : তবে কি সাধারণ বিমান আক্রমণের লক্ষ্যস্থল খুঁজতে বলা হয়েছিলো আপনাকে?

ফেরেবী : জানতাম এটা নতুন ধরনের বোমা। অ্যাটম বম্ বলে জানতাম না।

সাধন : আপনাকে বিশেষ করে এ কাজের ভার দেওয়া হয়েছিলো কেন মেজর ফেরেবী?

ফেরেবী : জানি না।

শরৎ : আমি জানি। সেরা সেরা চল্লিশ জনকে বাছাই করে বার করা হয়েছিলো এয়ারফোর্স থেকে। মেজর ফেরেবী তাদের একজন। শুধু তাই নয়, এক হিসেবে তাদের এক নম্বর—জাপানের আকাশ এতো ভালো করে আর কেউ চিনতো না। তাই না মেজর?

ফেরেবী : (কাঁধ ঝাঁকিয়ে) হতে পারে।

শরৎ : এই লক্ষ্যস্থল খুঁজে বার করতে কতোবার জাপানের আকাশে গিয়েছেন আপনি?

ফেরেবী : অনেকবার। প্রতি সপ্তাহে একবার কি দু'বার করে।

শরৎ : ক'টা লক্ষ্যস্থল খুঁজে বার করেছিলেন?

ফেরেবী : অন্তত দশটা।

শরৎ : কীরকম লক্ষ্যস্থল আপনাকে খুঁজতে বলা হয়েছিলো?

ফেরেবী : যেখানে বোমার কার্যকরী ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি বোঝা যাবে।

শরৎ : অর্থাৎ যেখানে ধ্বংসের পরিমাণটা সবচেয়ে বেশি হবে?

ফেরেবী : তা বলা যায়।

শরৎ : এবং সেইজন্যেই এমন সব শহর বাছতে হয়েছিলো, যা তখন পর্যন্ত বিমান আক্রমণে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। তাই না?

ফেরেবী : হ্যাঁ।

শরৎ : টিনিয়ন থেকে তার আগে বোমারু বাহিনীর ক'টা অভিযান হয়েছে জাপানে বলতে পারেন?

ফেরেবী : প্রায় পনেরো হাজার।

শরৎ : কতো টন বোমা ফেলা হয়েছে এই পনেরো হাজার অভিযানে?

ফেরেবী : এক লক্ষ টনের মতো।

শরৎ : জাপানের ক'টা শহরে?

ফেরেবী : সত্তরটা।

শরৎ : তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে—যে সব শহরের সামরিক মূল্য ছিল, তার সব ক'টাই বোমায় বিধ্বস্ত সে সময়ে?

ফেরেবী : মোটামুটি।

শরৎ : তাহলে আপনার বাছাই করা শহরগুলোর আর যাই থাক, সামরিক কোনো গুরুত্ব ছিল না?

ফেরেবী : তা বলা যায় না।

শরৎ : অন্য শহরের তুলনায় কম?

ফেরেবী : (থেমে) হ্যাঁ।

শরৎ : অর্থাৎ সে সমস্ত শহর সাধারণ নাগরিকে বোঝাই বেসামরিক শহর, তাই না? বলুন?

ফেরেবী : (একগুঁয়ে স্বরে) যে সব শহরে বেশি বোমা পড়ে নি তাই বাছতে বলা হয়েছিলো আমাকে।

শরৎ : আচ্ছা, থাক ও কথা এখন। আপনার বাছাই করা চারটে শহরে সাধারণ বোমারু আক্রমণ একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো। এ কথা কি সত্যি?

ফেরেবী : হ্যাঁ।

শরৎ : অর্থাৎ তাদের জীইয়ে রাখা হয়েছিলো?

ফেরেবী : তার মানে?

শরৎ : অ্যাটম বোমার মাহাত্ম্যের পুরো প্রমাণ পেতে গেলে খুচরো ধ্বংস বন্ধ করতে হয়, তাই না?

ফেরেবী : আমাকে কি এ প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

শরৎ : দরকার নেই। টিনিয়নে যখন অ্যাটম বোমা এসে পৌঁছোলো, তখন ক'জন জানলো সে কথা?

ফেরেবী : মেরে কেটে পঞ্চাশজন।

শরৎ : বাকি কেউ জানতো না?

ফেরেবী : নতুন ধরনের বোমা তা আন্দাজ করেছে হয় তো।

শরৎ : আপনি কতোটা জেনেছিলেন?

ফেরেবী : আমি জেনেছিলাম—এর একটা ইউরেনিয়াম টু-থার্টিফাইভ, অন্যটা প্লুটোনিয়াম টু-থার্টিনাইন।

শরৎ : ইউরেনিয়াম টু-থার্টিফাইভ বলতে কী বোঝায়—তখন জানতেন?

ফেরেবী : অত্যন্ত শক্তিশালী বলে জানতাম। কতোটা শক্তিশালী বুঝি নি।

শরৎ : কবে বুঝলেন?

ফেরেবী : ছউই আগস্ট সকালে।

শরৎ : কোথায়?

ফেরেবী : হিরোশিমায়।

শরৎ : হিরোশিমা। ছউই আগস্ট, ১৯৪৫। মেজর ফেরেবী, আপনার অভিযানের একটা বর্ণনা দিন।

ফেরেবী : ৫ই আগস্ট হুকুম আসে—টোয়েন্টিয়েথ এয়ারফোর্সের গ্রুপ ফাইভ ও নাইন হিরোশিমা, কোকুরা, নিইগাটা আর নাগাসাকি—এই চারটে শহরের যে কোনো একটায় বোমা ফেলবে, অবস্থা বুঝে। তিনটে বি-টোয়েন্টিনাইন প্লেন রাত বারোটার একটু পরে রওনা হবে। লীড প্লেন, যেটায় বোমা থাকবে, তার পাইলট থাকবেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল পল টিবেট্‌স্‌।

শরৎ : এক সেকেন্ড। সে প্লেনটার নাম কী ছিল জানেন?

ফেরেবী : সবাই জানে।

শরৎ : তবু বলুন।

ফেরেবী : ইনোলা গে।

শরৎ : ও নাম কেন হোলো, তা কিন্তু সবাই জানে না। আপনি নিশ্চই জানেন?

ফেরেবী : জানি।

শরৎ : কে দিয়েছিলেন ঐ নাম?

ফেরেবী : পল টিবেট্‌স্‌।

শরৎ : কোথায় পেলেন তিনি ও নাম?

ফেরেবী : (একটু থেমে) পলের মায়ের নাম ইনোলা গে টিবেট্‌স্‌।

শরৎ : মাতৃভক্ত সন্তান! মায়ের নাম অক্ষয় করে রেখেছে।

ফেরেবী : (নীরস কণ্ঠে) এটা কি—প্রশ্ন?

শরৎ : না। দুঃখিত। তিনটি প্লেনে সবশুদ্ধ ক'জন ছিল?

ফেরেবী : এগারোজন।

শরৎ : সকলেই কি জানতো, বোমাটা কী?

ফেরেবী : না।

শরৎ : একমাত্র আপনি জানতেন?

ফেরেবী: আমি, নেভী ক্যাপ্টেন উইলিয়াম পার্সনস্‌, আর পাইলট লেফটেন্যান্ট কর্নেল পল টিবেট্‌স্‌।

শরৎ : আপনার উপর কী ভার ছিল? (ফেরেবী নিরুত্তর) আপনার উপর কী ভার ছিল?

ফেরেবী : বোমাটা ফেলা।

শরৎ : হ্যাঁ, ঠিক। বারবার হিরোশিমার আকাশে উড়ে, অসংখ্য ফোটোগ্রাফ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে মেজর ফেরেবী এক দুর্মূল্য জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। ঠিক কোন জায়গায় কোন মুহূর্তে বোতাম টিপলে হিরোশিমার ধ্বংস সবচেয়ে বেশি হবে, তার চুলচেরা বিচার মেজর ফেরেবীর চেয়ে ভালো আর কেউ করতে পারতো না। তাই না মেজর?

ফেরেবী : যুদ্ধের সময় যে যে কাজ ভালো পারে, তাকে সেই কাজটা দেওয়াই নিয়ম।

শরৎ : নিশ্চয়ই। তারপর বলে যান।

ফেরেবী : আমরা উড়ছিলাম প্রায় ত্রিশ হাজার ফুট উপর দিয়ে। অন্য দু'টো বি-টোয়েন্টিনাইন প্রায় বারো মাইল পেছনে পাশাপাশি ছিল। সকাল হবার একটু পরে ডাঙা দেখা গেল। প্লেন আরো উঁচুতে তোলা হোলো। ন্যাভিগেটরের দেওয়া কোঅর্ডিনেট্‌সের সঙ্গে মিলিয়ে হিরোশিমার ত্রিভুজাকৃতি অন্তরীপ দেখতে পাওয়া গেল। র‍্যাডারের নির্দেশ না থাকলেও আমার চিনতে অসুবিধে হোতো না।

শরৎ : বলে যান।

ফেরেবী : আর কী জানতে চান?

শরৎ : কী করলেন?

ফেরেবী : আমার যা কাজ ছিল তাই করলাম।

শরৎ : কী দেখলেন?

ফেরেবী : দু'মিনিট সময় ছিল হাতে। ইনোলা গে ঘুরছিলো যখন, তখন বোমাটা ফাটলো, মাটি ছোঁবার কিছু আগে। ইনোলা গে যখন সম্পূর্ণ ঘুরেছে, তখন হিরোশিমা অদৃশ্য হয়ে গেছে একটা ঘন মেঘের আড়ালে।

শরৎ : বলে যান।

ফেরেবী : মেঘটা আস্তে আস্তে আরো ঘন হয়ে উঠতে লাগলো। যেন একটা মুঠো করা হাত। তারপর হঠাৎ প্রচণ্ড তেজে মুঠোটা শূন্যে উঠে এলো। প্রায় পনেরো হাজার ফুট উপরে ছড়িয়ে পড়লো ছাতার মতো। তারপর আমি আর দেখিনি।

শরৎ : না। তারপর দেখেছে বাকি দু'টো প্লেন। দেখেছে, ছবি নিয়েছে। আপনি কী করলেন?

ফেরেবী : ফিরে এলাম।

শরৎ : তার আগে, হিরোশিমা ছেড়েই?

ফেরেবী : হেডকোয়ার্টার্সে খবর পাঠালাম।

শরৎ : (সাধনকে) হ্যাঁ। মেজর ফেরেবী তাঁর নোটবুক থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে খবর লিখে রেডিও অপারেটরকে দিলেন। খুব সংক্ষিপ্ত খবর। মাত্র দু'টো ইংরেজি শব্দ।

সাধন : কী শব্দ?

শরৎ : বলুন মেজর ফেরেবী?

ফেরেবী : রেজাল্ট্স্ গুড।

[শরৎ হঠাৎ শূন্যে দু'হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলো]

শরৎ : গুড! রেজাল্ট্স্ গুড! ফল ভালো। খুব ভালো! টিনিয়ন দ্বীপে হেডকোয়ার্টার্সে এই দু'টি শব্দের অপেক্ষায় বিনিদ্র রাত কেটে গেছে, অবশেষে খবর এলো—রেজাল্ট্স্ গুড। কয়েক মিনিটের মধ্যে খবর চলে গেলো ওয়াশিংটনে। সেখান থেকে আটলান্টিক মহাসাগরে ক্রুইজার অগাস্টায়, যে জাহাজে প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান পট্স্ড্যাম কনফারেন্স সেরে ফিরছিলেন।

ফেরেবী : (নীরস কণ্ঠে) আপনার আর কোনো প্রশ্ন আছে?

শরৎ : আছে মেজর ফেরেবী। ও, না! এখন আর মেজর নয়। লেফটেন্যান্ট কর্নেল টমাস ফেরেবী।

ফেরেবী : বলুন।

শরৎ : টিনিয়ন থেকে আপনাদের রওনা হবার নির্দিষ্ট সময়টা শেষ মুহূর্তে হঠাৎ একঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়। এ কথা কি ঠিক?

ফেরেবী : হ্যাঁ, ঠিক।

শরৎ : এই পিছিয়ে দেবার নির্দেশের কারণ কী—আপনি জানেন?

ফেরেবী : না।

শরৎ : আন্দাজ করেন?

ফেরেবী : অনেক কিছু হতে পারে, অনেক টেকনিক্যাল কারণ। এটা এ ধরনের কাজে বিচিত্র কিছু নয়।

শরৎ : না বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া মানে হিরোশিমায় একঘণ্টা পরে পৌঁছোনো, তাই নয়?

ফেরেবী : হ্যাঁ।

শরৎ : এই একঘণ্টা দেরি হবার ফলে কতোখানি তফাৎ হোলো, আপনি বুঝেছিলেন?

ফেরেবী : আমার বোঝা না বোঝায় কিছু আসে যায় না। অর্ডার ইজ অর্ডার।

শরৎ : সাতটা পনেরোয় শহরের উপকণ্ঠের লোকেরা যে যার বাড়িতে বেরোবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলো। শহরের বাইরের অফিস কারখানার কর্মীরা সবে ট্রেন-বাস ধরতে শুরু করেছিলো। হিরোশিমার অফিসপাড়া, কারখানা-অঞ্চল, বন্দর এলাকা তখনো নির্জন। আর একঘণ্টা পরে, আটটা পনেরোয়, হাজার হাজার লোক চারিদিক থেকে ভিড় করে এসে জমা হয়েছে ঠিক সেই জায়গাটিতে—যেখানে আপনার নির্ভুল নিশানা দুনিয়ার প্রথম আণবিক বোমাটিকে ফাটিয়েছে। এ ঘটনা কি নেহাৎ টেক্‌নিক্যাল কারণে ঘটেছে?

ফেরেবী : যে কারণেই ঘটুক, আমার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। অর্ডার ছাড়া অন্য কিছুর সঙ্গেই আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আপনার আর কোনো প্রশ্ন আছে?

শরৎ : হ্যাঁ আছে। হিরোশিমা সম্বন্ধে আপনার বর্তমান মতামত কী?

ফেরেবী : আমাকে যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছিলো, আমি তা করেছি। ১৯৪৫ সালের ২৬ জুলাই মিত্রপক্ষ আণবিক অস্ত্র ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, জাপান চরমপত্র প্রত্যাখ্যান করবার পর। সে সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমার একমাত্র কর্তব্য ছিল—আদেশ সুষ্ঠুভাবে পালন করা, আমি তা করেছি। আজ আবার ঐ অবস্থায় ঐ হুকুম এলে ঠিক তাই করবো।

শরৎ : কেন কীভাবে করেছেন—সেটা আমার প্রশ্ন ছিল না লেফটেন্যান্ট কর্নেল। অ্যাটম বোমা ফেলা সম্বন্ধে আপনার মতামত জিজ্ঞেস করছিলাম। ব্যক্তিগত মতামত।

ফেরেবী : আমি মনে করি—সামরিক দিক থেকে সবচেয়ে কম ধ্বংস করে সবচেয়ে বেশি ফল পাওয়া গেছে। তার কারণ—হিরোশিমা-নাগাসাকির কয়েকদিন পরেই যুদ্ধ থেমেছে, জাপান মিত্রপক্ষের চরমপত্র মেনে নিয়েছে।

শরৎ : সামরিক দিক ছাড়া অন্য কোনো দিক নেই?

ফেরেবী : যুদ্ধের সময় নেই।

শরৎ : এখন নেই।

ফেরেবী : এখনকার কথা হচ্ছে না।

শরৎ : যুদ্ধের পর আপনি হিরোশিমায় গেছেন?

ফেরেবী : গেছি। যুদ্ধ থামবার এক সপ্তা পরেই গেছি।

শরৎ : হিরোশিমার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে আপনার কী মনে হয়েছে?

ফেরেবী : (স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে) মনে হয়েছে—যা করবার ছিল, ভালোভাবেই করা হয়েছে। এ গুড জব ওয়েল ডান।

শরৎ : আর কিছু মনে হয়নি?

ফেরেবী : না।

শরৎ : মনে কোনো অপরাধচেতনা জাগেনি?

[এই প্রথম ফেরেবীর স্থির কণ্ঠে উত্তেজনা আর উষ্মা প্রকাশ পেলো]

ফেরেবী : সেটা নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার। একা আমার ব্যাপার। আর কারো তা নিয়ে প্রশ্ন করার কোনো অধিকার নেই

[এক মুহূর্ত স্তব্ধতা। তারপর নীরস কণ্ঠে—]

আমি এখন যেতে পারি?

শরৎ : এক মিনিট। আপনি মেজর ক্লড ইথারলীকে চেনেন?

ফেরেবী · চিনতাম।

শরৎ : কোথায় প্রথম চিনেছিলেন?

ফেরেবি : টিনিয়ন দ্বীপে। ক্লডও আমাদের গ্রুপে ছিল।

শরৎ : কী ছিল?

ফেরেবী : পাইলট!

শরৎ : কী রকম পাইলট ছিল সে?

ফেরেবী : অত্যন্ত পাকা পাইলট। ঐ বয়সেই তার রেকর্ডে তেত্রিশটা সফল বিমান অভিযান লেখা ছিল। স্কোয়াড্রন কম্যান্ডও করেছে।

শরৎ : ঐ বয়স মানে—কতো বয়স?

ফেরেবী : টিনিয়নে যখন এসেছে তখন ছিল তেইশ। তারও দু'বছর আগে মেজর হয়েছে ক্লড।

শরৎ : হিরোশিমার দিন ওর উপর কী ভার ছিল?

ফেরেবী : ইনোলা গে-এর সঙ্গে যে দু'টো বি-টোয়েন্টিনাইন ছিল, তার একটার পাইলট ছিল ইথারলী।

শরৎ : হিরোশিমা অভিযানের ঠিক পরে ওর মনোভাব কী ছিল জানেন?

ফেবেবী : অভিযানের সাফল্যে খুশি হয়েছিলো। তাই হবার কথা। ওর রিপোর্টে হিরোশিমাকে আদর্শ লক্ষ্যস্থল বলে বর্ণনা করেছিলো।

শরৎ : তিনদিন পরে ইথারলীকে আর একটি অভিযানে পাঠানো হয়, আর একটি জাপানী শহরে। শহরটার নাম কী?

ফেরাবী : কোকুরা।

সাধন : কোকুরা? নাগাসাকি নয়?

ফেরেবী : কোকুরাই আসল টার্গেট ছিল। কোনো কারণে না হলে নাগাসাকি চেষ্টা করার কথা। লীড প্লেনের পাইলট কোকুরা খুঁজে পান নি।

শরৎ : তাহলে কোকুরা বেঁচে যাওয়া আর নাগাসাকি ধ্বংস হওয়া শুধু ভাগ্যের খেলা?

ফেরেবী : যুদ্ধের সময় এরকম ভাগ্যের খেলা অনেক হয়।

শরৎ : তা হয়, শুধু এতো মারাত্মক তফাৎ অন্য ক্ষেত্রে হয় না। যাই হোক, নাগাসাকির পর মেজর ইথারলীকে আপনি দেখেছেন?

ফেরেবী : দেখেছি।

শরৎ : কতোদিন দেখেছেন?

ফেরেবী : টিনিয়নে যতোদিন ছিল সে। যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত।

শরৎ : আগের মতোই খুশি ছিল সে।

ফেরেবী : (অল্প থেমে) জানি না।

শরৎ : কিছু বলে নি?

ফেরেবী : না। চুপচাপ থাকতো সব সময়ে।

শরৎ : কেন বলতে পারেন?

ফেরেবী : না। (হঠাৎ অধৈর্যে) কারো মনের কথা আমি বলতে পারি না। পারলেও বলতাম না। কোনো তথ্য বা ঘটনা যদি জানবার থাকে তো বলুন।

শরৎ : তথ্য? আচ্ছা ইথারলী কি বিবাহিত ছিল?

ফেরেবী : হ্যাঁ, যুদ্ধের সময় ছুটিতে গিয়ে বিয়ে করে এসেছিলো।

শরৎ : তাদের বিবাহিত জীবনের শেষ অবধি কী গতি হোলো, জানেন?

পেরেবী : (আবার অধৈর্যে) এ সব কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? তাকে বা তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেই তো পারেন?

শরৎ : আচ্ছা, তাই করবো।

[ফেরেবী কাঠগড়া থেকে নেমে চলে যাচ্ছে, শরতের শান্ত কণ্ঠ থামিয়ে দিলো তাকে]

আর একটা প্রশ্ন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফেরেবী। মেজর ইথারলী এখন কোথায় জানেন?

ফেরেবী : (এক মুহূর্ত থেমে) জেলে।

[সোজা বেরিয়ে গেলো ফেরেবী। শরৎ স্তব্ধ। সাধন কাগজ দেখে শরতের দিকে তাকালো।]

সাধন : পরের সাক্ষী? মেজর ইথারলী?

শরৎ : নাঃ, তাকে আর যন্ত্রণা দিয়ে লাভ নেই। তার চেয়ে মিসেস ইথারলীকে ডাকা ভালো।

সাধন : ডাকো।

শরৎ : (গলা তুলে) মিসেস ইথারলী!

[মিসেস ইথারলী এলো। তারুণ্যের সজীবতা আছে, লাস্যভাব নেই। সাধারণ, বুদ্ধিমতী, বাস্তবপন্থী মহিলা—জীবিতদের দলে।]

শরৎ : মিসেস ইথারলী, আপনার স্বামী ক্লড ইথারলী সম্বন্ধে আমরা কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

ইথারলী : ক্লড ইথারলী এখন আমার স্বামী নয়।

শরৎ : জানি। আপনি বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করেছিলেন কোর্টে।

ইথারলী : হ্যাঁ। আবেদন মঞ্জুর হয়েছিলো।

শরৎ : আপনি কি ক্লডকে ভালোবাসতেন না?

ইথারলী : বাসতাম। খুবই ভালোবাসতাম। ক্লডের মতো লোক আমি আগে কখনো দেখিনি।

শরৎ : তাহলে বিবাহবিচ্ছেদ চাইলেন কেন?

ইথারলী : ওর সঙ্গে ঘর করা আর সম্ভব ছিল না।

শরৎ : যুদ্ধের শেষে মেজর ইথারলী ফিরে আসবার পরেই কি আপনার এ কথা মনে হয়েছিলো?

ইথারলী : না। তখন আমার মতো সুখী মেয়ে আর কেউ ছিল না। ক্লড হীরো হয়ে ফিরেছিলো। টেক্সাসের গ্রেসন্ শহরে বীরের অভ্যর্থনা পেয়েছে। শোভাযাত্রা, ব্যান্ড, পতাকা, নগরসজ্জা, মেয়রের বক্তৃতা—কিছুই বাদ যায়নি সেদিন। কিন্তু ক্লড—(থেমে গেলো)

শরৎ : বলুন!

ইথারলী : অভ্যর্থনার অনুষ্ঠান শেষ হবার আগেই ক্লড হঠাৎ উঠে ছুটে বেরিয়ে গেলো, কাউকে কিছু না বলে। অনেকক্ষণ পরে তাকে খুঁজে পেলাম—একটা গোলাঘরে। একা লুকিয়ে বসে আছে। আর—আর কাঁদছে।

শরৎ : কাঁদছে?

ইথারলী : হ্যাঁ। ওকে এর আগে কখনো কাঁদতে দেখিনি। কান্না—কান্না ওর সঙ্গে একেবারে খাপ খায় না।

শরৎ : তারপর?

ইথারলী : সবাই বললো—স্নায়বিক গোলমাল। যুদ্ধের পর শান্তিপূর্ণ জীবনে মানিয়ে নিতে অনেকেই পারেনি প্রথম দিকে। আমিও তাই ভেবেছিলাম। নিজের উপর বিশ্বাস ছিল—ওকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারবো।

শরৎ : পারলেন না?

ইথারলী : না। চেষ্টার ত্রুটি করিনি। কিন্তু দিন দিন অবস্থা খারাপের দিকে যেতে লাগলো। আমি ভয় পেতাম ওকে দেখে। মাঝরাত্রে লাফিয়ে উঠে অমানুষিক গলায় চিৎকার করে উঠতো—

[শরৎ হঠাৎ মাটিতে পড়ে ক্লড ইথারলীর গলায় চিৎকার করে উঠলো]

শরৎ : রিলিজ্ ইট্! রিলিজ্ ইট্।

ইথারলী : (চোখে বিভীষিকা) ঐ এক চিৎকার—রিলিজ্ ইট্! তারপর কয়েক মুহূর্ত ঘর্মাক্ত শরীরে কাঁপতো, যেন নরক দেখছে। তারপর আবার চিৎকার করে উঠতো—

শরৎ : (ক্লডের কণ্ঠস্বর) নো! নট নাও! নট নাও! থিঙ্ক অফ দ্য চিল্‌রেন! দ্য চিল্‌রেন আর বার্নিং! দ্য চিল্‌রেন—(বুক মোচড়ানো গলায়) ক্রাইস্ট!

ইথারলী : ঐ সময়ে ক্লডের মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে আমার প্রাণ শুকিয়ে যেতো। সমস্ত মুখ যন্ত্রণা আর ভয়ে এমন বিকৃত হয়ে উঠতো—ওকে চিনতে পারতাম না। সারা শরীর কাঁপতো। সকালে দেখতাম—জ্বর এসেছে। কথা বললে শুনতে পেতো না। মাঝে মাঝে দু'চোখ বড়ো করে মেলে আমাকে বলতো—জিনিসপত্র গুছিয়ে দাও, হিরোশিমা যেতে হবে। পেন্টাগন হুকুম দিয়েছে, হিরোশিমা গিয়ে আমাকে দেখতে হবে—ওখানকার ছোট ছেলেমেয়েদের কী হয়েছে?

শরৎ : (ক্লডের কণ্ঠস্বর) দে ওয়ান্ট মি টু গো টু হিরোশিমা হানি—দ্য পেন্টাগন। দে ওয়ান্ট মি টু সি হোয়াট হ্যাপেন্ড টু দ্য চিলরেন দেয়ার। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো, বাট ইটস্ অ্যান অর্ডার, সী? ইট্স অ্যান অর্ডার!

ইথারলী : এই এক কাল্পনিক ভয় ওকে কুরে কুরে খাচ্ছিলো। পালাতে চেষ্টা করতো। পুলিস দেখলেই লুকোতো। পুলিস কেন, ইউনিফর্ম পরা যে কোনো

লোক—এমন কি পোস্টম্যান দেখলেও লুকোতো।

শরৎ : (ক্লডের কণ্ঠ) ইউ গট টু ওয়াচ ইট হানি, গট টু ওয়াচ দ্যাট ম্যান। হী'জ আফটার মি!

ইথারলী : অসম্ভব—অসম্ভব হয়ে উঠেছিলো! পাগল হয়ে যাচ্ছিলো ক্লড, বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাচ্ছিলো! অসম্ভব হয়ে উঠছিলো ওর সঙ্গে ঘর করা!

[শরৎ উঠেছে এর মধ্যে]

শরৎ : বুঝতে পারছি মিসেস ইথারলী।

ইথারলী : (হঠাৎ চেঁচিয়ে) কিচ্ছু বুঝতে পারেননি! কেউ কিচ্ছু বোঝেনি। ডিভোর্সের মামলা এনেছি বলে শহরশুদ্ধ লোক অবাক হয়ে তাকাতো—যেন আমি একটা স্বার্থপর পাষণ্ড মেয়ে, অসুস্থ স্বামীকে ফেলে পালাচ্ছি। ক্লড যখন মাঝরাতে উঠে ঐরকম চিৎকার করতো, তখন তো কেউ তাকে দেখেনি! ভয়ে হিম হয়ে গিয়েও দাঁতে দাঁত চেপে ঐ পাগলামি সামলেছি—ওদের কাউকে তো সামলাতে হয়নি। ওরা জানবে কী করে! ওরা দোষ দিয়ে খালাস।

শরৎ : (ধীর কণ্ঠে) আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না মিসেস ইথারলী, বিশ্বাস করুন।

ইথারলী : (সামলে নিয়ে) আমি—আমি দুঃখিত। কিছু মনে করবেন না। হঠাৎ যেন ক্লডের দুঃস্বপ্ন-দেখা চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠেছিলো। আর কী জানতে চান, বলুন।

শরৎ : বিবাহবিচ্ছেদের পর ক্লড কী করলো, যদি বলতে পারেন—

ইথারলী : এক কথায় বলা যায়—ভেসে চললো। গ্রেসন শহর ছেড়ে চলে গেলো টেক্সাসের এক খামারে, কৃষিমজুরের কাজ নিয়ে। ওখানেও প্রায় নাকি বলতো—ওকে জোর করে জাপানে পাঠানো হবে, হিরোশিমা আর নাগাসাকি ধ্বংসের হিসেব নিতে। কিছুদিন ভালো থাকতো, তারপর কিছুদিন বদ্ধ উন্মাদের মতো হয়ে যেতো। ওয়াকো মিলিটারি হসপিটালের ডাক্তারেরা পরীক্ষা করে বললেন—এক্সট্রিম নার্ভাস ডিপ্রেশান। তখন গভর্নমেন্ট থেকে পেন্সনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

সাধন : কতো টাকা?

ইথারলী : বেশি নয়, মাসে দু'শো সাঁইত্রিশ ডলার। কিন্তু বেশি কমে কী আসে যায়?

সাধন : কেন?

ইথারলী : ও তো এক সেন্টও ছুঁলো না ও টাকার। বলতো—খুনের দক্ষিণা।

শরৎ : (ক্লডের কণ্ঠ) প্রিমিয়াম ফর মার্ডার! ইয়া, দ্যাট্‌স্ হোয়াট ইট্ ইজ্—প্রিমিয়াম ফর মার্ডার। ফর হোয়াট উই ডিড্ টু দোজ্ জাপানীজ সিটিজ্ অ্যান্ড জাপানীজ্—চিলরেন্!

সাধন : তারপর?

ইথারলী : (নির্জীব কণ্ঠে) তারপর—ধরা পড়লো। চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়লো।

সাধন : চুরি?

ইথারলী : হ্যাঁ, চুরি। অস্বীকার করেনি একবারও। বরং অনেক চুরির কথা স্বীকার করলো যা আগে ধরা পড়েনি।

সাধন : কী চুরি?

ইথারলী : এমনি ছিঁচকে চুরি। দোকানে অফিসে ঢুকে ছোটখাটো চুরি। (অল্প থেমে) আর এই সমস্ত সময়টা ওর ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে দু'শো সাইত্রিশ ডলার করে জমা হয়েছে, এক সেন্টও ছোঁয়নি তার।

সাধন : চুরি করতো কি—টাকার জন্য?

ইথারলী : মনস্তাত্ত্বিক ডাক্তার বলেছিলেন—শাস্তি পাবার জন্যে। হিরোশিমার অপরাধের জন্যে শাস্তি খুঁজতো।

সাধন : (অল্প থেমে) এখন ও কোথায়?

ইথারলী : ফোর্ট ওয়ার্থ জেলে। (তারপর অদ্ভুত হেসে) মানচিত্র থেকে হিরোশিমা নাগাসাকি মুছে ফেলতে বেশিক্ষণ লাগেনি। ওর মন থেকে মুছে ফেলতে কতোদিন লাগবে—কে জানে?

শরৎ : (অল্প থেমে, মৃদুস্বরে) ধন্যবাদ মিসেস ইথারলী।

ইথারলী : (সচকিত হয়ে) অ্যাঁ? ও, আচ্ছা।

[চলে গেলো]

শরৎ : এ গেলো একটা দিক সাধন—যারা আকাশে ছিল। এবার যারা জমিতে ছিল তাদের পালা।

সাধন : (কাগজ দেখে) ডক্টর আরাতা ওসাদা, এমেরিটাস প্রফেসর, এক্স-প্রেসিডেন্ট—হিরোশিমা ইউনিভার্সিটি।

শরৎ : (গলা তুলে) ডক্টর আরাতা ওসাদা।

[ওসাদা এলেন। বয়স ষাট পেরিয়েছে, সৌম্য শান্ত, চেহারা শান্ত কণ্ঠস্বর]

শরৎ : ডক্টর ওসাদা, রচনাগুলো এনেছেন?

ওসাদা : এনেছি।

সাধন : কী রচনা?

শরৎ : স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের রচনা! ডক্টর ওসাদা লিখিয়েছিলেন ১৯৫১ সালে। বত্রিশটা স্কুল কলেজ থেকে প্রায় এক হাজার রচনা পাওয়া গিয়েছিলো, তাই না ডক্টর ওসাদা?

ওসাদা : দু'হাজার।

সাধন : বিষয়টা কী?

শরৎ : হিরোশিমার অভিজ্ঞতা।

ওসাদা : এরা সবাই পিকাদনের দিন হিরোশিমায় ছিল। চার থেকে এগারো বছর বয়স ছিল তাদের তখন।

সাধন : পিকাদন কী?

ওসাদা : পিকা মানে আলো, দন মানে বজ্রপাত। আমরা আণবিক বোমাকে পিকাদন বলে বর্ণনা করে থাকি।

শরৎ : আলো আর বজ্রপাত? এতো নরম নাম দিলেন?

ওসাদা : যারা দিয়েছে, ওর বেশি তাদের কল্পনা এগোয়নি বোধ হয়।

শরৎ : ডক্টর ওসাদা, আমরা ঐ রচনাগুলো থেকে কিছু শুনতে চাই।

ওসাদা : হ্যাঁ, শোনাই। (ক্ষমা প্রার্থনার সুরে) স্কুলের ছেলেমেয়েদেব রচনা লেখা—একটু ভাষা খেলাবার ঝোঁক রয়ে গেছে। থাকবেই। তবু বলবো—এর চেয়ে অনেক বেশি থাকবার কথা ছিল। প্রথমে ধরুন—কোনটা শোনাই? সব ক'টাই শোনবার মতো, সব ক'টাই জানবার মতো।

শরৎ : যে কোনো একটা নিন।

ওসাদা : আচ্ছা, এই এটা—এইকো মাৎসুনাগা। ১৯৪৫-এ ফিফ্‌থ্ গ্রেডে পড়তো। বয়স ধরুন, বছর দশেক ছিল তখন। (কাগজ পড়ে) "আমি মায়ের সঙ্গে খেতে বসেছিলাম। আমার বাঁ-হাতে ভাতের বাটি, ডান হাতে কাঠি। সবে এক গ্রাস ভাত মুখে তুলেছি, হঠাৎ চারিদিক যেন জ্বলে উঠলো কমলা রঙের একটা অতি উজ্জ্বল আলোতে।" (মুখ তুলে) এই আলোর রঙটা দেখেছি এক এক জন এক এক রকম লিখেছে। নীল, সাদাটে নীল, হলদে, কমলা। চোখ এতো ধাঁধিয়ে যায় যে ঠিক রঙটা বোঝা যায় না। জানেন তো—যারা সোজা তাকিয়েছিলো তাদের অনেকেই অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো? যাক গে, শুনুন। (কাগজ পড়ে) "আমি কিছু না ভেবেই ভাত মুখে দিলাম, বাটিটা আর কাঠি দু'টো রাখলাম, উঠে চার পাঁচ পা হাঁটলাম, তারপর কী হোলো জানি না।"

[প্রচণ্ড শব্দ করে বিস্ফোরণে মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাটিতে পড়লো কোরাসের সবাই। তাদের মধ্যে একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। বাকিরা যন্ত্রণায় মোচড়াচ্ছে, বর্ণনা অনুসারে অভিনয় করছে।]

এক : যখন চোখ খুললাম, দেখি চারিদিক সাদা ধোঁয়ায় ঢাকা। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে গেলাম। দেখলাম ডান পা-টা মাটিতে পুঁতে আছে। প্রাণপণ শক্তিতে টেনে পা-টা ছাড়িয়ে নিলাম। আমি কোথায়? আমার পাশে বসবার ঘরের বড়ো আলমারিটা কী করে এলো? সাদা ধোঁয়াটা কেটে আসছে। আমার কী হয়েছে? হঠাৎ দুপুরের রোদে চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। মাথা ঘুরে উঠলো। দাদার গলা শুনতে পেলাম—

[কোরাসের একজন ডাকলো]

দুই : এইকো-চান। এইকো-চান।

ওসাদা : (মুখ তুলে) আমরা সম্বোধনে নামের শেষে 'সান' শব্দটা যোগ করি। ছোটরা সানকেই 'চান' বলে।

[কাগজে চোখ নামালেন। আবার প্রথম মেয়েটাই কথা বলছে।]

এক : আমার মনে হোলো আমার নাম যেন জীবনে এই প্রথম শুনছি। চেঁচিয়ে সাড়া দিলাম। দাদা বললো—

দুই : ওখান থেকে নোড়ো না।

এক : ফিরে তাকিয়ে দেখলাম—বাড়িটা ধ্বসে পড়েছে। ধ্বংসস্তুপের ওপাশে আগুনের

হল্কা নাচছে। একটু পরে আমার বোনের চিৎকার শুনতে পেলাম। কাউকে দেখতে পেলাম না। দাদা বললো—

দুই : দাঁড়া আসছি!

এক : বলে ঝুঁকে দাঁড়ালো। দাদার মুখটা রক্তে ঢেকে গেছে। তক্তাগুলো সরাবে কি, দেখতেই পাচ্ছে না, রক্তে চোখ ঢেকে যাচ্ছে। তক্তা সরাচ্ছে আর বার বার চোখ মুছছে। এবার বাবার আর্তনাদ শুনলাম।

তিন : লাগছে! লাগছে!

এক : বাবাকেও দেখতে পেলাম না। আমি ভয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে গেছিলাম, যেন দুঃস্বপ্ন দেখছি। কিছুই করতে পারছি না, কেবল লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরছি। দাদা ততোক্ষণে আমার বোনকে টেনে বের করেছে। তাকে চেনা যায় না। চুলগুলো একেবারে সাদা, মুখের পাশটা কেটে ফাঁক হয়ে আছে, মাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে, আর টকটকে লাল রক্ত বেরিয়ে আসছে সেখান দিয়ে। মধ্যে মধ্যে একটা লম্বা নিশ্বাস শিষ দেওয়া আওয়াজ করে বেরিয়ে আসছে ঐ ফাঁকটা দিয়ে। ও একটা কাঁচের জানলা-ঘেরা ঘরে ছিল, তাই পঞ্চাশ ষাটটা—না, বোধ হয় শ-খানেক কাঁচের টুকরো ওর গায়ে বিঁধে গিয়েছিলো। পায়ের কাটা জায়গা দিয়ে হাড় দেখা যাচ্ছিলো। আমার নিজের বোন, তবু কাছে যেতে ভয় করছিলো। বাবার আর্তনাদ ক্রমেই বাড়তে লাগলো। দাদা বললো—

দুই : তুমি কোথায়?

তিন : তুই—তুই আমার উপর দাঁড়িয়ে আছিস!

এক : দাদা চমকে লাফিয়ে সরে দাঁড়ালো। কিছু দেখা গেলো না। চুন-বালির পাহাড়ে সম্পূর্ণ ঢেকে আছে দেহটা। মাথাটা দরজার চৌকাঠে শক্ত হয়ে আটকে গেছিলো। দাদা প্রাণপণে জঞ্জাল সরাতে লাগলো, বাবা যন্ত্রণায় আরো চিৎকার করতে লাগলেন। এই সময়ে মায়ের গলা শুনতে পেলাম—

চার : এইকো চান্! এইকো চান্!

এক : কিন্তু মাকেও দেখতে পেলাম না। ইঁট-কাঠের নিচে মা কী যেন একটা জিনিস ঠুকে ঠুকে শব্দ করছিলো, টিনের মতো কিছু একটা। আর ডাকছিলো।

চার : এইকো চান্!

[এইকো চান্ ডাকটা চলবে, অবশেষে থেমে যাবে]

এক : কিন্তু মায়ের গলা আস্তে আস্তে নেমে এলো। আমি প্রাণপণে জঞ্জাল সরাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সেই কড়ি-বরগা চুন-বালি কাঁচের স্তূপ সরাবো কী করে? এতোক্ষণে আমি কাঁদতে শুরু করলাম। মা তোমাকে বের করতে পারছি না। সমস্ত দোতলাটাই যে ভেঙে তোমার উপর—(অল্প থেমে) মায়ের গলা থেমে গেলো শেষে। আমি তখন যেন আর কিছুই অনুভব করছি না। এমন কি টেনে বের করতেও ইচ্ছা করছে না। শুধু বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছি—ভেঙে পড়া ছাতটার ধ্বংসস্তূপের দিকে। তার নিচ থেকে টিন ঠোকার শব্দটা আর আসছে না। (অল্প থেমে) দাদা ডাকলো—

দুই : এইকো চান্!

এক : ফিরে গেলাম সেখানে। দাদার পেটে একটা চার ইঞ্চি লম্বা কাটা—আগে দেখিনি। ইট-কাঠ নিয়ে টানাটানি করছে আর এক এক ঝলক রক্ত পড়ছে সেখানে দিয়ে। খানিকটা নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আছে। মনে হোলো এ যেন অন্য কেউ। আমার বোন হঠাৎ বসে পড়লো। আর ওঠেনি সে। (অল্প থেমে) বাবা এতোক্ষণে বেরিয়ে আসতে পারলেন কোনোরকমে! মা-কে বের করার কথা বলতেই দাদা বলে উঠলো—

দুই : এক্ষুনি এখান থেকে বেরোতে না পারলে সব্বাইকে পুড়ে মরতে হবে। শিগগির এসো!

ওসাদা : দেখি—আগুন প্রায় ঘিরে ফেলেছে আমাদের। যেদিকে যাবার চেষ্টা করি, লকলক করে আগুন জ্বলে ওঠে। পায়ে যেন আর শক্তি বাকি রইলো না। মনে হোলো—

শরৎ : (হঠাৎ চেঁচিয়ে) আর থাক ডক্টর ওসাদা।

ওসাদা : (মুখ তুলে) অ্যাঁ? হ্যাঁ, থাক। বেশি বাকি নেই, রচনাটা শেষ অবধি লেখেনি মেয়েটা। কী কারণে, কে জানে? আগুন থেকে সবাই শেষ পর্যন্ত বেরোলো কি না—আচ্ছা, এইটা শুনুন। ইওশিহিরো কিমুরা। এর বয়স পিকাদনের সময় ছিল আট বছর। "আমার কাজ ছিল স্নানের জল গরম করা। রোজ—" যাক গে, এ সব বাদ দিই। "৬ই আগস্ট জ্বর ছিল বলে বাবা কাজে যাননি। দাদা রান্নাঘরে—" না, এও থাক। এই যে, এইখান থেকে শুনুন। "সাইরেন শুনে বাড়ি চলে এলাম। কিন্তু একটু পরেই অল ক্লীয়ারের সাইরেন বাজলো। আমি আবার স্কুলে ফিরে গেলাম। টীচার আসেন নি, তাই গল্প করে চললাম। তারপর প্লেনের শব্দ শুনতে পেলাম। কয়েক সেকেন্ড পরে চারিদিক একটা হলদে আলোয় ঝলসে উঠলো—" (মুখ তুলে) দেখেছেন, এ ছেলেটি হলদে লিখেছে। (কাগজ দেখে) "যেন দুপুরের সূর্যের আলো খোলা চোখে এসে লাগলো। দু'এক সেকেন্ড পরে একটা প্রচণ্ড শব্দ। তারপরেই সব অন্ধকার।"

[পড়ে থাকা কোরাসের সবাই উঠে প্রচণ্ড শব্দে ঠিকরে পড়লো আবার। মেয়েটি কথা বলছে আবার, সবাই আগের মতোই অভিনয় করছে গল্প অনুসারে।]

এক : মাথার উপরে ছাতের কয়েকটা টালি ভেঙে পড়েছিলো। কোমরের উপর অনেকগুলো কাঠের বরগা। জ্ঞান হলে কোনোক্রমে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে এলাম। চারিদিকে অনেক লোক পড়ে আছে। তাদের অনেকের মুখ পুড়ে কালো হয়ে গেছে। রাস্তায় বেরিয়ে একটা নিশ্চিন্ততায় নিশ্বাস ফেলেছি, হঠাৎ ডান হাতে ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করলাম। দেখি হাত থেকে কনুই পর্যন্ত চামড়া উঠে গেছে, সমস্তটা লাল হয়ে রয়েছে। বাড়ির দিকে পা বাড়াতেই দিদির ডাক শুনতে পেলাম। ওর মুখটা এতো বদলে গেছে যে চিনতে কষ্ট হয়। কাপড় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। দু'জনে বাড়ি এলাম। কিন্তু বাড়ি নেই, সব চেপ্টে জমি হয়ে গেছে। কেউ নেই সেখানে। এদিক ওদিক খুঁজে আবার ফিরে এলাম। তখন বাবাকে দেখতে পেলাম! বাবা ইট-কাঠ সরিয়ে কী যেন বের করবার চেষ্টা

করছিলেন। তাবপর হাল ছেড়ে থেমে গেলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম—মা কই? বাবা ক্লান্তভাবে বললেন—

তিন : মারা গেছে!

এক : আমার মাথায় কে যেন একটা বাড়ি মারলো। একটা কথাও মুখ দিয়ে বেরোলো না। মায়ের মাথায় একটা পাঁচ ইঞ্চি পেরেক গেঁথে গেছিলো. (অল্প থেমে) তারপর বৃষ্টি শুরু হোলো। কাদা কাদা নোংরা জল। আমরা রেল পোলের নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম। রেল-পোলটা জ্বলছিলো আর ফটফট করে শব্দ হচ্ছিলো। বাবা জিজ্ঞেস করলেন—

তিন : তোর মাথায় কী হয়েছে?

এক : হাত দিতে চটচটে লাগলো। রক্ত। বৃষ্টি থামলে হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা পড়লো। একটা বাড়ি আগুনে পুড়ছিলো, আমরা সেখানে গিয়ে আগুন পোয়ালাম। অনেক লোক আগুন পোয়াচ্ছিলো। তাদের কেউ অক্ষত নেই। মুখ ফুলে গেছে, ঠোঁট কালো হয়ে গেছে। একজন পাগলের মতো জাপানী পতাকা ওড়াচ্ছে আর 'বানজাই' বলে চেঁচাচ্ছে। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিলো। নদীতে জল খেতে গেলাম। অনেকগুলো কালো কালো পোড়া পোড়া মৃতদেহ জলে ভেসে যাচ্ছিলো। আমি সেগুলো ঠেলে সরিয়ে জল খেলাম। চারিদিকে এতো মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিল যে তা দেখে আর কিছুই মনে হচ্ছিলো না। একটা বাচ্চা ছেলে মা মা করে চেঁচাচ্ছিলো। অনেকে নদীর দিকে আসছিলো, পড়ে যাচ্ছিলো আর মরে যাচ্ছিলো।

ওসাদা : "একটু পরে দিদিও পড়ে গেলো। বাবা তাকে কাঁধে করে যেখানে আগে আমাদের বাড়ি ছিল সেখানে—"

শরৎ : আর কতোটা আছে ডক্টর ওসাদা?

ওসাদা : অ্যাঁ? তা আছে অনেকখানি। তবে কাজের কথা বেশি নেই। ওর ঐ দিদিটি মারা গেছিলো ন'দিন পরে। সব চেয়ে বড়ো যে বোন, তার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। যেখানে সার্বজনীন চিতায় মৃতদেহগুলি পোড়ানো হচ্ছিলো, সেখান থেকে ওর বাবা একমুঠো ছাই নিয়ে এসেছিলো শুধু। এইটুকু শুনুন—রচনার শেষটা।

[কোরাসের মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো]

এক : "যুদ্ধ প্রত্যেক মানুষের শত্রু। আমরা যদি চিরদিনের মতো যুদ্ধ দূর করতে পারি, তবে আমি জানি স্বর্গে আমার মা সুখী হবেন।"

ওসাদা : (লজ্জিত হেসে) এরকম কথা দু'একটা তো থাকবেই। কাঁচা হাতের লেখা তো? অল্প বয়স—

শরৎ : (স্থির কণ্ঠে) হ্যাঁ ডক্টর ওসাদা। বড়ো কাঁচা হাত। বড়ো অল্প বয়স। বয়স হলে আর এসব কাঁচা কাথা বলবে না।

[এক মুহূর্তের নীরবতা]

ওসাদা: আর শুনবেন? আরো অনেকে আছে।

সাধন : সবই তো এইরকম?

ওসাদা : হ্যাঁ, সবই এইরকম। এই একই রকম। আবার সবই আলাদা। আলাদা আলাদা মানুষ তো? আলাদা আলাদা জীবন।

সাধন : হ্যাঁ, আশি হাজার আলাদা আলাদা জীবন।

ওসাদা : (বিনীত স্বরে) আশি হাজার আমেরিকান সরকারি ঘোষণা। জানেন বোধ হয়, ওয়াশিংটনও আশি হাজার শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলো। তাদের হিসেবে আরও বেশি হবার কথা।

সাধন : তবে কতো?

ওসাদা : আমাদের হিসেবে দু'লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার।

সাধন : একদিনে?

ওসাদা : না না একদিনে নয়, একদিনে নয়। সব ধরে। যারা পরে মারা গিয়েছিলো, রেডিও-অ্যাক্টিভিটির আক্রমণে যারা মরেছিলো—

শরৎ : রেডিও-অ্যাক্টিভিটির আক্রমণ। পারমাণবিক রোগ। জাপানে কী বলে যেন একে?

ওসাদা : বিষের ছোঁয়া।

শবৎ : হ্যাঁ, বিষের ছোঁয়া। এ রোগ পৃথিবীর কোন্ ডাক্তার প্রথম পরীক্ষা করেন, জানো সাধন?

ওসাদা : ডক্টার মিচিহিকো হাচিইয়া।

শরৎ : হ্যাঁ, আর তাঁর প্রথম রোগী কে ছিলেন জানো? তিনি নিজে।

ওসাদা : আমি কি এখন তাহলে—?

শরৎ : হ্যাঁ। ডক্টর ওসাদা।

[ওসাদা কাঠগড়া থেকে নামলেন]

অনেক ধন্যবাদ।

ওসাদা : (থেমে দিয়ে) ধন্যবাদ? (মাথা নেড়ে) না। না না, বরং শোনবার জন্যে ধন্যবাদ। এ সব তো কেউ শুনতে চায় না? ভুলতে চায়। অতীত বলে চাপা দিতে চায়।

[চলে গেলেন]

শরৎ : এই রকম একশোটি রচনা বেছে নিয়ে একটা বই ছাপা হয়েছে। দুনিয়াতে সেটাই বোধ হয় একমাত্র বই, যা ছোটদের লেখা, অথচ ছোটদের পড়বার উপযোগী নয়।

সা : (কাগজ দেখে) এবার? ডক্টর হাচিইয়া?

শরৎ : হ্যাঁ। (গলা তুলে) ডক্টর মিচিহিকো হাচিইয়া।

[কোরাসের সবাই মাটিতে শুয়ে হাসপাতাল রচনা করলো। একজন নার্স। হাচিইয়া এলেন। বয়স্ক, কিন্তু চলাফেরা দ্রুত, সজীব। প্রশ্নের অপেক্ষা না রেখে ঝুঁকে একবার অভিবাদন করে আরম্ভ করে দিলেন, যেন খুব তাড়া। কথা বলতে বলতে রোগী দেখছেন, নার্স ঘুরছে সঙ্গে।]

হাচিইয়া : **মিচিহিকো হাচিইয়া, ডাইরেক্টর, কম্যুনিকেশনস্ হসপিটাল। প্রথম দিকে আমরা**

রোগটাকে ধরতে পারিনি, ভেবেছিলাম—কাটা আর পোড়া ঘায়ের ব্যাপার। পরে নিজের রোগের সঙ্গে রোগীদের লক্ষণ মিলিয়ে আস্তে আস্তে বুঝতে পারি। শুধু আমি নই, নাগাসাকির ডক্টর শিরাবে, ডক্টর সুগিহারা, আরো দু'একজন ডাক্তার রোগটা ধরতে শুরু করেন। বোমার এপিসেন্টারের পাঁচশো গজের মধ্যে যারা ছিল, তাদের মধ্যেই আমাদের বেশির ভাগ রোগী। শ'দুই কেস হিস্ট্রি আমি তৈরি করেছি, তার মধ্যে যে কোনো একটা নেওয়া যাক। নাম—তাকাতা, মহিলা, বয়স আঠাশ। প্রথম পরীক্ষার তারিখ—আঠাশে অগাস্ট ১৯৪৫। বিস্ফোরণের সময়ে ছিল হাচোবেরি ফুড সেন্টারে—এপিসেন্টার থেকে সাতশো গজ দূরে। লক্ষণ—সাধারণ দুর্বলতা, পেটের অসুখ, মাঝে মাঝে বমি, জিভের স্বাদগ্রহণের ক্ষমতা নষ্ট। কয়েক দিন পরে চুল খসে যেতে শুরু হওয়া। হাসপাতালে ভর্তি, ঐ একই তারিখ—আঠাশে অগাস্ট। নাড়ি—স্বাভাবিক, নিশ্বাস—স্বাভাবিক, ইউরিন—নেগেটিভ, থোরাক্স বা অ্যাবডোমেনে অস্বাভাবিক কিছু নেই, রক্তের শ্বেতকণিকা ভীষণ কম। এই একটা ব্যাপার প্রায় প্রত্যেকেরই দেখা গেছে—রক্তের শ্বেতকণিকার পরিমাণ ভীষণ কমে যায়। এক কিউবিক মিলিমিটারে যেখানে নর্ম্যাল হোলো ছয় থেকে আট হাজার, সেখানে প্রথমে তিন হাজার পরে পাঁচশো পর্যন্ত নেমে আসে। সারা গায়ে ছোট ছোট 'পেটেকি'। পেটেকি হচ্ছে চামড়ায় লাল বা বেগুনি চাকা চাকা দাগ, রক্তের এক্সট্রাভ্যাসেশনের ফল। পয়লা সেপ্টেম্বর—পেটেকির সংখ্যা বৃদ্ধি, আকার—আঙুলের মাথার মতো। দুর্বলতা, জ্বর, ক্ষিদের অভাব, স্টুল দিনে তিনবার। নউই সেপ্টেম্বর—নাড়ি অত্যন্ত মৃদু, পেটেকির বৃদ্ধি, আকার—পায়রার ডিমের মতো, রঙ—মেটে বেগুনি আর লাল। তেরোই সেপ্টেম্বর—রোগিণীর মৃত্যু। এ-বি.-সি-সি-র ডাক্তারদের অভিমত হোলো—

সাধন : এ-বি-সি-সি মানে?

হাচিইয়া : অ্যাটমিক বম্ কন্ট্রোল কমিশন। আমেরিকান সংগঠন। ওরা আণবিক রোগ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছে, বিশেষ করে নবজাত শিশুদের ওপর এ রোগের প্রভাব নিয়ে। ওরা বলে—রেডিও অ্যাকটিভিটির বিপজ্জনক প্রভাব শুধু তাদের ওপরেই পড়েছে, যারা বোমা পড়ার সময় উপস্থিত ছিল, পরে যারা মারা গেছে, তাদের ওপর নাকি কোনো প্রভাব নেই! কিন্তু আমরা দেখেছি—কয়েকদিন পরে বাইরে থেকে এসে ওখানে গেছে, এমন লোকেও এ রোগে আক্রান্ত হয়েছে। সে যাই হোক, এ রোগ ধরবার চিকিৎসা বের করতে আমরা অন্ধকারে হাতড়েছি। রোগীদের ওপর পরীক্ষা করে করে বের করতে হয়েছে। এ ব্যাপারে আমার একটা সুবিধে ছিল, আমার নিজেরই রোগটা হয়েছিলো বলে পরীক্ষা করাটা অনেক সহজ হয়েছিলো। সব ডাক্তার এ সুযোগ পান নি। ভিটামিন 'সি' ইঞ্জেকশনে কাজ দেয় বেশ। নাগাসাকির ডাক্তাররা দেখেছেন—গ্লুকোজ বা অ্যালকোহল ইঞ্জেকশনে ফল পাওয়া যাচ্ছে। অ্যান্টি বায়োটিক্স আর ব্লাড ট্রান্সফিউশনও যথেষ্ট ব্যবহার হয়ছে পরে! কিন্তু একবার লিউকোমিয়া দাঁড়িয়ে গেলে—

[থমকে দাঁড়ালেন শেষ রোগীটির কাছে। সে মৃত।]

লিউকোমিয়ার কোনো চিকিৎসাই বেরোয়নি এখনো। (ঘড়ি দেখে) আচ্ছা, আর যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে, আমি চলি, আমাকে হাসপাতালে ফিরতে হবে।

[ঝুঁকে অভিবাদন করে চললেন]

শরৎ : (তাড়াতাড়ি) এক সেকেন্ড ডক্টর হাইচিয়া!

হাচিইয়া : (ফিরে) হ্যাঁ, বলুন?

শরৎ : বিকিনির হাইড্রোজেন বোমার সময় যারা এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিলো, তাদের সঙ্গে অ্যাটম বমের রোগীদের পার্থক্য কী?

[এই প্রথম হাচিইয়ার ব্যস্ত দ্রুত কণ্ঠস্বরে ধীরতা এলো। তিক্ততা এলো]

হাচিইয়া : তফাৎ? হাইড্রোজেন বোমার তেজস্ক্রিয় প্রভাবের তুলনায় অ্যাটম বম ছেলেমানুষ। অবশ্য বিধ্বংসী ক্ষমতা ধরলেও একই তফাৎ। লস আলমোসের বৈজ্ঞানিকরা হিসেব করে বলেছেন—পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে খতম করতে মাত্র চারশো টন ডিউটোরিয়াম লাগে।

[যেতে গিয়ে আবার ফিরলেন]

একটা সুবিধে আছে। রোগী দেখা, চিকিৎসা করা—এসব ঝামেলার দরকার হবে না আর!

[হন হন করে বেরিয়ে গেলেন, যেন অনেক দেরি হয়ে গেছে।]

শরৎ : আচ্ছা, এবার ডাক যাক—

সাধন : (হঠাৎ চেঁচিয়ে) আর থাক শরৎ! যথেষ্ট হয়েছে।

শরৎ : যথেষ্ট হয়েছে?

সাধন : হিরোশিমার বীভৎসতা পর পর ঘেঁটে গিয়ে কী লাভ হবে? এর কি কোনো শেষ আছে? ছাত ভেঙে মরা, আগুনে পুড়ে মরা, রোগের যন্ত্রণায় তিলে তিলে মরা—এর কোনটা জানতে বাকি আছে আমাদের?

শরৎ : আর একরকম মরা আছে সাধন। ভয়ে মরা।

সাধন : ভয়ে মরা?

শরৎ : হ্যাঁ, ভয়। আর একটা বোমার ভয়। হিরোশিমা নাগাসাকির পর আর একটা বোমা। তৃতীয় বোমা।

সাধন : কিন্তু সে তো—

শরৎ : আর এইখানেই হিরেশিমা-নাগাসাকির সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র, এই ভয়ে। ভয়ে মানুষের বুদ্ধি লোপ পায়, আবার ভয়েই মানুষের চেতনা জাগে। প্রাণীর আদিমতম অনুভূতি—ভয়।

সাধন : যদি তাই হয়—

শরৎ : দাঁড়া সাধন, একটু সবুর কর। তোর ডিফেন্সের ওকালতি শুনবো, শোনা আবার দরকার। কিন্তু তার আগে এক লক্ষ তেষট্টি হাজার ছ'শো একচল্লিশের সাক্ষ্যটা শুনে নে।

সাধন : সে আবার কী?

শরৎ : একটা নম্বর। ওয়ান-সিক্স-থ্রি-সিক্স-ফোর-ওয়ান। একটা ফাইল—কাওয়াগুচি। (গলা তুলে) এনেমন কাওয়াগুচি। (সাধনকে) এর সাক্ষ্যটা একটু এলোমেলো হতে পারে। মাথাটা কী অবস্থায় আছে তার উপর নির্ভর করছে। (আবার ডেকে) এনেমন কাওয়াগুচি!

[এনেমন এলো। পদক্ষেপ দ্বিধাগ্রস্ত। চারিদিকে চাইছে, যেন খুঁটিয়ে চারিপাশটা বুঝে নিতে চাইছে।]

এনেমন, কেমন আছো?

এনেমন : ভালো। ভালো আছি!

[প্রতি প্রশ্ন বুঝে উত্তর দিতে এনেমনের একটু দেরি হচ্ছে, যেন খুঁটিয়ে বুঝে উত্তরটা ভেবেচিন্তে দিতে হচ্ছে।]

শরৎ : এখন কী করো?

এনেমন : কিছু না। কিছু করি না!

শরৎ : খাওয়া জোটে কী করে?

এনেমন : কাপড় কুড়োই। ছেঁড়া নেকড়া। কাগজ। বিক্রি হয়। ভাঙা টিন। লোহা লক্কড়ের টুকরো। তাও বিক্রি হয়।

শরৎ : তুমি আগে কী করতে এনেমন?

এনেমন : আগে?

শরৎ : ১৯৪৫ সালের অগাস্টের আগে?

এনেমন : ১৯৪৫? অগাস্ট? ও, হিরোশমা!

[সচকিত হয়ে চারিদিকে তাকালো]

কাজ করতাম। চাকরি করতাম।

শরৎ : কোথায়?

এনেমন : মিৎসুবিসি। মিৎসুবিসি কারখানা।

শরৎ : কী কাজ?

এনেমন : এঞ্জিনীয়ারিং।

শরৎ : তুমি এঞ্জিনীয়ার ছিলে?

এনেমন : হ্যাঁ, এঞ্জিনীয়ার। মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ার। ছিলাম।

শরৎ : ছউই অগাস্টের গল্পটা আমাদের বলতে পারবে মনে করে?

এনেমন : গল্প? ও ছউই অগাস্ট। হ্যাঁ, গল্প। (একটু ভেবে নিয়ে) ছউই অগাস্ট। হিরোশিমা। মিৎসুবিসি ফ্যাক্টরি। চব্বিশ ঘণ্টায় দু'টো শিফট্। বারো ঘণ্টা করে। যুদ্ধের সময় তো? প্রথম শিফট্—রাত দু'টো থেকে বেলা দু'টো। আমার প্রথম শিফট্।

শরৎ : তোমার বয়স তখন কতো?

এনেমন : চল্লিশ! খুব ভালো স্বাস্থ্য ছিল। তখন তো খাওয়াদাওয়ার কষ্ট—লোকে বেশি খাটতে পারতো না। আমি পারতাম। বারো ঘণ্টার শিফট্—আমার কষ্ট হোতো না।

শরৎ : তারপর বলো।

এনেমন : তারপর? তারপর ভোর হোলো। তারপর আটটা বাজলো। অফিসে লোক বসে আছে। ব্লু প্রিন্ট চেক করতে হবে। মনে পড়লো। সই করতে হবে। অফিসে। কারখানা থেকে বেরিয়ে ইয়ার্ডে এলাম। ইয়ার্ডের ওপাশে অফিস। ইয়ার্ডে অতো আওয়াজ নেই। ইয়ার্ড ঠাণ্ডা। সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়া আসে। আকাশ দেখা যায়। তাকিয়ে দেখলাম। আকাশ দেখলাম। তখন—সাইরেন বাজলো।

[এনেমন হঠাৎ দু'হাত মুখে তুলে সাইরেনের আওয়াজ নকল করতে লাগলো]

শরৎ : এনেমন!

এনেমন : অ্যাঁ? হ্যাঁ। তখন সাইরেন বাজলো। সবাই কারখানা থেকে বেরিয়ে এলো। দলে দলে।

[কোরাস একদিক থেকে আব একদিকে গেলো]

বেরিয়ে শেলটরে গেলো। ইয়ার্ড দিয়ে। আমার পাশ দিয়ে। আমি তাড়াহুড়ো করিনি। হিরোশিমার বোমা তো পড়ে না (অন্যমনস্ক ভাবে) নাগাসাকিতেও পড়তো না। (সচকিত হয়ে) হ্যাঁ, তারপর সবাই শেলটারে গেলো। ঢুকে গেলো। আমি গেলাম না। আকাশ দেখলাম। অল-ক্লীয়ার বাজলো। সবাই ফিরলো।

[কোরাস ফিরে এলো. যেন শেলটার থেকে কারখানায়]

কারখানায় গেলো। আমি অফিসে যাবো। তখন প্লেন দেখলাম। আকাশে। অনেক উঁচুতে। আমাদের জেরো প্লেন নয়। বি-টোয়েন্টিনাইন। আমেরিকান। কিন্তু অল ক্লীয়ার হয়ে গেছে। তা ছাড়া বোমা তো পড়ে না। হিরোশিমায় বোমা পড়ে না। অফিসের দিকে গেলাম। একটুখানি গেলাম। একটু—কয়েক পা—তখন—হঠাৎ—

শরৎ : ওটা বাদ দিয়ে যাও এনেমন। আমরা জানি।

এনেমন : অ্যাঁ? হ্যাঁ, পিকাদন। সবাই জানে। এখন—সবাই জানে। (একটু থেমে) কারখানা এপিসেন্টার থেকে দূরে। সাড়ে চার হাজার মিটার দূরে। তবু ব্লাস্টের ধাক্কায় পড়ে গেলাম। পড়ে রইলাম। তারপর—জ্ঞান হোলো। ব্লাস্টে জামা ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। কারখানায় আগুন ধরেছে। আগুন—আর ধোঁয়া। আর ধুলো। আর মেঘ। হ্যাঁ, মেঘ! মেঘ মাটি থেকে আকাশে উঠছে। কিছু বুঝলাম না। উঠলাম। কোমরে খুব ব্যথা! হাত দিলাম। রক্ত। একটা টালি ছিটকে এসে লেগেছে। খুব গরম। গায়ে ফোস্কা পড়েছে। কিছু বুঝলাম না। শুধু বুঝলাম—পালাতে হবে। পালাতে হবে—যেমন করে হোক। বাঁচতে হবে! ছুটে বেরোলাম। চারিদিকে আগুন। নদীর দিকে ছুটলাম! ওখা নদী। কারখানার পাশে ওখা নদী। সেদিকেও আগুন। কারখানার গুদামে আগুন লেগেছে। শুধু নদীতে আগুন নেই। নদীর জলে লাফিয়ে পড়লাম। ভালো সাঁতার জানতাম! সরু নদী, কিন্তু অনেক মড়া ভাসছে। অনেক জ্বলন্ত জিনিস—ছিটকে ছিটকে পড়ছে। ডুব দিতে দিতে ওপারে গেলাম। উঠতে পারলাম না। নলখাগড়ায় আগুন ধরে গেছে। গাছ জ্বলছে। ঘাস জ্বলছে। ফিরলাম। সাঁতরে ফিরলাম এপারে। এপারে আগুন দ্বিগুণ

হয়ে জ্বলছে। একটা গাছের শিকড় ধরে ঝুলে রইলাম। গাছটা জ্বলছে। আগুন পড়ে পড়ে হাত মুখ জ্বলে গেলো। ছেড়ে দিলাম। আবার ওপারে। জলে বড়ো বড়ো কাঠ ভেসে আসছে। বড়ো বড়ো গাছের ডাল। আর মড়া। সাঁতরানো যায় না। ওপারেও আগুন। ছ'বার। এমনি করে ছ'বার এপার-ওপার হলাম। কতোখানি চলে গেলাম ভেসে। তারপর এক জায়গায় উঠতে পারলাম। তবু চারিদিকে আগুন। পালাও! আগুন! দৌড়ে পালাও! আগুন!

[এনেমন এতোক্ষণ পড়ে যাওয়া থেকে সাঁতার, দৌড়—সব কিছু অভিনয় করে যাচ্ছিলো কথার সঙ্গে সঙ্গে। এখন এক জায়গায় হুমড়ি খেয়ে পড়লো। কথা বন্ধ হোলো তার।]

শরৎ : (একটু অপেক্ষা করে) বলো এনেমন।

এনেমন : অ্যাঁ?

[উঠলো। আবার তার কথা আর অভিনয় শুরু হলো। কোরাসও যোগ দিলো তার সঙ্গে বর্ণনা অনুযায়ী।]

হ্যাঁ, আগুন। আবার নদী। আবার খাল। সাঁতার। দৌড়। শেষে হিজিয়ামা পৌঁছোলাম। ছ'ঘণ্টা পরে। ভীষণ রোদ। শুয়ে—ঘুমিয়ে পড়লাম। বিকেলে ঘুম ভাঙলো। তখন বেশি ব্যথা নেই। ঠাণ্ডা হাওয়া। বাড়ির দিকে গেলাম। স্টেশনের কাছে বাড়ি। এক বন্ধুর সঙ্গে থাকতাম। খুব ভিড়। অনেক মানুষ। মানুষ? কিন্তু মানুষের মতো চেহারা নয়। ভিড় ঠেলে এগোলাম। বাড়ি গেলাম। বাড়ি নেই। বন্ধু নেই। সাফ হয়ে গেছে। শুধু মানুষ। সব শহরের বাইরে যাচ্ছে। বসে বসে দেখলাম। ভাবলাম—শহরটা গেলো কোথায়? (একটু থেমে) ক্ষিদে পেলো। খাবার নেই। খাবারের দোকান ছাই হয়ে গেছে। শীত করলো। গায়ে জামা নেই। হাঁটলাম। ভিড়ের সঙ্গে। অনেক হাঁটলাম। কোই স্টেশানে পৌঁছোলাম। হিরোশিমার পরের স্টেশন। বড়ো মার্শালিং ইয়ার্ড আছে। একটা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একটা ওয়াগনে উঠলাম, শুয়ে— ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর—ভালো মনে নেই। একসময়ে টের পেলাম—গাড়ি চলছে। চলছে—আর থামছে। একটা টানেলে অনেকক্ষণ থেমে রইলো। অন্ধকার। কে যেন কথা বলছে। কে যেন ভাত দিলো এক বাটি। কী সব বললো যেন। কী সব বললো। তারপর দেখি—সবুজ মাঠ। আর নদী। মাঝে মাঝে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। আর গাছ। পাখি—পাখি ডাকছে। মনে হোলো—যুদ্ধ নেই। যুদ্ধ থেমে গেছে। আগুন নেই। বোমা নেই। সব থেমে গেছে। সব—থেমে গেছে। এমনি কতোদিন কেটেছে জানি না। একদিন সকালে—গাড়ি থামলো। সবাই নামলো। নেমে এলাম। সকলের সঙ্গে। হেঁটে হেঁটে—বাইরে এলাম। অবাক হয়ে দেখি—আরে? আমার নিজের শহর! সেন্ট্রাল স্টেশন! অ্যাভিনিউ ধরে হাঁটলাম। জুনিন মাচির দিকে। রাস্তার দু'পাশে গাছ। ওদিকে জুনিন মাচি। আকাশে সাদা মেঘ। আকাশে—আকাশে প্লেন! কী প্লেন? কী প্লেন? হঠাৎ ভীষণ ভয় হোলো! পেটের মধ্যে গুলিয়ে উঠলো! ছুটলাম। একটা নালায় লাফিয়ে পড়লাম। প্লেনটা

ঘুরছে। একটা মেঘের আড়ালে যাচ্ছে। কিন্তু ওটা কী? ওটা কী নামছে। কালো, ছোট্ট—ওটা কী নামছে? নেমে আসছে? নেমে আসছে? তারপর—(চিৎকার করে) আবার পিকাদন! পিকাদন! পিকাদন!

[হুমড়ি খেয়ে পড়লো। তারপর ভাঙা গলায়—]

আমার নিজের শহর। নাগাসাকি। না—গা—সাকি।

শরৎ : তিনদিনে দু'বার পিকাদন। দু'টো অ্যাটম বোমা। দু'টো শহরের ধ্বংস। আমেরিকার খবরের কাগজওয়ালারা এর চেয়ে অনেক কম ইন্টারেস্টিং খবর হাজার হাজার ডলার দিয়ে কেনে। এটা কেনেনি যদিও।

সাধন : এ রকম অবস্থায় পৌঁছোলো কী করে?

শরৎ : কী করবে? মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারকে কে চাকরি দেবে তখন জাপানে? কোন্ কারখানাটা আস্ত আছে? মাথাটাও বিগড়ে গেছে। যেখানে সেখানে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। যা পায় কুড়িয়ে কুড়িয়ে খায়। ন্যাকড়া কুড়োয়। আর এ শহর ও শহর ঘোরে। যেন তাড়া খেয়ে খেয়ে ঘোরে। অ্যাটম বোমা যেন ওকেই বিশেষ করে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। দু' দু'বার পেয়েছে, আবার পেলে আবার মারবে। তাই পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়।

[এনেমন হঠাৎ লাফিয়ে উঠে আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে চিৎকার করে ছুটে বেড়াতে লাগলো]

এনেমন : পিকাদন! পিকাদন! পিকাদন!

শরৎ : এনেমন! এনেমন! চলো! এসো!

[শরৎ আর সাধন তাকে ধরে সযত্নে বসিয়ে দিলো অন্যদের কাছে]

এই হোলো ১৯৫৬ সালের এনেমন। তখনো এনেমন। এনেমন কাওয়াগুচি।

সাধন : তার মানে?

শরৎ : ১৯৫৭ সালের মাঝামাঝি কাঁধের কাছে একটা জ্বালা শুরু হলো। সারা গায়ে ফোঁড়া উঠলো। সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয়ের মলমে কোনো কাজ হয় না। শেষে নাগাসাকির এক ভুক্তভোগী ওকে নিয়ে গেলো এ-বি-সি-সি-র স্পেশ্যালিস্টদের কাছে। তারা লুফে নিলো প্রায়।

সাধন : কেন?

শরৎ : অ্যাটমিক ক্যান্সার। নাগাসাকিতে এরকম কেস খুব কম পাওয়া গেছে।

সাধন : তারপর?

শরৎ : তারপর—এনেমন কাওয়াগুচির ন্যাকড়া কুড়োনোর দিন শেষ হোলো। নাম ঘুচে গেলো। সে নম্বর হোলো। হিরোশিমা-নাগাসাকির মিলনসম্ভূত সন্তান—ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ফোর ওয়ান।

সাধন : আজও তাই?

শরৎ : আমি জানি না। এতোদিন বেঁচে থাকবার কথা নয়। কিন্তু তাতে কী এসে যায়? ১৯৫৬ সালেই কি সে বেঁচে ছিল? যা দেখলি তাকে কি বেঁচে থাকা বলে?

সাধন : একেই তুই বলতে চাইছিস ভয়ে মরে থাকা?

শরৎ : শুধু একেই বলছি না সাধন। শুধু এনেমনই তৃতীয় বোমার ভয়ে মরে আছে তা নয়। আরো হাজার হাজার এনেমন কাওয়াগুচি আছে। জাপানে আছে, জাপানের বাইরেও আছে। তারা ন্যাকড়া কুড়োয় না, পোড়া সিগারেট জমিয়ে রাখে না, রাত্রে ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে ওঠে না, কিন্তু তারা সবাই মনে মনে পালিয়ে বেড়াচ্ছে তৃতীয় বোমার তাড়া খেয়ে খেয়ে।

সাধন : ঠিক। সবাই জানে, যদি আবার যুদ্ধ বাধে—

শরৎ : যুদ্ধ নয় সাধন। যুদ্ধ পরের কথা। তৃতীয় বোমা যুদ্ধের অপেক্ষায় বসে নেই।

সাধন : তার মানে?

শরৎ : (ডেকে) সাঞ্জিরো মাসুদা!

[সাঞ্জিরো এলো। বাঁ-পাটা ছোট, তাই খুঁড়িয়ে হাটে। ঝুঁকে অভিবাদন জানিয়ে কাঠগড়ায় উঠলো।]

নাম?

মাসুদা : সাঞ্জিরো মাসুদা।

শরৎ : দেশ?

মাসুদা : নিপ্পন। ইয়াইজু বন্দর।

শরৎ : বর্তমান পেশা?

মাসুদা : কারিগরির কাজ করি। কিছু ক্ষেত খামার আছে।

শরৎ : আগে কী করতে?

মাসুদা : মাছধরা জাহাজের খালাসি ছিলাম।

শরৎ : শেষ কোন্ জাহাজে কাজ করেছো?

মাসুদা : ফুকুরিয়ু মারু। টুনিমাছ ধরা ট্রলার। নিরানব্বই টন। খুব ভালো জাহাজ।

শরৎ : ফুকুরিয়ু মারু মানে কী—জানিস সাধন? লাকি ড্রাগন। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলো। সব নাবিককে বিখ্যাত করে দিয়েছিলো। তাই না মাসুদা?

মাসুদা : (সাধারণ কণ্ঠে) হ্যাঁ, তখন সব কাগজে আমাদের নাম বেরিয়েছিলো।

সাধন : কখন?

শরৎ : ১৯৫৪ সালে। জানুয়ারির শেষে ইয়াইজুর ছোট্ট ঘাট থেকে ফুকুরিয়ু মারু বেরোলো, আর পাঁচটা মাছ-ধরা ট্রলারের মতো।

মাসুদা : হ্যাঁ, সে সালে ঠাণ্ডা বেশি পড়েছিলো। মাছ ভালো উঠলো না। টুনিমাছের ঝাঁক দক্ষিণে চলে যায় ঠাণ্ডা বেশি পড়লে। খুঁজতে খুঁজতে আমরাও দক্ষিণে চললাম। পয়লা মার্চ টুনিমাছের ঝাঁক মিললো। জাহাজ লঙ্গর হোলো। জাল পাতা রইলো সারারাত। ভোরে মাছ তুলে ফিরতি পথে রওনা হবার কথা।

শরৎ : তুমি সে রাতে কী করছিলে?

মাসুদা : আমার ওয়াচ ডিউটি ছিল। ডেকের ওপরে ছিলাম।

শরৎ : তারপর?

মাসুদা : ভোররাতে, সবে আলো ফুটছে তখন, হঠাৎ পশ্চিম দিকের আকাশ ঝলসে উঠলো একেবারে! সে কী আলো! সবাই তাজ্জব হয়ে গেলো। অনেক উঠে

এলো দেখতে। তারপর দেখি—একটা নীল মেঘ, মেঘটা হঠাৎ সাঁ করে সিধে উঠে গেলো আকাশে। নীল রঙ বদলে টকটকে লাল হয়ে গেলো। আকাশ, সমুদ্দুর সব যেন রক্তে লাল হয়ে গেলো বিলকুল।

[কোরাস উঠে এসেছে, তারা যেন ঐ জাহাজের নাবিক।]

শরৎ : কেউ তখন বুঝতে পারেনি?

মাসুদা : কবে কোন খবরের কাগজে পড়েছে, কার খেয়াল থাকে বলুন? খেয়াল থাকলে আর অতো কাছে লঙ্গর হয় জাহাজ?

শরৎ : কতো কাছে?

মাসুদা : একশো মাইলও হবে না।

সাধন : কিসের কাছে?

মাসুদা : বিকিনি।

শরৎ : বিকিনি অ্যাটলস্। দোসরা মার্চ, ১৯৫৪ সাল। হাইড্রোজেন বোমার প্রথম পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ। তোর মনে আছে সাধন—ছোটবেলায় রথের মেলায় হাইড্রোজেন বেলুন কিনে এনে খেলতাম, সুতো ছেড়ে দেখতাম কতোটা উঁচুতে ওঠে? হাইড্রোজেন গ্যাসটা তখন কতো চেনা ছিল, না? শান্ত নিরীহ একটা খেলনা।

সাধন : (মাসুদাকে) তারপর?

মাসুদা : তারপর হঠাৎ একজন চিৎকার করে উঠলো—বিকিনি! কাপ্তেন তক্ষুনি লঙ্গর তোলবার হুকুম দিলেন। এঞ্জিন চালু হোলো। আর সেই সময়—গড়াম! কান ফাটানো আওয়াজ! আর সে কী ঢেউ! জাহাজের নিচে ঢেউ ফুলে ফুলে উঠছে, আর তার মধ্যে জাল টানা হচ্ছে। মাছ। টুনি মাছ। হোল্ড বোঝাই। জাহাজ ফিরতি পথে। তারপর—বিষ, বিষ, খালি বিষ!

সাধন : বিষ?

মাসুদা : আকাশ থেকে বিষ ঝরে পড়লো। চার ঘণ্টা ধরে পড়লো। প্রথমে ভেবেছিলাম—কুয়াশা। তারপর মনে হোলো—ফিনফিনে বরফ। কিন্তু বরফ ওখানে কী করে পড়বে? তারপর দেখি—ধুলো। খুব মিহি সাদা ধুলো। টাইফুনে প্রবালের গুঁড়ো অমনি ওড়ে—দেখেছি আগে, কিন্তু আকাশ থেকে বরফের মতো পড়তে কখনো দেখিনি। দেখতে দেখতে গা, মাথা, সারা জাহাজ সাদা হয়ে গেলো একদম। কেউ হাতে নিয়ে দেখলো, কেউ মুখে দিয়ে দেখলো। একজন পুঁটলি বেঁধে রাখলো, দেশে ফিরে দেখাবে বলে। সারা পথ ঐ পুঁটলি তার বালিশের নিচে ছিল। জাহাজ ভর্তি ঐ সাদা ধুলো আমরাই ধুয়ে মুছে সাফ করলাম। কে জানতো তখন—বিষ ঘাঁটছি?

শরৎ : কখন বুঝলে সে কথা?

মাসুদা : তিন দিনের দিন একজন পড়লো। গায়ে শক্তি পায় না, দাঁড়াতে পারে না। কাপ্তেন রেস্ট অর্ডার দিলেন। পরদিন আরো দু'জন। বমি করে, ভেতরটা জ্বলতে থাকে, জ্বর ওঠে। যারা তখনো খাড়া ছিল, তাদের খাটনি বাড়লো খুব। সাতদিন

পরে সব্বার চোখ দিয়ে পুঁজ বেরোনো শুরু হলো। পুরো তেইশ জনেরই। সারা গায়ে লাল লাল ঘা। চুল উঠে যায়, চুলের সঙ্গে মাথার চামড়াও ওঠে। তাই নিয়ে কাজ করতে হবে, জাহাজ চালাতে হবে কোনোমতে। সে এক বুতুড়ে জাহাজ, ভূতে চালাচ্ছে। কেমন করে শেষ দিনগুলো গেলো—এখন ভালো করে মনে করতে পারি না। বারো দিন। চোদ্দ তারিখে ইয়াইজুতে জাহাজ ভিড়লো। ফুকুরিয়ু মারু জাহাজ।

শরৎ : লাকি ড্রাগন! দুনিয়া তখন সে ড্রাগনের লাক্-এর খবর পেয়ে গেছে। দুনিয়া তখন মুগ্ধ—এইটুকু মানুষের এইটুকু মগজ থেকে কী জিনিসই না বেরিয়েছে। ন'বছরে ইউরেনিয়াম-প্লুটোনিয়ামকে নব্বই বছর পেছনে ফেলে এসেছে—হাইড্রোজেন। সেই শান্ত নিরীহ বেলুন ভরা গ্যাসের পরমাণু ভেঙে জুড়ে ভেঙে মানুষের হাতে পৃথিবীকে লোপাট করে দেবার অফুরন্ত শক্তি—কিন্তু থাক! এখন থাক ওকথা। মাসুদা বলো।

মাসুদা : নেমে দেখি—খুব ভিড়। কিন্তু সবাই সরে সরে যাচ্ছে। আসল কারণ তখনো চাপা দেওয়া আছে, কিন্তু সবাই জানে। পালিয়ে যাচ্ছে সবাই। পরদিন টোকিওর রেডক্রস হাসপাতাল আর ইউনিভার্সিটি থেকে বললো—রেডিও অ্যাক্টিভিটি। আমরা টোকিওতে চালান হলাম এক এক করে।

শরৎ : তারপরের বিশদ বিবরণ শোনবার কোনো দরকার নেই সাধন। বড়ো বড়ো বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা যমের সঙ্গে লড়াই করে তেইশ জনের বাইশ জনকে ফিরিয়ে এনেছে। হাইড্রোজেন বোমার মাহাত্ম্যেরও প্রচুর তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে ঐ তেইশ জনের রোগযন্ত্রণায়। মাসুদা হাসপাতালে ছিল—ক'মাস যেন?

মাসুদা : এক বছর আট মাস।

শরৎ : এক বছর আট মাস। যতো রকম রোগের যন্ত্রণা আর বীভৎসতা তোর কল্পনায় আসবে সাধন, ধরে নে তার থেকেও অনেক বেশি মাসুদা ভুগেছে, হাসপাতালে একা শুয়ে শুয়ে।

মাসুদা : একা নয়, একা নয়! মা আসতো প্রতি মাসে দু'বার করে, ইয়াইজু থেকে! গাড়িভাড়া কোত্থেকে জোটাতো কে জানে? টোকিও শহরে রাস্তা হারিয়ে ফেলতো প্রায়ই। ইয়াইজুতে সবাই মা-কে এড়িয়ে চলতো—আমার কাছে আসতো বলে, তবু আসা কামাই যায়নি কখনো। চুপ করে বসে দেখতো। একদিন একগাল হেসে চিঠিটা বের করে দিলো।

সাধন : কার চিঠি?

মাসুদা : আমার সঙ্গে যার বিয়ে হবার কথা ছিল। বাড়ির দরজায় বন্ধ চিঠি রেখে গেছে। মা ধরে নিয়েছিলো—মা ভেবেছিলো—চিঠিটা পেয়ে হাসপাতালে আমার খুব ভালো লাগবে। সেদিন নিজের চেয়ে মা-র জন্যে আমার কষ্ট লেগেছিলো বেশি।

সাধন : কী ছিলো চিঠিতে?

মাসুদা : কী আবার থাকবে? যা থাকার কথা! বিষ-ছোঁয়া রোগীকে বিয়ে করবে কোন্ সাহসে?

শরৎ : কিন্তু বিয়ে তো একজন করেছে তোমায় শেষ অবধি?

মাসুদা : হ্যাঁ। এই বিষ-ছোঁয়া রোগী নিয়েই তার কাজ ছিল। টোকিও হাসপাতালে নার্স ছিল সে। কিন্তু—(থেমে গেলো)

শরৎ : (ধীর স্বরে) আমি জানি মাসুদা।

মাসুদা : না, আমি নালিশ করবো না। মা আছে। আমার বৌ খুব ভালো মেয়ে, ইয়াইজুর হাসপাতালে কাজ করে এখন। একটা ছোট বাড়ি তুলেছি—আমেরিকান সরকার ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলো, সেই টাকা দিয়ে। আমি ভালোই আছি। আর তাছাড়া—এ তো আমার একার নয়? একজন বাদে সকলেরই এক হাল।

সাধন : কী হাল?

শরৎ : বাইশ জনের মধ্যে একুশ জনেরই প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে রেডিও অ্যাক্টিভিটির দাপটে। জাপানীদের কাছে এটা প্রায় অপূরণীয় ক্ষতি।—আচ্ছা মাসুদা, তুমি এসো।

[মাসুদা অভিবাদন করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেলো।]

তৃতীয় আণবিক বোমার শহীদ। যুদ্ধের জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে না সাধন। একটা দু'টো নয়, বহু আণবিক বিস্ফোরণের পরীক্ষা হয়েছে আজ অবধি এই পৃথিবীর বুকে। তার রেডিওঅ্যাক্টিভ ফল-আউটের হিসেব এখনো পুরো কেউ জানে না। শুধু এইটুকু জানি—১৯৬২ পর্যন্ত যে ক'টা বিস্ফোরণের পরীক্ষা হয়েছে, তার ফল-আউটের তেজেই এই পৃথিবীতে বিশ লক্ষ বিকলাঙ্গ শিশু জন্মেছে। একটা বৈজ্ঞানিক তথ্য বলবার আছে এইখানে। ১৯৪৫ সালে হিরোশিমার বোমাটার শক্তি ছিলো কুড়িহাজার টন টি-এন-টি-র সমান। আর ১৯৫৪ সালে বিকিনির হাইড্রোজেন বোমার শক্তি দু'কোটি টন টি-এন-টি। অর্থাৎ ঠিক এক হাজার গুণ। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা!

সাধন : তাহলে এবার বৈজ্ঞানিকের কাঠগড়ায় দাঁড়াবার পালা?

শরৎ : হ্যাঁ।

সাধন : কাকে ডাকবে বলো?

[শরৎ যেন একটা কাগজ বেছে নিয়ে সাধনকে দিলো]

শরৎ : বলছি। আগে এইখানটা পড়ো।

সাধন : কী এটা?

শরৎ : একটা চিঠি। ১৯৩৯ সালের দোসরা অগাস্ট আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্ট চিঠিটা পেয়েছিলেন।

সাধন : "ফ্রান্সের জোলিও, আমেরিকান ফের্মি আর শিলার্ডের কাজের মধ্যে দিয়ে গত মাস চারেকের ভিতর একটা সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। যথেষ্ট পরিমাণ ইউরেনিয়ামে একটা নিউক্লিয়ার চেইন রিঅ্যাকশন আরম্ভ করা সম্ভব, যা কাজে লাগিয়ে প্রচণ্ড শক্তিশালী বোমা তৈরি করতে পারা ধারণার অতীত নয়, সম্পূর্ণ

নিশ্চিত না হওয়া গেলেও। এই জাতের একটি মাত্র বোমা একটা পুরো শহর ধ্বংস করে দিতে পারে, চারপাশের কিছু অঞ্চল সমেত।"

শরৎ : এই চিঠি পাবার পর রুজভেল্ট যে বিরাট প্রচেষ্টা আরম্ভ করলেন, তার নাম দেওয়া হোলো ম্যানহাটান প্রজেক্ট। গত মহাযুদ্ধের মধ্যেই তাতে খরচ হলো চব্বিশ-শো কোটি টাকা। এক লাখ পঁচিশ হাজার লোক অক্লান্ত খেটে কারখানা ল্যাবরেটরি খাড়া করলো। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রতিভাশালী বিজ্ঞানীদের বিরাট দল বছরের পর বছর একযোগে খাটলেন। চরম গোপনীয়তার বেড়াজালে ঘেরা আজব এক বিজ্ঞানশিবিরে আলাদিনের দৈত্য বেরোলো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণু ভেঙে।

সাধন : কিন্তু এ চিঠি—

শরৎ : আমি জানি সাধন। আমি জানি এ চিঠি তিনি কেন লিখেছেন। জানি বলেই অন্য সবাইকে বাদ দিয়ে এঁকেই ডাকতে চাইছি।

সাধন : (উঠে দাঁড়িয়ে) শরৎ! তুমি এঁকেও আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চাও?

শরৎ : আসামী কেন সাধন? আসামী, ফরিয়াদি, সাক্ষী, বিচারক—সব। একাই সব। প্রত্যেকে। প্রত্যেক মানুষ।

সাধন : (অল্প থেমে) বেশ, ডাকো।

শরৎ : (ডেকে) প্রফেসর অ্যালবার্ট আইনস্টাইন!

[আইনস্টাইন এলেন, ধীর পদক্ষেপে, কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়ালেন। শরৎ সাধন স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে, কেউ কোনো প্রশ্ন করলো না।]

আইনস্টাইন: হ্যাঁ, ও চিঠি আমার। বৈজ্ঞানিক লেও শিলার্ড যখন ও চিঠি আমাকে লিখতে বলেন, তখন তাঁর যুক্তিকে আমি অস্বীকার করতে পারিনি। আমার ছোট্ট অঙ্কটাকে যে সব দিগ্বিজয়ী বৈজ্ঞানিকরা বাস্তবে প্রমাণ করেছিলেন, তাদের সবাই আমেরিকায় এসে জমা হন নি। নীল্‌স বোহ্‌র এলেন, এনরিকো ফের্মি, মেইটনের এলেন, কিন্তু নাৎসি জার্মানীতে রয়ে গেলেন অটো হান ফ্রিট্‌জ্ স্ট্রাসমানের মতো বৈজ্ঞানিকরা, যাঁরা ১৯৩৮ সালে বের্লিনের কাইজার উইলহেল্‌ম্ ইনস্টিটিউটে ইউরেনিয়ামের অ্যাটমকে ভেঙে দেখিয়েছেন। সেদিন কে বলতে পারতো—এই বিরাট বিধ্বংসী শক্তি তাঁরা হিটলারের হাতে তুলে দেবেন না? কে বলতে পারতো—চুপ করে বসে থাকো, আগুন নিয়ে খেলা কোরো না? সারা বিশ্ব তো তখন আগুনেই জ্বলছে? আমার কি সেদিন অধিকার ছিলো—জেনেও না জানাবার?

[এরা জবাব দিলো না। আইনস্টাইন একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন।]

আর একটা চিঠি আমি লিখেছিলাম প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে। এ চিঠির পাঁচ বছর পরে।

সাধন : আর একটা চিঠি?

আইনস্টাইন : হ্যাঁ। ততেদিনে লস আলামোসে আণবিক বোমা তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু হিটলার হেরে গেছে, প্রমাণ হয়ে গেছে— আণবিক অস্ত্র তার ছিল না। লেও

শিলার্ড সে সময়ে—শুধু শিলার্ড কেন, অধিকাংশ পরমাণু বিজ্ঞানী তখন পাগলের মতো চেষ্টা করছেন মানুষের সৃষ্টি এই দানবকে বশে আনবার। ১৯৪৫-এর এপ্রিলে শিলার্ডই আমাকে দিয়ে লিখছিলেন এই দ্বিতীয় চিঠি।

সাধন : কী ছিল এই চিঠিতে?

আইনস্টাইন : এ চিঠিতে বলা হয়েছিলো—শত্রুপক্ষ, মিত্রপক্ষ এবং কয়েকটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র—এদের সকলের প্রতিনিধিদের ডাকা হোক প্রশান্ত মহাসাগরের এক জনহীন দ্বীপে। তাদের সামনে পরীক্ষা করে দেখানো হোক আণবিক বোমার বিধ্বংসী ক্ষমতা, যা দেখে শত্রুপক্ষ যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। একমাত্র এই উপায়ে অসংখ্য মানুষের জীবনরক্ষা হতে পারে, শান্তি ফিরে আসতে পারে।

সাধন : রুজভেল্ট রাজি হলেন না?

আইনস্টাইন : রুজভেল্ট এ চিঠি দেখেন নি।

সাধন : দেখেন নি?

আইনস্টাইন : না। এ চিঠি, আর তার সঙ্গে শিলার্ডের এক বিস্তারিত মেমোরান্ডাম রুজভেল্টের টেবিলে পৌঁছেছিলো, তখনো খোলা হয় নি। বারোই এপ্রিল রুজভেল্ট হঠাৎ মারা গেলেন।

সাধন : তারপর?

আইনস্টাইন : ট্রুম্যানের আমলে কিছু করা গেলো না। শিলার্ড, জেমস ফ্রাঙ্ক, রাবিনোউইচ্, আরো বহু বৈজ্ঞানিক আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। শেষ অবধি এক বিশেষজ্ঞ কমিটির হাতে প্রশ্নটা গেলো। সে কমিটিতে গভর্নমেন্ট আর মিলিটারি প্রতিনিধি ছিলেন, আব ছিলেন সাতজন নামকরা পরমাণু বিজ্ঞানী। সে কমিটি রায় দিলেন—

[থেমে গিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ালেন আইনস্টাইন]

শরৎ : এই কমিটির তিনটি সুপারিশ প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের কাছে পাঠানো হয়।

সাধন : (যেন কাগজ দেখে) "এক—জাপানের উপর যতো শীঘ্র সম্ভব এই বোমা ব্যবহার করা হোক। দুই—বোমার লক্ষ্যস্থল যৌথ হওয়া উচিত, অর্থাৎ কোনো সামরিক ঘাঁটি বা কারখানা যার চারিদিকে অথবা পাশেই বিধ্বস্ত হবার মতো বহু বাড়িঘর আছে। তিন—বোমাটির চরিত্র সম্বন্ধে কোনো সতর্কবাণী যেন আগে না দেওয়া হয়।

আইনস্টাইন : এই শেষ প্রস্তাবটি এতো ভয়ানক যে নৌবাহিনীর প্রতিনিধিও আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু কমিটির আর সবাই—কমিটির বৈজ্ঞানিকরা—

[আবার থেমে গিয়ে মাথা নাড়তে লাগলেন]

হিরোশিমার ছবি আমি দেখেছি। সাত বছর পরে একজন আমাকে দেখায়। কয়েকটি জাপানী পত্রিকায় বেরিয়েছিলো। আমি—আমার মনে হয়েছিলো—এ যদি জানতাম, বৈজ্ঞনিক না হয়ে মিস্ত্রী হতাম!

শরৎ : সেই ছবি দেখবার পর আপনি এক জাপানী প্রকাশকের কাছে একটা চিঠি লিখেছিলেন।

আইনস্টাইন : হ্যাঁ। (যেন কাগজ পড়ে) তা আমি মনে করি, যুদ্ধের সময় মানুষ মারাও খুন করার সামিল। তবু যতোদিন দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পরস্পরের সহযোগিতা না করছে, যতোদিন তাদের বিভেদের মীমাংসা আর শান্তিরক্ষা আইনসঙ্গত উপায়ে না করছে, ততোদিন তাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। এমন অবস্থায় একটা দেশকে সব রকম পন্থাই নিতে হয়, বর্বরতম অস্ত্রও তৈরি করতে হয়, তা না হলে অস্ত্রপ্রতিযোগিতায় হেরে যেতে হবে। এতে শুধু যুদ্ধকেই টেনে নিয়ে আসা হয়, এবং এ যুগে যুদ্ধ মানেই সম্পূর্ণ সর্বব্যাপী ধ্বংস। বর্তমান অবস্থায় যুদ্ধের কোনো সীমা নির্দিষ্ট করে রাখা সম্ভব নয়। একমাত্র কার্যকরী উপায় হোলো—যুদ্ধ বস্তুটাকেই বিলুপ্ত করা। মানুষকে এই একটা উদ্দেশ্য নিয়েই এগোতে হবে, অন্য কোনো পথ নেই। বিভিন্ন দেশের সামাজিক জীবনে মূলগত পার্থক্য এতো বেশি যে এ দাবি তাদের কাছে করা নিঃসন্দেহে কঠিন; কিন্তু তবু, অসম্ভব নয়। (মুখ তুলে) না। অসম্ভব নয়। অসম্ভব কক্ষনো নয়। সম্ভব করতেই হবে! যেমন করে হোক, সম্ভব করতেই হবে, না হলে—

[উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন, এখন আবার হতাশ ভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন]

(ভাঙা গলায়) বিজ্ঞানের দীর্ঘ ইতিহাসে সবচেয়ে মারাত্মক ভুল বৈজ্ঞানিকেরা কী করেছেন জানো? হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করা।

[অন্ধকার। আলো জ্বলতে দেখা গেলো—সাধন বসে আছে, শরৎ তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। কোরাস সারি বেঁধে একদিকে, পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে।]

শরৎ : কাউন্সেল ফর দ্য ডিফেন্স। (সাধন নিরুত্তর) কাউন্সেল ফর দ্য ডিফেন্স!

সাধন : শরৎ।

শরৎ : কী?

সাধন : তুই এ সব ছেড়ে দে।

শরৎ : আমি ছেড়ে দিলেই কি 'এ সব' আমাকে ছাড়বে?

সাধন : এ সব ভুলে যা।

শরৎ : ভুলে যাবো? কী করে?

সাধন : চেষ্টা করে। অন্যদিকে মন দিয়ে।

শরৎ : ধরে নেওয়া গেলো- চেষ্টা করে ভোলা সম্ভব। কিন্তু ভোলবার অধিকার আছে তোর আমার?

সাধন : তোর আমার এতে কিছু করবার নেই।

শরৎ : কার করবার আছে?

সাধন : ওপর মহলের লোকেদের। যারা দেশ চালায়, যুদ্ধ বাধায়। তারা যদি না বোঝে, তুই আমি কী করতে পারি?

শরৎ : তুই আমি বাসের প্যাসেঞ্জার, পেছনের সিটের খদ্দের। ড্রাইভার ঘণ্টায় আশি মাইল স্পীডে বেপরোয়া গাড়ি হাঁকিয়ে চলবে, কিন্তু আমরা বলতে পারবো না—ওহে আস্তে! দেখে চলো! ওই বাচ্চাটাকে বাঁচিয়ে। প্রশ্ন করতে পারবো

না—ড্রাইভারটার লাইসেন্স আছে কী না! সে পাগল কি না, অন্ধ কি না! আমাদের 'অন্য' দিকে মন দিতে হবে! জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখে বলতে হবে—আহা, কী সুন্দর!

সাধন : তাই বলে দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে জীবনটা নষ্ট করবি? যে ব্যাপারে তোর বিন্দুমাত্র দায়িত্ব নেই—

শরৎ : কে বলে নেই?

সাধন : কী দায়িত্ব আছে, বল?

শরৎ : দু'টো দায়িত্ব আছে। এক—আমি আর ঐ ড্রাইভারটা একই জাতের—মানুষ। দুই—আমি আর ওই ড্রাইভার একই শতাব্দীতে জন্মেছি, এই বিংশ শতাব্দী।

সাধন : এই বিংশ শতাব্দীতে তুই আর ড্রাইভার ছাড়া আরো অনেকে জন্মেছে। তাদের সকলের দায়িত্ব তুই যদি একা—

শরৎ : হ্যাঁ সাধন, তাদের সকলের দায়িত্ব আমার একার! ঠিক যেমন তাদের সকলের দায়িত্ব তোর একার! ওদের প্রত্যেকের একার একার!

সাধন : আর কেউ যদি সে দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে রাজি—

শরৎ : ঘাড়ে নিতে রাজি না হয়, তবু আমাকে নিতে হবে। (এগিয়ে এসে তীব্রস্বরে) মনে কর আজ থেকে হাজার বছর পরে ত্রিংশ শতাব্দীর মানুষেরা ইতিহাস ঘেঁটে আমাদের কাহিনী উদ্ধার করছে। নাক কুঁচকে আঙুল দেখিয়ে বলছে—ওই দেখো, বিংশ শতাব্দীর মানুষ! আত্মঘাতী বিকৃতবুদ্ধি জানোয়ার কতকগুলো! কী জবাব দিবি তুই?

সাধন : জবাব দেবার জন্যে আমি বেঁচে থাকবো না।

শরৎ : কিন্তু আমি থাকবো! আমাকে বেঁচে থাকতে হবে।

[শরৎ উত্তরোত্তর উত্তেজিত হয়ে উঠছে, তার গলা চিৎকারে দাঁড়াচ্ছে]

ত্রিংশ শতাব্দীর মানুষের সামনে আমার শতাব্দীকে সমর্থন করতে আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। পৃথিবী মরে গেলেও আমাকে বেঁচে থাকতে হবে! আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হবে! বলতে হবে—ভুল বুঝো না। আমার শতাব্দী—

[সাধন হঠাৎ ভয় পেয়ে উঠে এসে শরৎকে ধরলো। কিন্তু শরৎ তার হাত ছাড়িয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলো চিৎকার করতে করতে।]

সাধন : শরৎ! শরৎ!

শরৎ : আমার শতাব্দী—আমার শতাব্দীকে—বিচার করতে হলে—বিচার করতে হলে—

[শরৎ এখন কাঠগড়ায়, সাধন তাকে ধরে আছে। শরৎ অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লো। আলো নিভে গেলো]

হ্যালো, টেস্টিং, টেস্টিং। ওয়ান টু থ্রি ফোর--

[ধীরে ধীরে আলো ফুটছে। কোরাস আগের মতো, সাধন মিশে গেছে কোরাসের সঙ্গে। শরৎ আস্তে আস্তে উঠছে]

ফাইভ সিক্স—হ্যালো! শুনতে পাচ্ছো? আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? হ্যালো,

হ্যালো, ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স—

[শরৎ উঠেছে]

শোনো। ত্রিংশ শতাব্দীর মানুষ। শোনো। বিংশ শতাব্দীর কথা শোনো। আমি বিংশ শতাব্দীর মানুষ—শরৎ চৌধুরী। বিগত মৃত বিধ্বস্ত বিংশ শতাব্দীর একমাত্র প্রতিনিধি শরৎ চৌধুরী কথা বলছি, শোনো। আমার শতাব্দী নির্দোষ। মিথ্যা সাক্ষ্যে বিশ্বাস কোরো না। মিথ্যা বিশ্বাসে অবিচার কোরো না। আমার শতাব্দী নির্দোষ। ত্রিংশ শতাব্দীর সুন্দর শান্ত পবিত্র মানুষেরা, শোনো। আমার শতাব্দীও সুন্দর হোতো। বিংশ শতাব্দীর মানুষও শান্ত হতো, যদি না মানুষের জন্মগত চিরশত্রু তার সর্বনাশ করতো। ঐ শত্রু, ঐ হিংস্র বীভৎস নরখাদক পিশাচ শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষকে ধ্বংস করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে চলেছে। মানুষের ঐ চিরশত্রু—মানুষ নিজে। গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকা শত্রুর চেহারা দেখে ফেলেছি। ভয় পেয়েছি, আঘাত পেয়েছি, আঘাত করেছি, হত্যা করেছি! তার মৃত চোখে আবার সেই জীবন্ত চোখের ছায়া দেখেছি—নিজেকে দেখেছি। আঘাত করেছি, আঘাত পেয়েছি! ধ্বংস করেছি, ধ্বংস হয়েছি! হত্যা নয়, আত্মরক্ষা! নিজের কাছ থেকে নিজের আত্মরক্ষা! আমি নির্দোষ। আমার শতাব্দী নির্দোষ!

[কোরাস ঘুরে দাঁড়ালো। তাদের স্থির দৃষ্টি শরৎকে ভেদ করে দূরে। শরৎ নেমে এসে তাদের মুখোমুখি হোলো]

শোনো! ত্রিংশ শতাব্দীর অমৃতের পুত্ররা শোনো! তোমাদের অমৃত—আমি! তোমাদের অমৃত মন্থিত হয়েছে আমার শতাব্দীর বিষে! তোমাদের জন্ম আমার আমার শতাব্দীর যন্ত্রণাবিকৃত গর্ভবেদনায়। কাকে বিচার করছো? নিজের মাকে? গর্ভধারিণীকে? বলো! জবাব দাও!

[কোরাস স্থাণু, নিরুত্তর। শরতের কণ্ঠে ভয়।]

জবাব দিচ্ছো না কেন ত্রিংশ শতাব্দী? জবাব দিচ্ছো না কেন?

[সরে এলো কাঠগড়ার দিকে]

ত্রিংশ শতাব্দী জবাব দিচ্ছে না। হয়তো ত্রিংশ শতাব্দী নেই। হয়তো এই শতাব্দীর পরে আর শতাব্দী আসেনি। এই শতাব্দীতেই হয়তো ধ্বংস হয়ে গেছে সব কিছু, আলো নিভে গেছে পৃথিবীর। রাত্রি। চিররাত্রি। সব কিছু—অন্ধকারে ডুবে গেছে।

[কাঠগড়ায় হতাশায় ঝুঁকে পড়েছে শরৎ। তারপর হঠাৎ মাথা তুললো।]

কিন্তু—আমি আছি! আমি—শরৎ চৌধুরী—আছি। আমি, শরৎ চৌধুরী, শতাব্দীর দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে বলছি—আমি জবাব দেবো! এই শতাব্দীর হয়ে আমি জবাব দেবো! আজ! কাল! চিরদিন! (দর্শকদের দিকে আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে) তুমি? তুমি কী করবে—ঠিক করেছো? তুমি? তুমি? তুমি?

বিবর

মুখবন্ধ

নাইজেরিয়ায় বাস করার সময়ে একজনের কাছ থেকে এক শারদীয়ায় সমরেশ বসুর 'বিবর' উপন্যাসটা পড়েছিলাম। অশ্লীল বলে তখন উপন্যাসটির খুব বদনাম, কিন্তু ওর অন্তর্নিহিত বক্তব্যটা আমাকে খুব নাড়া দিয়েছিলো। সেই ঝোঁকে দু'দিনে লিখে ফেলেছিলাম নাটকটা। দুরূহ কাজ, কারণ প্রায় সবটাই নায়কের মনের চিন্তা, কিন্তু আমি তো নাটক ছাড়া আর কিছু লিখতে শিখিনি, যা পারলাম করেছি। তবে সমরেশবাবুকে নাটকটা পড়ে শুনিয়েছিলাম, তাঁর খুব ভালো লেগেছিলো, এবং আমার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন—মূল বক্তব্যটা ঠিকই বেরিয়েছে নাটকে।

বিগত বিয়াল্লিশ বছর নাটকটা প্রকাশ করিনি, প্রযোজনায় রগরগে অংশটুকুর উপর নির্ভর করা হবে—এই ভয়ে। আমাদের দেশে বড়ো একটা কেউ নাট্যকারের অনুমতি নেবার দরকার মনে করেন না, তবু আমার নিষেধ রইলো কেউ যেন এই নাটক প্রযোজনা না করেন।

বিবর

চরিত্রলিপি

(মঞ্চাবতরণ অনুযায়ী)

প্রদ্যোৎ	সরকারী অফিসার
লোকটি	সরকারী ঋণপ্রার্থী
কুমারেশ	প্রদ্যোতের বন্ধু
নীতা রায়	স্বাধীনচেতা তরুণী
চ্যাটার্জি	সরকারী অফিসার
বাগচি	অফিসের বিভাগীয় প্রধান
ভদ্রলোক	পুলিশ অফিসার
বার-এর মেয়ে	বারাঙ্গনা

প্রথম দৃশ্য

[মঞ্চের পেছনদিকের এক ধাপ উঁচু প্ল্যাটফর্ম। তার উপর একদিকে একটা নিচু খাট। দর্শকদের দিকে তার মাথা। মাঝখানে প্ল্যাটফর্মের সামনের দিকে একটা জানলা, পেছনদিকে পার্টিশন, যাতে এপাশ থেকে ওপাশে যাওয়া যায় দর্শকদের অলক্ষিতে। অন্যদিকে একটা অফিসঘর— টেবিল, চেয়ার, ফাইল র‍্যাক, টেবিলে টেলিফোন। মঞ্চের সামনের অংশে একদিকে বার-এর টেবিল, চেয়ার, বার, গোটা তিনেক বার-স্টুল। বাকি মঞ্চটা ফাঁকা।
পেছন দিকটা অন্ধকার। সামনে নিচে একটা উজ্জ্বল আলোর ফালি, যেন রাস্তা। সেখানে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে প্রদ্যোৎ। পরনে স্যুট-টাই।]

প্রদ্যোৎ ট্যাক্সি! ট্যাক্সি!—ধুত্তোরি!
[প্রদ্যোতের সঙ্গে আরো চার পাঁচটা কণ্ঠস্বরও 'ট্যাক্সি' বলে ডাকছে। প্রদ্যোৎ ঘড়ি দেখলো। পেছন দিয়ে একটি তরুণী হেঁটে যাচ্ছে, প্রদ্যোৎ ফিরে তাকালো,মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে চলে গেলো। প্রদ্যোৎ কাঁধঝাঁকানি দিলো, তার মন এখন ট্যাক্সির দিকে বেশি।]
ট্যাক্সি!
[একটি ভদ্রলোক প্রদ্যোতের কাছে এলো]

লোকটি নমস্কার স্যার।

প্রদ্যোৎ (ফিরে) নমস্কার।

লোকটি বাড়ি চললেন?

প্রদ্যোৎ না, বাড়ি নয়, যাবো একটা কাজে। আপনি— ?

লোকটি চিনতে পারলেন না স্যার? পায়োনীয়ার এঞ্জিনীয়ারিং অ্যান্ড অ্যালায়েড ইন্ড্রাস্ট্রিস্ স্যার।

প্রদ্যোৎ ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। কদ্দুর এগোলো আপনার?

লোকটি তা স্যার, আপনাদের আশীর্বাদে—

প্রদ্যোৎ ট্যাক্সি!

লোকটি তাড়াতাড়ি আছে বুঝি?

প্রদ্যোৎ হ্যাঁ, তা একটু—

লোকটি এ সময়ে ট্যাক্সি পাওয়া—ইম্‌পসিবল্ স্যার, ইম্‌পসিবল্। অথচ আমি একটা ট্যাক্সির পারমিটের জন্য দু'বছর ধরে কী হয়রানি। এখন হাল ছেড়ে দিয়েছি।

প্রদ্যোৎ হাল ছেড়ে সরকারী লোন্ নিয়েছেন ইন্ড্রাস্ট্রি খোলার নামে?

লোকটি নামে না স্যার, নামে না—সিরিয়াস কারবার। মেশিনারি পাওয়াই ঝামেলা, নইলে এতোদিনে প্রোডাক্‌শন শুরু হয়ে যেতো।

প্রদ্যোৎ (হেসে) বলি তুলেছেন কিছু এখনো? না ফাঁকা মাঠ?

লোকটি না না, কী বলেন? তুলেছি বৈ কী। মানে, ইয়ে—কবে আসছেন স্যার—ইনস্পেকশনে?

প্রদ্যোৎ (হেসে) সে কি আপনাকে বলে কয়ে যাবো?

লোকটি হেঁ হেঁ, সে তো বটেই। তবে কিনা—ধ্যারধেরে গোবিন্দপুর তো? জানা না থাকলে একটু মিষ্টিমুখ করাবারও—

প্রদ্যোৎ যাবো যাবো, নেক্সট্ উইক নাগাদ যাবো।

লোকটি ঠিক আছে স্যার। চলি স্যার. আপনার ট্যাক্সি তো এখনো—

প্রদ্যোৎ ও হবে এখন, আপনি ভাববেন না।

লোকটি না স্যার। আর ভেবেই বা কী করবো? আমার ট্যাক্সি থাকলে আমি না হয় নিয়ে আসতে পারতাম। তা তো আপনাদের গভর্নমেন্ট দিলো না। হেঁ হেঁ, চলি স্যার।

[ভদ্রলোকটি চলে গেলো। প্রদ্যোৎ মুখ বিকৃত করলেন।]

প্রদ্যোৎ : (দাঁতের ফাঁকে) ব্যাটা ঘড়িয়াল!—ট্যাক্সি!

কুমারেশ : (নেপথ্যে)। প্রদ্যোৎ! এই প্রদ্যোৎ!

প্রদ্যোৎ : (শুনতে পায়নি) ট্যাক্সি! ট্যাক্সি!

[ততোক্ষণে কুমারেশ এসে ঘাড়ে চাপড় মেরেছে]

কুমারেশ : কী হে সোনার চাঁদ, এতো তড়িঘড়ি কিসের?

প্রদ্যোৎ : শালা, তুই? (ঘাড় ডলে) থাবড়াগুলো একটু ওজন বুঝে মারতে পারিস না?

কুমারেশ : অফিস থেকে বেরিয়েই একেবারে হন্যে হয়ে ছুটেছিস, সে কি ইয়ে কবে বসে আছে না কি?

প্রদ্যোৎ : না না, অন্য একটা দরকার। মানে একজনের একটা চাকরির—

কুমারেশ : উরিশ্‌শালা! পরোপকার?

প্রদ্যোৎ : পরোপকারের ইয়ে করি।

কুমারেশ : তবে? কোনো সুসখী বুঝি?

প্রদ্যোৎ : আহা, তাই যদি হোতো রে? এ হারামজাদা গুঁফোকার্তিক।

কুমারেশ : তবে তোর এতো মাথাব্যথা কেন?

প্রদ্যোৎ : বাড়ি বাড়ি—পিতাঠাকুর! বাড়ির জ্যেষ্ঠপুত্তুর না আমি? অপোগণ্ড ভাইপো ভাগ্নে শ্যালকপুত্তুরদের জন্যে একটু দৌড়ঝাঁপ না করলে পিতাঠাকুর ছেড়ে কথা কইবে? কত্তব্য না?

কুমারেশ : পরের চাকরির উমেদারি—এই বেলা স'পাঁচটার সময়ে? ধুর! চ', এক পাত্তর চড়িয়ে নি।

প্রদ্যোৎ : না রে, এখন হয় না। দেরি করলে পাবো না তাকে।

কুমারেশ : কাকে?

প্রদ্যোৎ : যার কাছে যাচ্ছি উমেদারি করতে।

কুমারেশ : তিনি কিনি?

প্রদ্যোৎ : (একটু ইতস্তত করে, হেসে) রুবী দত্ত।

কুমারেশ : আরিব্বাস—এই তোর গুঁফোকার্তিক? খোদ রুবী 'দেবী' কলকাত্তাওয়ালি?

আছো ভালো বাবা।

প্রদ্যোৎ : আমি আর ভালো থাকলাম কই? এসব অনেক ওপরতলার ব্যাপার।

কুমারেশ : তুমি মক্কেল এসব দিকে বেশ ওপরতলায় হাত বাড়াতে পারো। আমি চিনি না তোমায়?

প্রদ্যোৎ : আরে ধুৎ! বাড়িতে ঢুকলে কুকুর লেলিয়ে দেয় না—এই পর্যন্ত।

কুমারেশ : ওফ্! একেবারে বিনয়ের লেত্তি হয়ে গেলি যে?

প্রদ্যোৎ : না, সত্যি—

কুমারেশ : যাক গে, ওসব ফুটপাথে দাঁড়িয়ে হয় না। আয়, রঞ্জন বার-এ আয়।

প্রদ্যোৎ : না রে, মাইরি—দেরি হয়ে যাবে।

কুমারেশ : ওরে শালা, ভাদ্দুরে, যাবি যাবি, তোকে আটকাবো না। যাবার আগে একটু মুখে দিয়ে যাও আমার শাহেনশা। দু'পাত্তর চড়িয়ে গেলে জমবে ভালো।

প্রদ্যোৎ : তুই বুঝছিস না কুমারেশ, সন্ধের পর ওখানে যাওয়া চলে না। নানানরকম সব আছেন তো?

কুমারেশ : বলি, যাবি কিসে? ট্যাক্সি তো পাবি না। বাসে ঝুলতে ঝুলতে গেলে এমনিই তো সাতটা বাজাবি?

প্রদ্যোৎ : যা বলেছিস। এ যে কী অবস্থা হয়েছে কলকাতা শহরের—

কুমারেশ : ঐ দেখ! দেখেছিস? আমার অফিসের গাড়ি।

প্রদ্যোৎ : অফিসের গাড়ি আছে? এতোক্ষণ বলিসনি কেন উল্লুক? চল্ চল্—

কুমারেশ : উঁহু। আগে রঞ্জন বার, তারপর গাড়ি।

প্রদ্যোৎ : শোন—মাইরি—

কুমারেশ : নো শোনাশুনি। এক পেগ, দশ মিনিট।

প্রদ্যোৎ : কিন্তু—

কুমারেশ : কাম্ অন্!

[কুমারেশ প্রদ্যোৎকে বগলদাবা করে হাঁটা লাগালো। বার-এর আলো জ্বলে উঠলো। দু'জনে টেবিলে গিয়ে বসলো। বেয়ারা এলো।]

কুমারেশ হুইস্কি-সোডা, দো বড়া পেগ।

প্রদ্যোৎ : না, আমি একটা ছোট—

কুমারেশ কেন চাঁদ? তেনার হুইস্কির গন্ধ নাকে সয় না? (বেয়ারাকে) দো বড়া পেগ।

[বেয়ারা চলে গেলো]

বল্!

প্রদ্যোৎ : কী বলবো?

কুমারেশ রুবী দত্ত বিছ্নায় কেমন?

প্রদ্যোৎ : রুবী দত্তর বিছানা আমাদের মতো চুনোপুঁটির জন্যে নয় ভাই। খোদ কর্তা ওর বিছ্নায়।

কুমারেশ বলি খোদ কর্তা তো চব্বিশ ঘণ্টা সেখানে পড়ে থাকে না!

প্রদ্যোৎ : তা হলেও লম্বা লিস্টি আছে রথী-মহারথীদের। আমি শুধু চৌকাঠটা

কোনোমতে ডিঙিয়েছি, লিস্টির ল্যাজের দিকেও নাম লেখাতে বুড়ো হয়ে যেতে হবে।

কুমারেশ : সত্যি বলছিস?

প্রদ্যোৎ : খাঁটি সত্যি। অন্যরকম হলে তোকে বলতাম না? বড়ো বড়ো মক্কেল তো এ নিয়ে জাঁক করে বেড়ায়। এ তো প্রেস্টিজের ব্যাপার।

[বেয়ারা হুইস্কি নিয়ে এলো, সে না যাওয়া পর্যন্ত চুপ।]

কুমারেশ : তা যা বলেছিস, প্রেস্টিজই বটে। আর নইলে কী যে পায়? আমি একবার দেখেছি—দূর থেকে অবিশ্যি, তেমন আনারকলি কিছু মনে হোলো না তো।

প্রদ্যোৎ : না, তবে রাঁধুনি রেখেছে এখনো। পঁয়ত্রিশ হোলো, তবু—

কুমারেশ : পঁয়ত্রিশ? আমি শুনেছিলাম আরো বেশি।

প্রদ্যোৎ : না, পঁয়ত্রিশ। লোকে একটু বেশি বলে হিংসেয়।

কুমারেশ : লোকে আরো বলে—জাঁহাবাজ মাগী।

প্রদ্যোৎ : জানি। আরো নাম আছে—কালীকলকেত্তাওয়ালি। রুবী 'দেবী' কিনা আজকাল? আমি বলি—ঠাটেশ্বরী দেবী। মনে মনে অবিশ্যি।

কুমারেশ : সামনে কী বলিস?

প্রদ্যোৎ : (হেসে) সামনে? রুবীদি। সদ্য প্রমোশন পাওয়া গেছে।

কুমারেশ : (হা হা করে হেসে) এই তো চাঁদু, সিধে পথেই এগোচ্ছো। তা হবে না কেন? চেহারাটা তো মোটামুটি বম্বে-হীরো-মার্কা আছে। মুখেও দিব্যি চালু।

প্রদ্যোৎ : তা কর কর, হিংসে কর একটু, ওতেই আনন্দ।

কুমারেশ : না, মাইরি বলছি। আমার তো দৌড় বড়োজোর অফিসের স্টেনো, তাও এমন স্টেনো জুটেছে কপালে—

প্রদ্যোৎ : কী, বুড়ি? না ভাগলপুরী গাই?

কুমারেশ : আরে না না—ছুঁড়ি। দেখতে শুনতেও মন্দ ছিল না, বুঝলি—ছিমছাম, বেশ ইয়ে। কিন্তু শালা সতীত্ব যেন ঠিকরে বেরোচ্ছে। তবু তো বে করেনি।

প্রদ্যোৎ : রেখে দে! সতীত্ব—গুষ্ঠির পিণ্ডি।

কুমারেশ : না রে, একে দেখেই মনে হয়—

প্রদ্যোৎ : যা যাঃ! দেখে যদি সতীত্ব বোঝা যেতো। তোকে বুঝি হীরেন বক্সীর গপ্পোটা বলিনি কোনোদিন?

কুমারেশ : কোন্ হীরেন?

প্রদ্যোৎ : হীরেন বক্সী রে—আর্টিস্ট, চিনিস না? পুলিসের চোর-ধরা ডালকুত্তার মতো সতীত্ব তার দেহের পবিত্রতা খুঁজে বেড়াতো।

কুমারেশ : কী গপ্পো তার?

প্রদ্যোৎ : সে বিরাট গপ্পো, আর একদিন বলবো। নে, শেষ কর।

কুমারেশ : কচ্ছি কচ্ছি তাড়া দিস নি। শোন তোকে খুলেই বলি। ওর সঙ্গে আজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি।

প্রদ্যোৎ : কার সঙ্গে?

কুমারেশ : ঐ যে বললাম না? স্টেনো?

প্রদ্যোৎ : তবে আর সতীত্ব শোনাচ্ছিলি কেন?

কুমারেশ : না না, সে বলে কয়ে এই প্রথম রাজি করিয়েছি— সিনেমায় যেতে। হাজার ফৈজৎ। তার উপর আবার আমার তিনি। মহা ঝামেলায় পড়েছি।

প্রদ্যোৎ : কী করেছেন তিনি?

কুমারেশ : যা করবার—পতির চরিত্রে সন্দেহ। আগেকার সতীসাধ্বীরা ঘরে বসে সন্দেহ করতেন, এখন তো আবার কলেজে-পড়া সতী? লুকিয়ে ধাওয়া করা, নজর রাখা—কিছুই বাদ যায় না।

প্রদ্যোৎ : বলিস কী রে? নজর রাখে?

কুমারেশ : কড়া নজর। দু'দিন ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি। তাই তো আজ তোকে পেয়ে সুট্ করে বার-এ ঢুকে পড়লাম। কে জানে কোথায় ঘাপটি মেরে আছে!

প্রদ্যোৎ : বার-এ ঢুকলে দোষ নেই বুঝি?

কুমারেশ : নেই আবার? সবেতেই দোষ। তবে স্ত্রী-ঘটিত ব্যাপারটাই আসল। বারটা এখন মেনে নিয়েছে। অল্পস্বল্প চেল্লাচেল্লির ওপর দিয়ে যায়।

প্রদ্যোৎ : বিয়ে করো আরো।

কুমারেশ : না করে উপায় কী ছিল বল? বিয়ে না করলে এই চাকরি জুটতো কোনোদিন? তোমার মতো বাবার খুঁটির জোর তো ছিল না আমার?

প্রদ্যোৎ : হ্যাঁ, ঐ একটা পিতাঠাকুর করেছেন আমার, উব্‌গার। জন্মদান ছাড়া ব্যাকডোরটা তো ভালোই বুঝতেন? কার সঙ্গে দেখা করতে হবে, কাকে ভেট দিতে হবে, কাকে তেল—এভরিথিং।

কুমারেশ : তবে? বাবা না থাকলে অগত্যা শ্বশুর। শ্বশুরের মেয়ে নিয়ে কি আর মাথা ঘামিয়েছি তখন?

প্রদ্যোৎ : এখন ঘামিয়ে ছাড়ছে, কী বলিস?

কুমারেশ : তা ভাই, দাম তো দিতেই হবে? সে যাক, এখন কী করে এই স্টেনো স্‌সুন্দরীকে—কিছু টিপস্ ছাড় না? তুই তো খলিফা লোক এসব ব্যাপারে। ধরছিস আর পেড়ে ফেলছিস।

প্রদ্যোৎ : কই আর? সব টাকার খেল বাবা, অতো টাকা কোথায় পাবো? তাও তো চাকরিটায় কিছু ঘুষের মালকড়ি আছে, নইলে থার্ড গ্রেড অফিসারের এইটুকু ফুটানিও থাকতো না।

কুমারেশ : না, টাকা—ঠিক আছে, বুঝলাম। কিন্তু সবাই তো বাজারের—

প্রদ্যোৎ : হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ ভাষাটা আলাদা। দরাদরিটা খোলাখুলি হয় না, আর ক্যাশের বদলে কাইন্ড।

কুমারেশ : যাঃ, তুই ব্যাটা বড়ো বেশি সিনিক হয়ে উঠেছিস।

প্রদ্যোৎ : সিনিক? (ভেবে) কে জানে বাবা, সিনিকই বলে বোধ হয় একে। কিম্বা হয়তো সতীসধ্বীদের শতহস্তেন রাখি বলে তাদের খবরাখবর ততোটা পাই নে।

কুমারেশ : বলি, প্রেম তো করেছিলি কোনো কালে, না কি?

প্রদ্যোৎ : প্রেম? তুই তোর স্টেনোর সঙ্গে প্রেম করছিস না কি?

কুমারেশ : না না, মানে—তা ইয়ে, যাকে বলে—

প্রদ্যোৎ : দেখ্ কুমারেশ, খচ্চর হবি হ, সাব্লাইম খচ্চর হোস নি। ওটা তোর আমার ধাতে সইবে না।

কুমারেশ : (হা হা করে হেসে) তা যা বলেছিস। তবে হ্যাঁ, মধ্যে মধ্যে ভাবি—প্রেম জিনিসটা কী?

প্রদ্যোৎ : পেরেম্। ভালোবাস্সা। হৃদয়ের স্সুধা।

কুমারেশ : তোর কাছে প্রেমের শতনাম শুনতে চাই নি। ব্যাপারটা তোর কীরকম মনে হয়, মানে—

প্রদ্যোৎ : তা আমি কী করে বলবো? কলেজের ছোকরা-টোকরা, যারা প্রেম করে, তাদের জিজ্ঞেস কর গে।

কুমারেশ : (মুচকি হেসে) শোনা যায়—তুইও না কি এককালে খুব গভীর প্রেমে পড়েছিলি?

প্রদ্যোৎ : (সিধে কুমারেশের চোখে তাকিয়ে) নীতা রায়?

কুমারেশ : সেইরূপই জনশ্রুতি।

প্রদ্যোৎ : ও, তোর তো নীতা রায়ের অ্যাপার্টমেন্টে যাতায়াত নেই।

কুমারেশ : তার মানে?

প্রদ্যোৎ : তার মানে নীতা রায়ের লিস্টিও খুব ছোট না। রুবী দত্তর লিস্টির কাছে যদিও লাগে না।

কুমারেশ : আহা, আমি এখনকার কথা বলছি না—

প্রদ্যোৎ : ওর আর এখন তখন নেই। নীতা রায় কিছু ধোয়া তুলসীপাতা নয়, আমিও নই, কোনোদিন ছিলামও না।

কুমারেশ : অর্থাৎ বলতে চাস—

প্রদ্যোৎ : বলতে চাই—খুব ক্লীয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। সমঝওতা—তুমোও যা, আমুও তাই। এই সম্পর্ক।

কুমারেশ : কিন্তু গোড়া থেকেই কি—

[বেয়ারা এলো কাছে]

বেয়ারা : স্যার, আওর দো পেগ লায়েঁ?

কুমারেশ: আঁা (ঘড়ি দেখে) মাই গড! পৌনে ছ'টা!

[হিঁচড়ে টাকা বের করে টেবিলে রাখলো]

চলি রে—সাংঘাতিক দেরি হয়ে গেছে।

প্রদ্যোৎ : সে কী রে, আমায় যে লিফ্ট্—

কুমারেশ : আর পারলাম না রে, ভেরি সরি। প্লীজ ডোন্ট মাইন্ড!

[কুমারেশ ছুটলো। প্রদ্যোৎ হাসলো।]

প্রদ্যোৎ : শালা, আমি ভাদ্দুরে! আর তুমি?

[উঠে এলো সামনে। বার-এর আলো নিভে গেলো। মঞ্চের আলোও কমে আসছে।]

ট্যাক্সি! ট্যাক্সি!

[আলো আরো কম, প্রদ্যোতের আবছা মূর্তি, তার আর অন্যদের হাঁক— 'ট্যাক্সি'। তারপর গাড়ি ব্রেক কষার আওয়াজ। মিলিত কণ্ঠস্বর 'ট্যাক্সি'! ড্রাইভারের মোটা গলা—'আরে দেখতে নেহীঁ? সওয়ারি হ্যায়!' তারপর পরিষ্কার কণ্ঠস্বর]

নীতা : উঠে এসো।

প্রদ্যোৎ : নীতা?

নীতা : উঠে এসো।

[গাড়ির দরজা বন্ধ হবার, গাড়ি চালু হবার শব্দ। জানলার ফ্রেমটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, নীতার মুখ। একটু কৌতুকের ছোঁয়া। পাশ ফিরে বসে, যেন ট্যাক্সির জানলায়। কয়েক সেকেন্ড। দপ করে আলো নিভে গেলো।

একটা স্পটলাইটের আলো সামনের দিকে। বার-এর একটা চেয়ার টেনে এনে প্রদ্যোৎ বসেছে উল্টো করে, ঘোড়সওয়ারের মতো, চেয়ারের পিঠে হাত রেখে। দর্শকদের দিকে তার মুখ। মুখে একটা বাঁকা হাসি ফুটলো, চোখ মারলো]

প্রদ্যোৎ : তুমোও যা, আমুও তাই। সবই তো বোঝো বাবা।

একটা পুরুষকণ্ঠ : প্রদ্যোৎ।

প্রদ্যোৎ : জগদীন্দ্রনাথ। আমার পিতাঠাকুর। শাহেনশা ব্যক্তি।

একটা স্ত্রীকণ্ঠ : প্রদ্যোৎ।

প্রদ্যোৎ : অনসূয়া দেবী। আমার উপর এঁর একমাত্র দাবি হোলো—ইনি আমাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। ভগবান জানে মাইরি—কিসের দাবি এবং কে সে দিব্যি দিয়েছিলো। আমি হলফ করে বলতে পারি—আমি এর কিছুই জানতাম না।

একটা পুরুষকণ্ঠ : ওহে ঘোষ।

প্রদ্যোৎ : বাগচি সাহেব, অফিসের চীফ্। ডিভাইন খচ্চর। পিতাঠাকুরের স্যাঙাৎ আবার।

একটা স্ত্রীকণ্ঠ : কে, দাদা?

প্রদ্যোৎ : আমার সহোদরা। ভালো নাম বিদিশা। কেন যে ওর বাপ-মা এই নাম রেখেছিলো, আমার জানা নেই। যদ্দুর জানি—বিদিশা একটা জায়গার নাম। দিল্লী, কারমাটার, কাঠমাণ্ডু নাম রাখলেই বা কী দোষ হোতো?

একটা পুরুষকণ্ঠ : এই যে দাদা, ফিরলেন?

প্রদ্যোৎ : বিদিশার অন্যতম। বিদিশার 'বর্তমান'। অথবা বর্তমানদের অন্যতম। ইনি বাড়িতে আসেন আমাদের পিতামাতার অনুমত্যানুসারে। পিতৃদেবের বন্ধুস্থানীয় কোনো ভদ্রলোকের ছেলে, চাকরিটিও মন্দ করেন না, অতএব—

একটা স্ত্রীকণ্ঠ : হ্যালো ডার্লিং।

প্রদ্যোৎ : মিডনাইট বার-এর ঐ গোয়ানীজ মেয়েটা। কী নাম যেন? মনেও থাকে না ছাই—ডোরা না ক্লারা। কালো, কিন্তু যাকে বলে কড়ামাল।

একটা পুরুষকণ্ঠ : মিস্টার ঘোষ।

প্রদ্যোৎ : চ্যাটার্জি সাহেব। সেকেন্ড গ্রেড অফিসার। এর সঙ্গে রোজ এক জীপে অফিসে যাতায়াত। যাবার সময়ে আমাকে আগে তুলবে, ফেরার সময়ে আমায় পরে

নামাবে। যদিও আমি থাকি ভবানীপুরে আর তিনি সেই দমদম।

[প্রদ্যোৎ সিগারেট ধরাতে দেশলাই জ্বালালো।]

স্ত্রীলোক : প্রদ্যোৎ।

[প্রদ্যোতের হাতেব জ্বলন্ত কাঠি একমুহূর্ত থেমে গেলো। তারপর যেন জোর করে সিগারেট ধরালো।]

প্রদ্যোৎ : নীতা রায়।

[সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিযে সশব্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে চলে গেলো অফিসের টেবিলে। জানলার ফ্রেমে নীতা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দু'হাত ফ্রেমে রেখে শিথিল অলস ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। আলো ফুটলো অফিসে, প্রদ্যোৎ চেয়ারে বসে ফাইল দেখছে। নীতা জানলা ছেড়ে বিছানায় এলো। পা তুলে এলিয়ে বসলো খাটের মাথার তক্তাটায় কনুই রেখে। অলসভাবে হাত বাড়িয়ে অদৃশ্য টেলিফোন ডায়াল করতে লাগলো। প্রদ্যোৎ ঘণ্টা বাজিয়েছে এর মধ্যে। বেয়ারা এলো।]

কফি নিয়ে এসো।

[বেয়ারা চলে গেলো। প্রদ্যোতের টেবিলে ফোন বাজছে। সে ফোন তুললো বিরক্তভাবে।]

ঘোষ স্পীকিং।

নীতা : কী হোলো? সত্যি ভুলে গেলে নাকি?

[প্রদ্যোতের মুখ থেকে বিরক্তি মুছে গেছে। কিন্তু যেটা ফুটে উঠেছে সেটা নির্ভেজাল আনন্দ নয়।]

প্রদ্যোৎ : তুমি তো জানো—ভুলি না।

নীতা . কতোদিন দেখা দাওনি বলো তো?

প্রদ্যোৎ : কী করবো? তোমার তো আবার এ সে নানারকম—

নীতা : তা থাকুক গে। তুমি আজ চলে এসো। একটুও ভালো লাগছে না।

প্রদ্যোৎ : তুমি তো জানো আমি কী রকম হিংসুটে। তোমার সব সোশ্যাল কনট্যাক্ট, লোকজন—আমার সহ্য হয় না।

নীতা : লোকজন থাকলে তোমাকে আসতে বলতে পারি? (প্রদ্যোৎ চুপ) কী, আসছো তো?

প্রদ্যোৎ : না এসে আর উপায় আছে?

নীতা · কী জানি? তোমার এখন রুবী দত্তর কাছে আসা-যাওয়া, আমাকে কি আর ভালো লাগবে?

প্রদ্যোৎ : যা, রুবী দত্ত কতো বড়ো!

নীতা : বড়ো তো কী হয়েছে?

প্রদ্যোৎ : থাকগে, ওসব বাজে কথা ছাড়ো।

নীতা : আচ্ছা, ছাড়লাম। আসবে তো ঠিক? না আর কারো কাছে যাবার কথা আছে?

প্রদ্যোৎ : জানোই তো বাবা, তোমার দরজা খোলা পেলে আর কারো কাছে যাওয়া আমার হয় না। তবে হ্যাঁ? তোমায় যদি একা না পাই—

নীতা : পাবে গো, পাবে।

[নীতা ফোন রাখতে না রাখতে ওর খাট অন্ধকার হয়ে গেলো। অফিসের আলো আস্তে আস্তে কমছে। প্রদ্যোৎ হাতের সিগারেটটা হিংস্রভাবে অ্যাশট্রেতে ঘষে নেভাচ্ছে।]

প্রদ্যোৎ : (দাঁতের ফাঁকে) কসবী!

[উঠে সামনে এলো প্রদ্যোৎ। সামনের আলো জ্বলে উঠলো। অফিস অন্ধকার। প্রদ্যোৎ চেয়ারে এক পা তুলে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে।]

(দর্শকদের) তবু একটা কথা মিথ্যে বলিনি। নীতার একলা ঘরের দরজা খোলা পেলে অন্য মেয়ের কাছে যাই না। ইচ্ছেই করে না যেতে। নীতা জানে সেটা। জানে—তু-উ-উ করে ডাকলেই পোষা কুকুরের মতো ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ছুটবো। রোজই ছুটতাম পারলে। তাই বলে রোজ ছোটা চলে না তো? মাঝে মাঝে, মাসের মধ্যে তিন-চার বার এমনি ডাকলে, কিম্বা আগে থেকে খবর দিয়ে। খবর দিয়েও যে সব দিন—এক একদিন রাত দশটায় হঠাৎ খ্যাপা কুকুরের মতো হন্যে হয়ে—(কাল্পনিক ফোন তুলে) নীতা? কী করছো? গেলে একটু কফি খাওয়াবে? (মুখ তুলে দর্শকদের দিকে চোখ টিপে) কফি খেতেই চাই বটে। (কাল্পনিক ফোনে নীতার গলা ভেঙচে) ভীষণ টায়ার্ড, শুয়ে পড়েছি, প্লীজ রাগ কোরো না। (মুখ তুলে) এর থেকেও খারাপ। (আবার ভেঙচে) এতো রাত্রে আর বাইরে থেকো না, বাড়ি চলে যাও, লক্ষ্মীটি। (মুখ তুলে ছটফটিয়ে সরে গিয়ে) মনে হয়—গদাম করে একটা লাথি কষাই পেছনে! সত্যি যদি হকমকিয়ে গিয়ে উঠতাম, তাহলে হয় তো দেখতাম 'এঞ্জেল লাসারি'র ম্যানেজার-কাম-ডাইরেক্টর—নমশুদ্দুর, বলে কায়স্থ, একটি শুওরের বাচ্চা—ওদের টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনে নীতার দাঁত-দেখানো হাসিমুখের ছবিটার প্রশংসা করতে গিয়ে একটুস্ একটুস্ অন্যরকমের কথা বলছে। আর নীতা তার কালো ঘোড়ার মতো চেয়ারার দিকে তাকিয়ে মিঠে মিঠে হাসছে। কিম্বা হয়তো গাইয়ে কাশী ব্যানার্জি, বা দলজিৎ— সেই পাঞ্জাবী ছোকরা। (একটু হেসে) আর তুমি নিজে চাঁদ? মারো ঝাড়ু। তুমোও যা আমুও তাই।

[একবার পায়চারি করে এসে সিগারেট ধরালো। চেয়ারে বসলো ঘোড়সওয়ারের মতো।]

অথচ ও যখন মাতামাতির পর ক্লান্ত হয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়ে থাকে, তখন এক এক সময়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চোখের পলক ফেলতেও পারি না, পলক ফেললেই যেন ওকে হারিয়ে ফেলবো। (হঠাৎ লাফিয়ে উঠে) আর ঠিক ঐ একই সময়ে, ঐ একই মুহূর্তে একটা দুর্জয় রাগে আর ঘেন্নায় ওর মুখে থুতু ছিটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে!

[উত্তেজিতভাবে একবার ঘুরে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালো]

এ যে কীরকম ব্যাপার আমি বুঝি না বাবা। কেমন যেন মামদোবাজি মামদোবাজি মনে হয়। কিন্তু এ ছাড়া কী করে যে বোঝানো যায় ব্যাপারটা, আমি জানি না।

[জানলার ফ্রেমে আলো জ্বলে উঠলো। নীতা ট্যাক্সিতে বসার ভঙ্গীতে বসে আছে। প্রদ্যোৎ অনেকটা অন্ধকারে।]

নীতা : প্রদ্যোৎ, উঠে এসো।

প্রদ্যোৎ : নীতা?

নীতা : উঠে এসো।

প্রদ্যোৎ : (দর্শকদের) কোথাও যাচ্ছে অভিসারে। ঐ পথে হলে আমাকে নামিয়ে দেবে দয়া করে।

নীতা : উঠে এসো।

প্রদ্যোৎ : (দর্শকদের) তবু কি না উঠে আমার উপায় আছে?

নীতা : কোথায় চলেছো?

প্রদ্যোৎ : আপাতত একটা কাফে অ্যান্ড বার সাইনবোর্ড-মারা শুঁড়িখানায় নামিয়ে দিলেই হবে।

নীতা : আড্ডা?

প্রদ্যোৎ : হ্যাঁ। তবে বলা যায় না, একটা কাজও রয়েছে। করে উঠতে পারবো কি না জানি না।

নীতা : কী কাজ?

প্রদ্যোৎ : সেটা জেনে তোমার বিশেষ লাভ হবে না। তুমি কোথায় চলেছো?

নীতা : আমার ঘরে।

[প্রদ্যোৎ অন্ধকারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো।]

প্রদ্যোৎ : (দর্শকদের) একটা থাপ্পড়ের মতো বললো কথাটা! প্রমাণ করে দিলো—আমাকে, এই পুরুষটাকে, ও আপাদমস্তক চেনে। আমি কী চাইছি, কী ভাবছি—ও জানে। (নীতার দিকে তাকিয়ে) কেন, কে আসবে?

নীতা : (মুখে হাসি) কেউ না।

প্রদ্যোৎ : সে কী। কেউ না অথচ এতো তাড়াতাড়ি?

নীতা : কেন, আমি আমার ঘরে একা সন্ধেবেলা থাকি না?

প্রদ্যোৎ : হ্যাঁ, তোমার তো আবার একলারই গেরস্থালি। তবে সন্ধেবেলা, ঘরের মধ্যে, নীতা রায় একলা—

নীতা : একলা কোথায়? এই তো তোমাকে পেয়ে গেলাম।

প্রদ্যোৎ : (দর্শকদের) আর একটা থাপ্পড়! (প্রশংসাসূচক প্রশ্রয়ে হেসে) হারামজাদী। এতোক্ষণ খেলাচ্ছিলো আমাকে। জেনেশুনে! জানে—দরকারমতো আমাকে ডাক দিতেও পারে, আবার এক কথায় নাকচ করতেও পারে। আমাদের সম্পর্কটা তো আবার প্রেমের! পীরিতের করাত প্রাণ কাটে চিরে চিরে, মালিনী এমন করাত কোথায় পেলি? তোমাকে পেয়ে গেলাম! ঠিক তাই, তাহলে আর ঘরে ফিরে ভেবে ভেবে আর কাউকে টেলিফোনে ডাকতে হবে না। এ বেশ দুম করে পেয়ে গেলো আমাকে—সন্ধেরাত্তিরের একটা ব্যবস্থা!

নীতা : ড্রাইভার, বাঁয়া গেট।

[জানলার আলো নিভে গেলো]

প্রদ্যোৎ : নীতার, কী যেন বলে—অ্যাপার্টমেন্ট। তেতলায়। লিফ্‌ট্‌ নেই, সিঁড়ি। আজ সিঁড়ি ভেঙে নীতার গা ঘেঁসে আমি উঠছি। আজ সন্ধেয় আমি, আমাকে পেয়ে গেছে তো!

[খাটের আলো জ্বলে উঠছে আস্তে আস্তে। নীলাভ আলো।]

খুব তো বলছি, আমি নিজে কী করি? যে সন্ধেয় মনটা খেঁকি কুত্তার মতো হন্যে হয়ে ওঠে, সেদিন কাকে রিঙ করবো, কার দরজায় গিয়ে হাজির হবো—কিছু ঠিক আছে? সে নীতাও হতে পারে, অন্য কোনো মেয়েও হতে পাবে, মিডনাইট বার-এর ডোরা না ক্লারা—সেও। কিন্তু নীতা যদি—নীতাকে যদি পাওয়া যায়, একলা, তাহলে অবিশ্যি—

[নীতা খাটের কাছে। হাতের ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেললো একদিকে। এক পা এক পা তুলে জুতো খুললো।]

কী বলে একে? সেক্স অ্যাটাচমেন্ট? সেক্স ইনভল্‌ভ্‌মেন্ট? আজকাল তো আবার সব কিছুই সায়েন্টিফিক। না কি একেই বলে প্রেম? প্রেম—হুঁঃ! পেরেম! অথচ ছেড়ে তো যেতে পারি না? ছেড়ে যাবার স্বাধীনতা পুরো আছে, কিন্তু স্বাধীনতা চায় কোন্‌ শালা? পরাধীনতার গর্তে সুখে আছি দাদা, বেস্‌ আছি। চাকরিটার কথাই ধরো না? পরাধীনতার বিউ—টিফুল গর্ত। ছেড়ে যাবার স্বাধীনতা? ওঃ বাবা তা কি হয়? জীবিকা না? মালের পয়সা, মেয়েবাজি করবার পয়সা, জোগাচ্ছে না? সব ছাড়তে পারি বাবা, চাকরিটি নয়। আর নীতা নয়।

[অফিসের আলো জ্বলে উঠলো। খাটের আলোও জ্বলছে। নীতা চুল আঁচড়াচ্ছে।]

চাকরি আর নীতা—একটা মিল আছে, না? চাকরিটাকে স্ত্রীলিঙ্গে দেখলে—হ্যাঁ, স্ত্রীলিঙ্গ ছাড়া আর কী? প্রথম যেদিন ঢুকেছিলাম, দুরুদুরু বক্ষে, যেন জীবনের নতুন বাসর। পবিত্র দাম্পত্যজীবনের মতো পবিত্র কর্মজীবন—সমাজের মঙ্গলার্ধে। প্রথম ফাইলের পাতা খোলা—সে তো প্রথম ঘোমটা তোলা। আর প্রথম সই করা মানে তো প্রথম চুম্বন যাকে বলে। মনে হোলো—যাঃ শালা। রাজা হয়ে গেছি একেবারে। তুমি মোরে করেছো সম্রাট! তারপর? ওরেব্বাবা! কোথায় এসেছো চাঁদ, ভালো করে দেখো। হ্যাঁ, মিথ্যে যদি না বলতে পারো, দিনকে যদি রাত না করতে পারো ঘুষ খেয়ে, তবে কেটে পড়ো চাঁদ! তাই কখনো পারি? উল্লুকের মতো ভুলভাল ধারণা করে রেখেছিলাম, তাই প্রথমটা একটু হকচকিয়ে গেছিলাম—এই যা। তারপরেই, যাকে বলে, হাবড়ে পড়ে রইলাম। জীবনের সবকিছু জোগাচ্ছে—পান, আহার, মৈথুন। তার ওপর ইজ্জৎ, অফিসার না? এ হেন স্‌সৌন্দরীর মর্জি মেনে চলতেই হবে। আর তার মর্জি মানেই সত্যি-মিথ্যের কোনো ব্যাপার নেই। সেও যেন খানিকটা, কী বলে—অসহায়। তার চারদিকে সবাই যেন মদ্দা ময়ূরের মতো হন্যে হয়ে রয়েছে। নিজেকে তার বাঁচিয়ে চলার উপায় নেই। এই—এই নীতার মতোই।

[একটা সিগারেট ধরালো]

আর এই নীতার মতোই, চাকরি-মেয়েটা আমার কাছে সেই আসক্তি আর ঘেন্না—সেই মামদোবাজি। আঁকড়ে ধরে থাকি, আবার একই সঙ্গে মনে হয় দু'হাতে সামনে তুলে নিয়ে এসে মুখে থুতু ছিটিয়ে দিই! এক এক সময়ে এতো ঘেন্না করে মনে হয় গলা টিপে খতম করে দিই! চাকরিটাকে আবার তা কেমন করে করা যায় জানি না। সবাই মামদোবাজি—ধুত্তোরি!

[অফিসের আলো নিভে গেলো। হন হন করে উঠে গেলো প্রদ্যোৎ নীতার কাছে। নীতা তখনো চুল আঁচড়াচ্ছিলো। প্রদ্যোৎ কোটটা খুলে একপাশে ছুঁড়ে ফেললো, টাইটা আলগা করে মাথা গলিয়ে বের করে ছুঁড়ে মারলো কোটের উপরে।]

নীতা : কী কাজ আছে যেন বলছিলে?

[প্রদ্যোৎ নীতাকে টেনে আড়ালে নিয়ে গেলো।]

প্রদ্যোতের কণ্ঠ : এই কাজ।

নীতার কণ্ঠ : উঁ—অসভ্য! কেন, যাও না, কোথাও বসে গেলো গে!

[ঠোঁটটা আলতো করে মুছতে মুছতে নীতা ফিরে এলো। চুল আঁচড়াতে লাগলো। প্রদ্যোৎও এলো।]

প্রদ্যোৎ : বের করো না—কী আছে।

নীতা : কিছু নেই।

প্রদ্যোৎ : শরীর খারাপ হলে তো একটু আধটু চলে?

নীতা : আজ শরীর খারাপ করে নি।

প্রদ্যোৎ : একটু খারাপ করো না শরীরটা?

নীতা : ওসব না হলে চলে না, না? তাহলে বার-এ গেলেই পারতে?

প্রদ্যোৎ : না হলেও চলবে, পেটে তো কিছুটা আছে? তবে আর একটু জমতো।

নীতা : না, জমানো টমানো কিছু হবে না।

[একবার প্রদ্যোতের দিকে চোখ পাকিয়ে চেয়ে নীতা আড়ালে চলে গেলো। প্রদ্যোৎ খাটে বসে স্প্রিঙের গদিতে দু'বার দোল খেলো। নীতা ফিরে এলো আধশূন্য একটা বোতল আর দু'টো গ্লাস নিয়ে।]

প্রদ্যোৎ : (ঠোঁট উল্টে) জিন?

নীতা : জিন তো কী? মেয়েদের ড্রিঙ্ক?

প্রদ্যোৎ : নিজের জন্যে এনেছিলে বুঝি?

নীতা : হ্যাঁ, আমি তো খেয়ে উল্টে যাচ্ছি। (প্রদ্যোৎ ঢাললো) আমার জন্যে ঢাললে কেন?

প্রদ্যোৎ : একটুখানি। আজ সন্ধেয় হঠাৎ দেখা হয়ে যাবার অনারে।

[নীতা প্রদ্যোতের দিকে তাকালো। দু'জনের কেউই খানিকক্ষণ চোখ ফেরালো না।]

নীতা : সত্যি, তোমাকে যে ও সময়ে ওরকম জায়গায় দেখতে পাবো, ভাবতেই পারিনি। একবার ভেবেছিলাম—ডাকবো না।

প্রদ্যোৎ : কেন?

নীতা : জানি তো? এলেই তো খালি এসব খেতে চাইবে, আর—

['আর' কথাটা হাসিতে ইঙ্গিতে স্পষ্ট]

প্রদ্যোৎ : নাও, ধরো।

[নীতা গ্লাস নিলো না, একটু হেসে চিরুনিটা রেখে আড়ালে চলে গেলো।]

কী করছো ওখানে?

নীতার কণ্ঠ : সকালে করা মাংস ছিল ফ্রিজে, গরম করে নিচ্ছি। জানি—অফিস থেকে বেরিয়ে খালিপেটেই ওসব চালাচ্ছো।

প্রদ্যোৎ : কিন্তু তুমি রাত্রে কী খাবে?

নীতার কণ্ঠ : সে হবে এখন কিছু একটা।

প্রদ্যোৎ : তা হবে না। তাহলে রাত্রে দু'জনেই কোথাও খেতে যাবো।

নীতার কণ্ঠ : কিন্তু চিত্রাকে বলা নেই, ওর তো ফিরতে সেই রাত দশটা সাড়ে দশটা।

প্রদ্যোৎ : অতো রাত?

নীতার কণ্ঠ : হ্যাঁ, রোজই তাই আসে। সন্ধেবেলা চলে যায়। ওর তো আবার অনেক গণ্ডা সব আছে।

প্রদ্যোৎ : এসে না হয় একটু বাইরে বসে থাকবে।

নীতার কণ্ঠ : তা অবিশ্যি—অসুবিধে নেই। এগারোটার মধ্যে ফিরে আসবো।

[প্রদ্যেৎ দু'হাতে গ্লাস নিয়ে আড়ালে বলে গেলো।]

প্রদ্যোতের কণ্ঠ : নাও, ধরো।

নীতার কণ্ঠ : রাখো ওখানে! --আঃ কী হচ্ছে? পুড়ে মরবো যে!

প্রদ্যোতের কণ্ঠ : সরে এসো তবে এদিকে।

নীতার কণ্ঠ : না, মাংসটা নামাতে দাও আগে।

[প্রদ্যোৎ ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো মঞ্চের সামনের দিকে, সেখানে আলো জ্বলেছে। হাতের গ্লাস থেকে চুমুক দিলো।]

প্রদ্যোৎ : (দর্শকদের) দৃশ্যটা কেমন? বেশ জমাটি প্রেম মনে হচ্ছে না? বাইরে থেকে তাই মনে হয়। 'কেন যাও—কোথাও বসে টানো গে।' অর্থাৎ এমনিতে তো এখন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বসে গিলতাম, আর ওকে পেয়ে ঐ যে এখন খুশিতে উপচে পড়ছি, তাতে স্বভাবগত খোঁচাটা দেওয়া চাই। তার মানে—যা কিছুই দেবে, ভুলতে দেবে না যে—'দেখো, তোমায় দিচ্ছি।' 'আমার জন্যে ঢাললে কেন?' নেকী! ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানেন না তিনি। কতো লিটার তলিয়ে যাচ্ছে! আর আমি? আমিই বা কম কিসে? 'তুমি রাত্রে কী খাবে?' আহা, কী দুশ্চিন্তা, যেন এ পাড়ায় রাত্রে খাবার পাওয়া যাবে না। আসলে ঐ—তুমোও যা, আমুও তাই। ঝেড়ে সত্যি কথা বলা—ও বাবা, সে তো স্বাধীনতা। ডেঞ্জারাস মাল। তার চেয়ে এই বেস্ বাবা পরাধীনতার গর্ত, মিথ্যে কথা আর ন্যাকামির গর্ত, বড়ো সুখ। মিথ্যে বলে বুঝতে পারছে? টের পাচ্ছে? তাতে কী? কিছু তো বলতে পারবে না, আমিও যে টের পাচ্ছি। পরস্পরের পাপ কাটাকাটি করে ইকুয়াল টু সমঝওতা—তুমোও যা আমুও তাই।

[নীতা রেকর্ড চালিয়েছে, খাটের কাছে এসেছে। গুনগুন করে রেকর্ডের সঙ্গে

গাইছে। হাতের গ্লাসটা গালে চেপে ধরে শরীর দুলিয়ে অল্প অল্প নাচছে। প্রদ্যোৎ ধীরে ধীরে ওর দিকে ফিরে দাঁড়ালো।]

তবু নীতার এই অ্যাপার্টমেন্টে, এই শোবার ঘরে নীতাকে একলা পেলে আমি রোজ আসতে রাজি আছি—রোজ। এ এক আসক্তি, এক প্রচণ্ড টান, এক—(সামনের দিকে তাকালো এক ঝটকায়) আর ঐ একই সঙ্গে, একই মুহূর্তে—গা রি-রি করা ঘেন্না আর রাগ! সেই মামদোবাজি। এরকম আবার কারো হয় না কি? (একটু থেমে) হয় বোধ হয়। নীতার হয়। চরম সুখের মুহূর্তেও ওর মুখে ঠিক অমনি রাগ আর ঘেন্না ফুটে উঠতে দেখেছি। যেন ওর ইচ্ছে করছে—আমায় গলা টিপে মেরে ফেলতে। এর কোনো মানে নেই, কোনো মাথামুণ্ডু নেই। তবু—প্রেম? ইহারেই কয় প্রেম! আগে আগে আমার ঐরকম ধারণা ছিল, নীতা আমার। একলা আমার। আমাদের প্রেম হয়েছে। (হেসে উঠে) পেরেম! প্রথম যেদিন ধারণাটা ভাঙলো, সেদিন--ও বাবা, আমার কী কষ্ট। অথচ তার দু'দিন আগেই দক্ষিণ বাংলায় এক গ্রামে বেড়াতে গিয়ে ষোলো সতেরো বছরের একটা মেয়েকে—সে মেয়েটাও বলিহারি! কী বলবো, আদর টাদর করে আমি নিজেই তো বলে ফেলেছিলাম—যাঃ শালা! তবু, তবু প্রথম যেদিন জানলাম—নীতা আমার একলার নয়, সেই দিনটা—পরে অনেকদিন একা একা হেসেছি। নীতা অসচ্চরিত্রা বিশ্বাসঘাতিনী, আর তুমি সাধুপুরুষ? মাথায় গাঁট্টা! তুমোও যা, আমুও তাই।

[ঢক করে অনেকটা জিন গিললো। গানটা জোর হয়ে উঠলো। নীতা নেমে এলো গ্লাস হাতে। নাচতে শুরু করলো, প্রথমে অল্প, তারপর পুরোপুরি। প্রদ্যোতের কোমর দুলে উঠেছে, সেও নাচছে। ছোঁয়াছুঁয়ি নেই, তবু ভঙ্গীতে, চোখের ইশারায়, মুখের অস্ফুট স্বরে নৈকট্য স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। গান আরো জোরে, নাচ আরো চটুল। হঠাৎ গান শেষ হয়ে গেলো। আলো নেভবার ঠিক আগের মুহূর্তে দেখা গেলো—প্রদ্যোৎ ছুটে আসছে নীতাকে বুকে পিষে ফেলতে।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মঞ্চের সামনের দিকে দু'টো চেয়ার গায়ে গায়ে লাগানো, দর্শকদের দিকে মুখ করে। তার একটায় প্রদ্যোৎ, আর একটায় চ্যাটার্জি, ঘেঁসাঘেঁসির মধ্যে যতোটা পারে ছোঁয়া বাঁচিয়ে বসে। চ্যাটার্জির মাথায় টাক, চোখের দৃষ্টি মরা মাছের মতো, সিধে সামনের দিকে তাকিয়ে। হাতে ভাঁজ-করা খবরের কাগজ মুঠো করে ধরা, মুখ গম্ভীর। প্রদ্যোৎ একবার আড়চোখে তাকালো। মুখে বাঁকা হাসি ফুটলো। তারপর দর্শকদের উদ্দেশ করে কথা বললো।]

প্রদ্যোৎ : চ্যাটার্জি সাহেব। এঁর সঙ্গে রোজ এক জীপে অফিসে যাতায়াত। আমি ভেতরে ড্রাইভারের পাশে বসি, উনি বাইরের দিকে। সুপিরিয়ার তো? বৃষ্টি-বাদলা হলে আবার ব্যবস্থাটা উল্টে যায়। ওনার মনের ইচ্ছে—আমি পেছনে গিয়ে বসি। সে গুড়ে বালি। মুখ ফুটে বলতে ভরসা পান না, জানেন—বললে কথাটি থাকবে

না, এবং তার পরে যে অবস্থাটার মুখোমুখি হতে হবে, সেটা খুব সুবিধের নয়।
[প্রদ্যোৎ আর একবার আড়চোখে দেখে নিলো, দর্শকদের দিকে চোখ টিপে হাসলো।]
কীরকম সিধে তাকিয়ে আছে? যেন গাড়িটা উনিই চালাচ্ছেন! আমার দিকে তাকালেই যেন সতীত্ব নাস্ হয়ে যাবে একেবারে! বুড়োর মনে শান্তি নেই কিন্তু! প্রতি দশ বছরে একটা করে বৌ খুইয়ে এখন তৃতীয় পক্ষ। বৌটা—এই সাতাশ-আটাশ—তা বেশ মাখো-মাখোই হবে। রোজ চেষ্টা করি—জানলা-টানলায় দেখা যায় যদি। একদিনও দেখতে পেলাম না। সম্বন্ধী লুকিয়ে রেখে দেয় ভেতরে। তাতে তো কিছু বাঁচলো না চাঁদ? প্রথম পক্ষের ছেলে যে সব গুবলেট করে দিচ্ছে? কলেজ পালিয়ে বাড়ি আসে ছোঁড়া—জোর কানাঘুষো! ঐ জন্যই বুড়োর অমনি মরা-মাছের হতো চেহারা—ভেতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে আর কি?
[গাড়ি যেন ব্রেক কষলো, দু'জনে সামনে ঝুঁকে পড়লো। চ্যাটার্জি নড়েচড়ে বসলেন।]
যাঃ শালা—আবার লালবাতি! কে যাচ্ছে মেয়েটা? দু'বার তাকালো যেন? মন্দ না। সবুজ করো বাবা। আর ভালো লাগে না বুড়োটার সঙ্গে। এই ছেড়েছে, যাক বাবা।
[প্রদ্যোৎ হঠাৎ চমকে উঠে ঘুরে তাকালো। চমকের ধাক্কায় চ্যাটার্জি বিরক্ত হয়ে নড়েচড়ে বসলেন। প্রদ্যোৎ সচেতন হয়ে ফিরলো, তার মুখে একটা টান।]
আশ্চর্য। হঠাৎ দেখে মনে হয়েছিলো—নীতা যাচ্ছে। নীতার মতোই গড়ন অনেকটা। এরকম মনে হচ্ছে কেন? মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেলো না কি? আচ্ছা, নীতা বোধহয় এতোক্ষণে, মানে নীতাকে—না। এখন থাক। অফিসে গিয়ে কফি নিয়ে বসে ঠাণ্ডা মাথায় সবটা একবার ভেবে দেখতে হবে, গোড়া থেকে আগাপাস্তলা। গোড়াটাই বা কী? কাল সন্ধেয় আচমকা দেখা হয়ে যাওয়া? একটা যোগাযোগ—অ্যাক্সিডেন্টের মতো। কিন্তু অমন যোগাযোগ তো আকছারই ঘটছে। ঠিক করলাম এক, আর হয়ে গেলো আর এক। সারাদিন হয় তো নীতার কাছে যাওয়া ঠিক, নীতা নীতা নীতা নীতা করতে করতে লাস্ট মোমেন্টে নীতা গেলো পিছলে, আর আমি যে মেয়ের কথা তিনমাস ভাবিনি একবারও, তারই বিছনায়—কিম্বা হয়তো ডোরা না ক্লারা কী যেন নাম—নাঃ! সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ধুর শালা, আবার লাল বাতি!

চ্যাটার্জি : (না ফিরে) পেপার দেখেছেন না কি?

প্রদ্যোৎ : (চমকে) না। কেন, বিশেষ কোনো খবর আছে না কি স্যার?
[হঠাৎ আলো নিভে নীতার খাটের কাছে আলো জ্বলে উঠলো। নীতা উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, যেন ঘাড় গুঁজে ঘুমোচ্ছে। একটা হাত ঝুলে রয়েছে খাটের বাইরে। প্রদ্যোৎ আর চ্যাটার্জির পেছন থেকে আলো পড়েছে, ফলে তারা ছায়ামূর্তি।]

চ্যাটার্জি : দেখুন।

[কাগজটা প্রদোৎকে দিলেন। সামনের আলো আবার আগের মতো হোলো। পেছনে খাটের আলো আস্তে আস্তে কমছে। প্রদ্যোৎ কাগজের প্রথম পাতাটা দেখছে।]

(আড়চোখে দেখে) পাঁচের পাতা।

[প্রদ্যোৎ পাতা ওল্টালো। চোখ বোলাতে লাগলো।]

বুঝলেন কিছু?

প্রদ্যোৎ : কোন্ খবরটা—ঠিক বুঝতে পারছি না।

চ্যাটার্জি : কেন? ঐ তো ছবি দিয়েছে—হরলাল ভট্টাচার্য। দেশপ্রেমিক, কীভাবে দেশের ইন্ড্রাস্ট্রি বাড়ানো যাবে, হাতে-কলমে কাজ করে তিনি দেখাচ্ছেন। এর মধ্যেই একটা ছোট-যন্ত্রপাতি বানাবার কারখানা তৈরির ব্যাপারে আনেকখানি এগিয়ে গিয়েছেন। আট বিঘে জমির ওপর কারখানা বিল্ডিং তৈরি হবে বলেছে—

[চ্যাটার্জি থামলেন। প্রদ্যোৎ পড়লো। কাগজ রাখলো।]

কীরকম বুঝলেন?

প্রদ্যোৎ : ধড়িবাজ ব্যাটা।

চ্যাটার্জি : ধড়িবাজ তো বটেই। কিন্তু মতলবটা—

প্রদ্যোৎ : মতলব?

চ্যাটার্জি : আপনার রিপোর্টটা তো ঘুরে এসেছে?

প্রদ্যোৎ : আপনার কাছ থেকে বাগচি সাহেব হয়ে খোদ কর্তার সই হয়ে এসেছে! যেখানে যেখানে খবর যাবার চলে গেছে কাল। অ্যান্টি করাপ্শনেও গেছে এক কপি।

চ্যাটার্জি : হুম্। তাই ভাবছি—হঠাৎ এসব কেন? কিছু একটা আছে মতলব।

প্রদ্যোৎ : খোদ কর্তার সই হয়ে গেছে, এখন আর মতলব করে করবে কী? আট বিঘের জায়গায় জমি কিনেছে মোটে তিন বিঘে। একটা টালিশেড, কিছু করোগেটেড টিন, আর হাজার পাঁচেক ইঁট—কমপক্ষে দু'বছরের বর্ষায় স্যাঁতলা পড়ে গেছে। হাজার দশেক টাকার মালও হবে না সব মিলিয়ে। ওর টাকাকড়ি দূরে যাক, আমাদের লোন সাড়ে তিন লাখ—তার কোনো পাত্তাই নেই।

চ্যাটার্জি : হুম। সেসব তো রিপোর্টে লিখেছেন আপনি—দেখেছি। কিন্তু—হুম।

প্রদ্যোৎ : তার ওপর জমি ওখানে সস্তা। সাত-আটশো টাকা বিঘে, আর ও দেখিয়েছে চার হাজার করে।

চ্যাটার্জি : সবই তো বুঝলাম, তবু—আচ্ছা, আপনি যতোবার খোঁজখবর নিতে গেছেন, পাত্তাই দেয়নি, না?

প্রদ্যোৎ : সেইটাই আশ্চর্য লেগেছে আমার। কাগজপত্র দেখাতো, যেন দয়া করে দেখাচ্ছে। তড়পানি দেখে আমি তো ভেবেছিলাম সত্যিই বুঝি বিরাট কারখানার খেল দেখাবে।

চ্যাটার্জি : হুম্। জোর একটা আছে কোথাও।

[গাড়ি পৌঁছে গেছে। চ্যাটার্জি নামলেন. প্রদ্যোৎও নামলো। চ্যাটার্জি প্রদ্যোতের দিকে না তাকিয়ে ঘটমট করে চলে গেলেন। প্রদ্যোৎ সামনের দিকে এলো।]

প্রদ্যোৎ : বাপস্, বাঁচালি মা! শালার পাশে বসে থাকতে হলে মনে হয় যেন মরা বোয়ালমাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। তৃতীয় পক্ষের আর অপরাধ কী? কিন্তু হরলাল ভট্চায্যি। তুমি সাড়ে তিনলাখ টাকা ফুঁকলে কিসে বাবা? গাড়ি-বাড়ি? মদ? মেয়েমানুষ—মেয়েমানুষ কি চলে এ বয়সে? (হেসে) এ আমি কী বলছি? বুড়ো হলে তো মেয়েমানুষের খরচা বেশি। কিন্তু বাপধন, এবার ডুবেছো, শ্রীঘর ছাড়া গতি নেই তোমার। কিছু ছাড়লেই পারতে বাবা, তা না, ডাঁট দেখিয়ে হুট্আউট করে দিলে। দশ হাজার টাকা লোন খায় যারা, তারাই যা ছাড়ে তাতেই দু'মাস এদিক সেদিকের খরচা চলে যায় আমার মতো মক্কেলের, আর তুমি শালা সাড়ে তিন লাখ খাবে আমাদের শুকনো হাতে রেখে? হুঁ হুঁ, বুঝবে এবার। (যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো) পেপারটা নিয়ে অমন চমকালাম কেন? আজকের পেপারে কিছু ওঠা সম্ভব না জানি, তবু—তার ওপর ঐ মেয়েটা। উঁহু, এরকম উল্লুকের মতো করলে তো হবে না? একবার ঠান্ডা মাথায় সবটা যদি—

[প্রদ্যোৎ চলে গেলো অফিসে। কোটটা খুলে চেয়ারের পেছনে রাখলো। টেবিলের উপর রাখা ঢাকা-দেওয়া জলটা খেলো ঢকঢক করে। ফোন বাজলো।]

ধূর শালা, আসতে না আসতেই! (ফোন তুলে) হ্যালো...স্পীকিং। (স্বর বদলে গেলো) ও, গুডমর্নিং স্যার। ইয়েস স্যার, জাস্ট নাও...ও, ইমিডিয়েটলি স্যার। (ফোন রেখে) কী হোলো রে বাবা, সক্কালবেলাই ডাকে কেন আমায়?

[উঠে কোটটা নিয়ে সামনে চলে এলো। অফিসের আলো নিভে সামনের আলো জ্বলেছে। দর্শকদের উদ্দেশ করে কথা বললো কোট পরতে পরতে।]

বাগচি সাহেব। চীফ্— কাঁচাখেকো দেব্তা। একের নম্বর হারামজাদা, ভাগ না দিয়ে একটি পয়সা খাবার উপায় নেই, টের পেলেই বৃন্দাবন দেখিয়ে ছেড়ে দেবে। চারটে বাড়ি করেছে কলকাতায়, একটা মধুপুরে। মধুপুরে কাকে রাখে কে জানে?

[প্রদ্যোৎ মঞ্চ ছেড়ে গেলো। অফিসের আলো জ্বলেছে। প্রদ্যোৎ উঁকি মারলো।) মে আই—]

বাগচি : ও ইয়েস। কাম্, কাম্ ইন। সীট ডাউন প্লীজ।

[প্রদ্যোৎ বসলো সামনের চেয়ারে]

হ্যাঁ, কথাটা হচ্ছে—হরলাল ভট্টাচার্যের কেসটা একটু অসুবিধেয় ফেলেছে।

প্রদ্যোৎ : অসুবিধে? মানে, আমার দিক থেকে কোনোরকম—?

বাগচি : উম্? না, মানে—তোমার রিপোর্টটা উইথড্র করতে হবে।

প্রদ্যোৎ : উইথড্র?

বাগচি : হ্যাঁ, ফাইলটা খোদ কর্তার সই হয়ে বেরিয়ে এসেছে, তুমি জানো। যে জন্যে তিনি এখন হাত কামড়াচ্ছেন।

প্রদ্যোৎ : হাত কামড়াচ্ছেন?

বাগচি: হ্যাঁ, মানে এ দপ্তরে গতকালই একটা প্রচার হয়ে গেছে তো? শুধু তাই নয়, অ্যান্টিকরাপশনেও কপি চলে গেছে।

প্রদ্যোৎ : সে তো আমি জানি। মানে, আমরা সবাই মানি।

বাগচি : জানি, কিন্তু ভুল জানি।

প্রদ্যোৎ : ভুল জানি?

বাগচি : হ্যাঁ ভুল, মানে—ভুল, বুঝলে না? আমি তোমাকে ঠিক কী বলবো (হঠাৎ ঝুঁকে) কাল রাত দশটা নাগাদ কোথায় ছিলে?

প্রদ্যোৎ : (একটু চমকে) দশটা? একটু আড্ডা দিতে গেছিলাম।

বাগচি : বাড়িতে তোমাকে কেউ কিছু বলেন নি?

প্রদ্যোৎ : কই, না তো?

বাগচি : আমি তোমাকে বাড়িতে কাল রাতে ফোন করেছিলাম।

প্রদ্যোৎ : ও, তাই না কি? এক্সট্রিমলি—

বাগচি : পেলাম না। তাই আজ সকালের অপেক্ষাতেই—আজ সকালের পেপার দেখেছো নিশ্চয়?

প্রদ্যোৎ : হ্যাঁ, হরলাল ভট্টাচার্যের ইন্ডাস্ট্রির ওপর লেকচার—

বাগচি : হ্যাঁ, খুব জ্ঞানী লোক, বুঝলে? হি ইজ এ ট্যালেন্টেড্ ম্যান। জিনিয়াস। এ প্যাট্রিয়ট, পলিটিক্যাল সাফারার—(প্রদ্যোৎ চুপ করে রইলো) এখন কথা হচ্ছে—হরলালবাবু সম্বন্ধে আমাদের রিপোর্টটা, মানে তোমার ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টটা, যাকে বলে—ভুল হয়েছে। হি ইজ এ গ্রেট ম্যান, তার সম্বন্ধে আর একটু কশাস্ হওয়া উচিত ছিল। মানে, আমাদের সকলেরই হওয়া উচিত ছিল। প্রচার করা হয়ে না গেলে ওটা তো তখনই চেপে দেওয়া যেতো, কোনো ঝামেলাই ছিল না। এখন কী বলে—আর একটা রিপোর্ট লিখে, মানে ফার্দার ইনভেস্টিগেশনে তুমি যেন আসল খবরটা জানলে, এইভাবে হরলালবাবুর ওপর থেকে চার্জগুলো তুলে নিতে হবে। মানে উইথড্র যাকে বলে, আমার কথাটা তুমি—

[ফোন বাজলো]

(ফোনে) হ্যালো...ইয়েস, স্পীকিং...দ্যাটস্ অলরাইট্, হি'ল সী ইউ ইমিডিয়েটলি।

[ফোন রেখে ভুরু কুঁচকে তাকালেন]

তোমার চেম্বারে কে একজন বসে আছে। কী একটা জরুরি কারণে দেখা করতে চায়। ওটা সেরেই তুমি আবার আমার এখানে চলে এসো। কী করে উইথড্র করা যায় সেটা আলোচনা করা যাবে, আই লাইক টু হেল্প ইউ। মিস্টার চ্যাটার্জির সঙ্গে আমি কথা বলছি, ওঁকেও ডাকা যাবে। (প্রদ্যোৎ বেরোতে গেলো) একটা কথা। কাল-পরশুর মধ্যে কোনো—বিজনেস করো নি তো?

প্রদ্যোৎ : না স্যার।

বাগচি : ঠিক আছে, ঘুরে এসো।

[প্রদ্যোৎ বেরিয়ে সামনে এলো। অফিসের আলো নিভে সামনে আলো ফুটলো।]

প্রদ্যোৎ : অমায়িক খচ্চর! হরলাল জিনীয়াস? প্যাট্রিয়ট? ব্যাপারটা যেন মাথায় ঢুকবে

ঢুকবে করেও ঢুকছে না। (একটু থেমে) ঢুকছে না? জলের মতো পরিষ্কার তো ব্যাপারটা। হরলাল সম্বন্ধে যে রিপোর্টটা করা হয়েছে, অর্থাৎ যা আমি বমি করার মতো উগড়ে ফেলেছি, এখন তা আমাকে অমৃতের মতো চেটে চেটে গিলতে হবে। এবং—(একটু থেমে) হাত কামড়াচ্ছে? হরলাল তাহলে খোদ কর্তাকেই প্যাঁচে ফেলেছে? এই জোর ছিল বলেই অ্যাদ্দিন শুকনো হাতে হুটআউট করে দিচ্ছিলো শালা? কিন্তু জোরটা কোথায়? ব্ল্যাকমেল? রুবী দত্ত আছে না কি এর ভেতরে? মরুগ গে! হরলাল পরে ভাবা যাবে, আগে আমার—কিন্তু কোন্ শুওর আমার ঘরে বসে আছে কে জানে? কখন যে একটু ঠান্ডা মাথায় ভাববার সুযোগ পাবো?

[প্রদ্যোৎ অফিসের দিকে গেলো। সেখানে আলো জ্বললো সামনের আলো নিভে গিয়ে। প্রদ্যোতের টেবিলের উল্টোদিকের চেয়ারে গোলগাল টাকমাথা এক ভদ্রলোক, প্রদ্যোৎ ঢুকতে উঠে দাঁড়ালো। প্রদ্যেৎ আবার কোট খুলে রাখলো।]

বসুন।

[দু'জনে বসলো। প্রদ্যোৎ একটা ফাইল টেনে নিয়ে ভদ্রলোকের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো।]

ভদ্রলোক : আপনি নিশ্চয় খুব ব্যস্ত, কিন্তু আমার না এসে উপায় ছিল না।

[ভদ্রলোকের গোল মুখে একটা শিশুসুলভ নিরীহ ভাব, কিন্তু গলা অসম্ভব মোটা।]

প্রদ্যোৎ : কী ব্যাপার বলুন?

ভদ্রলোক : আমি আসছি, আপনার গিয়ে ইন্টেলিজেন্স ব্র্যাঞ্চ থেকে। একটা ইনভেস্টিগেশনের দায়িত্ব পড়েছে আমার ঘাড়ে, তাই আসতে হোলো।

প্রদ্যোৎ : কী ব্যাপার বলুন তো? আমাদের অফিসের ব্যাপারে কিছু—

ভদ্রলোক : না না অফিসের ব্যাপারে নয়, আমি আপনার কাছেই এসেছি। কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে, একটু সময় আমাকে দয়া করে দিতে হবে।

প্রদ্যোৎ : কিন্তু সেটা না শুনলে তো কিছুই বলতে পারছি না। আমার আবার আজকেই একটা জরুরি কাজ পড়ে গেছে, এক্ষুনি সুপিরীয়রদের সঙ্গে বসে ফয়সালা করে ফেলতে হবে। (একটু হেসে) মানে, আমিও একটা ইনভেস্টিগেশন নিয়েই গোলমালে পড়ে গেছি। তবু বলুন, আপনার কথা নিশ্চয় শুনবো, আমাকেই যখন আপনার জিজ্ঞাসাবাদের দরকার।

ভদ্রলোক : আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাকেই, মানে, বিষয়টা স্যার—একটা খুন।

প্রদ্যোৎ : (অবাক হয়ে) খুন? কোথায়?

ভদ্রলো : ক্লিফোর্ড ম্যানশন্স্, হান্টিংডন স্ট্রীট, সাত নম্বর অ্যাপার্টমেন্ট।

প্রদ্যোৎ : (চাপা দিয়ে) কী বলছেন? ওটা—ওটা তো নীতার অ্যাপার্টমেন্ট—

ভদ্রলোক : নীতা রায়।

প্রদ্যোৎ : হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন না। সে আমার, কী বলবো—

ভদ্রলোস : (মুখ নামিয়ে) হ্যাঁ জানি, তাঁর সঙ্গে আপনার খুবই হৃদ্যতা ছিল। উনি কাল রাত্রে ওঁর ঘরে খুন হয়েছেন।

প্রদ্যোৎ : (প্রাণ চেঁচিয়ে) খুন। নীতা খুন? হাও—হু—কে করেছে?

[দপ করে আলো নিভে গেলো। সারা মঞ্চ অন্ধকার। তারপর জানলার ফ্রেম আলোকিত, নীতা পাশ ফিরে, যেন ট্যাক্সিতে বসা।]

নীতা : প্রদ্যোৎ, উঠে এসো।

প্রদ্যোতের কণ্ঠস্বর : নীতা।

নীতা : উঠে এসো।

[জানলার আলো নিভে গেলো, সামনে আলো, প্রদ্যোৎ দর্শকদের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে ধীবে ধীরে, যেন ভেবে ভেবে বলছে।]

প্রদ্যোৎ : আচ্ছা, সব রকম স্বাধীনতাতেই তো আমি ভয় পাই, আমরা সবাই ভয় পাই। এই যেমন নীতার সংস্পর্শ না করার স্বাধীনতা তো আমার ছিল, তবু ওর এক ডাকেই আমি চলে এসেছি, বরাবর, যার মানে—আমার প্রতিটি রক্তকণা পরাধীনতার মদ খেয়ে নেশা করে বসে আছে, নীতারও তাই, আমি আসলে এই পরাধীনতার মধ্যেই যা হোক একটু খেয়ে পরে বেঁচে বর্তে থাকবার আশ্রয় পেয়েছি। সে হিসেবে স্বাধীনতাকে আগুনের মতো ভয় করে এসেছি। ইচ্ছের স্বাধীনতাকে প্রকাশ করতে ভয় পেয়েছি। একটা গর্তে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছি, বেশ মিথ্যে কথা বলে সকলের সঙ্গেই দিব্যি কাটিয়ে দিচ্ছি, সবাই দিচ্ছে। আমরা কেউ তো সত্যি কথা বলি না, সত্যি আচরণ করি না, তাই প্রত্যেকেই একটা করে গর্ত বেছে নিয়েছি আর পরাধীনতার সুখে বুঁদ হয়ে আছি।

[প্রদ্যোৎ থামলো। খাটের আলো জ্বললো। নীতা চুল আঁচড়াচ্ছে]

তবু সত্যি বলতে কী—ঐ কুৎসিৎ স্বাধীনতাটা, এর যে কী গতিবিধি, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। এটা যেহেতু আমারই 'ইচ্ছে', সেই হেতু অন্যের গর্তে ওর থাকার উপায় নেই। আমারই পরাধীনতার সুখের গর্তে কোনোরকমে থাকে, পরাধীনতার দাপটে খাঁচায় বন্ধ বাঘের মতো, কিন্তু সে যে কখন কোন্‌দিনে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে, পরাধীনতার দুর্বল জায়গাগুলো খুঁজে ফিরছে, যাতে সুযোগ পেলেই ঘাউ করে লাফিয়ে পড়তে পারে, আর তা হলেই—

এই তো নীতা, আমার গর্তের সুখের মধ্যমণি। দিব্যি দু'জনে মিথ্যে বলে মিথ্যে নিয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছিলাম। আপোষ, অ্যাডজাস্টমেন্ট না কী বলে—তুমোও যা আমুও তাই। এইরকম চিন্তা করে মানিয়ে গুছিয়ে—কিন্তু কোত্থেকে সেই আপোষহীন স্বাধীনতার বাঘ লাফিয়ে পড়ে এইখানে—

[প্রদ্যোৎ বাঁহাতের কনুইটা পরীক্ষা করে দেখলো। নীতা চিরুনি রেখে চলে গেলো। নাচের গানটা শোনা গেলো, প্রদ্যোতের কোমরটা দুলে উঠতে লাগলো। নীতা এসেছে খাটের পাশে আবার। হাতের গ্লাস গালে চেপে দুলে দুলে নাচছে। তার চোখ খাটের অন্যপাশে, যেন প্রদ্যোৎ ওখানেই রয়েছে। গান বাড়ছে, কোমরের দোলানি বাড়ছে। নীতার চোখের ইঙ্গিত, শরীরের আকুতি বাড়ছে। প্রদ্যোতের কাছের আলো কমে আসছে, নীতা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। প্রদ্যোৎ অন্ধকার, নীতা আগুনের শিখা হয়ে নাচছে, গান আরো জোরে, আরো জোরে। হঠাৎ নীতা

বিছানায় আছড়ে পড়লো। দপ করে মঞ্চের সব আলো নিভে গেলো। অন্ধকারে নীতার অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, গভীর অনুভবের অস্ফুট আর্তি।]

নীতার কণ্ঠস্বর : আঃ! প্রদ্যোৎ। প্র—দ্যোৎ! আঃ! না না —ওঃ—আঃ—প্রদ্যোৎ!

[হঠাৎ অন্ধকারে প্রদ্যোতের কর্কশ হাসি আর অশালীন কণ্ঠস্বর সমস্ত আমেজ সমস্ত আবেগ খানখান করে দিলো।]

প্রদ্যোতের কণ্ঠস্বর : বলো বাবাজী—নীতা রায় প্রেম বিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়।

[সামনের আলো জ্বলে উঠলো। প্রদ্যোৎ দাঁড়িয়ে আছে একই জায়গায়। খাটের আলো ফুটে উঠলো আস্তে আস্তে। নীতা উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, যে ভঙ্গীতে আগে একবার তাকে দেখা গেছিলো। প্রদ্যোৎ ওদিকে ফিরলো।]

প্রদ্যোৎ : আচ্ছা, নীতা তো এরকম সময়ে প্রায়ই অমনি উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে। ঠিক এই রকম এলিয়ে শুয়ে আধবোঁজা চোখে একদিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে, আর মাঝে মাঝে অনেকটা প্রলাপের মতো বকে।

নীতা : (না নড়ে) আচ্ছা, জীবনের কী মানে বলতে পারো?

[প্রদ্যোৎ দর্শকদের দিকে ফিরলো]

প্রদ্যোৎ : হ্যাঁ, এইরকম সব কথা।

নীতা : সত্যি, আমার কিছু ভালো লাগে না।

প্রদ্যোৎ : হ্যাঁ।

নীতা : এক এক সময়ে মনে হয়—সুইসাইড করি।

প্রদ্যোৎ : হ্যাঁ এইরকম—নিশ্বাস ফেলে ফেলে নিচু গলায়, আসলে প্রলাপ বকবার মেয়েই নয় নীতা রায়। এ বেশ আরামে এলিয়ে পড়া স্বপ্নের বিলাসের মতো। যেন—হ্যাঁ, এই বেশ রক্তের এক আশ্চর্য নেশায় বুঁদ হয়ে আছি, এখনই যতো দুঃখের কথা বলতে ইচ্ছে করছে—ভাবটা এইরকম। কালকেও যদি এই অবস্থাটায় চলে আসতে পারতাম, আকর্ষণ আর ঘেন্নার ঐ মামদোবাজি পার হয়ে কোনোরকমে এই 'প্রলাপ' বকার অবস্থায়, এই গর্তের মধ্যের আরামে, যেমন কতোদিন করেছি আগে, তাহলে হয় তো—

[হঠাৎ অফিসের আলো জ্বলে উঠলো। গোলমুখো ভদ্রলোক ঝুঁকে প্রদ্যোতের চেয়ারের দিকে তাকিয়ে। যেন প্রদ্যোৎ বসে আছে ওখানে।]

(আগের স্বরে) হাও, হু—কে, কে করেছে?

ভদ্রলোক : সেটা জানবার জন্যেই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

প্রদ্যোৎ : কিন্তু আমি তো এর কিছুই জানি না।

ভদ্রলোক : যা জানেন, তা বললেই হবে। অর্থাৎ মিস রায় সম্বন্ধে যা জানেন—যাতে কিছুটা সাহায্য হয়।

প্রদ্যোৎ : নিশ্চয় বলবো, যা জানি সব বলবো।

ভদ্রলোক : আচ্ছা, মিস রায়ের সঙ্গে আপনার শেষ কবে দেখা হয়েছে, মনে করতে পারেন কি?

প্রদ্যোৎ : তা হবে—দিন দশ-বারো। কিন্তু একটা কথা, কীভাবে ও খুন হয়েছে?

ভদ্রলোক : দম বন্ধ হয়ে। মানে, এখনো পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এসে পৌঁছয়নি। তবে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে—দম বন্ধ করেই মারা হয়েছে।

প্রদ্যোৎ : মাই গড্!

[অফিসের আলো নিভে গেলো]

কিন্তু না, তা হোলো না। প্রলাপ বকা পর্যন্ত এগোনো গেলো না। ঐ মামদোবাজির মুহূর্তেই কথা বলে উঠলাম দুজনেই।

[খাটের আলো নিভে গেলো]

আচ্ছা, কে আগে কথা বলেছিলো? নীতা?

[অন্ধকারে নীতার গলা, খানিকটা আবিষ্ট নেশাগ্রস্ত স্বরে।]

নীতা : যদি তখন দেখা হয়ে না যেতো, অন্য কারো কাছে ছুটতে, না?

প্রদ্যোৎ : তুমি?

নীতা : কেন, কী ভাবো তুমি আমাকে?

প্রদ্যোৎ : আমাকে তুমি কী ভাবো?

নীতা : পুরুষরা যা।

প্রদ্যোৎ : তোমাকেও আমি একটা মেয়ে ভাবি। মেয়েরা যা, ঠিক তাই।

নীতা : মেয়েরা কী?

প্রদ্যোৎ : সব চাওয়াতেই যে গলে, যে মনে করে—সবাই আমাকে চাক।

নীতা : আর তোমরা? চেয়ে বেড়াও।

প্রদ্যোৎ : হ্যাঁ।

নীতা : আর ভালোবাসা?

প্রদ্যোৎ : যে বাসায় ভালো ল্যাভেটরি আছে।

নীতা : সে তো তোমাকে গোড়া থেকেই দেখে বুঝেছি!

[প্রদ্যোতের মুখে একটা প্রচণ্ড ঘৃণা]

প্রদ্যোৎ : কারণ তুমি গোড়ায় আমার সঙ্গেই পেম করেছিলে।

নীতা : তোমার চোখ ভীষণ লাল দেখাচ্ছে!

[প্রদ্যোতের হাতটা মুঠো হয়ে উঠলো]

প্রদ্যোৎ : মাল টেনেছি।

নীতা : (হঠাৎ আর্তনাদ করে) উঃ! লাগছে বুকে, ছাড়ো!

প্রদ্যোৎ : আমার লাগাতে বেশ লাগছে।

নীতা : তার মানে—তুমি এই! তুমি কখনোই ভালোবাসতে পারো না।

প্রদ্যোৎ : তুমি পারো!

নীতা : এ সময়ে তোমাকে আমার ঘেন্না করে!

প্রদ্যোৎ : তোমার মুখে আমার থুতু দিতে ইচ্ছে করে!

নীতা : আমারও করে! ছাড়ো, আর গলা জড়িয়ে ধরতে হবে না।

প্রদ্যোৎ : না ছাড়বো না।

[নীতার কণ্ঠ হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলো, তারপর একটা রুদ্ধ গোঙানি। দর্শকদের

উদ্দেশ করে প্রায় অভিব্যক্তিবর্জিত স্বরে প্রদ্যোৎ কথা বললো।]
গলা জড়িয়ে ধরি নি। আমার বাঁ হাতটা ওর গলায় আলতোভাবে ফেলা ছিল। আমার কনুইটা ওর গলায়, টুঁটির কাছে চেপে বসছিলো। ওর গলাটা যে এতো নরম তা আগে কখনো মনে হয়নি. যেন একটা গর্তের মধ্যে কনুইটা ঢুকে যাচ্ছিলো, ওর চোখ ফেটে পড়ছিলো, ও বলতে চাইছিলো—'তুমি'—আমি বলেছিলাম— 'কোনো কথা নয়'। আমরা গলাটা কেমন চাপা আর মোটা শোনালো, হয়তো বা সমস্ত শক্তি দিয়ে চাপছিলাম বলে, ঠিক তক্ষুনি নীতার হাত আমার পেটে খামচে ধরেছিলো। এতো জোরে যেন ছিঁড়ে ফেলবে পেটটা, আমি হ্যাঁচকা দিতেই নতুন টেরেলিনের শার্টটা পড়পড় করে ছিঁড়ে গেলো, তার ঐ হ্যাঁচকার জন্যেই কনুইয়ের চাপটা আরো বেশি পড়লো, যাতে নীতা—
[প্রদ্যোৎ থামলো। খাটে আলো। নীতার দেহ আগের মতো উপুড় হয়ে পড়ে। প্রদ্যোৎ আস্তে আস্তে সেদিকে ফিরলো।]
না, ওরকমভাবে ছিল না তখন। আমিই ফিরিয়ে দিয়েছি। ওর ঘাড়ভাঙামতো চেহারাটা দেখতে ভালো লাগছিলো না বলে আমিই উপুড় করে দিয়েছি। কাপড়জামাগুলো আমিই—

[হঠাৎ ফিরে এক পা এগিয়ে এলো]

আচ্ছা, এটাকে তো খুন করাই বলে? অথচ আমি ওকে খুন করতে চাইনি—মাইরি—কারণ ওকে যদি খুন করতে হয়, তাহলে তো আমার নিজেকেও খুন করতে হয়। কিন্তু ওরে বাবা—সে আমি ভাবতেই পারি না! যদিও ঐ একই ঘৃণায় আর রাগে নীতাও আমাকে গলা টিপে মারতে পারতো, আর মারলে তাকে আমি দোষ দিতে পারতাম না।
আসলে 'আমি' খুন করিনি' করেছে এই কনুইটা। কিন্তু কনুইটাকে দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই। যাকে বলে কোনো এক্সপ্রেশনই নেই। তবু এই কনুইটাই খুনী। কিন্তু সে কথা কি পুলিসকে বোঝাতে পারবো? আমি—মাইরি স্যার—খুন করতে চাইনি, কিন্তু আমার গর্তের মধ্যে, আমার সুখের পরাধীনতার মধ্যে কুৎসিত স্বাধীনতা নামক একটা জিনিস আছে, সেইটা হঠাৎ আমার কনুইয়ে ভর করেছিলো, শুনে নিন স্যার— (মোটা গলা নকল করে) আর শোনবার দরকার নেই, ডেলিবারেট মার্ডার, চলো শ্রীঘর! (আবার নিজের গলায়) আপনাদের আমি ঠিক ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারলাম না, মানে আসক্তি আর ঘৃণা, নীতাকে নিয়ে এই দুইয়ের মাঝখানে— হ্যাঁ জানি, এসব উন্মুকের মতো কথা। কিন্তু বিশ্বাস করুন স্যার, সত্যি বলছি—একটা অদ্ভুত, কী বলবো, একটা বিচ্ছিরি দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেছিলাম। আরো পরিষ্কার করে বললে—ওকে ভালোবাসতাম, অথচ ঘৃণা করতাম—মামদোবাজি বলছেন তো? আমিও তা জানি। কিন্তু কী করবো, ব্যাপারটা যে তাই! এর মানে যাকে ভালোবাসতাম, তাকেই একটা ঘৃণায় আর রাগে আমি—আমি না স্যার, আমার এই কনুইটা চেপে মেরে ফেলেছে।

নাঃ, এ বলা যায় না। এ বলা মানে ঐ কুৎসিৎ সত্যিকথা বলার স্বাধীনতাটাকেই আস্কারা দেওয়া। এটাকে যখন খুন বলেই ধরা হবে, তখন গর্তের সুখে বাঁচতে গেলে নীতার ঘর থেকে আমার সব চিহ্ন সরিয়ে ফেলতে হবে, আঙুলের ছাপ না কী বলে, সেসব রুমাল দিয়ে মুছতে হবে, চুপিচুপি বেরোতে হবে। বাড়ি গিয়ে ছেঁড়া টেরেলিনের শার্টটা পোড়াতে হবে, কে জানে—নীতার নখে টুকরো ফুকরো আটকে আছে না কি। একেবারে নতুন শার্টটা, দু'মাসও যায়নি। সিগারেটের টুকরো— ওটা সুবিধে আছে। এ ব্র্যান্ড আমার নয়, এ রুবী দত্তর অনারে কেনা দামী ব্র্যান্ড।

[প্রদ্যোৎ খাটের কাছে গেলো। রুমাল দিয়ে খাটের নানা অংশ মুছতে লাগলো। তারপর বেরিয়ে গিয়ে একটা বিলিতি কায়দার লম্বা ডান্ডা লাগানো ঝাঁটা নিয়ে এলো।]

এ কী ফ্যাচাং রে বাবা! শেষে কি না ঝাঁটা হাতে করে ঘর সাফ হবে? খুনীরা এতো ঝামেলা নিয়ে এসব করে কী করে—বুঝি না বাবা! মজুরি পোষায়?

[ঝাঁট দেওয়া শেষ করে প্রদ্যোৎ ডাণ্ডাটা রুমাল দিয়ে মুছলো, রুমাল দিয়ে ধরে বাইরে নিয়ে রেখে এলো। চলে যেতে গিয়ে থামলো, নিচু হয়ে নীতার মুখটা দেখার চেষ্টা করলো। একবার মুখের কাছে নিজের মুখটা নিয়েও গেলো, কিন্তু পিছিয়ে এলো আবার। বেরিয়ে গেলো দ্রুত। মঞ্চের সব আলো নিভে গিয়ে শুধু নীতার ফর্সা সুঠাম বাহুটা উজ্জ্বল হয়ে আছে।

অফিসের আলো জ্বললো। প্রদ্যোৎ নিজের চেয়ারে, মুখোমুখি গোলমুখো লোকটা। প্রদ্যোৎ সিগারেট ধরাচ্ছে। নীতার বাহু তখনো উজ্জ্বল।]

ভদ্রলোক : আপনার সঙ্গে কি কাল ওঁর দেখা হয়েছিলো?

প্রদ্যোৎ : হলে তো আপনাকে বলতামই?

ভদ্রলোক : না, তবু একবার জিজ্ঞেস করা কর্তব্য। আচ্ছা আপনার কি কাউকে সন্দেহ হয়?

প্রদ্যোৎ : আমার— ?

ভদ্রলোক : হ্যাঁ, মানে আপনার সঙ্গে তো ওঁর খুবই যাকে বলে—ইয়ে ছিল, হয় তো কখনো কিছু বলে থাকতে পারেন।

প্রদ্যোৎ : কী বলে থাকতে পারে?

ভদ্রলোক : এই ধরুন, বিশেষ কোনো লোক ওঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে, খুনের ভয়টয় দেখায়—

প্রদ্যোৎ : না, সেরকম কখনো কিছু বলে নি তো। আর আমি কাউকে খুন করার মতো ভাবতে পারছি না।

ভদ্রলোক : ওঁর কোনো শত্রু ছিল বলে জানতেন?

প্রদ্যোৎ : না। অন্তত আমার কাউকে কখনো কিছু মনে হয়নি। জানি না ভেতরে ভেতরে যদি কিছু থেকে থাকে।

ভদ্রলোক : (অল্প হেসে, সঙ্কুচিতভাবে) কিছু মনে করবেন না। আপনার কি মনে হয়—মিস রায় খুব ফেয়ার লাইফ লীড করতেন? মানে, আপনার সঙ্গে তো ওঁর খুবই ইয়ে

ছিল, আপনার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বলে কিছু জানতেন?

প্রদ্যোৎ : না, সেরকম কাউকে মনে হয়নি।

ভদ্রলোক : সেরকম কিছু থাকাটা কি খুব অসম্ভব ছিল মনে হয়?

প্রদ্যোৎ : এর কোনো জবাব ঠিক দিতে পারলাম না।

ভদ্রলোক : আচ্ছা ওঁর ওখানে কাদের যাতায়াত ছিল, কিছু নামধাম আপনি বলতে পারেন?

প্রদ্যোৎ : তা পারি। নীরেশ দাস, এঞ্জেল লাসারির ম্যানেজার-কাম-ডায়রেক্টর। এন. আর. ভৌমিক, অয়েল কোম্পানিতে কাজ করে, কোনটা বলতে পারছে না। দলজিৎ বলে এক পাঞ্জাবী ছোকরা। কাশী ব্যানার্জি, গায়ক—

[বলতে বলতে প্রদ্যোৎ নেমে এসেছে সামনে। ভদ্রলোক মুখ নিচু করে নোটবুকে টুকে চলেছে।]

(দর্শকদের) যতোগুলো নাম জানতাম, সবগুলোই বলে দিলাম, সবাই আগে জবাবদিহি করে মরুক তো! অনেকেই তো ঐ ঘরে ঐ খাটে র‍্যালা করে গেছে, দেখি না, তাদের কেউ ফাঁসে কি না?

ভদ্রলোক : (মুখ তুলে প্রদ্যোতের চেয়ারের দিকে তাকিয়ে) আচ্ছা, এই এঁদের সঙ্গে মিস রয়েছে সম্পর্কটা ঠিক, মানে, কিছু মনে করবেন না—

প্রদ্যোৎ : (সামনের দিকে তাকিয়েই, কথা কেটে) না, নীতা বেশ্যা ছিল না।

ভদ্রলোক : (অত্যন্ত সঙ্কুচিত) না না, আমি সে কথা বলি নি—

[অফিসের আলো নিভে গেলো। প্রদ্যোৎ আরো এগিয়ে এসে স্পষ্ট করলো যে ভদ্রলোকের কথার জবাব সে এখন নিচ্ছে না।]

প্রদ্যোৎ : এমন ছিল না যে পুরুষের সংসর্গই ওর জীবিকা। ভালো লাগা মন্দ লাগার একটা ব্যাপার ছিল, ইচ্ছের একটা ব্যাপার। তার মানে কি এই যে নীতার ইচ্ছের স্বাধীনতা ছিল? জীবনে নানান বাধ্যবাধকতা থাকলেও? ওর ভালো লাগাটাকে স্বাধীনভাবে কাজে লাগাতো নীতা, যেমন আমিও লাগিয়ে থাকি, পারলে কেই বা ছেড়ে দেয়? সারা পৃথিবীটাই তো বন্দী-স্বেচ্ছাচারীতে ভর্তি। কিন্তু সব গর্তের মধ্যে, গর্ত বাঁচিয়ে, এ ফাটল ও ফাটল দিয়ে যতোটা পারা যায়। গর্তের সুখে আঁচড় না লাগিয়ে। কিন্তু স্বাধীনতা যখন গর্ত ফাটিয়ে লাফিয়ে পড়ে কনুইয়ে এসে ভর করে, বাঁহাতের এই কনুইটায়—তখন আমি যেন আমাকে ঠিক চিনতে পারি না। কাল রাত্রি থেকে—

অথচ আমি তো ইন্টেলিজেন্সের তুম্বোমুখো লোকটাকে ঠিক মিথ্যে কথা গুছিয়ে বলতে পারছি? সেখানে তো ঐ নোংরা স্বাধীনতাটা ঘাউ করে লাফিয়ে উঠে বলছে না—হ্যাঁ মশাই, নীতাকে আমিই খুন করেছি। কারণ আমি আর, কী বলে—আসক্তি ঘৃণা আর মিথ্যের সঙ্গে ঠিক পেরে উঠছিলাম না। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি, ওকে ছেড়ে গেলাম না কেন? কিন্তু ওকে ছেড়ে যাওয়াও যা ওকে কী বলে—নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াই তাই। মানে মেরে ফেলা। কী রকম? তা হলেই তো বিপদে ফেললেন মশাই, অতো কি আমি গুছিয়ে বলতে পারি? মানে নিজেকে ঠিক ততোটা কি আমি চিনি? এই ধরুন—শরীরের একটা দূষিত অঙ্গ,

যাকে খুবই ভালোবাসি, না হলেও চলে না, অথচ রাখলেও কষ্ট। থেকেও নেই, অথচ ইচ্ছে সে থাকুক, যা কোনোরকমেই সম্ভব নয়, এ অবস্থায় কেটে ফেলাই তো ভালো? তবু জানা গেলো সে নেই। কই, আমি তো তুম্বোমুখোকে এসব কথা বলিনি? দিব্যি তো নিজেকে বাঁচিয়ে আমার গর্ত থেকে সুতো ছেড়ে যাচ্ছি? অথচ কাল রাত্রে শয়তান স্বাধীনতাটা, সত্যিটা, এই কনুইয়ে যে কী করে যে ভর করলো—

[শেষ কথাগুলো বলতে বলতে প্রদ্যোৎ অফিসের চেয়ারে গিয়ে বসলো। সেখানে আলো। প্রদ্যোৎ সিগারেট ধরালো।]

আচ্ছা, ব্যাপারটা কী হয়েছে না হয়েছে, একটু জানতে পারি কি?

ভদ্রলোক : নিশ্চয়। কাল রাত বারোটা নাগাদ পুলিসের কাছে টেলিফোনে খবর দেওয়া হয়—মিস রায়ের ঘরের দরজা বন্ধ, ভিতরে আলো জ্বলছে, কিন্তু ডাকাডাকি করে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। মেড সারভেন্টটা বাইরে অপেক্ষা করছিলো। সে—

প্রদ্যোৎ : চিত্রা?

ভদ্রলোক : হ্যাঁ, চিত্রাই নাম। তাকে অবশ্য আমরা আটকেছি, কারণ মেয়েটার স্বভাবচরিত্র ভালো নয়। একবার প্রস্টিটিউশনের চার্জে ধরাও পড়েছিলো। তা ছাড়া দরজাটাও যখন বাইরে থেকে টেনে দিলেই লক হয়ে যায়, তখন তার পক্ষে কিছু অসম্ভব না, মানে অপরচুনিটি যাকে বলে। তবে মোটিভ কিছু পাইনি। বিকজ—ঘরের দামী জিনিস কিছুই খোয়া যায়নি। তা ছাড়া সবাই বলছে ঝিটা মিস রায়ের বিশ্বস্ত ছিল, ওর হাতেই সব কিছু থাকতো। তবু, জিজ্ঞাসাবাদের জন্যেই আটকানো দরকার, পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত মেয়ে, হঠাৎ ভয় পেয়ে পালিয়ে যেতে পারে। যাই হোক, বাড়ির মালিকের ফোন পেয়ে পুলিস মোটামুটি ফাউল প্লে সন্দেহ করে প্রস্তুত হয়েই এসেছিলো। মেকানিক দিয়ে দরজা খুলিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখা গেলো—শি ইজ ডেড। আপনার খবরটা ঐ ঝিয়ের কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি।

প্রদ্যোৎ : (একটু টান) কী খবর?

ভদ্রলোক : মানে আপনারা যাঁরা মিস রায়ের ওখানে যাতায়াত করতেন। আপনি যাদের নাম করলেন, তার সব নামই ঝিটা পুলিসকে জানিয়েছে। তাতেই আপনার কাছে আসতে পারলাম।

প্রদ্যোৎ : আপনারা কাকে সন্দেহ করছেন। অর্থাৎ কাউকে সেরকম কিছু মনে হচ্ছে?

ভদ্রলোক : আমি এ পর্যন্ত আপনাকে নিয়ে তিনজনের সঙ্গে দেখা করলাম, সন্দেহ কাউকেই কিছু করিনি। তবে কী জানেন, আমাদের কাজটাই স্যার এমন, সবাইকেই সন্দেহ করতে হয় আমাদের, আবার—

[প্রদ্যোৎ আগের সিগারেট থেকে আর একটা ধরাচ্ছে]

প্রদ্যোৎ : খুনীর কোনো চিহ্নও কি পাওয়া যায় নি?

ভদ্রলোক : এ বিষয়ে আপনাকে কিছু বলতে পারলাম না। কিন্তু আপনি এই অল্প সময়েই

মেলা সিগারেট খেলেন, চেন স্মোকিং যাকে বলে—

[প্রদ্যোৎ মুখ তুলে তাকালো। ভদ্রলোকের চোখে কোনো ভাবলেশ নেই।]

প্রদ্যোৎ : তা যা শোনালেন, তাতে একটু বেশি সিগারেট খাবো, এতে আর—

[টেলিফোন বাজলো]

(ফোন) হ্যালো...হ্যাঁ স্যার, উনি এইবার উঠবেন। উঠলেই আমি যাচ্ছি স্যার আপনার ঘরে।

[ফোন নামিয়ে রাখলো। ভদ্রলোকের ওঠবার কোনো লক্ষণ নেই।]

ভদ্রলোক : আপনার মূল্যবান সময় অনেক নষ্ট করে দিয়েছি। কিন্তু কী করবো—কাজের দায়িত্ব। যতোক্ষণ পর্যন্ত এর একটা কিনারা না করতে পারছি। হয় তো আরো কয়েকবার আপনাকে বিরক্ত করতে পারি। জানেন তো, কাগজওয়ালারা পেছনে লেগেই আছে, দেরি হলেই—অথচ এমন নয় যে খুনী এসে আমাদের কাছে নিজে থেকে ধরা দেবে। আচ্ছা, এখন উঠি।

[উঠলো না কিন্তু। প্রদ্যোৎ চেয়ে রইলো]

(নিরীহ সুরে) আচ্ছা, আপনি গতকাল রাত্রে কোথায় ছিলেন?

প্রদ্যোৎ : (অল্পক্ষণ তাকিয়ে থেকে, বাঁকা স্বরে) কলকাতায় আমাদের একটা বাড়ি আছে।

ভদ্রলোক : (অপ্রস্তুত হেসে) কথাটা বোধ হয় ঠিক করে জিজ্ঞেস করা হোলো না। আমি জানতে চাইছিলাম কাল সন্ধে থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত কোথায় ছিলেন?

প্রদ্যোৎ : রাত এগারোটার সময়ে রাস্তায়, সন্ধেবেলাও রাস্তায়।

ভদ্রলোক : কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

প্রদ্যোৎ : আমার অনেক কাজ আছে, আপনার কথাও আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

ভদ্রলোক : (নিষ্পাপ শিশুর মতো তাকিয়ে থেকে) ডাক্তারের অভিমত হচ্ছে—সন্ধে থেকে রাত এগারোটাব মধ্যে মিস রায় খুন হয়েছেন! আমি জিজ্ঞেস করছি সে সময়টা আপনি কোথায় ছিলেন?

প্রদ্যোৎ : কেন জিজ্ঞেস করছেন?

ভদ্রলোক: যাতে জানতে পারি আপনি ও সময়ে মিস রায়ের অ্যাপার্টমেন্টে ছিলেন কি না।

প্রদ্যোৎ . সে কথা তো আপনাকে আগেই বলেছি, নীতার সঙ্গে গতকাল আমার দেখাই হয়নি।

ভদ্রলোক : বলেছিলেন বুঝি? আমার একেবারেই মনে ছিল না, কিন্তু কোথায় ছিলেন তা বললেন না তো?

প্রদ্যোৎ : আপনি কোথায় ছিলেন?

[ভদ্রলোক চুপ করে তাকিয়ে রইলো খানিকক্ষণ]

ভদ্রলোক : আমি? আমার সঙ্গে তো মিস রায়ের আলাপ ছিল না। বা ওখানে যাতায়াত ছিল না। তাই এক্ষেত্রে আমার কথাটা আসে না।

প্রদ্যোৎ : তবে কি আমার পরিচিত যে কোনো মানুষ খুন হবে আর তার খুন হবার সময়ে আমি কোথায় ছিলাম তা আমাকে মনে রাখতে হবে?

ভদ্রলোক : আইন তাই বলে। মনে রাখতে পারলেই ভালো, নইলে অসুবিধেয় পড়তে হয়।

এই আর কী? বিশেষ করে আপনি যখন এ ব্যাপারে সন্দেহের উর্ধ্বে নন।

প্রদ্যোৎ : তার মানে? বলতে চান আমার দ্বারাও নীতা খুন হতে পারে?

ভদ্রলোক: পারে না কি?

প্রদ্যোৎ : আপনার সঙ্গে সত্যি আমার কথা বলার সময় নেই আর, আমিও একটা ইনভেস্টিগেশন নিয়ে ব্যস্ত।

ভদ্রলোক : (উঠে দাঁড়িয়ে) তাহলে বললেন না কোথায় ছিলেন?

প্রদ্যোৎ : (সিগারেট ধরিয়ে) শুনতেই যদি চান, তবে শুনুন—আমি যে কোথায় ছিলাম তা আমার নিজেরই মনে নেই। বেজায় মাল টেনেছিলাম কিনা?

ভদ্রলোক : মাল?

প্রদ্যোৎ : মাল জানেন না?

ভদ্রলোক : মদের কথা বলছেন? (প্রদ্যোৎ চেয়ে রইলো) মদ্যপান করেন না কি?

প্রদ্যোৎ : হ্যাঁ মশাই, মাল-টাল খেয়ে থাকি, বস্ত্রপরিধান আহারাদিও করে থাকি। তারপরে এও মনে করে বলতে পারছি না—কোনো মেয়ে-টেয়ের ঘরেও গেছিলাম কিনা, স্ত্রীলোকের সংস্পর্শও করে থাকি কিনা? তাও হয় তো গেছিলাম।

ভদ্রলোক : গিয়েছিলেন কিনা—তাও মনে করতে পারছেন না?

প্রদ্যোৎ : না, ঝোঁকের মাথায় ওসব আমার কিস্যু মনে থাকে না।

ভদ্রলোক : কোন মেয়ে, কোথায় থাকে। কিস্যু মনে করতে পারেন?

প্রদ্যোৎ : না।

ভদ্রলোক মিস রায় কি না মনে করতে পারেন?

প্রদ্যোৎ : (প্রস্তুত ছিল) হ্যাঁ পারি। ওকে আবার আমি ভালোবাসি কিনা, মানে বাসতাম। তাই ওর কাছে গেলে সে কথা আমার মনে থাকে।

ভদ্রলোক আর যেসব মেয়ে-টেয়ের কাছে যান, মানে আপনি যেরকম বলছেন—গিয়ে-টিয়ে থাকেন. এদের বুঝি ভালোবাসেন না?

প্রদ্যোৎ : আপনি যতো মেয়ের কাছে যান, সবাইকে কি ভালোবাসেন?

ভদ্রলোক : আমি? আমি তো কোনো মেয়ের কাছে--

প্রদ্যোৎ : যান-টান না। তবে অনেকেই তো গিয়ে থাকে—বেশ্যা, কিম্বা হাফ-গেরস্থ। নিশ্চয় সেসব খবর আপনারা রাখেন। সবই তো আর প্রেম নয়, গা-চুলকানিই বেশি, সেইটাই বলছিলাম।

[টেলিফোন বাজলো]

(ফোনে) হ্যালো...ইয়েস স্যার...উঠে দাঁড়িয়েছেন, এইবার যাবেন বোধ হয়...আচ্ছা স্যার বলছি। (টেলিফোন রাখলো)

ভদ্রলোক : আচ্ছা, যাচ্ছি। তবু আপনি একটু মনে করবার চেষ্টা করবেন—সন্ধে থেকে রাত এগারোটা অবধি কোথায় ছিলেন। দরকার হলে আবার আসবো, নমস্কার।

[বেরিয়ে গেলো। প্রদ্যোৎ উঠে সামনে এলো, অফিসের আলো নিভে সামনে আলো।]

প্রদ্যোৎ : মনে হচ্ছে যেন কাল রাতের সব কথা ওর জানা। আমার ভেতরটাকে যেন

পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। মনে হচ্ছে—এখনো যেন যায়নি, সামনেই বসে আছে, তাকিয়ে আছে গিরগিটির মতো। খোয়াব দেখছি নাকি? কিন্তু এসব এখন ভাববার সময় নেই। মামদোরা সব বসে আছে পাল্টা রিপোর্টের জন্যে। আচ্ছা, ব্যাপারটা একবার ভালো করে ভেবে দেখা যাক। খোদ কর্তারই কোথাও হরলালের কাছে টিকি বাঁধা আছে, নিজের বা দলের কোনো সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। নইলে তিনি ছেড়ে কথা কইতেন না। তিনিও হয়তো দাঁতে দাঁত চেপে হরলালকে শুওরের বাচ্চা বলছেন—মানে হরলাল আসলে যা, তবু নিরুপায়। তাই হয়তো তাঁর নির্দেশে হরলালকে নিয়ে ইন্ড্রাস্ট্রির ওপর স্টেটমেন্ট দেওয়ানো হয়েছে। যাতে রিপোর্ট শুধরে নিতে সুবিধে হয়। যে জন্যে বাগচি বলছে—হরলাল ট্যালেন্ট, জিনিয়াস—(হঠাৎ) মাইরি, ও কথাটা মিথ্যে বলিনি কিন্তু। নীতার কাছে গেলে সত্যি মনে থাকে। ভালোবাসা অবিশ্যি জানি না। (গা-ঝাড়া দিয়ে) না, তাহলে দাঁড়ালো এই—হরলাল লোনের সাড়ে তিন লাখ মারুক, তার জন্যে তাকে শাস্তি দেওয়া দূরের কথা, তার নামে যে কলঙ্কজনক রিপোর্টটা বেরিয়ে গেছে, সেটা এক্ষুনি তুলে নিতে হবে। এবং রিপোর্টটা যখন আমার, তখন আমাকেই পাল্টা লিখতে হবে, অত্যন্ত রিগ্রেটের সঙ্গে, তদন্তের মূলেই এমন কিছু ক্রটি রয়ে গেছিলো যে ভুলভাবে রিপোর্ট করা হয়েছে। হরলাল আসলে অনেকদূর থাকে বলে 'অগ্রসর', তাই হয়েছেন। (হঠাৎ হেসে ফেলে) প্রতিদ্বন্দ্বী? ব্যাটা উল্লুক। নীতার পুরুষ-বন্ধুরা কেউ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না কি? প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে যা বোঝায় তার কি কোনো অস্তিত্ব আজকাল আছে? সবই তো নীতার ইচ্ছে, মনে ধরে গেলেই হোলো। যেমন আমি যখন কোনো মেয়ের কাছে যাই, তখন কি ভাবি সে নীতার প্রতিদ্বন্দ্বিনী? সে তো তখন আমার ইচ্ছেটাকে মেটাবার জন্যে থাকে। নীতার সঙ্গে তার সম্পর্ক কী?

কিন্তু আমি যেন নিজেকে ঠিক চিনে উঠতে পারছি না। গতকাল রাতেও ঠিক এমনি হয়েছিলো। অর্থাৎ আমি যে আমার সেই সুখের গর্তের মধ্যে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলাম, বেশ শক্তভাবেই ছিলাম, সেখানে যেন ঠিক সেই সুখ আর আরাম বোধ করছি না। আমি তো নীতাকে খুন করবো ঠিক করে যাইনি, তবু তো কনুইটা ওরকম করে—অথচ ভেবে দেখতে গেলে সব চুকে যাবার পর কেমন যেন একটা স্বস্তি, একটা প্রশান্তি, না কী বলে, ঠিক ওরকম প্রশান্তি আগে যেন কখনো বোধ করিনি। ঐ কুৎসিত স্বাধীনতার সঙ্গে এই প্রশান্তির কোথায় একটা যোগাযোগ। মানে কীরকম যেন গোলমাল। আর এক মামদোবাজি যেন—সেরেছে! পেটটা এরকম গুলিয়ে উঠলো কেন রে বাবা? সকালে তাড়াহুড়োয় লুচিগুলো গিলে নাকি? একবার তো ছুটতেই হবে মনে হচ্ছে।

[প্রদ্যোৎ ছুটলো, অফিস হয়ে জানলার পেছনের পার্টিশনটার আড়ালে। যখন আলো ফুটলো, বাগচি আর চ্যাটার্জি টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে, প্রদ্যোতের প্রস্থানপথের দিকে তাকিয়ে। প্রদ্যোৎ বেরিয়ে এলো রুমালে মুখ মুছতে মুছতে।]

বাগচি : (কড়া গলায়) এর মানে কী? বেয়ারা বললো—সেই লোকটা অনেকক্ষণ আগে

চলে গেছে। তুমি আসলে না কেন আমার ঘরে?

চ্যাটার্জি : ছেলেমানুষ আপনারা। কাজের গুরুত্ব বোঝেন না।

বাগচি : সীট ডাউন, সীট ডাউন। এইখানেই কথাবার্তা সেরে নেওয়া যাক।

[তিনজনে বসলো]

আমার মতে, তুমি রিপোর্টে একটু দুঃখ টুঃখ প্রকাশ করে বলো—আগের রিপোর্টে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, আসলে হরলাল ভট্চাজ্ একজন বিরাট কর্মী মানুষ, এবং তার কাজের ক্ষেত্র বিভিন্ন দিকে এতো বিস্তীর্ণ যে একটা বড়ো কাজ এতো অল্প সময়ের মধ্যে করে ওটা সম্ভব নয় তার পক্ষে, যে কারণে কিছু রঙ ইনফর্মেশনের জন্যে তোমার রিপোর্টটা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে গেছে। (চ্যাটার্জিকে) হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক?

চ্যাটার্জি : হ্যাঁ, এ ছাড়া ওনাকে আর কীভাবে উইথড্র করা যেতে পারে? তবে ঐ সঙ্গে হরলালের কাজের একটা ডিটেলড্ ফিরিস্তি দেওয়া যেতে পারে।

প্রদ্যোৎ : মানে ইমাজিনারি।

বাগচি : সবটাই তো তাই। আর বুদ্ধিও তো শুনলাম রুবী দত্তই কর্তাকে দিয়েছে। (হঠাৎ ফুঁসে উঠে) বাট্ দ্যাট্ চ্যাপ্, দ্যাট গ্রেট গাই হরলাল—সাড়ে তিন লাখ টাকা ফুঁকলে কিসে আমি ভেবে পাই না।

চ্যাটার্জি : তার হিসেবও কোনোদিন পাওয়া যাবে না।

[দু'জনে খানিকক্ষণ চুপ করে অবিচারটা ভাবলেন]

বাগচি : যাই হোক, মনের মধ্যে একটু গুছিয়ে নিয়ে স্টেনোগ্রাফারকে ডেকে তৈরি করে ফেলো, যাতে আজই সব ঠিক করে ফেলা যায়।

প্রদ্যোৎ : না, রিপোর্ট যা করার তা করা হয়েছে। আর নতুন করে কিছু করার নেই।

[দু'জনে স্তম্ভিত। প্রদ্যোৎ নিজেও অবাক হয়ে গেছে। তার ডান হাতটা বাঁ হাতের কনুইয়ের কাছে চলে গেছে নিজের অজান্তে।]

বাগচি-চ্যাটার্জি : (একসঙ্গে) তার মানে?

প্রদ্যোৎ : তার মানে আমি পারবো না।

[প্রদ্যোৎ হাত সরিয়ে সচেতনভাবে কনুইয়ের দিকে তাকালো। তারপর তার চোখ অফিসের ফাইল-র‍্যাকে, টেবিলে, চেয়ারে ঘুরে এলো।]

বাগচি : তুমি—তুমি এর পরিণাম জানো?

প্রদ্যোৎ : জানি।

চ্যাটার্জি : যেটা করতে আপনি অভ্যস্ত, সেটা সকালবেলাই গিলে মরেছেন না কি?

প্রদ্যোৎ : না।

বাগচি : (হঠাৎ) আচ্ছা, তোমার এ ধারণা হয়নি তো যে আমরা হরলালের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করে তোমাকে দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিচ্ছি?

প্রদ্যোৎ : না।

বাগচি : (খেঁকিয়ে) তবে? কোন্ সাহসে বলছো তুমি পারবে না?

প্রদ্যোৎ : ঠিক জানি না।

[প্রদ্যোতের হাত আবার বাঁ হাতের কনুইয়ে চলে গেছে। নীতার বাহুর আলো মিলিয়ে আসছে আস্তে আস্তে।]

চ্যাটার্জি : আমার মনে হচ্ছে আপনি ব্যাপারটার গুরুত্ব এখনো বুঝতে পারেন নি, তাই ছেলেমানুষি করছেন। এ ধরনের কথাবার্তা বলবেন না, যা বলা হচ্ছে করুন।

বাগচি : তোমাকে তো যথেষ্ট বিচক্ষণ বলেই জানতাম। অল্প বয়সে এতোটা উন্নতি করেছো, তোমার কাছ থেকে এরকম—(চ্যাটার্জিকে) আজকালকার ছেলেছোকরাদের কিছু বোঝবার উপায় নেই। দেশটা এদের জন্যে একেবারে উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। কী বলছে, কী করছে—একটা রেসপেক্ট নেই, বিনয় নেই—যাচ্ছেতাই। বুঝলে হে ছোকরা, এই যে তোমাদের আজকাল পোশাক-আশাক নেত্য-কেত্য সব হয়েছে, অল ইরেসপন্সিবল্ বখাটে—যাই হোক, সময় অনেক চলে গেছে, আর দেরি করে না।

প্রদ্যোৎ : আপনারাই কেউ উইথড্র করুন না?

বাগচি : (ক্ষেপে) কেন করবো? তোমার কেস তুমি উইথড্র করবে!

প্রদ্যোৎ : (শান্তভাবে) আমার যা বলবার, তা তো বলেই দিয়েছি আপনাদের।

[ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট বের করলো, বাগচি চ্যাটার্জি অবাক।]

ইফ্ ইউ পারমিট প্লীজ।

[সিগারেট ধরালো। এদের মুখ থেকে চট করে কিছু বেরোলো না]

চ্যাটার্জি : কেন, কী হোলো হঠাৎ আপনার? এসব কি আপনার কাছে নতুন নাকি? ঘুষ খাবার জন্যে অনেক ফাইলই তো ওলটপালাট করে দিয়েছেন।

প্রদ্যোৎ : (ধোঁয়া ছেড়ে) আর ভালো লাগে না।

চ্যাটার্জি : কোনো পলিটিক্স আপনার মাথা খায়নি তো?

প্রদ্যোৎ : আজ্ঞে না। এ মাথায় খচ্চরের দাঁত বসে না।

[চ্যাটার্জি হকচকিয়ে গেলেন। বাগচি টেবিলে চাপড় মেরে লাফিয়ে উঠলেন।]

বাগচি : ইউ—ইউ ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট—যে তুমি না করলে ওটা পড়ে থাকবে। আমরা অনেক ভালোভাবেই ম্যানেজ করবো। কিন্তু তুমি মনে রেখো, তোমাকে আমি স্পেয়ার করবো না। কিছুতেই না তোমাকে—তোমাকে—

প্রদ্যোৎ : তাড়িয়ে ছাড়বেন।

বাগচি : ইউ'ল সী দ্যাট। আসুন মিস্টার চ্যাটার্জি।

[বাগচি সবেগে বেরিয়ে গেলেন]

চ্যাটার্জি : কেসটার কাগজপত্র, ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট—সব কোথায়?

প্রদ্যোৎ : ওগুলো সবই বাড়িতে রয়েছে।

চ্যাটার্জি : ওগুলো তো আপনাকে নিয়ে আসতে হবে।

প্রদ্যোৎ : দেখা যাবে।

চ্যাটার্জি : তার মানে—আপনি ওগুলো আটকাবেন?

প্রদ্যোৎ : বুঝতে পারছি না।

চ্যাটার্জি : (একটু থেমে) আটকেও কিছু করতে পারবেন না।

[চ্যাটার্জি বেরিয়ে গেলেন। প্রদ্যোৎ উঠে দাঁড়িয়ে সামনে ফিরলো]

প্রদ্যোৎ : কাগজপত্র সব অফিসেই আছে, তবু খচরামি করলাম। জানি আটকেও করতে পারবো না, চাটুজ্যে ঠিকই বলেছে। বাগচিও ঠিক বলেছে। আমার জন্যে কিছু পড়ে থাকবে না। সব বেশ ভালোভাবেই ম্যানেজ হবে। তবু, তবু একটা, ঐ কী বলে—প্রশান্তি। এ বিষয়ে এখন কোনো সন্দেহ নেই যে চাকরিটাকে আমি খুন করেছি। নীতার মতো। ঐ কুৎসিৎ স্বাধীনতাটা তারপর গর্ত ফাটিয়ে বেরিয়ে এসে আমার মুখে ভর করেছে, ঠিক যেমন কাল রাত্তিরে আমার কনুইয়ে ভর করেছিলো। (চারিদিকে তাকিয়ে) এই টেবিল্, চেয়ার, ঐ ফাইলর‍্যাক, আলমারি, ঐ দেওয়ালগুলো, দরজাটা—সব মরে পড়ে রয়েছে। ঘাড় গুঁজে। আমার চাকরি-মেয়ে, নীতার মতো।

[সহসা খুব জোরে ঘণ্টা বাজালো। বেয়ারা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো। তার মুখে একটা বিস্ময়। লম্বা সেলাম জানালো, যেটা আগের বারে জানায়নি।]

বেয়ারা : সাব্?

[প্রদ্যোৎ অবাক হয়ে তাকালো]

প্রদ্যোৎ : কফি নিয়ে এসো।

বেয়ারা : জী।

প্রদ্যোৎ : আর শোনো।

বেয়ারা: জী?

প্রদ্যোৎ : ফোন এলে তুমি ধরবে, বলে দেবে আমি নেই সীটে।

বেয়ারা : জী।

[প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেলো]

প্রদ্যোৎ : ব্যাটা সব শুনছিলো বোধহয়।

[প্রদ্যোৎ বসে একটা ফাইল টেনে মন দেবার চেষ্টা করলো। তারপর সেটা বন্ধ করে তুলে ধরে হাসলো।]

এ ঘেঁটে আর কী হবে? এ যেন—ঠিক যেমন কাল নীতার মরা শরীরে উত্তাপ খুঁজছিলাম, নীতার মরা ঠোঁটে—

[সব আলো নিভে গেলো। অন্ধকারে ফোন বাজলো। বেজেই চললো অবশেষে থামলো। বার-এর আলো ফুটে উঠলো। স্টুলে সেই মেয়েটা। প্রদ্যোৎ এলো। কোটটা তার কাঁধে ঝুলছে। টাইটা আলগা করা। বসলো। সিগারেট ধরালো। বেয়ারা এসে অর্ডার নিয়ে গেলো, পানীয় দিয়েও গেলো। প্রদ্যোৎ এক চুমুক খেলো। গোলমুখো পুলিসের লোকটা ঢুকলো, এদিক ওদিক চেয়ে প্রদ্যোতের কাছে এলো, স্টুলে বসা মেয়েটার উদগ্রীব চোখটা সন্তর্পণে এড়িয়ে।]

ভদ্রলোক : আপনাকে দেখলাম ঢুকতে, তাই এলাম।

প্রদ্যোৎ : বেশ করেছেন। একটু চলবে?

ভদ্রলোক : না না, ওসব চলে না আমার। আপনাকে অনেকবার ফোন করেছিলাম অফিসে। প্রত্যেকবারই শুনলাম—সাব নহী হ্যায়।

প্রদ্যোৎ : হ্যাঁ, বেয়ারাটাকে সেইরকমই বলে রেখেছিলাম। লোকে বড়ো জ্বালাতন করে।

ভদ্রলোক : ঘরেই ছিলেন? আশ্চর্য, আপনি অফিসার, পাবলিকের সঙ্গে কারবার, এরকম ফোন রিসীভ না করে বসে থাকতে পারেন?

প্রদ্যোৎ : পারলাম তো দেখছি।

ভদ্রলোক : (একটু থেমে) আপনি মনে করতে পারলেন— কাল এসময়ে আপনি কোথায় ছিলেন?

প্রদ্যোৎ : না। কে জানে হয়তো এখানেই ছিলাম?

ভদ্রলোক : না, এখানে ছিলেন না, সে খবর পেয়েছি। প্রায় ছ'টা পর্যন্ত আপনি এবং আর একজন রঞ্জন বার-এ ছিলেন।

প্রদ্যোৎ : (যেন মজা খাচ্ছে) তাই নাকি? তা হবে বোধ হয়।

ভদ্রলোক : কাল দশটার একটু পরে মিডনাইট বার-এ আপনি গিয়েছিলেন।

প্রদ্যোৎ : তা হতে পারে। এই তো করি মশাই।

[প্রদ্যোৎ এক চুমুকে বাকিটা শেষ করে হাত তুলে বেয়ারাকে ইশারা করলো আর একটা দিতে।]

ভদ্রলোক : কিন্তু সত্যি, আপনার মতো একজন দায়িত্বশীল অফিসার, ইয়ং ম্যান, রেসপেক্টেবল বাড়ির ছেলে, যদি সন্ধে থেকেই এ-বার ও-বার করে ঘুরে বেড়ান, সেটা ভালো দেখায় না।

প্রদ্যোৎ : কাদের পক্ষে সেটা ভালো দেখায় বলতে পারেন?

ভদ্রলোক : যাদেরই হোক, আপনাদের নয়।

[বেয়ারা পানীয় রেখে গেলো]

বেশ তো, বড়ো বড়ো হোটেল, যেখানে সাধারণের বিশেষ যাতায়াত নেই, কিম্বা নিজেদের আড্ডায়—

প্রদ্যোৎ : আপনি কলকাতার টপ গ্রেডের লোকদের কথা বলছেন তো? আমার চেয়ে অনেক বেশি দায়িত্বশীল, যাদের ভোররাত্রে চ্যাংদোলা করে গাড়িতে তুলে দেওয়া হয়? আমি অতোটা বড়ো নই। রোজ রাতে মদ, মেয়েমানুষের পেছনে টাকা খরচ করবার একটা সীমা আছে আমার। তাও তো যা করি, সবই তো মশাই ঘুষের টাকায়।

ভদ্রলোক : আপনার কথাবার্তা অত্যন্ত খারাপ। আমি কোনো অফিসারের মুখে এরকম কথাবার্তা শুনিনি।

প্রদ্যোৎ : তা হবে। এখন আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিন।

ভদ্রলোক : শান্তি কি আপনার আছে?

প্রদ্যোৎ : আপনার থেকে বেশি আছে।

ভদ্রলোক : যাই হোক, কাল ছ'টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত কোথায় ছিলেন একটু মনে করুন।

প্রদ্যোৎ : আপনাকে তো আগেই বলেছি—মনে করতে পারছি না?

ভদ্রলোক : তার মানে—আপনার অ্যালিবাই আপনি প্রমাণ করতে পারছেন না।

প্রদ্যোৎ : না, ও নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই।

ভদ্রলোক : আপনি জানেন—আপনাকে অ্যারেস্ট করা যায়?

প্রদ্যোৎ : করুন। তাতে যদি খুনের কিনারা হয় নিশ্চয় করবেন।

ভদ্রলোক : কিন্তু আপনি একজন অফিসার—

প্রদ্যোৎ : আইনের চোখে তার কি কোনো মাপ আছে? (ভদ্রলোক চুপ) ক্ষেত্রবিশেষে অনেক কিছুই হয়, কী বলেন? (ঝুঁকে) আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

ভদ্রলোক : নিশ্চয়।

প্রদ্যোৎ : বলতে পারেন—আপনি-আমি কেন জেলের বাইরে?

ভদ্রলোক : তার মানে?

প্রদ্যোৎ : তার মানে, আমরা সকলেই বেশ বদমাইশ নই কি? আপনি কি জোর করে বলতে পারেন যে আপনি কোনো অপরাধ করেন নি? যেমন ধরুন—আমি ঘুষ খাই, আপনি কি বলতে পারেন—আপনি আইনসংবিধান সব নিক্তিতে মেপে চলছেন? তা যদি না হয়, তবে আপনার আমার মতো মানুষে কি আরো বড়ো বড়ো মানুষে জেলখানা ভরে যাওয়া উচিত নয়?

ভদ্রলোক : (ঠোঁট চেটে) আপনার নেশা বোধহয় জমে উঠেছে।

প্রদ্যোৎ : না উঠলেও উঠবে এইবার।

ভদ্রলোক : তবে এখন চলি। মনে করবার চেষ্টা করবেন।

[ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলো, প্রদ্যোৎ হাসলো। এক চুমুক খেয়ে গ্লাস নিয়ে সামনে এককোণে এলো।]

প্রদ্যোৎ : শালুক চিনেছে গোপালঠাকুর। (এক চুমুক খেয়ে) এই তো বেশ আবার গর্ত থেকে সুতো ছাড়ছি বাবা? কালকের শুঁড়িখানার সব খবরগুলো জোগাড় করেছে ঠিক। তবে আমার মুখ থেকে শোনবার দরকার কী বাবা? নিজেরাই খুঁজে পেতে বের করে নাও না? কষ্ট করবে না, খুনী ধরবে না, মাইনেটা মারবে, খালি ঐ চিন্তা করলে কি হয়? মাইরি আর কি!

[আর এক চুমুক খেয়ে প্রদ্যোৎ ফিরে গেলো। তার পা ঈষৎ টলছে। একবার পেটে হাত রাখলো, যেন ব্যথা অনুভব করছে। বসলো। মেয়েটা উন্মুখ চোখে তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হোলো। মেয়েটা হাসলো—অভ্যস্ত হাসি। প্রদ্যোৎও হাসলো। মেয়েটা টুল থেকে নেমে দাঁড়ালো আর একটু স্পষ্ট আহ্বানের অপেক্ষায়, প্রদ্যোৎ হাত তুলে সে আহ্বান জানালো। মেয়েটা হাসিমুখে কাছে এসে পাশের চেয়ারটা আরো কাছে টেনে এনে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো। প্রদ্যোৎ তার কাঁধে বাহুটা তুলে দিলো। কী যেন বললো। অন্ধকার হয়ে গেলো।

আলো ফুটলো, প্রদ্যোৎ আর কুমারেশ বার-এ একটা টেবিলে পানপাত্র নিয়ে বসে। দিন এখন। প্রদ্যোতের কোট টাই নেই, চুল অবিন্যস্ত। আলো ফোটবার একটু আগে থেকেই প্রদ্যোতের গলা শোনা গেছে।]

তার পরদিন যখন অফিসে গেলাম, বুঝলি— মনে হোলো সবাই আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে। রোজ যখন ঢুকি তখন কিন্তু চেহারাটা অন্যরকম

থাকে, যেন মনে মনে বলছে—লোচ্চাটা এলো রে, রাত্তিরটা কোথায় কেটেছে বাবা? সেদিন মাইরি, একেবারে অন্যরকম চেহারা, যেন তারিফ করছে। ঘরে ঢুকে দেখি—টেবিলে একখানা কাগজ, তাতে লেখা—'হে সাহসী বীর, আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।' উল্লুক সব!

কুমারেশ : কেন, উল্লুক কেন? তুই যা করেছিস, সেটা তো—

প্রদ্যোৎ : (তাকিয়ে দেখে) ওরে শালা, তুমিও উল্লুক হয়ে উঠছো না কি? যেন ওদের অভিনন্দনের জন্যে আমি কিছু করেছি! তা ছাড়া ওদের যেন চিনি না আমি। সব শালা ফেরেব্বাজ, ফাঁকিবাজ, যে যার নিজের তালে আছে। আমাকে গলা টিপে মারলে যদি দু'টো ইনক্রিমেন্ট হয়ে যায় মাইনের, সব শালা ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে সঙ্গে সঙ্গে। গরিব আবার ভদ্রলোক—সবচেয়ে মারাত্মক মাল!

কুমারেশ : আর এক পেগ করে আনতে বলি?

প্রদ্যোৎ : আর থাক, অনেক হয়েছে।

কুমারেশ : কোথায় অনেক? তিনটে তো খেলি মোটে?

প্রদ্যোৎ : কুমারেশ জানিস এখন আমি রিটার্ন দিতে পারবো না। চাকরি একটা না পেলে—

কুমারেশ : (ধমকে) বাজে বকিস নি। (বেয়ারাকে ইশারা করলো)

প্রদ্যোৎ : আর চাকরি পেলেও এসবের খরচ আর—লিলুয়ায় একটা ইন্টারভিউ দিয়ে এলাম কাল। ভালোই তো মনে হোলো। তবে ঘুষ-ফুস্ লাগে যদি, তাহলে তো গেলো।

কুমারেশ : বাড়িতে কী বলে?

প্রদ্যোৎ : বাড়ি? ও, তোকে বলা হয়নি—বাড়িতে থাকি না এখন। চাঁদনিচকের কাছে একটা ঘর পেয়েছি—

কুমারেশ : সে কী রে?

প্রদ্যোৎ : হ্যাঁ, পিতৃদেব প্রায় স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিলেন—মাতাল হাতি পোষা তাঁর পক্ষে সম্ভব না। তা ছাড়া বড়ো অশান্তি।

কুমারেশ : কী রকম?

প্রদ্যোৎ : মাতৃদেবী জ্বালিয়ে মারছিলো—যাতে বলে কয়ে মানিয়ে-টানিয়ে আবার—(হেসে) রুবী দত্তও না কি ফোন করেছিলো বাড়িতে—আমার রুবীদি রে? দেখা করতে বলেছে।

কুমারেশ : দেখা করবি নে?

প্রদ্যোৎ : মাথা খারাপ?

কুমারেশ : তোর হোলো কী বল দিকিনি?

প্রদ্যোৎ : কী জানি। গর্তের বাইরে চলে এসেছি বোধহয়।

কুমারেশ : সে আবার কী?

[বেয়ারা পেগ দিয়ে চলে গেলো]

গর্তের বাইরে মানে?

প্রদ্যোৎ : আজেবাজে কথা? নেশা চড়ছে বোধহয়। ও, আর এক উল্লুকের কথা শোন।

এটিকে যে কোন শ্রেণীর খচ্চরের পর্যায় ফেলা যাবে, ঠিক করতে পারছি না—সেক্রেড না সাব্লাইম না ডিভাইন। বেটা একদিন, ঐ ইয়ের পরদিন আর কি, রাস্তায় পেয়ে গাড়ি করে নিয়ে গেলো দক্ষিণেশ্বর—কী সব কথা বলবে। তা ভ্যানতারা আর ফুরোয় না। শেষে বলে কী জানিস? যদি হরলালের ব্যাপারটা ফলাও করে ওদের কাগজে ছাপতে দিই তাহলে রাতারাতি আমাকে হীরো করে দেবে। নগদ কিছু টাকাও দেবে। ঐ ফাঁকে কিছু টাকা করেও নেবে, সে কথাটা আর উচ্চারণ করলো না।

কুমারেশ : তুই কী বললি?

প্রদ্যোৎ : বললাম—আপনি একটি রামখচ্চর।

কুমারেশ : মাইরি?

প্রদ্যেৎ : আর কী বলবো? যেন ওর কাগজের কাটতির জন্যে আমি এসব করেছি।

কুমারেশ : কী বললো শুনে?

প্রদ্যোৎ : সে বলিহারি বাবা। বদন বিগড়ে দৈত্যের মতো হয়ে গেলো, তবু হাসতে লাগলো সমানে। এমন কি গাড়ি করে আবার কলকাতায় পৌছে দিতেও চাইলো। আমি বললাম—কেটে পড়ুন। তার আগে, যদি জানা থাকে, এখানে পায়খানাটা কোথায় আছে দেখিয়ে দিয়ে যান। মাইরি, তাই দিলো। সত্যি, পেটটা আজকাল—লিভারটা বোধহয় কলাপোড়া খেয়ে গেছে।

[কুমারেশ সিগারেট এগিয়ে দিলো, দু'জনে ধরালো]

আরো আছে। খগেনকে মনে আছে? রাজনীতি নিয়ে ক্ষেপেই আছে? এসে বলে—আমার মধ্যে না কি একটা 'সংগ্রামী' মানুষ আছে, ও না কি বরাবরই জানতো। পার্টির দরজা না কি খোলা, আমি হীরো হয়ে ঢুকে পড়তে পারি। আহা মাইরি, প্রাণটা জল হয়ে গেলো শুনে। 'সংগ্রামী'! শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর।

[গ্লাসে লম্বা একটা চুমুক দিলো]

কুমারেশ : প্রদ্যোৎ! তুই ভয়ানক বদলে গেছিস এই ক'দিনে।

প্রদ্যোৎ : কিসে বদলালাম? খিস্তিখেউর করছি, মালও টানছি, মেয়েবাজিও করছি, বদলটা কোথায় দেখলি?

কুমারেশ : দেখছি ঠিকই। আর দেখছি—নীতা রায় খুন হবার পর থেকেই—

প্রদ্যোৎ : (হা হা করে হেসে) নীতা রায়ের মধ্যে জুলিয়েট দেখছিস না কি তুই? হীরেন বক্সীর মতো সতীত্ব-পবিত্রতা-নিষ্ঠাসন্ধানী ডালকুত্তা হয়ে উঠছিস না তো?

কুমারেশ : না না, বিলীভ মি, আমি সেরকম—আমি জানি—নীতা রায় বন্ধুবান্ধব বাছবিচার করে জোটাতো না, আজেবাজে অনেক—আর তার ফলও বেচারাকে দিতে হোলো শেষ পর্যন্ত। কিন্তু তুই যদি এ নিয়ে—মানে ইফ ইউ টেক ইট্ টু মাচ্ টু হার্ট—

প্রদ্যোৎ : আই সী। এবার আমার মধ্যে দেবদাস বের করেছিস।

কুমারেশ : নাঃ, তোর সঙ্গে—আচ্ছা। নীতার মৃত্যুর সঙ্গে তোর এখনকার এই যাকে বলে

পরিবর্তন—তার কোনোই সম্পর্ক নেই বলতে চাস?

প্রদ্যোৎ : (খানিকটা তাচ্ছিল্যভরে) থাকতে পারে। নট ইম্পর্ট্যান্ট। নীতা ইজ নট ইম্পর্ট্যান্ট। মানে তুই যা ভাবছিস তা নয়।

[জানলার ফ্রেমে সহাস্য নীতা ফুটে উঠেছে। দু'হাত দু'দিকে রেখে একটা মন্থর আলস্য, অথচ একটা আমন্ত্রণ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। বারটা অন্ধকার হয়ে আসছে।]

কুমারেশ : কী তবে?

[প্রদ্যোৎ জবাব দিলো না। বার সম্পূর্ণ অন্ধকার। অন্ধকারে কুমারেশের কণ্ঠ আবার]

কী তবে?

[প্রদ্যোৎ এবারও জবাব দিলো না। এগিয়ে এলো সামনে। আলো ফুটে উঠলো। কুমারেশ নেই, পেছনে জানলার ফ্রেমে তখনো নীতা।]

প্রদ্যোৎ : (ধীরে ধীরে) নীতা নেই। মরে গেছে। আশ্চর্য, তবু নিজেকে কিছুতেই কথাটা বিশ্বাস করাতে পারলাম না। তাকে নিজের হাতে মেরে ফেলেছি, অথচ বিশ্বাসই হচ্ছে না—সে নেই। তাকে আর কখনোই দেখতে পাবো না, ছুঁতে পাবো না। এও আবার সেই মামদোবাজির মতোই আর একটা ব্যাপার মনে হচ্ছে। এর কোনো মানে নেই, তবু ভেতরে একটা চিন্তার জেদ—

[প্রদ্যোৎ একদিকে চলতে শুরু করলো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক জায়গাতেই হাঁটছে।]

চিন্তার জেদ। তুম্বোমুখোটা ঘুরে ঘুরে হাল ছেড়ে দিয়েছে। তাতে যেন চিন্তাটা আরো চেপে বসার সুযোগ পাচ্ছে। সেই যে দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ধারে বসে সন্ধেবেলা চিন্তাটা মাথায় চেপেছিলো, সেই রামখচ্চরটা যাবার পরে, সেই থেকে এই সাতদিনে সমানে চিন্তাটার জেদ বেড়ে চলেছে। এর মধ্যে সাস্পেনশন, ফাইলে ফাইলে আমার অপকীর্তি আবিষ্কার, যেটা বাগচি-চাটুজ্যে কোম্পানি দূরে যাক, আমার খুকু বোনটাও আবিষ্কার করতে পারতো। মরুক গে, তারপর ডিসমিস, পিতাঠাকুর, বাড়ি ছাড়া—এর সব কিছু চাপা দিয়ে এই সাতদিন ধরে শুধু নিজেকে বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করেছি—নীতা নেই, ওকে আর পাবো না। কোনোভাবেই না, তবু কিছুতেই পেরে উঠছি না। এ যে কী—কী—কী মামদোবাজি।

[হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে দর্শকদের দিকে ফিরলো। নীতা মুছে গেলো অন্ধকারে। প্রদ্যোৎ যেন মনে মনে কী একটা বুঝতে চেষ্টা করছে প্রাণপণে।]

আচ্ছা, আচ্ছা যদি এরকম হোতো, আমি আর নীতা এরকম ভাবে মিশে যেতে পারতাম যে দু'জনে কখনো কারো কাছে মিথ্যে বলবো না—না না, সবাই যেমন বলে সেরকম না—মাথাটা ঘুরছে, ভালো করে ভাবতে পারছি না—আমি বলছি—যা কিছু মনের মধ্যে জাগে, আবার ডুবে যায়, যা কখনোই বাইরে প্রকাশ পায় না, কারো সাধ্য নেই ভেতরটা দেখতে পায়—আর সেইখানটা, সেখানটাই যদি দু'জনে দু'জনের কাছে খুলে দিতে পারতাম—

[প্রদ্যোৎ আবার আগের মতো হাঁটছে]

আর ওফ্! ভীষণ খারাপ খারাপ ব্যাপার দু'জনেই দু'জনের মধ্যে দেখতে পেতাম, তবু পিছু হটা নয়, কারণ মিথ্যেটা তো ওকে বা আমাকে একলা কষ্ট দিচ্ছিলো না, দু'জনকেই, তাই ভয় পাবার কী আছে—তবু যাকে বলে 'সত্য'— বৌ নয়, বেশ্যা নয়, প্রেমিকা নয়, কী বলে আমি তা জানি না, যা 'সত্য'—দু'জনে দু'জনের কাছে প্রকাশ করতে পারতাম—অর্থাৎ সেই স্বাধীনতা, যার ভয়ে মরি, সেই স্বাধীনতার স্বাদের জন্যেই দু'জনে দু'জনের সঙ্গে মিশে যেতে পারতাম—ঐ সত্য, সত্যের জন্যেই যেন পাগল হয়ে দু'জনে—সেক্স অ্যাটাচ্‌মেন্ট যেমন পাগলামি, তেমনি সত্যের কোনো অ্যাটাচমেন্ট যদি থাকতো, তাহলে তাহলে—এ কী!

[প্রদ্যোৎ দাঁড়িয়ে গেলো। তার বাহু জানলার ফ্রেমে, তার চোখে বিস্ময়।]

আমি যে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলাম। এ কোন সিঁড়ি? কোথাকার, কোন বাড়ির? এ তো—এ তো নীতার অ্যাপার্টমেন্ট! এর মানে কী? মাথাটা খারাপ হয়ে গেলো না কি? ও সেই—সেই যে বললাম—চিন্তার জেদ। কারণ আমার ভেতরের তো ধারণা আমি নিজের গলাতেই কনুই বসিয়েছি। তাই ভেতরটা ঠেলতে ঠেলতে এখানে নিয়ে এসেছে। —কে?

[তুম্বোমুখো ভদ্রলোক এগিয়ে আসছে]

ও, আপনি?

ভদ্রলোক : ঘরটা খুলে দেবো? চাবি আছে আমার কাছে।

প্রদ্যোৎ : (একটু থেমে) দিন।

[ভদ্রলোকের পেছন পেছন প্রদ্যোৎ বেরিয়ে গেলো। ভদ্রলোক নীতার খাটের কাছে এসে আলো জ্বাললো। প্রদ্যেৎও এলো খাটের পাশে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখছে সে। ভদ্রলোক একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে প্রদ্যোতের দিকে। একবার চোখাচোখি হোলো। প্রদ্যেৎ চোখ ফিরিয়ে নিলো। কিন্তু ভদ্রলোকের অস্তিত্ব যেন ভুলে গেছে সে। তার দিকে পেছন করে খাটের আরো কাছে এলো। নীতা যেখানে উপুড় হয়ে পড়ে ছিল, সেখানটায় তাকিয়ে রইলো। সেই নাচের গানটা একটু আগে শুরু হয়েছে মৃদুস্বরে। প্রদ্যোৎ একটু ঝুঁকলো, আবার খাড়া হোলো। ভদ্রলোক এক পা এগিয়ে এলো। প্রদ্যোৎ সম্পূর্ণ ঝুঁকে বিছানার চাদরটায় হাত রাখলো। তারপর আস্তে আস্তে হাঁটু গেড়ে বসে বিছানায় হাত বুলোতে লাগলো, যেন গভীর আদরে। ভদ্রলোক আর এক পা এগিয়ে আসছে। গান জোর হয়ে উঠলো। সম্পূর্ণ অন্ধকার, পর্দা পড়ে গেলো।]

এনুগু, নাইজেরিয়া

আরম্ভ : ১লা ডিসেম্বর, ১৯৬৭

শেষ : ১লা জানুয়ারি, ১৯৬৮

পাগলা ঘোড়া

প্রথম অঙ্ক

[বড়ো তক্তাপোশ। দু'টো নিচু টুল। একটা সরা চাপা জলের কলসি। পেছনে বাঁ-দিকে দরজা, তারপর জানলা, তারপর দেওয়াল ঘুরে সামনের দিকে খানিকটা এগিয়ে ঘরের সীমা নির্দেশ করছে। দরমার দেওয়াল, টিনের চাল, খানিকটা ভগ্নদশা। ডান পাশের জায়গাটা যেন ঘরের বাইরে। রাত। ঘরে পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। খোলা দরজা আর জানলার বাইরে একটা লাল আভা নেচে নেচে উঠছে। ঘরের বাইরের অংশের পেছন দিকটা অন্ধকার।

চারজন তাস খেলছে—টোয়েন্টি নাইন। দু'জন তক্তাপোশে বসে, দু'জন টুলে। এক পিট খেলে খেলা সংক্রান্ত কথা আরম্ভ হোলো।]

সাতু : ডিক্লেয়ার!
কার্তিক চিড়িয়া? আহাহা! ডবলের খেলা, মনে আছে তো?
সাতু : আঠারোর ডাক!
হিমাদ্রি : ইস, শশীদা!
কার্তিক : এই!
সাতু : ব্যস, আর পিট নেই! কী তাস নিয়ে ডেকেছিলেন?
কার্তিক : আঠারোত্তিন একুশ— তেইশ-চব্বিশ— সাতাশ-আঠাশ— তিরিশ-একত্রিশ— খেলা মবে ভূত!
সাতু : বের করুন—দু'টো কালো!
কার্তিক : চারটে হোলো শশীবাবু! আর একটা হলেই কালো পাঞ্জা!
শশী : একবার দেখে আসা দরকার বোধহয়—
হিমাদ্রি : আমি যাচ্ছি।
শশী : না না, তুমি বারবার যাচ্ছো, আমি যাই এবার—
হিমাদ্রি : তাতে কী হয়েছে? আপনি বসুন—

[হিমাদ্রি চলে গেলো]

শশী : যাঃ! হিমাদ্রি বেচারা প্রত্যেকবার—
কার্তিক : আহা, বয়স কম আছে, যাক না? বয়সকালে আমরা অমন কতো গেছি—
সাতু : কার্তিকবাবু খুব যে বয়স দেখাচ্ছেন? কতো বয়স হোলো আপনার?
কার্তিক : তা হোলো স্যার, মেঘে মেঘে বেলা কম যায়নি!
সাতু : কতো? পঞ্চাশ?
কার্তিক : পঞ্চাশ?
সাতু : আর না হয় পঞ্চান্নই হোলো—
কার্তিক : পঞ্চান্ন— ?
সাতু : আরো বেশি বলতে চান?

কার্তিক : অ্যাঁ? (তারপর হেসে) আজ্ঞে না—আমার এই উনপঞ্চাশ পুরলো গেলো ফাল্গুনে—

সাতু : (হা হা করে হেসে) উনপঞ্চাশ! এই নিয়ে বয়স দেখাচ্ছেন কার্তিকবাবু? উনপঞ্চাশ আমি পেরিয়ে গেছি দু'বছর আগে!

শশী : তার মানে? আপনি ফিফ্‌টি ওয়ান??

সাতু : ইয়েস স্যার! ফিফ্‌টি ওয়ান! হাফ্‌ সেঞ্চুরি প্লাস ওয়ান।

শশী : ইম্‌পসিব্‌ল্‌!

কার্তিক : তার মানে—আমার থেকে আপনার বয়স বেশি?

সাতু : তাই তো দাঁড়ালো।

শশী : (কার্তিককে) দেখে কেউ বলবে?

কার্তিক : আমার বিশ্বেস হয় না।

সাতু : গড্‌স ট্রুথ!

শশী : আমার ধারণা ছিল, কার্তিকবাবু আপনার থেকে অন্তত দশ বছরের বড়ো—

সাতু : (আবার অট্টহাস্য) মাঠে ঘাটে কুলি খেদিয়ে খেতে হয় শশীবাবু—শনি রবি নেই, রোদ্দুর বিস্টি দিন রাত—কিস্যু নেই! বুড়ো হবার টাইম পেলাম কোথায়?

কার্তিক : হ্যা হ্যা—এটা বেড়ে বলেছেন! বুড়ো হবার টাইম নেই, অ্যাঁ? যেমন, মরবার ফুরসত নেই—কথায় বলে না? হ্যা হ্যা—

শশী : নাঃ, আপনাকে দেখলে মনে হয় সাতুবাবু, পোস্টমাস্টারি চুলোয় দিয়ে ঠিকেদারি ধরি।

সাতু : বলেন কী? অমন সুখের চাকরি ছেড়ে এই ছন্নছাড়া জীবন পছন্দ হোলো?

শশী : আরে দুর মশাই—ছন্নছাড়া। ছন্ন-ধরা হয়েই বা কী ঘণ্টা হোলো জীবনে? আপনি তবু দেশ-বিদেশ ঘুরছেন, পাঁচ রকম দেখছেন—ইন্টারেস্টিং লাইফ।

কার্তিক : আমার স্যার ইন্টারেস্টিং লাইফে শখ নেই। যা আছি বেশ আছি।

শশী : হ্যাঁ! বেশ আছেন! নিক্তি মেপে চোখের মাথা খেয়েছেন, আর ঘরের কোণে টুলে বসে বসে গেঁটে বাত গজিয়েছেন—

কার্তিক : ভায়া, ওই ঘরের কোণে বসে চশমার ফাঁক দিয়েই কার্তিক কম্পাউন্ডার তামাম দুনিয়া দেখছে। সেও কম ইন্টারেস্টিং নয়। সবাইকেই ঘুরে ফিরে ডাক্তারখানায় হাজ্‌রে দিতে হয়—প্রায় এই এইখেনকার মতনই—

শশী : হ্যাঁ, আপনারাই তো এইখানকার সিংহদ্বার—

[সাতকড়ির অট্টহাস্য]

কার্তিক : তা বলছেন বলুন। তবু ওই সিংহদ্বারে আপনারা সেধেই আসেন, আবার দক্ষিণাও দেন।

সাতু : খাঁটি কথা কার্তিকবাবু, ঠিক কথা! তবে আমি আপনাদের সিংহদরজায় শেষ কবে যে গেছি মনেই পড়ে না। এ কাঠখোট্টা শরীরে রোগ ব্যাধি ঢুকতে চায় না—

কার্তিক : বলবেন না স্যার, বলবেন না। বলতে নেই।

সাতু : (অট্টহাস্য) বলতে নেই, করতে নেই, দেখতে নেই, জানতে নেই, খেতে নেই—এই শুনে শুনে বুড়ো হলুম কার্তিকবাবু! অথচ করলাম না জানলাম না হ্যানো বস্তু বাকি নেই বিশেষ, তবু তো টিঁকে আছি ঠিক।

কার্তিক : আহা, খেতে নেই শুনে মনে পড়লো সাতুবাবু! ওটা বের করবেন না?

সাতু : হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। (উঠলো)

শশী : হিমাদ্রির সামনে একটু কেমন যেন—

কার্তিক : আহা, হিমাদ্রি তো ভাজা মাছটি উলটে খেতে শেখেনি!

শশী : না, ছেলেমানুষ তো?

কার্তিক : কীসের ছেলেমানুষ? তিরিশের কাছাকাছি হতে চললো, এখনো খোকাবাবুটি আছে নাকি?

শশী : ইস্কুল মাস্টার তিরিশেও খোকা রয়ে যায়। তার ওপর ওর আবাব আদর্শ ফাদর্শ বাই আছে—

সাতু : হাঃ হাঃ হাঃ—আদর্শ! হাঃ হাঃ—

শশী : হাসবেন না সাতুবাবু! আদর্শ খুব কাজের জিনিস! অনেক উব্‌গারে লাগে। আমার খান-দুই থাকলে পারতো।

কার্তিক : তা রাখলেই পারতেন?

শশী : অতো সোজা নাকি? ও মাল ঠিক পয়সার মতো, জমিয়ে রাখা মুশকিল।

সাতু : কেন, হিমাদ্রিবাবু তো জমিয়ে রেখেছেন বেশ?

শশী : রেখেছে কি না ভগবান জানে! বুলি তো অনেকেই কপচায়।

কার্তিক : যাক্ গে সাতুবাবু, মেলা কথা হয়ে যাচ্ছে, আপনি বের করুন।

[সাতকড়ি উঠে ঘরের কোণে রাখা ব্যাগটা থেকে চারটে গ্লাস আর একটা বোতল বার করে আনলো।]

দেখি? বাঃ! বিলিতি মাল কদ্দিন যে খাইনি।

শশী : চারটে গেলাস কী হবে? হিমাদ্রি খাবে ভেবেছেন?

সাতু : অতো কি হিসেব করেছি? চারজন আছি, চারটে নিয়ে এলাম।

কার্তিক : তা বেশ করেছেন। বলা যায় না, কাউকে বলবো না কথা দিলে হিমাদ্রির আদর্শ টলতেও পারে।

শশী : হ্যাঁঃ! ভালোমানুষটাকে না বখিয়ে স্বস্তি নেই, না?

কার্তিক : আমার বখাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ভায়া। না বখালে ভাগে বেশি পাবো।

সাতু : ভাগ নিয়ে চিন্তা করবেন না কার্তিকবাবু।

[ব্যাগ থেকে একটা বোতল বার করলো]

কার্তিক : এ কী! আপনি কেন গাঁটের পয়সা খরচ করে—

শশী : হ্যাঁ, সত্যি—

সাতু : (অট্টহাস্য) পয়সা কি গাঁটে থাকবার জন্যে তৈরি হয়েছে? আপনিই তো এইমাত্র বললেন—পয়সা রাখবার মতো মালই নয়।

শশী : না, তবু মল্লিকবাবু যখন দিলেনই—

সাতু : মল্লিকবাবু কেন দিলেন, আমি সেইটা বরং ভেবে পাই না—

কার্তিক : দেবে না মানে? এমনি এমনি এই ভূতুড়ে রাত্তিরে লোকে বেরুবে—ইয়ার্কি!

সাতু : না বেরুলে মল্লিকের কী?

[শশী আর কার্তিক হাসলো]

কার্তিক : আপনি এ অঞ্চলে নতুন সাতুবাবু, তার ওপর সারাদিন রাস্তায় খোয়া পেটাচ্ছেন, ব্যাপার-ট্যাপার খোঁজ পান না।

সাতু : কী ব্যাপার?

কার্তিক : সে আছে। মল্লিকবাবুর স্বার্থ আছে।

সাতু : স্বার্থ?

শশী : আপনি মেয়েটাকে চিনতেন?

সাতু : নাঃ! এই প্রথম দেখলাম।

শশী : মেয়েটা কে, কী বৃত্তান্ত—সেসব খবরও রাখেন না বোধ হয়?

সাতু : নাঃ! কোত্থেকে রাখবো?

কার্তিক : আপনি যে কী কারণে বেরুলেন ভেবে পাই না।

সাতু : বেরুবো না, বাঃ? খবরটা জানলাম যখন—তার উপর আপনারা আসছেন—

কার্তিক : আরে আমি তো এসেছি মশায় বিলিতির টানে। আর আপনি কি না নিজেই বিলিতি বয়ে নিয়ে এসে—

শশী : সত্যি, আপনি সারাদিন খাটেন, আপনাকে ডাকাটা আমার অন্যায় হয়েছে—

সাতু : কী যে বলেন!

কার্তিক : না ডেকে করতেন কী শশীবাবু?

শশী : তাও ঠিক। ক'টা লোক বেরুতো এ গাঁয়ের—এই ভূতুড়ে মাঝরাত্তিরে? তার উপর ওই মেয়ের জন্যে—

সাতু : ওই মেয়ে মানে? ওই মেয়ে কী?

[হঠাৎ অন্ধকার চিরে খিলখিল করে হেসে উঠলো মেয়েটা। ঘরের বাইরের অন্ধকার অংশটা জ্বলে উঠলো। খোলা চুল, কোমরে আঁচল জড়ানো। মেয়েটা হেসেই চলেছে। ঘরের আলোটা নিভে গিয়ে তিনজনকে ছায়ামূর্তি করে রেখেছে। তাদের দেহ স্থির, তারা হাসি শোনেনি কেউ।]

মেয়েটা : (হাসতে হাসতে) আমি কী! আমি কে! কী বৃত্তান্ত! তোমরা জানো না? তোমরা জানো না কেউ? আমি কী? আমি কে? কী বৃত্তান্ত?

[আলো কমে অন্ধকার হয়ে গেলো আবার। মেয়েটার চেহারা, মেয়েটার হাসি মিলিয়ে গেলো অন্ধকারে। ঘরে আবার আলো। কথাবার্তায় কোনো বিরতিই যেন পড়েনি।]

সাতু : ওই মেয়ে কী ব্যাপার বুঝলাম না।

কার্তিক : অনেক ব্যাপার সাতুবাবু। অনেক ব্যাপার।

শশী : আমি মেয়েটার কোনো দোষ দেখি না।

কার্তিক : মেয়েটার একমাত্র দোষ হোলো—সে মেয়ে!

শশী : তা বলতে পারেন।

সাতু : আপনারা রহস্য ঘনিয়ে তুললেন যে। মনে হচ্ছে যেন একটা গল্প আছে এর মধ্যে?

[আবার অন্ধকার হয়ে গেলো ঘর। বাইরে আলোয় ফুটে উঠলো মেয়েটা।]

মেয়েটা : গল্প? কার গল্প নেই? কার রহস্য নেই? তোমরা? তোমাদের গল্প নেই? তোমাদের রহস্য নেই? বার করে নিয়ে এসো না গল্পগুলো! তোমাদের সব গল্পগুলো। দেখবে সব গল্প মিলেমিশে একাক্কার হয়ে গেছে। তোমাদের গল্প, আমাদের গল্প—সব—মিলেমিশে একাক্কার—

[আবার খিলখিল করে হেসে উঠলো মেয়েটা। আলো কমতে লাগলো।]

তোমাদের—আমাদের—সব গল্প—মিলে —মিশে—একাক্কার—

[মিলিয়ে গেলো। ঘরে আলো।]

কার্তিক : গল্প না থাকলে মল্লিকবাবু বিলিতি বোতল বের করে? শশীবাবু অবিশ্যি বোতলের জন্যে আসেনি। হিমাদ্রির তো কথাই নেই।

শশী : আছে দাদা, আমারও স্বার্থ আছে, এমনি এমনি আসিনি। হিমাদ্রির মতো আদর্শও আমার নেই, সাতুবাবুর মতো--

সাতু : বাঃ! আমি তো এসেছি আপনাদের কোম্পানির জন্যে! সেটা স্বার্থ নয়?

শশী : খানদানি স্বার্থ। আমাব স্বার্থটা কিঞ্চিৎ মোটা। মল্লিকবাবুকে খুশি করতে পারলে ট্রান্স্ফারের ঝামেলা বাঁচে। আমাদের ওপর মহলে ওনার যথেষ্ট জানাশোনা আছে।

সাতু : আপনারা আবার বাড়িয়ে বলেন! যেন এমনিতে আসতেন না—

কার্তিক : এমনিতে? এই শর্মা নয় অন্তত।

সাতু : আপনি বলতে চান একটা মেয়ে যদি এই অবস্থায়—মানে তার যদি এক পক্ষাঘাত-রোগী বাপ ছাড়া তিনকূলে কেউ না থাকে—

শশী : ও সাতকড়িবাবু, আপনারও হিমাদ্রির মতো আদর্শ গজাচ্ছে নাকি এই বয়সে?

[সাতকড়ি উচ্চহাস্যে ফেটে পড়লো। হিমাদ্রি ফিরে এলো।]

ঠিক আছে?

হিমাদ্রি : হ্যাঁ। এখন বেশ কিছুক্ষণের জন্যে নিশ্চিন্দি।

শশী : বোসো বোসো—

[হিমাদ্রি বসতে গিয়ে বোতল গ্লাস দেখে একটু থমকে গেলো। তারপর বসলো। কার্তিক শশীর দিকে চেয়ে একটু মুখ টিপে হাসলো।]

কার্তিক : কই সাতুবাবু, ওটা কি খুলবেন না?

সাতু : অ্যাঁ? হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। (বোতল খুলে গ্লাসে ঢালতে ঢালতে) হিমাদ্রিবাবু কিছু মনে করবেন না, আপনার শুনলাম এসব চলে না—

হিমাদ্রি : না না, মনে করবার কী আছে? আমার—আমাকে নিয়ে ভাববেন না—মানে—

শশী : আমি এতোটা খাবো না।

সাতু : কোথায় এতোটা! এই তো শুরু সবে। সোডা নেই, জল লাগবে নাকি কারো?

কার্তিক : আজ্ঞে না। এ জিনিস আমি জল দিয়ে মাটি করতে রাজি নই।
সাতু : শশীবাবু?
শশী : নাঃ, ঠিক আছে। নীট্ই ভালো।
সাতু : বাঃ! সবাই এক পথের পথিক। এই তো চাই।
কার্তিক : ও হিমাদ্রি। একটু চেখে দেখবে নাকি?
হিমাদ্রি : না না, আমার ও সব—পোষায় না, মানে—আপনারা খান।
কার্তিক : আমরা তো খাবোই। তুমিও না হয় খেয়ে দেখলে একদিন?
হিমাদ্রি : না না—
কার্তিক : ভয় নেই, তোমার ছাত্ররা কিছু জানতে পারবে না। হেডমাস্টারমশাইও জানবেন না।
হিমাদ্রি : না, সেজন্যে না।
শশী : (বক্রস্বরে) প্রিন্সিপ্‌ল্?
[হিমাদ্রি হঠাৎ চোখ তুলে সোজা শশীবাবুর দিকে তাকালো। তার তোতলামি বন্ধ হয়ে গেলো।]
হিমাদ্রি : প্রিন্সিপ্‌ল্ও নয় শশীবাবু। স্কুলটিচার দেখলেই আপনার ধরে নেন সে প্রিন্সিপ্‌ল্-এর ডিপো।
শসী : ম্‌ম্—হ্যাঁ—তা, কথাটা ভুল বলোনি।
সাতু : তবে একটু চেখে দেখতে বাধা কী?
হিমাদ্রি : বাধা—ভয়! স্কুলটিচারের প্রিন্সিপ্‌ল্ না থাকলেও, প্রিন্সিপ্‌ল্-এর পোশাকটা পরে থাকতে হয়। না হলে চাকরি যায়।
কার্তিক : তা এখানে দু'চুমুক খেতে ভয়টা কী?
হিমাদ্রি : এখানেই থামবে, দু'চুমুকেই থামবে, তা আমি কী করে জানবো কার্তিকদা?
সাতু : ওটা আপনার ভুল ধারণা হিমাদ্রিবাবু। একদিন খেলেই নেশা জন্মে যায়, তা নয়। মনের জোর যদি থাকে
হিমাদ্রি : আমার মনের জোর কতোটা আমি জানি না সাতকড়িবাবু। যেটুকু দেখেছি, তাতে বিশেষ ভরসা পাই না।
কার্তিক : এটা অতিরিক্ত বিনয় হয়ে গেলো না?
হিমাদ্রি : বিনয়? হুঁঃ!
কার্তিক : দেখো, মুখের সামনে বলতে চাই নে, কিন্তু এ গাঁয়ের ছেলে বুড়ো মাস্টার ছাত্র সক্কলের মুখে তোমার যা সুখ্যাতি শুনি—
হিমাদ্রি : (হেসে উঠে) কী সুখ্যাতি কার্তিকদা? আমি অঙ্ক ভালো পড়াই?
কার্তিক : না, তার চেয়ে বেশি। সেসব শুনে তোমার কাজ নেই, তবে একথা ঠিক, যার মনের জোর নেই, তার কপালে ও ধরনের সুখ্যাতি জুটতো না।
হিমাদ্রি : ওরা কতোটুকু জানে? ওরা যাকে মনের জোর বলে ভুল করে, তার আসল নাম কী জানেন? শুয়োরের গোঁ। সে যে কী চিজ তা আমার চেয়ে বেশি কে জানবে?
[মেয়েটা হেসে উঠলো আবার—আলোয়। ঘরের আলো নেভেনি এবার।]

মেয়েটা : এই দেখো। এই তো গল্প? এই তো রহস্য? এক এক জনের এক একটা গল্প। এক একটা রহস্য। কে কার গল্প জানে? বলো? কে কার গল্পের খবব রাখে?

হিমাদ্রি : নিন, শুরু করুন আপনারা।

সাতু : চিয়ার্স।

শশী : চিয়ার্স।

কার্তিক : সে আবার কী?

হিমাদ্রি : (হেসে) সে কি কার্তিকদা, চিয়ার্স বলে খেতে হয় আপনি জানেন না?

কার্তিক : নাঃ! আমি বলি—তারা তারা কালী ব্রহ্মময়ী মা!

[ঢক করে এক চুমুকে অনেকখানি খেয়ে মুখটা ঈষৎ বিকৃত কবলো]

আহা, এমন না হলে বিলিতি? বুক জুড়িয়ে গেলো একেবারে।

শশী : বুক জ্বলে গেলো বলুন!

কার্তিক : ও একই কথা ভায়া, একই কথা।

মেয়েটা : সত্যি? বুক জ্বলা আর বুক জুড়োনো---একই কথা? সত্যি? সত্যি বলছো? (পেছনের দিকে আঙুল দেখিয়ে) তাহলে ওই যে ধু ধু করে আগুন, ও কি জ্বলছে? না জুড়োচ্ছে?

[দপ করে অন্ধকার হয়ে গেলো মেয়েটা]

শশী : আব কতোক্ষণ লাগবে মনে হয় হিমাদ্রি?

হিমাদ্রি : আর ঘণ্টা দুই বড়ো জোর। ধু ধু করে আগুন জ্বলছে।

কার্তিক : হ্যাঁ, কাঁচা বয়সের মড়া, পুড়তে বেশিক্ষণ লাগে না।

[হঠাৎ একটা কুকুর দীর্ঘ আর্তস্বরে কেঁদে উঠলো। সাতকড়ি ভয়ানক চমকে উঠলো।]

কার্তেক : ও কী সাতুবাবু? কুকুরের ডাক শুনে ওরকম চমকে উঠলেন কেন?

সাতু : (অল্প হেসে) কুকুরের এই চিৎকারটা আমার চিরদিনই অসহ্য লাগে।

[মেয়েটার মুখ জানলায় হঠাৎ]

মেয়েটা : চিরদিন? সত্যি?

শশী : হ্যাঁ, এক একটা আওয়াজ আছে, ছেলেবেলা থেকেই কেমন যেন—

সাতু : (গম্ভীর) না, ছেলেবেলা থেকে নয়। চিরদিন বললাম, আসলে—মরুক গে।

[গ্লাসে চুমুক দিলো]

মেয়েটা : কেন, মরুক গে কেন? বলো না, বলো না! তোমার গল্পটা?

সাতু : কী কার্তিকবাবু? চারটে কালো বেরিয়ে রয়েছে, পাঞ্জাটা করে দেবেন না?

মেয়েটা : বলবে না? তোমার গল্পটা?

শশী : করাচ্ছি পাঞ্জা! হিমাদ্রি এসো তো, হু হু করে কালোগুলো বুঁজিয়ে লাল করে দি!

[তাস বিলি হোলো, চারটে করে। মেয়েটা জানলা ছেড়ে দরজায় এসে দাঁড়ালো। উৎসুক চোখে দেখছে এদের।]

আপনার ডাক।

সাতু : ষোলো।

হিমাদ্রি : পাস।

সাতু : সতেরো।

শশী : আছি।

সাতু : পাস।

[শশী রঙ করলো। আরো চারটে তাস বিলি হোলো। খেলা শুরু হোলো। মেয়েটি আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে ঝুঁকে একে একে হাতের তাস দেখতে লাগলো। তারপর সামনের দিকে এগিয়ে এলো।]

মেয়েটা : (মৃদু কণ্ঠে) সাহেব বিবি। জোড়া জোড়া। সাহেব বিবি জোড়া জোড়া। না না না। আমপাতা জোড়া জোড়া। আমপাতা জোড়া জোড়া। মারবো চাবুক ছুটবে ঘোড়া। ওরে বিবি সরে দাঁড়া। আসছে আমার পাগলা ঘোড়া।

[গলা ক্রমেই চড়ছে। হাত মুঠো হয়ে উঠেছে, মুখে যন্ত্রণা।]

পাগলা ঘোড়া খেপেছে। বন্দুক ছুড়ে মেরেছে। অল রাইট—ভেরি গুড—

[হঠাৎ দু'হাতে গাল চেপে ধরে ওই কুকুরটার মতোই আর্তনাদ করে উঠলো]

না—আ—আ—আ—

সাতু : আঠাশ উনত্রিশ—ডুবে গেছে! পাঞ্জা!

[মেয়েটা ছিটকে সরে গেলো সামনে একপাশে। এদের দিকে তার চোখ। দর্শকদের দিকে এলো চুলের রাশি।]

পাঞ্জা! (বোতল তুলে) আসুন কার্তিকবাবু। শশীবাবু গেলাসটা এগিয়ে দিন।

শশী : না, আমার শেষ হয়নি এখনো।

সাতু : আরে নিন নিন—কালো পাঞ্জা খেয়েছেন, শোকটা ডোবান।

[মেয়েটা ঘুরে দাঁড়ালো। খেলোয়াড়দের দিকে আঙুল দেখিয়ে দর্শকদের বললো—]

মেয়েটা : শোক ডোবাবে? মদে?

[খিল খিল করে হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে ছুটে চলে গেলো ঘরের বাইরে দিয়ে, পেছনে, এলোচুল দুলিয়ে। সাতু তাস বিলি করতে গেলো।]

শশী : না, আর থাক! আর ভালো লাগছে না।

কার্তিক : কেন স্যার? হারছেন বলে?

শশী : (উঠে দাঁড়িয়ে) তা বলতে পারেন। তবে, জিতলেই কি সব সময় ভালো লাগে?

সাতু : বলেন কী? জিতলে ভালো লাগবে না?

শশী : না। সব জেতা ভালো লাগার জেতা নয়।

সাতু : যেমন?

শশী : যেমন? এই তো মুশকিলে ফেললেন, অতো ভেবেচিন্তে কি বলেছি কথাটা? যেমন ধরুন, আপনি একটা কোনো জেদ নিয়ে আপনার বউয়ের সঙ্গে প্রচণ্ড তর্ক করলেন—

সাতু : (অট্টহাস্য) আমার বউ! আপনি আর উদাহরণ খুঁজে পেলেন না?

কার্তিক : কেন, বিয়ে কি একেবারেই করেন নি?

সাতু : একেবারেই না। একবারও না। সময় পেলাম কই?

শশী : অভাবটা কি শুধু সময়েরই সাতুবাবু?

সাতু : ওই হোলো। কথার কথা আর কী?

কার্তিক : বিয়ে করবার ইচ্ছে হয়নি কোনোদিন?

সাতু : ইচ্ছে কী দুঃখে হবে বলুন? বিয়ে করে লোকে যা পায়, তা যদি আমি বিয়ে না করেই পেতে পারি, এবং আরো অনেক ভালোভাবে পেতে পারি—

হিমাদ্রি : সত্যিই কি তাই পাওয়া যায়?

সাতু : যদি বলেন পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা—তবে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু বংশরক্ষার ব্যাপারে কোনোদিন বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা বোধ করিনি, কী করবো বলুন?

হিমাদ্রি : বংশরক্ষার কথা আমি বলিনি।

সাতু : তবে? ঘর? সংসার? গৃহিণীর পবিত্র হস্তের পবিত্র চচ্চড়ি?

[সাতু হা-হা করে হাসলো]

ওসব কিছু নয় হিমাদ্রিবাবু, কিছু নয়! আপনিও জানেন, আমিও জানি—আসল ব্যাপারটা আলাদা।

কার্তিক : আসল ব্যাপারটা আপনি কোথায় পেতেন?

সাতু : চুনোপুঁটি ঠিকেদারের জীবন কার্তিকবাবু! কুলিকামিন আছে, পাড়া-বেপাড়া আছে—

কার্তিক : ও! ভদ্রঘর বাদ?

সাতু : ভদ্রঘর বলতে আপনারা যা বোঝেন, সেটা যে একেবারেই বাদ, তা নয়। তবে তাঁরা ভদ্রমহিলা, না 'ওরা'---আমি আজ অবধি ঠিক করে উঠতে পারিনি।

[শশী এর মধ্যে দরজায় গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ ফিরে এসে নিজের গ্লাসটা তুলে বাড়িয়ে দিলো সাতকড়ির দিকে।]

শশী : আর একটু দিন তো।

সাতু : এই তো, কথার মতো কথা বলেছেন। আসুন স্যার। (ঢেলে) কার্তিকবাবু?

কার্তিক : (গ্লাস শেষ করে বাড়িয়ে দিয়ে) আছি। আমার কাছে 'পাস' পাবেন না।

সাতু : কী হিমাদ্রিবাবু? মত পরিবর্তন হোলো নাকি?

হিমাদ্রি : (হেসে) না, এখনো হয়নি।

[শশী এবার জানলায়]

কার্তিক : শশীবাবু, ছটফট করে বেড়াচ্ছেন কেন?

শশী : (ফিরে) অ্যাঁ?—না, বসে বসে পা ধরে গেছে।

[খিলখিল করে হেসে উঠলো মেয়েটা। আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সে ঘরের বাইরে ওপাশে। এদিকে অন্ধকার। শুধু জানলার কাছে শশী খানিকটা আলোয়।]

মেয়েটা : পা নয়, পা নয়—মাথা। মাথা ধরে গেছে। ধরবে না মাথা? ভিতরে কতো কী রয়েছে, কতো কী ঘুরছে নাগোরদোলার চরকিপাকের মতো। বনবন বনবন

করে ঘুরছে, বোঝা যাচ্ছে না চেনা যাচ্ছে না, ছায়াবাজির মতো—বনবন বনবন করে ঘুরছে—

শশী : (স্পষ্ট উচ্চারণে, কিন্তু অনেকটা আপনমনে) মালতী।

[মেয়েটা খিলখিল করে হেসে উঠলো আবার]

মেয়েটা : মালতী? মালতী ক—বে মরে ভূত হয়ে গেছে। আমার মতো। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, ঠিক ওই রকম (পেছনে আঙুল দেখিয়ে)—অমনি ধু ধু আগুনে, আমার মতো।

[শশী চমকে ফিরে দাঁড়ালো। যেন সামনে কাউকে অবাক হয়ে দেখছে।]

শশী : মালতী!

মেয়েটা : হ্যাঁ গো, মালতী! বলো না, বলো না, তোমার হারজিতের গল্পটা? (দর্শকদের দিকে) ভারি সুন্দর গল্পটা, ভারি মিষ্টি। আমার খুব ভালো লাগে।

[শশী জানলা ছেড়ে এগিয়ে এলো সামনে—মাঝখানের দিকে]

শশী : মালতী! তুমি—তুমি এখানে এলে কেন?

[মেয়েটা এগিয়ে এলো। সে এখন মালতী হয়ে গেছে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার মুখে বিষণ্ণ হাসি, কিন্তু চোখে জ্বালা।]

মালতী : তাড়িয়ে দেবে?

শশী : তুমি কথা দিয়েছিলে, কোনোদিন তুমি—

মালতী : আমি কথা দিইনি।

শশী : কথা হয়েছিলো, আর কোনোদিন—

মালতী : কথা হয়নি। তুমি বলেছিলে। তুমি। সব তোমার কথা।

শশী : হ্যাঁ, হতে পারে—কিন্তু—তাই কি ভালো নয়?

মালতী : ভালো। খারাপ। উচিত। অনুচিত। মঙ্গল। অমঙ্গল। সব তুমি ঠিক করে দিয়েছো। সব তুমি ঠিক জানো। তুমি তো বিধাতা? তোমার বিধানে তো ভুল হয় না?

শশী : মালতী তুমি নিজেও জানো—

মালতী : (হঠাৎ জ্বলে ওঠে) কী জানি? নিজে কী জানি?

শশী : তুমি জানো না? এরকমভাবে এ সময়ে আমার কাছে আসা মানে—

মালতী : চলে যেতে বলছো?

শশী : তা ছাড়া আর কী পথ আছে মালতী?

মালতী : হ্যাঁ, চলেই যাবো। এর আগেও চলে যেতে বলেছো, চলে গেছি। যে পথে যেতে বলেছো, সেই পথেই গেছি। তোমারই জিৎ। বরাবর।

শশী : জিত?

মালতী : জিত নয়? জেতোনি তুমি?

শশী : কীসের জিত? জিত কীসের?

মালতী : তোমার জিত। তোমার নিজের উপর জিত। পেরেছো তুমি। ভেসে যাওনি, খুঁটি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছো। নিজের কাছে হেরে যাওনি তুমি।

শশী : আমি কি হার-জিতের কথা ভেবে—

মালতী : না, তা কেন? তা কেন ভাববে? তুমি ভেবেছো ভালো-মন্দর কথা, উচিত-অনুচিতের কথা, মঙ্গল-অমঙ্গলের—

শশী : (প্রায় চেঁচিয়ে) মালতী!

মালতী : (কঠিন কণ্ঠে) হ্যাঁ, চলেই যাবো। আমি জানতাম, তুমি চলে যেতেই বলবে। তোমার জিতের আত্মপ্রসাদ তুমি ছাড়তে পারবে না।

[শশী কী বলতে গেলো, কিন্তু মালতী বলতে দিলো না। এগিয়ে এলো জ্বালাধরা চোখ শশীর চোখে রেখে।]

যাবার আগে শুধু তোমাকে জানিয়ে যাবো—কেন এসেছিলাম।

[মালতী জামার সব চেয়ে নিচের বোতামটা খুলতে লাগলো।]

শশী : (স্তম্ভিতভাবে) এ কী করছো মালতী?

[দপ করে মঞ্চের সব আলো নিভে গেলো। মেয়েটার অর্ধোন্মাদ খিলখিল হাসি শুধু অন্ধকার চিরে। ঘরের আলো জ্বললো। শশী আগের মতো জানলায়। মেয়েটা নেই।]

কার্তিক : পা-টা আমারও ধরে গেছে।

[উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলো]

তারা, তারা মা!

সাতু : (হেসে উঠে) চিয়ার্স! নিন, কারণ-বারি।

[কার্তিকের হাতে তার গ্লাসটা তুলে দিলো]

কার্তিক : কারণ-বারি। শ্মশান-কালীর মন্ত্রঃপূত বারি! মা! মা!

[পান করলো]

সাতু : কী শশীবাবু? সত্যিই আর খেলবেন না?

শশী : (এক পা এগিয়ে এসে) বলেন যদি, খেলতে পারি—

সাতু : না না, ভালো না লাগলে, কী দরকার? তার চেয়ে বরং—গল্প সল্প হোক।

[মেয়েটা ছুটে এলো, ঘরের বাইরে তার কোণটায়]

মেয়েটা : হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ভালো। গল্প সল্প হোক।

[দু'হাতে চিবুক রেখে গল্প শুনতে বসলো, পবম উৎসাহে। শশীও বসেছে এর মধ্যে।]

সাতু : কী কার্তিকবাবু! বলুন কিছু?

কার্তিক : আমি?

সাতু : আপনি তো সিংহদ্বারে বসে তামাম দুনিয়া দেখতে পান বললেন। সেই দুনিয়ার গল্পই রসালো দেখে দু'একটা ছাড়ুন!

হিমাদ্রি : রসালো গল্প? শ্মশানে? (হেসে উঠলো)

সাতু : শ্মশানেই তো রসালো গল্প জমে। গরম শয্যা দরকার ভূতের গল্পের জন্যে। আমি লেপের গরমের কথা বলছি না অবিশ্যি—

[হা হা করে হাসলো নিজের রসিকতায়]

কার্তিক : তা যা বলেছেন। শ্মশানে রসালো গল্পই ভালো জমে। যাকে বলে—প্রেমের গল্প।

হিমাদ্রি : প্রেম! (হেসে উঠলো)

কার্তিক : (মিটিমিটি হেসে) কেন হিমাদ্রি? পাকসিটে-মারা বুড়োর মুখে প্রেম কথাটা শুনে হাসি পেলো?

হিমাদ্রি : না, আমি মোটেই ও জন্যে হাসিনি!

কার্তিক : তবে?

হিমাদ্রি : কী জানি? এই শ্মশানের সঙ্গে প্রেমটা ঠিক মেলাতে পারলাম না বলে হাসি পেলো বোধ হয়।

শশী : (হঠাৎ অত্যধিক জোর দিয়ে) প্রেম মানেই শ্মশান। শ্মশান মানেই প্রেম।

মেয়েটা : (হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে) মিথ্যে কথা। মিথ্যে কথা।

কার্তিক : হ্যাঁ, তা কথাটা নেহাত মিথ্যে বলেননি।

মেয়েটা : হ্যাঁ মিথ্যে! একেবারে মিথ্যে!

সাতু : বুঝলাম না ঠিক। শ্মশানে প্রেমের গল্প জমতে পারে, কিন্তু প্রেম মানেই শ্মশান, শ্মশান মানেই প্রেম, এটা ঠিক—মানে, মিলটা কোথায়?

শশী : সাংঘাতিক মিল—এক জায়গায়।

সাতু : কোন জায়গায়?

শশী : আগুন। ওই যে জ্বলছে? পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।

মেয়েটা : (প্রবল প্রতিবাদে) কক্ষনো না! কক্ষনো না! প্রেম পুড়িয়ে ছাই করে দেয়? কক্ষনো না!

সাতু : (হেসে) আই সি। প্রেমের আগুন?

মেয়েটা : (প্রায় আর্তস্বরে) না! না! ও আগুন পোড়ায় না, ও আগুন জুড়োয়! পোড়ায় না, জুড়োয়।

কার্তিক : প্রেমের আগুন? হ্যাঁ, তা বলা যায়। তবে শ্মশানের আগুনের আগে প্রেমের আগুনে জ্বলে নেওয়াটা মন্দ না।

মেয়েটা : (উদগ্রীব স্বরে) হ্যাঁ হ্যাঁ। বলো, বলো।

কার্তিক : তাতে অন্তত বেঁচে থাকার একটা মানে দাঁড়ায়।

সাতু : তবে কি আপনি বলতে চান—জ্বলুনি না খেলে বেঁচে থাকার মানে দাঁড়ায় না?

কার্তিক : আপনার আমার হয়তো দাঁড়ায়। মেয়েদের কথা জানি নে।

[জানলার কাছে গেলো]

মেয়েটা : জানো না? জানো না?

হিমাদ্রি : তার মানে---জানেন।

সাতু : (হেসে) ঠিক। তার মানে বলতে চান—প্রেমের আগুনে না পুড়লে মেয়েদের জীবনে মানেই দাঁড়ায় না।

কার্তিক : (ফিরে) আমি আমাদের বাঙালি মেয়েদের কথা বলছি।

সাতু : তাই হোলো না হয়।

কার্তিক : তাও সব্বাইকার কথা বলছি না।

সাতু : (হেসে) হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, বিশেষ কারো কথা। সেই গল্পটাই তো বের করতে চাইছি।

মেয়েটা : আছে? গল্প আছে? বলো না। তোমার গল্প আমি কিচ্ছু জানি না।
কার্তিক : (হেসে) আরে না মশাই, আমার গল্প কিছু নেই।
মেয়েটা : নেই? সত্যি নেই?
কার্তিক : এই মেয়েটার কথাই ধরুন না?

[মেয়েটা হঠাৎ পাথর হয়ে গেলো]

সাতু : হ্যাঁ, কথাটা উঠলো একবার, তারপর চাপা পড়ে গেলো। এই মেয়েটার কী ব্যাপার, তখন কী বলছিলেন?
মেয়েটা : (মিনতি করে) না না! না! ও গল্পটা এখন থাক! ওটা এখন থাক! ওটা পরে, কেমন? ওটা পরে হবে।
কার্তিক : এই মেয়েটা তো এখন জ্বলছে। শ্মশানের আগুনে। এর বেঁচে থাকাটার কী মানে দাঁড়িয়েছে ওর নিজের কাছে বলতে পারেন?
সাতু : কেন, এ মেয়েটা আপনাদের ওই 'প্রেমের আগুনে' কখনো জ্বলেনি?
[কার্তিক শশী হিমাদ্রি তিনজনেই হো হো করে হেসে উঠলো। মেয়েটা দু'হাতে কান চাপা দিয়ে ছুটে চলে গেলো।]
শশী : প্রেমের আগুন? এই মেয়েটা?
কার্তিক : (কর্কশ অশালীন স্বরে) প্রেম বলতে অবিশ্যি আপনি যদি বলেন—
হিমাদ্রি : (বাধা দিয়ে) আহাঃ, কার্তিকদা।
সাতু : কেন? কী হোলো?
কার্তিক : (বক্রস্বরে) এসব খারাপ ব্যাপার হিমাদ্রির ভালো লাগে না।
হিমাদ্রি : ব্যাপারের কথা নয়। আপনি কী ভাষায় বলবেন, সেটা তো জানি?
কার্তিক : ওহো, ভাষাটারই দোষ। তা তুমিই বলো, তোমার পবিত্র ভাষায়।
শশী : পবিত্র ভাষা! 'পবিত্র'!
হিমাদ্রি : (চটে) শশীদা—
শশী : (ঠোঁট উলটে) মর‍্যালিস্ট!
হিমাদ্রি : কে মর‍্যালিস্ট?
শশী : কে নয়? তুমি, আমি, কার্তিকবাবু—
কার্তিক : আমাকে বাদ দিয়ে বলুন শশীবাবু। আপনাদের মর‍্যালিটির মুখে আমি—যাক গে! খারাপ কথা বলা বারণ, বলবো না।
সাতু : আহা হা, রাগারাগি কেন? বেশ তো গল্প সল্প হচ্ছিল!
হিমাদ্রি : গল্প বিশেষ কিছু নেই সাতুবাবু। আমি দু'কথায় বলে দিচ্ছি শুনুন। এই মেয়েটার মা মরে গেছলো ওকে জন্ম দিতে। তিনকুলে থাকবার মধ্যে ছিল বুড়ো বাবা—
শশী : শুধু বুড়ো নয়, আবার পক্ষাঘাতের রোগী, নড়াচড়া নেই।
[হঠাৎ কুকুরটা কেঁদে উঠলো আবার। শশী থেমে গেলো। সাতু এবার যেন আরো চমকে উঠলো প্রথমে। দাঁতে দাঁত চেপে সমস্ত কান্নাটা শুনলো। তারপর হঠাৎ এক ঝাঁকানিতে হাতের গ্লাসের মদটা ছিটিয়ে ফেলে দিলো।]
কার্তিক : হাঁ হাঁ ও কী করলেন? পয়সার মাল—

সাতু : (সামলে নিয়ে) একটা পোকা পড়েছে মনে হোলো। বেশি ছিল না।

[শক্ত হাতে বোতল থেকে অনেকটা ঢেলে নিলো। শশীকে আর কার্তিককেও দিলো।]

হিমাদ্রি : (উঠে) যাই, একবার দেখে আসি—

সাতু : আমি দেখছি—(উঠে পড়লো)

হিমাদ্রি : না না, আপনি গল্পটা শুনুন—

সাতু : ফিরে এসে শুনবো এখন। দেখি, কুকুরটাকেও খেদিয়ে দিতে পারি কি না—

[সাতকড়ি বেরিয়ে গেলো। শশী এক চুমুক খেলো।]

শশী : এঃ, বড়ো বেশি খাওয়া হয়ে যাচ্ছে।

কার্তিক : কিছু ভাববেন না। বে-এক্তেয়ার হয়ে পড়লে আপনাকে বয়ে নিয়ে যাবো বাড়িতে।

শশী : (হেসে) আবার ফিরতি পথেও কাঁধ লাগাবেন?

হিমাদ্রি : কী যে বলেন শশীদা!

শশী : (আরো হেসে) অলক্ষুণে কথা? বলতে নেই, ষাট ষাট? অ্যাঁ? এ তো মেয়েদের মতো কথা হয়ে গেলো হিমাদ্রি!

হিমাদ্রি : (লজ্জিত হেসে) তা হবে। মেয়েরাই তো এসব সংস্কার মাথায় ঢোকায় ছেলেবেলা থেকে।

[কার্তিক বসে তাস ভাঁজছিলো আপন মনে]

কার্তিক : এসো হে হিমাদ্রি, ততোক্ষণ একবাজি পেটাপেটিই খেলি।

[হিমাদ্রি বসলো। তাস বিলি হোলো। একটা করে তাস ফেলে লাল কালো মিলিয়ে পিট তোলা। শশী উঠে জানলায় গেলো। খেলা চললো। মেয়েটা ওদিকে ফুটে উঠলো আলোয়। বসে আছে সে।]

শশী : বাইরেটা কী অন্ধকার রে বাবা। চাঁদ কি একেবারেই নেই আজ?

কার্তিক : (খেলতে খেলতে) আছে। ছোট সাইজ।

মেয়েটা : (যেন আপন মনে) আচ্ছা, সেদিন চাঁদটা কী সাইজের ছিল?

শশী : (বাইরের দিকে চেয়েই) তাতে কী আসে যায়?

মেয়েটা : না, ভাবছিলাম। এইরকম ছোটই ছিল বোধ হয়। নাকি বড়ো? পূর্ণিমার রাত ছিল নাকি সেটা? বড়ো গোল রূপোর থালার মতো চাঁদ?

শশী : (একইভাবে) কী আসে যায়? কে খেয়াল করেছে?

মেয়েটা : খেয়াল করে দেখোনি, না? হ্যাঁ, শ্মশানে এসে কে আর অতো খেয়াল করে? মড়া পোড়াতে এসেছো, মড়া পুড়িয়ে চলে যাও।

শশী : (আগের মতো) মালতী।

মেয়েটা : হ্যাঁ গো, মালতী। মালতীর মড়া। পোড়াতে গিয়েছিলে, মনে নেই? তুমি, তোমার সেই গুণধর বন্ধু—প্রদীপ না দীপক কী যেন নামটা?

শশী : প্রদীপ।

মেয়েটা : হ্যাঁ, প্রদীপ। বেশ বাহারি নাম। আরো কে কে যেন ছিল সব—শ্মশানবন্ধুর দল। মনে নেই?

শশী : প্রদীপ! শয়তান!

মেয়েটা : (হেসে উঠে) হ্যাঁ ঠিক! শয়তান! শয়তান নয়? ওর জন্যেই তো মালতী—

শশী : (ঘুরে দাঁড়িয়ে) মালতী!

[মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে মালতী হয়ে উঠে দাঁড়ালো। শশী এগিয়ে এলো তার দিকে।]

মালতী!

মালতী : না। না না না—

শশী : মালতী শোনো—

মালতী : না না—

শশী : শোনো মালতী! শোনো! এ ছাড়া—

মালতী : না না, আমি পারবো না! আমি পারবো না!

শশী : (ওর কথার উপরেই) এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই মালতী, কোনো রাস্তা নেই!

মালতী : আমি পারবো না! এখন আমি কিছুতেই পারবো না!

শশী : এই একমাত্র পথ মালতী, আর কোনো রাস্তাই নেই—

মালতী : এখন আমি পারবো না! এখন আর আমি কিছুতেই—কিছুতেই—

শশী : কিন্তু মালতী, তুমি যদি প্রদীপকে বিয়ে না করো—

মালতী : (আর্তস্বরে) না না, বোলো না! বোলো না! এখন সে আর কিছুতেই হয় না—কিছুতেই—

শশী : কিন্তু তুমি তো এতোদিন—ওকেই—

মালতী : এতোদিন জানতাম না—এতোদিন বুঝিনি—এখন আমি—এখন আমি কিছুতেই ওকে বিয়ে করতে পারবো না—তুমি—

শশী : মালতী—

মালতী : তুমি—তুমি—কেন জানালে আমাকে? তুমি কেন—তুমি কেন—এলে? তুমি কেন—

শশী : কিন্তু আমি তো তোমাকে কখনো বলিনি—

মালতী : তুমি কেন—হ্যাঁ, জানি! জানি! তুমি আমাকে কখনো বলোনি। কোনোদিন বলোনি! কিন্তু কেন? কেন বলোনি?

শশী : কেন, তুমি জানো না?

মালতী : হ্যাঁ জানি! প্রদীপ তোমার বন্ধু। প্রদীপ তোমার ভাই! তোমার আপন খুড়তুতো ভাই! প্রদীপের সঙ্গে ছোটবেলা থেকে তোমার—জানি জানি সব জানি!

শশী : তাহলে কেন—?

মালতী : (চিৎকার করে) শুধু সেইজন্যেই তুমি আমাকে দূরে ঠেলে দেবে?

শশী : শুধু?

মালতী : শুধু সেইজন্যে তুমি আমাকে বিয়ে করবে না? শুধু প্রদীপের জন্যে?

শশী : মালতী—

মালতী : প্রদীপ যদি না থাকতো, প্রদীপের সঙ্গে আগে যদি বিয়ের কথা না হোতো— তাহলে তুমি আমাকে— ?

শশী : মালতী, ওরকমভাবে ভেবে কি কোনো— ?

মালতী : বলো না, তাহলে? তাহলে তুমি আমাকে বিয়ে করতে না?

শশী : এটা কি একটা প্রশ্ন হোলো?

মালতী : তবে? তবে? এখন শুধু প্রদীপের কাছে তোমার মুখ থাকবে না বলে—

শশী : (দৃঢ়কণ্ঠে) প্রদীপের কাছে নয় মালতী। আমার নিজের কাছে। আমার নিজের কাছে নিজের মুখ থাকবে না।

[মালতী স্তব্ধ হয়ে গেছে]

এরকমভাবে নিজের কাছে হেরে গিয়ে তোমাকে বিয়ে করলে নিজেও সুখী হতে পারবো না, তোমাকেও সুখী করতে পারবো না।

মালতী : হেরে গিয়ে?

শশী : হ্যাঁ মালতী। হেরে গিয়ে। তুমি যদি আজ প্রদীপকে ছেড়ে—

মালতী : কিন্তু তুমি আমাকে বিয়ে না করলেও, প্রদীপকে তো আমি আর কিছুতেই বিয়ে করতে পারবো না। তাহলেও তুমি হেরে যাবে?

শশী : (একটু থেমে) তাহলেও হেরে যাবো।

মালতী : কেন?

শশী : আমি কোনোদিন ভুলতে পারবো না—আমার জন্যেই তুমি প্রদীপের জীবনটা নষ্ট করে দিলে।

মালতী : আর—আর—সুখী হতে পারবে না?

শশী : পারা কি সম্ভব?

মালতী : সম্ভব নয়?

শশী : তুমি কি আমাকে চেনো না মালতী?

[মালতী খানিকক্ষণ বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইলো শশীর মুখের দিকে। তারপর ভয়ার্ত চোখে দু' পা পিছিয়ে গেলো, ডান হাতের মুঠোটা মুখের সামনে উঠে এলো ভয়ের ভঙ্গীতে। তারপর হঠাৎ ফিরে ছুটে চলে গেলো। একটা নিশ্বাস-টানা বোবা আর্তস্বর শুধু বাতাসে ভেসে রইলো। শশী ধীরে ধীরে জানলার দিকে ফিরে চললো।]

কার্তিক : আমার সব খতম হয়ে এলো যে?—এই পেয়েছি, লাল! যাক, তবু খানিকক্ষণ লড়া যাবে।

[হঠাৎ বাইরে কুকুরটা মার-খাওয়া চিৎকার করে উঠলো—কেঁই! কেঁই, কেঁই, কেঁই। পালাচ্ছে, দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে আওয়াজটা।]

হিমাদ্রি : (হেসে) মেরেছে কুকুরটাকে সাতুবাবু!

[সাতকড়ি ফিরে এলো হাত ঝাড়তে ঝাড়তে]

কী? তাড়ালেন?

সাতু : হ্যাঁ! এই ঘরের কাছেই ঘাপটি মেরে বসে ছিলো বেটা! মেরেছি একটা পোড়াকাঠ ছুড়ে।

শশী : লাগিয়েছেন তো ঠিক?

সাতু : হ্যাঁ, একেবারে পিঠের ওপর।

শশী : আমি মারলে ঠিক দশ হাত দূর দিয়ে বেরিয়ে যেতো।

সাতু : না না, একেবারে কাছ থেকে মেরেছি—

শশী : ও কাছ থেকে মারলেও তাই। আমার টিপ একদম নেই। যা মারি, সব উলটো দিকে চলে যায়।

[সাতু বসে গ্লাসে একটা লম্বা চুমুক দিলো।]

কার্তিক : (তাস ঠেলে) নাও। থাক এবার।

সাতু : কী খেলছিলেন?

কার্তিক : পেটাপেটি। এমনি সময় কাটানো আর কী?

[হিমাদ্রি উঠে আড়মোড়া ভেঙে একটা সশব্দ হাই তুললো। কার্তিক দু'বার তুড়ি দিলো।]

সাতু : কী হিমাদ্রিবাবু? ঘুম পেলো নাকি?

হিমাদ্রি : নাঃ, মড়া পোড়াতে এসে আমার ঘুম পায় না একদম, কেন কে জানে?

সাতু : আপনি অনেক মড়া পুড়িয়েছেন হিমাদ্রিবাবু?

হিমাদ্রি : তা, অনেক না হলেও, বারো চোদ্দটা তো হবেই।

সাতু : আপনি?

কার্তিক : আমার লেখাজোখা নেই। প্রকাণ্ড গুষ্ঠি—কেউ না কেউ মরছেই হরদম। বেঁচে থাকতে সম্পর্ক নেই, মরলে গিয়ে কাঁধ লাগিয়ে দায়টা চুকিয়ে আসি। তারপর গুষ্ঠির বাইরে হলেও মালের গন্ধ যদি থাকে—

সাতু : শশীবাবু, আপনারও নিশ্চয়ই অনেক অভিজ্ঞতা?

শশী : হ্যাঁ, তা হবে।

সাতু : আমিই তাহলে এখানকার সবচেয়ে আনাড়ি। আমার এটা ধরে তিনটে হোলো।

কার্তিক : সে কী! মোটে?

সাতু : তা হবে না কেন বলুন? ছেলেবেলা থেকেই ঘরছাড়া, পথে পথে ঘোরা। ওই তিনটের একটাও আমার নিজের কেউ নয়।

[মেয়েটা ছুটে এলো তার জায়গায়]

মেয়েটি : কী? কী? কী বললে?

হিমাদ্রি : আত্মীয় কেউ নেই আপনার?

সাতু : দেশে জ্ঞাতগুষ্ঠি কে আছে না আছে জানি না। সেই পনেরো বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলুম, তারপর থেকে আর খোঁজ রাখি না।

হিমাদ্রি : ঘর বলতে তাহলে কিছু নেই আপনার?

সাতু : (অট্টহাস্য করে) ঘর? যেখানে যখন থাকি, সেটাই ঘর! তাঁবু, ডাকবাংলো, কুলিবস্তি, ভাড়া করা চালাঘর, এঁদো হোটেল—কতো জায়গায় থাকলাম!

মেয়েটা : আর? আর কোথাও থাকোনি?

সাতু : হ্যাঁ, মধ্যে মধ্যে বেশ সাজানো গোছানো শোবার ঘরেও রাত কাটে। তাতে খরচ বেশি পড়ে, তবু থাকাটা থাকার মতো নয়।

[হা হা করে হেসে উঠলো]

হিমাদ্রি : ও, বুঝেছি।

সাতু : (হাসতে হাসতে) বুঝেছেন? বড়ো অসৎ-সংসর্গে পড়ে গেছেন হিমাদ্রিবাবু। চরিত্র থাকলে হয়।

হিমাদ্রি : (হেসে) সঙ্গদোষে চরিত্র যাবার বয়স কি আর আছে?

শশী : না না, হিমাদ্রির চরিত্র যাবার মতো মালই নয়! টাইট চরিত্র একেবারে।

হিমাদ্রি : (হেসে) শশীদা আজ আমার চরিত্রের উপর খুব রেগে আছেন মনে হচ্ছে?

শশী : তোমার চরিত্র নয়। আর আজ বলেও নয়। 'চরিত্র' বস্তুটার উপরই আমি হাড়েচটা—বরাবর।

মেয়েটা : বরাবর?

শশী : (না শুনে) বরাবর না হলেও অন্তত বহুদিন ধরে।

হিমাদ্রি : (হেসে) কতোদিন ধরে?

মেয়েটা : দশ বছর সাত মাস, তাই না?

শশী : তা প্রায় বছর দশেক হবে।

কার্তিক : তার মানে কী—দশ বছর আগে চরিত্রটি প্রথম খুইয়েছিলেন?

শশী : চরিত্র খোয়াইনি। চরিত্রে বিশ্বাস খুইয়েছি!

কার্তিক : ও একই কথা।

মেয়েটা : না, এক কথা নয়।

শশী : আচ্ছা সাতুবাবু, ওই যে আপনি—যাকে বলে বেশি খরচ দিয়ে ঘর ভাড়া করেন—ওখানে আপনার—দরকার মেটে?

সাতু : ওখানেই দরকার মেটে, আর কোথাও মেটে না।

শশী : আপনি ভাগ্যবান লোক।

সাতু : ভাগ্যবান আপনিও হতে পারেন। সিধে রাস্তা। যদি বলেন নিয়ে যেতেও পারি।

শশী : না, আমি গেছি। কাজ হয়নি।

সাতু : মানে?

শশী : মানে, দরকার মেটেনি।

সাতু : তাহলে বিয়ে করে ফেলুন।

শশী : বিয়েও করে দেখেছি।

সাতু : ও, বিয়ে করেছেন? সে কবে?

শশী : করেছিলাম বছর আষ্টেক আগে। একটা চেষ্টা আর কী?

সাতু : কীসের চেষ্টা?

শশী : ওই—কী বলবো—দরকার মেটে কিনা চেষ্টা করে দেখা।

সাতু : মিটলো না?

শশী : নাঃ! বরং দু'টি বছর নরকযন্ত্রণা। যাক তবু শেষ অবধি যে রেহাই দিয়ে গেছে, এইটাই বাঁচোয়া।

সাতু : ও, মারা গেছেন?

হিমাদ্রি : থাক ও কথা।

শশী : (একটু বিরক্তভাবে) এর আবার থাকাথাকির কী আছে হিমাদ্রি? (সাতুকে) মরেনি সাতুবাবু। পালিয়ে গেছে।

হিমাদ্রি : (তাড়াতাড়ি) মানে, বাপের বাড়ি ফিরে গেছে।

শশী : ও হ্যাঁ, পালিয়ে গেছে বললেই কারো সঙ্গে পালিয়ে গেছে মনে হয়, না? হিমাদ্রির এসব দিকে কড়া নজর! কেউ ভুল বুঝলেই সর্বনাশ, না হিমাদ্রি?

হিমাদ্রি : আমি সেজন্যে বলিনি।

শশী : যেন তাতে কিছু এসে যায়!

হিমাদ্রি : বলছি তো আমি সেজন্যে—

শশী : (না শুনে, সাতুকে) তবে আমার দিক থেকে নিশ্চিন্দি। বাপ-মার আদুরে মেয়ে ছিল, বাড়িও বাইরে—পাটনায় থাকে ওরা। শুনেছি লুকিয়ে চুরিয়ে আবার বিয়ে দিয়েছে। (হঠাৎ হেসে উঠে) লুকিয়ে চুরিয়ে—বুঝলেন সাতুবাবু? যেন আমি জানতে পারলে বাগড়া দেবো! আমি!

সাতু : (অট্টহাস্য করে) তা অতো লুকোনো, তবু আপনি জানতে পেরে গেলেন?

শশী : সে অনেকরকম হিতৈষী থাকে সাতুবাবু। চোখ গোল করে এসে শুনিয়ে গেছে। আমি কিছু করবো না শুনে আমার সঙ্গে তাদের কথা বন্ধ এখন। সেটাও বাঁচোয়া।

[মেয়েটা এতোক্ষণ চুপ করে বসে শুনছিলো]

মেয়েটা : (হঠাৎ) আচ্ছা, এসব গল্প করছো কেন? মালতীর গল্প করবে না?

সাতু : তাহলে তো আপনাকে নিয়ে মুশকিল শশীবাবু! ঘর পেতেও হোলো না, ঘর ভাড়া করেও হোলো না, আপনাকে এখন আমি কোথায় পাঠাই?

শশী : (হেসে) চুলোয়! ওই যে জ্বলছে?

সাতু : সে তো আছেই, আমাদের সকলেরই। কিন্তু তদ্দিন?

শশী : তদ্দিন অন্যদের চুলোয় তুলে ভুলে কাটিয়ে দেবো একরকম করে।

মেয়েটা : বলবে না? মালতীর গল্প বলবে না?

সাতু : তা এরকম হাল হোলো কী করে আপনার? না-ঘরকা না-ঘাটকা?

মেয়েটা : বলো না, বলো না!

সাতু : প্রেম-টেম করেছিলেন নাকি কম বয়সে?

শশী : (হো হো করে হেসে) প্রেম! বাঙালির ছেলের আবার প্রেম! অত মুরোদ কোথায়?

কার্তিক : কেন, বাঙালির ছেলের প্রেম করবার মুরোদ নেই?

শশী : কার আছে না আছে, জানি না দাদা। আমার ছিল না।

[মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়েছে, খানিকটা উত্তেজিতভাবে।]

মেয়েটা : আর বাঙালি মেয়ের? বাঙালি মেয়ের?

সাতু : তা আপনি প্রেম করুন না করুন, আপনার প্রেমে কোনো মেয়ে পড়েনি?

[মেয়েটি উন্মুখ]

শশী : (হেসে উঠে) আমার প্রেমে? দুনিয়ায় এতো লোক থাকতে?

মেয়েটা : মিথ্যেবাদী! মিথ্যেবাদী! মিথ্যেবাদী!

[বলতে বলতে ছুটে চলে গেলো]

শশী : তা ছাড়া আমার প্রেমে কেউ পড়লে আমার এই—যাকে বললেন 'না ঘরকা না ঘাটকা'—এ অবস্থা হবে কেন?

সাতু : তাও তো বটে। আপনি তো মশায় ভাবিয়ে তুললেন?

কার্তিক : ও আর ভেবে কী হবে সাতুবাবু। দিন, গেলাসটা ভরে দিন।

সাতু : ও হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আসুন। (ঢাললো) আপনি?

[শশী কী যেন ভাবছে, সাড়া দিল না]

শশীবাবু?

শশী : (চমকে) অ্যাঁ?

সাতু : গেলাসটা দিন।

শশী : ও! (প্রায় উদ্‌গ্রীবভাবে) হ্যাঁ হ্যাঁ, দিন।

[গ্লাসে যেটুকু ছিল এক চুমুকে শেষ করে বাড়িয়ে দিলো! সাতু ঢেলে দিলো।]

সাতু : (হেসে) তারা তারা মা।

কার্তিক ও শশী : (হেসে) তারা তারা মা।

[সকলে একসঙ্গে পান করলো]

সাতু : আমাদের কী কথা হচ্ছিলো যেন?

কার্তিক : শশীবাবুর বউয়ের কথা।

সাতু : না না, তার আগে, তার আগে। আমি বেরুবার ঠিক আগেই—

হিমাদ্রি : ও, এই মেয়েটার গল্প বলছিলেন শশীদা।

সাতু : হ্যাঁ হ্যাঁ। (ভেবে) গল্পটা কি শেষ হয়েছিলো?

শশী : হ্যাঁ হ্যাঁ। ও গল্প কখন হয়ে চুকে গেছে!

সাতু : হয়ে গেছে? শেষটা কিছুতেই মনে করতে পারছি না তো?

কার্তিক : শেষটা মরে গেলো আর কী? সেই সুবাদে আমরা এখানে বসে বিলিতি মারছি।

হিমাদ্রি : (হেসে) আপনাদের তিনজনেরই নেশাটা যেন একসঙ্গে জমে উঠলো মনে হচ্ছে?

সাতু : (হিমাদ্রির কথায় কান না দিয়ে) না না, মরে গেলো, সে তো জানা কথা। তার আগে! কী যেন একটা রহস্য ছিল।

শশী : রহস্য?

কার্তিক : না না, রহস্য ফহস্য কিছু ছিল না। সিধে ব্যাপার।

[মেয়েটা ফুটে উঠলো আলোয়]

সাতু : আরে হ্যাঁ মশাই, ছিল! আমার বেশ মনে আছে। আরে, তাই নিয়েই তো প্রথম কথাটা উঠলো!

কার্তিক : কী কথা উঠলো?

সাতু : কী কথা মনে থাকলে আর আপনাদের জিজ্ঞেস করবো কেন?

মেয়েটা : ও গল্পটা থাক না? কী হবে মনে করে?

হিমাদ্রি : ও, ওই প্রেমের আগুনের কথা?

সাতু : হ্যাঁ হ্যাঁ—অ্যাঁ? প্রেমের আগুন? না না, তারও আগে, আপনি তখন বাইরে গিছলেন—এই বোতল নিয়ে কী যেন কথাটা উঠলো—

কার্তিক : ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে! আপনি জিজ্ঞেস কবছিলেন--এ ছুঁড়ি মরলো, তো মল্লিকবাবু বোতল দিতে গেলো কেন?

সাতু : অ্যাই। এই কথাটাই এতোক্ষণ—তবে? বলেছিলাম না, রহস্য একটা ছিল?

হিমাদ্রি : এই আপনার রহস্য?

মেয়েটা : মালতী! মালতী! তুমি আসবে না? এরা কি আমার গল্পই করবে?

সাতু : হ্যাঁ, বলুন শশীবাবু!

[শশী অন্যমনস্ক ছিল]

শশী : অ্যাঁ?

সাতু : রহস্যটা প্রকাশ করুন?

শশী : কী রহস্য?

মেয়েটা : মালতী! তুমি আসবে না?

সাতু : সে কী মশাই, আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি?

মেয়েটা : মালতী!

শশী : ঘুমিয়ে—? নাঃ! না, ঘুমোবো কেন?

হিমাদ্রি : (হেসে) নেশা হয়েছে সাতুবাবু, শশীদা বুঁদ!

শশী : না, মোটেই না—আমি—

মেয়েটা : মালতী!

সাতু : না না, নেশা হতে যাবে কেন? বলুন শশীবাবু।

শশী : কী বলবো?

সাতু : এই মেয়েটার কথা—

শশী : কার কথা?

মেয়েটা : মালতী!

সাতু : এই যে মেয়েটা—যাকে পোড়াতে এসেছেন—

শশী : (চমকে) মালতী?

[মেয়েটা এতোক্ষণে নিশ্চিন্ত হোলো]

হিমাদ্রি : (অবাক হয়ে) মালতী?

মেয়েটা : হ্যাঁ হ্যাঁ মালতী।

সাতু : ও, এই মেয়েটার নাম মালতী ছিল বুঝি?

[কার্তিক শশীর কথা খেয়াল করেনি]

কার্তিক : এই মেয়েটার? মালতী? না তো?

সাতু : তবে যে শশীবাবু—

[শশী হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো]

শশী : আমি একটু—আমি একবার—আসছি আমি—

[দরজার দিকে গেলো]

সাতু : সে কী? (তারপর খেয়াল করে) ও, বাইরে যাচ্ছেন? আচ্ছা ঘুরে আসুন।

[শশী ততোক্ষণে বেরিয়ে গেছে]

কার্তিক : (উঠে) আমারও একবাব খোলসা হওয়া দরকার।

[দরজা দিকে গেলো]

সাতু : তবে চলুন, আমিও যাই। বাঙালির ইউনিটি দেখিয়ে আসি। (উঠে) হিমাদ্রিবাবু?

হিমাদ্রি : (হেসে) না, আমার দরকার নেই।

[কার্তিকের পেছন পেছন সাতু বেরিয়ে গেলো। হিমাদ্রি টুলে বসে ছিল, তক্তাপোশের ধারে মাথা রেখে পা লম্বা করে আধশোয়া হয়ে একটা আড়মোড়া ভাঙলো।]

মেয়েটা : (একটু কাছে এসে, ফিসফিস করে) এই, শোনো।

[হিমাদ্রি নড়লো না। মেয়েটা আর এক পা এগুলো]

এই শোনো। শোনো না? শোনো! শুনছো?

[হিমাদ্রি হঠাৎ তড়াক করে খাড়া হয়ে বসলো, যেন একটা আওয়াজ শুনেছে। এদিক ওদিক তাকালো। মেয়েটাকে অবশ্য দেখতে পেলো না। তাবপর উঠে দাঁড়িয়ে কাপড়ের ট্যাকে গোঁজা হাতঘড়িটা বার করে দেখলো। দেখে রেখে দিলো। তক্তাপোশের পাশ দিয়ে অলসভাবে দরজার দিকে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো! বোতলটা তুলে দেখলো একবার।]

মেয়েটা : খাবে? খাও না? খাও না একটু? কিছু হবে না।

[হিমাদ্রি একটু থেমে মাথা নেড়ে রেখে দিলো বোতলটা। জানলায় গিয়ে দাঁড়ালো।]

আচ্ছা, না খেলে। কিন্তু তোমার গল্পটা বলো না? বলো না এদের—তোমার গল্পটা।

[একটু অস্থিরভাবে হিমাদ্রি ফিরে এলো]

মনে পড়ছে তো! পড়ছে না?

[হিমাদ্রি বোতলটার দিকে তাকালো। একটু যেন হাত বাড়ালো।]

হ্যাঁ হ্যাঁ. খাও না? এইবেলা খেয়ে নাও, ওরা জানতে পারবে না।

[হিমাদ্রি হাত টেনে ঘুরে দাঁড়ালো]

খাবে না? আচ্ছা, তাহলে ওইদিকটায় দেখো। ওই যে—লাল আগুন ঝলসে ঝলসে উঠছে?

[হিমাদ্রি জানলায় গেলো]

দেখেছো? ঝলসে ঝলসে উঠছে? মনে পড়ছে না? মনে পড়ছে? তখন যে গিয়ে অতোক্ষণ আগুনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলে, মনে পড়েনি? বলো?

মনে পড়ছে না?

[হঠাৎ হিমাদ্রির বিকৃত চাপা কণ্ঠস্বর শোনা গেলো]

হিমাদ্রি : সে কি আমার দোষ?

মেয়েটা : কার দোষ তবে? কার দোষ?

[হিমাদ্রি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো। তার দু'হাত মুঠো]

হিমাদ্রি : (প্রায় হিংস্রকণ্ঠে) চুলোয় যাক!

মেয়েটা : (হাসিমুখে) চুলোতেই তো গেছে। যায়নি? এমনি জ্বলজ্বল করেই তো জ্বলেছে তুমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছো। দেখোনি?

হিমাদ্রি : (যন্ত্রণায়) মিলি!

মেয়েটা : (উৎসাহে) হ্যাঁ হ্যাঁ, মিলি! মিলি!

হিমাদ্রি : মিলি! আমি--আমি—

মেয়েটা : হ্যাঁ হ্যাঁ বলো না, বলো না, ভারি সুন্দর গল্পটা--

হিমাদ্রি : আমি—আমি কী করতে পারতাম?

[মেয়েটা এলোচুল খোঁপা করে জড়ালো। শাড়ির আঁচলটা ঘুরিয়ে পরলো আধুনিক শহুরে মেয়ের কায়দায়। যেন তৈরি হয়ে দাঁড়াচ্ছে হিমাদ্রির অপেক্ষায়]

হিমাদ্রি : (নিজের মনে) এ হয় না! এ হবে না। এতো তফাত! আকাশপাতাল তফাত।

[মেয়েটা মিলি হয়ে এগিয়ে এলো]

মিলি : হিমাদ্রি।

[হিমাদ্রির দেহ কঠিন হয়ে উঠলো]

হিমাদ্রি!

হিমাদ্রি : বলুন।

মিলি : (আহত) 'বলুন'?

হিমাদ্রি : হ্যাঁ বলুন। কী করতে হবে?

মিলি : আমি এমন কী করেছি হিমাদ্রি যে তুমি এরকম করছো?

হিমাদ্রি : আপনি? আপনি যাই করুন, আমার তাতে কী বলবার আছে?

মিলি : হিমাদ্রি, আমি জানি, আমি জানি তুমি—কিন্তু সবসময়ে পেরে উঠি না যে? যে সমাজে ছোটবেলা থেকে মানুষ হয়েছি, যাদের ছোটবেলা থেকে দেখছি, মিশছি—

হিমাদ্রি : আমাকে এসব কথা বলছেন কেন মিস রায়? আমি আপনার ভাইকে পড়াই, সে সম্বন্ধে যদি কিছু বলার থাকে—অথবা সে কাজে আমার যদি কোনো ত্রুটি হয়ে থাকে—তো বলুন।

[মিলি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো]

মিলি : তুমি আমার সামান্যতম দোষও সহ্য করতে পারো না, না?

[হিমাদ্রি চুপ]

আমার বাবা বড়োলোক—এইটাই আমার সবচেয়ে বড়ো অপরাধ, না?

[হিমাদ্রি চুপ]

(হঠাৎ যন্ত্রণায়) তুমি কি চাও আমি হাঁটু গেড়ে বসে তোমার কাছে ক্ষমা চাই?

হিমাদ্রি : মিস রায়—

মিলি : বলো! বলো! তাই চাও তুমি? যদি চাও তো আমি তা-ই করবো! তুমি জানো আমি তা-ই করবো। আমার না করে উপায় নেই। সেইজন্যেই কি বারবার আমার মুখটাকে মাটির উপরে ঘষে দাও তুমি?

হিমাদ্রি : মিস রায়, আপনি উত্তেজিত হয়েছেন, এখন কথাবার্তা না বলাই ভালো। আমি যাই।

[হিমাদ্রি ফিরে গেলো জানলায়]

মিলি : হিমাদ্রি! হিমাদ্রি! (যন্ত্রণায় বিকৃত স্বরে) আই হেট ইউ! আই হেট ইউ—হেট ইউ—হেট ইউ!

[ছুটে চলে গেলো। হিমাদ্রি জানলায় দাঁড়িয়ে, বাইরের দিকে চেয়ে। সাতকড়ি আর কার্তিকের হাসির আওয়াজ শোনা গেলো। হিমাদ্রি চমকে সরে এলো জানলা ছেড়ে। সাতু আর কার্তিক ঢুকলো ঘরে।]

সাতু : হা হা হা হা হাঃ হা—যা বলেছেন! খাঁটি কথা!

কার্তিক : কিন্তু শশীবাবু একটু যেন—

সাতু : ও কিছু না। অনেকদিন পরে খাচ্ছেন তো? একটু বাইরে বসলেই ঠিক হয়ে যাবে।

কার্তিক : (দরজায় গিয়ে দেখে) না, কাছাকাছিই বসেছেন—দেখা যাচ্ছে।

হিমাদ্রি : কী, শশীদার শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?

সাতু : না না, একটু মাথাটা ধরেছে, তাই বললেন খানিকক্ষণ বাইরে বসবেন। ভাববার কিছু নেই।

[কার্তিক আর সাতু বসে গ্লাসে চুমুক দিলো। হিমাদ্রি দরজায় গিয়ে বোধহয় শশীকে দেখলো।]

কার্তিক : তারা তারা মা, পার করো!

সাতু : (হেসে উঠে) এখনি পার হতে চান না কি?

কার্তিক : না না, এখুনি নয়। বেশ আছি এই দুনিয়ায়। (একটু ভেবে) তবে কী জানেন, পার হলেও খুব লোকসান নেই। আমি কাউকে খাওয়াই পরাই না, কাজেই আমি পার হলে কেউ কাঁদবেও না।

সাতু : না খাওয়ালে পরালে কাঁদে না বুঝি কেউ?

কার্তিক : (আবার ভেবে) কই, আমার তো তেমন কেউ দেখছি না। আপনার কেউ আছে নাকি।

সাতু : আমার? নাঃ। কাঁদা তো দূরের কথা, অল্পসল্প আসতো যেতো—এমনও কেউ বাকি নেই।

কার্তিক : সব চুলোয় দিয়েছেন?

সাতু : সব বলতে তো—অনেক বোঝায়। অন্তত একাধিক। তাই না?

কার্তিক : আপনার কি—একমেবাদ্বিতীয়ম্?

[সাতু অট্টহাস্য করলো]

সাতু : একমেবাদ্বিতীয়ম্! বাপরে! অতো ভারী ব্যাপার কিছু ছিল না মশাই। কোত্থেকে থাকবে বলুন? পনেরো বছর বয়স থেকে যা লাইফ লিড করেছি তাতে—

কার্তিক : সে কী মশাই? আমার তো ধারণা ছিল দেশ-বিদেশ ঘুরলে নানারকম অভিজ্ঞতা হয়—

সাতু : ও, অভিজ্ঞতার কথা বলছেন?

কার্তিক : না, হ্যাঁ—অভিজ্ঞতা মানে, নানারকম সম্পর্কও তো অভিজ্ঞতা—বিশেষ মেয়েদের সঙ্গে—

সাতু : আমার সম্পর্ক কীরকম মেয়েদের সঙ্গে, তা তো শুনলেনই। আমি মরে গেলে তাদের কারো কিছু আসবে যাবে, এটা ভাবা শক্ত।

কার্তিক : কেন, শরৎবাবু যাদের কথা লিখেছেন, তাদের কারো দেখা পেলেন না?

[সাতু অট্টহাস্য করলো। হিমাদ্রি খানিকটা চমকে ঘুরে দাঁড়ালো। মেয়েটা ফুটে উঠলো আলোয়।]

সাতু : না, কই আর পেলাম?

মেয়েটা : আচ্ছা, কেন তোমরা বলতে চাও না বলো তো? কেন তোমরা চেপে যাও? লুকিয়ে রাখো? বলতে ইচ্ছে করে না? চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে না?

[হিমাদ্রি হঠাৎ দরজা ছেড়ে এগিয়ে এলো]

হিমাদ্রি : সাতুবাবু আমি মত বদলেছি। আমাকে একটু দেবেন?

সাতু : (মহোৎসাহে) এই তো! এই তো, কথার মতো কথা! নইলে এক যাত্রায় পৃথক ফল—ও কি জমে?

[মহা সমারোহে চতুর্থ গ্লাসে ঢালতে শুরু করলো]

কার্তিক : তার উপর শ্মশানযাত্রা!

সাতু : হ্যাঁ, ঠিক কথা।

হিমাদ্রি : ব্যস্ ব্যস্, আর না।—ইস, অতোটা দিলেন কেন?

সাতু : কিচ্ছু না মশাই—হোমিওপ্যাথির ডোজ। তবে একেবারে নীটটা আর খাবেন না প্রথম দিনেই, একটু জল দিয়ে দি, দাঁড়ান।

হিমাদ্রি : না, আপনারা যেমন খাচ্ছেন, তাই খাবো।

কার্তিক : ব্রেভো ব্রাদার। তবে একটু অল্প অল্প করে চুমুক দিয়ো।

[হিমাদ্রি এক চুমুক খেয়ে মুখ বিকৃত করলো। মেয়েটা উৎসুক চোখে দেখছিলো।]

মেয়েটা : খেয়েছো? এবার বলবে?

হিমাদ্রি : অ্যাঃ। এ তো ভয়ানক বিস্বাদ মশাই? কী সুখে খান?

কার্তিক : এর স্বাদ জিভে নয় ভায়া—মগজে।

মেয়েটা : হ্যাঁ, মগজে। তাই তো লোকে বলে? ওই আগুনের মতো। জ্বলে আর জুড়োয়। জুড়োয় আর জ্বলে। তাই না? তাই না?

কার্তিক : (বোতলটা তুলে) এ বোতলটা শেষ হয়ে এলো।

সাতু : তবে? বুদ্ধি করে আর একটা বোতল না আনলে কী হোতো বলুন দেখি?

কার্তিক : বুদ্ধি তো ওদিকে আমারও টনটনে ছিল সাতুবাবু। কিন্তু শুধু বুদ্ধি দেখিয়ে তো সা-মশায়ের দোকান থেকে মাল বের করা যায় না?

[সাতু অট্টহাস্য করলো]

মেয়েটা : আর একটু খাও না? আর একটু খাও।

[হিমাদ্রি আর এক চুমুক খেলো]

ভোলবার জন্যে খাচ্ছো? না। ভোলা যাবে না। আরো মনে পড়বে। আরো। তখন গল্প বলবে, কেমন? বলবে তো?

[শশী ফিরে এলো দরজায়]

সাতু : আসুন আসুন! মাথা সাফ হয়েছে?

শশী : মাথা? কেন, মাথার কী হয়েছে?—আমার গেলাস কোনটা?

সাতু : এই যে, দাঁড়ান ভরে দি।

[ভরে দিলো। শশী এক চুমুক খেয়ে গ্লাসটা নিয়ে জানলায় দাঁড়ালো।]

শশী : উঃ, কী অন্ধকার রাত রে বাবা! এমন আর দেখিনি।

মেয়েটা : দেখোনি? সেদিন কি তবে পূর্ণিমা ছিল?

সাতু : শশীবাবু, আপনার গল্পটা আর শেষই করলেন না।

শশী : (ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়িয়ে) গল্প?

মেয়েটা : (ফিসফিস করে) হ্যাঁ। গল্প। মালতীর গল্প। মালতী।

সাতু : এই মেয়েটার গল্প।

মেয়েটা : (শশীর দিকে চোখ রেখে) না। আমার গল্প না। মালতীর গল্প। মালতী।

[শশী হঠাৎ এগিয়ে এসে গ্লাসটা রাখলো তক্তাপোশে।]

শশী : (উত্তেজিত স্বরে) আচ্ছা সাতুবাবু, একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন?

সাতু : (অবাক হয়ে) কেন দেবো না?

শশী : (দ্রুতকণ্ঠে) ধরুন, আমি আপনার বন্ধু, খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু—

সাতু : সে তো বটেই!

শশী : না না, আরো ঘনিষ্ঠ, ধরুন একেবারে ছেলেবেলা থেকে—কিম্বা হয়তো আমি আপনার ভাই, ছোট ভাই, আর আমি—আমি আপনার সঙ্গে একটা মেয়ের আলাপ করিয়ে দিলাম—বললাম—একে আমি বিয়ে করবো—মেয়েটাও ধরুন আমাকে বিয়ে করতে চায়। আপনি—আপনি কি তাকে—(থেমে গেলো)

মেয়েটা : না না! আরো বলো! এতে কী করে হবে?

শশী : (কপালে একবার হাত চালিয়ে) না। না। ঠিক করে বলা হোলো না। ধরুন, আপনি জানেন—আমি দুশ্চরিত্র। না, তাও না, আরো বড়ো কথা—আমি নিষ্ঠুর- চরিত্র—স্বার্থপর—আমি—আমি—আমার সঙ্গে বিয়ে হলে মেয়েটা সুখী হবে না—আপনি জানেন—আপনি খুব ভালো করে জানেন সে কথা—তাহলে কি—? (আবার থেমে গেলো)

মেয়েটা : আরো বলো। সব বলো।

শশী : আর—তারপর যদি দেখেন আপনি মেয়েটাকে ভালোবাসছেন—মেয়েটাও—মেয়েটাও আপনাকে ভালোবাসছে—মেয়েটা বুঝতে পারছে প্র—আমাকে বিয়ে করলে তার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে—তাহলে—তাহলেও কি আপনি—মেয়েটাকে—আমার হাতে তুলে দেবেন?

[সকলে চুপ করে শুনছিলো। চুপ করেই রইলো।]

বলুন! তুলে দেবেন? জেনেশুনে? তুলে দেওয়া উচিত মনে করবেন? কর্তব্য মনে করবেন? আমি বন্ধু বলে? ভাই বলে?

সাতু : (ধীরে ধীরে) বড়ো শক্ত প্রশ্ন শশীবাবু। এর জবাব আমি দিতে পারবো না।

শশী : কার্তিকবাবু?

[কার্তিক ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো]

হিমাদ্রি?

হিমাদ্রি : (একটু থেমে) আজ সকালে যদি প্রশ্নটা করতেন—কিম্বা বিকেলেও—এক কথায় বলে দিতাম—হ্যাঁ উচিত! কারণ সে বন্ধুর বাগ্‌দত্তা।

মেয়েটা : (রুদ্ধশ্বাসে) এখন?

শশী : এখন?

হিমাদ্রি : (ধীরে ধীরে) এখন—জানি না শশীদা। (একটু থেমে, হাতের গ্লাসটা তুলে) জানলে বোধহয় এটা খাবার দরকার হোতো না।

মেয়েটা : (মুখ তুলে, প্রায় কুকুরটার মতো আর্তস্বরে) মালতী-ঈ-ঈ। এরা জানে না! এরা কেউ জানে না! জানলেও বলে না।

[ঘরের আলো মেয়েটাব কথার মধ্যে কমে প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে। শশী এদিকে এগিয়ে এসেছে।]

শশী : মালতী!

[মেয়েটা মালতী হয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। দু'টো উজ্জ্বল আলো দু'জনকে আলোকিত করেছে। বাকি সব অন্ধকারে।]

মালতী।

মালতী : হ্যাঁ চলেই যাবো। আমি জানতাম তুমি চলে যেতেই বলবে। তোমার জিতের আত্মপ্রসাদ তুমি ছাড়তে পারবে না।

[শশীর উদ্যত কথা থামিয়ে দিয়ে এক পা এগিয়ে এলো। আগের মতো।]

যাবার আগে শুধু তোমাকে জানিয়ে যাবো—কেন এসেছিলাম।

[মালতী জামার সবচেয়ে নিচের বোতামটা খুলতে লাগলো]

শশী : (স্তম্ভিতভাবে) এ কী করছো মালতী?

[মালতীর হাতের আঙুল থেমে গেলো। তার চোখে প্রথমে অল্প বিস্ময়, পরে উপলব্ধি। তাবপর মুখে একটা মর্মান্তিক জ্বালাধরা হাসি ফুটে উঠলো। শশী সম্মোহিতের মতো সেই হাসির দিকে চেয়ে রইলো।

মালতী নিচের বোতামটা খোলা শেষ করে ধীরে ধীরে ঘুরে শশীর দিকে পিঠ করে দাঁড়ালো। তারপর আস্তে আস্তে জামাটা তুলে পিঠের খানিকটা অনাবৃত করে

দেখালো। একটা অস্ফুট চিৎকার করে শশী এক পা পিছিয়ে গেলো।]

এ কী!!

মালতী : তোমার বন্ধু। তোমার ভাই।

শশী (রুদ্ধস্বরে) ক্‌কেন?

মালতী . বলেছিলাম—আমি তাকে ঘেন্না করি, আর তোমাকে ভালবাসি।

[শশী নির্বাক। মালতী জামা নামিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালো। বোতামটা আবার লাগাতে শুরু করলো।]

কী দিয়ে করেছে জানো?

[শশীর মুখে কথা ফুটলো না]

তুমি আমাদের বিয়েতে যে রুপোর বড়ো ছুরিটা উপহার দিয়েছিলে? সেইটা গরম করে।

[শশী নির্বাক]

রুপো খুব তাড়াতাড়ি গরম হয় তো? ওর হাতে সময় বেশি ছিল না।

[শশী চেয়েই রইলো। মালতী শশীর চোখে চোখ রেখে জামাটা কোমরে গুঁজতে লাগলো। তার মুখে সেই জ্বালাধরা হাসি। আলো নিভে গেলো আস্তে আস্তে। সব অন্ধকার।

আবার আলো ফুটলো তক্তাপোশের কাছে। শশী যেখানে দাঁড়িয়ে এদের প্রশ্ন করেছিলো, সেখানে সেইভাবে দাঁড়িয়ে। মালতী নেই।]

শশী জানো না?

হিমাদ্রি : না শশীদা। এখন জানি না।

শশী · আপনারা কেউ জানেন না?

[সাতু আর কার্তিক মাথা নাড়লো]

আমি জানি। আপনি কর্তব্য মনে করে মেয়েটাকে আমার হাতে তুলে দিলে এক বছরের মধ্যে মেয়েটা কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দেবে। আপনি আর আমি সেই পোড়াদেহটাকে কাঁধে করে নিয়ে এসে ওই--ওইরকম—আবার আগুনে পোড়াবো।

[সবাই চুপ]

আপনি বলবেন—আমার অত্যাচারে মরেছে? নিশ্চয়ই! তাই তো মরেছে। আপনার কী দোষ? দুনিয়া তাই বলবে! আপনার কী দোষ? আপনিও দুনিয়ার সঙ্গে গলা মিলিয়ে যতোদিন পারেন--যতোদিন পারেন—নিজেকে—

[হঠাৎ গ্লাসটা তুলে এক চুমুকে খালি করে দিলো! তারপর সম্পূর্ণ শান্ত নিরুত্তাপ কণ্ঠে কথা বললো।]

তাস দিন সাতুবাবু। দেখি এবার জিতি না হারি।

বিরতি

দ্বিতীয় অঙ্ক

[প্রথমে দেখা গেলো মেয়েটাকে। বসে আছে সে নিজের জায়গায়, দর্শকদের দিকে তাকিয়ে।]

মেয়েটা : কেমন লাগলো, গল্পটা? মালতীর গল্প? ভারি সুন্দর, না? ভারি মিষ্টি গল্প। আমার খুব ভালো লাগে। ওদেরও গল্প আছে। এক একজনের এক একটা গল্প। এখন শুনলে হয়তো ততোটা ভালো লাগবে না। খানিকটা একই ধরনের তো? আমার কিন্তু প্রত্যেকটাই সুন্দর লাগে। সমান সুন্দর। বারবার শুনতে ইচ্ছে করে। ভালোবাসার গল্প তো?

হ্যাঁ, ভালোবাসার গল্প। প্রত্যেকটা। ভা-লো-বা-সা। সুন্দর কথাটা, না? ভা-লো-বা-সা। ওই আগুনের মতো। জ্বলে আর জুড়োয়। তা যদি না হোতো—

আচ্ছা, এই যে কষ্ট যন্ত্রণা আগুনে পোড়া—এ সমস্ত আজে বাজে কথা, না? এসব কোনো কাজের কথা নয়। আসল কথা নয়। মরলে তো জ্বলতেই হবে, ওই যেমন আমি জ্বলছি এখন। কিন্তু যদি ওই জ্বলাটাই থাকে, আর কিছু না, আর কিচ্ছু না—উঃ!

[দু'হাতে মুখ ঢেকে বসলো। ওদিকে আলো ফুটতে লাগলো, গলা শোনা গেলো।]

কার্তিক : ষোলো।

শশী : আছি।

কার্তিক : সতেরো।

শশী: আছি।

কার্তিক : আঠেরো।

শশী : আছি।

কার্তিক : উনিশ।

শশী : আছি।

হিমাদ্রি : কী করছেন কী, শশীদা? চারটে কালো বেরিয়ে আছে—

শশী : তুমি থামো তো! আছি।

কার্তিক : পাস।

সাতু : ডবল।

হিমাদ্রি : হোলো তো? চারটে কালো—এইবার কালো ছক্কা।

শশী : (নির্বিকার হেসে) দাও রঙ করি।

[রঙ করা হোলো। তাস বিলি হোলো। খেলা শুরু হোলো। ওদের দ্বিতীয় বোতল চলছে। মেয়েটা মুখ তুললো আস্তে আস্তে।]

মেয়েটা : সন্ধেবেলা আকাশটা কীরকম আস্তে আস্তে রঙ বদলায়, না? আমার ঘরের জানলাটা পশ্চিমদিকে। রোজ সন্ধেয় জানলায় দাঁড়িয়ে আকাশের রঙ-বদল দেখতাম। সেই ছোটবেলা থেকে দেখছি। কতো ছোটবেলা মনে নেই। পনেরো

বছর বয়স পর্যন্ত রোজ—হ্যাঁ, সত্যি—রোজ সন্ধেবেলা, ওই একই জানলায় দাঁড়িয়ে—পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত। তারপর তিন বছর দেখিনি। ওখানে পশ্চিমদিকে জানলা ছিল না—জানলাই ছিল না, তার পশ্চিমদিক। বাইরের দিকের যতো জানলা—সব ঘষা কাঁচের শার্সি। খোলা যায় না। আলো আসে, কিছু দেখা যায় না। উঃ, সন্ধেটা আকাশের রঙ দেখবার জন্যে কী ছটফটই না করতাম! মনে হোতো—একদিনও যদি, একটা সন্ধেও যদি—পশ্চিমদিকে একটা খোলা জানলা পাই—একটা সন্ধে যদি আকাশের ওই রঙ—

সাতু : কই রঙ দেখি! ডিক্লেয়ার!

কার্তিক : ইস্কাবন?

শশী : কেন, আপত্তি আছে?

কার্তিক : না, না, কিছুমাত্র না। খেলো হিমাদ্রি।

মেয়েটা : তারপর আবার পেলাম। তিনবছর পরে—আবার। পশ্চিমদিকের সে—ই পুরোনো জানলাটা। কবজা ভেঙে পাল্লা ঝুলে পড়েছে? পড়ুক! ছাত দিয়ে বর্ষায় জল পড়ে? পড়ুক। পক্ষাঘাতে বাবা শুয়ে আছে? থাক। তবু তো সন্ধেবেলা আকাশের রঙ বদল দেখা যায়।

কে যেন বলেছিলো, এই সন্ধের আলোটাকে না কি বলে—কনে-দেখা আলো। আচ্ছা, কনে-দেখা কেন বলে? কে কনে দেখে? কীসের জন্যে দেখে? আর ওই আলোটাই কেন বেছে বেছে কনে দেখবার আলো হোলো?

জানি না। কাকেই বা জিজ্ঞেস করবো? আমি শুধু—(হাসতে শুরু করলো, লাজুক হাসি) আমি শুধু—ওই আলোয় বসে—নিজেকেই কনে ভাবতাম—হ্যাঁ সত্যি! এমন বোকার মতো—কিন্তু—ভাবতে ভালো লাগতো—সত্যি! (হঠাৎ চমকে) এ মা! দেখেছো? এসব কী আজে বাজে বকে চলেছি? এগুলো কি গল্প নাকি, ছিঃ!

এই, তোমাদের খেলা কি শেস হবে না? আমি যে পুড়ে শেষ হয়ে এলাম!

কার্তিক : (হঠাৎ চেঁচিয়ে) এই যে স্যার, আসুন—রঙের টেক্কা!

সাতু : আহা হা হা! এই তো চাই কার্তিকবাবু!

হিমাদ্রি : যাঃ! গেলো।

[মেয়েটা অন্ধকার হয়ে গেলো আস্তে আস্তে]

সাতু : তেইশ—পঁচিশ—

হিমাদ্রি : ও আর গুণে কী হবে? ও তো জানা কথা।

সাতু : ঊনত্রিশ—একত্রিশ বত্রিশ! কালো ছক্কা!

শশী : (হাসিমুখে) আবার হেরেছি তাহলে?

হিমাদ্রি : তা হারবেন না? সাতা আটা নিয়ে উনিশ বিশ হাঁকবেন খালি!

শশী : আরে এই তো খেলা! ভেবেচিন্তে হিসেব করে কি খেলা হয়?

সাতু : হিমাদ্রিবাবু আপনার গেলাস খালি করুন।

হিমাদ্রি : না, আমি আর খাবো না, আপনারা খান।

সাতু : সে কী? আপনি তো সেই প্রথমবারে যা নিয়েছেন, তাই—

হিমাদ্রি : ওতেই হবে। আমার কাজ হয়ে গেছে।

সাতু : কাজ?

হিমাদ্রি : (উঠে) আমি একবার দেখে আসি বরং।

[হিমাদ্রি বেরিয়ে গেলো]

সাতু : (চোখ টিপে) কার্তিকবাবু, দিন তো ওর গেলাসটা এদিকে—

[কার্তিক হেসে গ্লাসটা এগিয়ে দিলো। সাতু খানিকটা ঢেলে দিলো। গ্লাসটা আবার যথাস্থানে ফিরে এলো।]

শশী : গোড়ায় খানিকটা নেশা হয়েছিলো, এখন যেন সেটাও কেটে আসছে। কেন বলুন তো?

সাতু . হ্যাঁ, আমারও যেন তাই!

কার্তিক : বিলিতি না হলে বলতুম—জল মিশিয়েছে বেটারা।

সাতু : কী জানি, হয়তো খেলায় মন ছিল বলে। একটু রিল্যাক্স করে না খেলে নেশা জমতে চায় না।

কার্তিক · তাহলে বিল্যাক্স করে এক ঢোক খাই। (ঠ্যাং ছড়িয়ে এলিয়ে বসে) কী বলে যেন?—চিয়ার্স!

সাতু : (হেসে) তারা তারা মা!

শশী : আপনার কাল কাজ করতে কষ্ট হবে না? সারারাত জাগার পর রোদের মধ্যে—

সাতু : নাঃ! এসব গা-সওয়া আমার। রাতেই ঘুমোতে হবে, এমন কোনো কথা নেই আমার পাঁজিতে। যখনই ফাঁক পাই, ঘুমিয়ে নিতে পারি।

শশী : নেপোলিয়ন বলুন?

সাতু : (অট্টহাস্যে) হ্যাঁ, শুধু দিগ্‌বিজয়টা হোলো না, এই যা!

কার্তিক : আমার সকালবেলা ঠিক ঢুলুনি আসবে। ডাক্তার দেখে না ফেললে বাঁচি।

সাতু : তা কী হয়েছে? সারারাত জেগে মড়া পুড়িয়েছেন শুনলে--

কার্তিক . ওরে বাবা! স্বাধীন ব্যবসা আপনার সাতুবাবু—চাকরি কী চিজ বুঝবেন কী করে?

সাতু : তাও বটে। চাকরি কোনোদিন করা হয়নি। যদিও 'স্বাধীন' কথাটা একেবারে ভুল।

কার্তিক : ডাক্তারের ধারণা—ঢুলতে ঢুলতে আমি ভুলভাল ওষুধ দিয়ে রোগীকে বিষ খাইয়ে মারবো।

সাতু : আচ্ছা কার্তিকবাবু, আপনি তো বহু বছর এই কাজ করছেন, না?

কার্তিক : তা প্রায়—ছাব্বিশ বছর হতে চললো।

সাতু : আচ্ছা, কোনোদিন কি ওষুধের ভুল কিছু হয়নি?

কার্তিক : ভুল হবে না কেন? কতো হয়েছে। তবে এমন ভুল কোনোদিন হয়নি যাতে রোগী মারা পড়ে। সত্যিকারের বিষ নিয়ে আর কতোটুকু নাড়াচাড়া করতে হয়?

সাতু : কিছু তো হয়?

কার্তিক · হ্যাঁ, তা হয়। আপনার কাউকে মারবার দরকার থাকলে বলবেন।

সাতু : (অট্টহাস্যে) না মশাই, এখন অবধি সেরকম কোনো দরকার পড়েনি কোনোদিন।
শশী : আমার পড়তো এতোদিনে, যদি বউ নিজে থেকে রেহাই না দিতো।
সাতু : আচ্ছা, আপনার কাছে বিষ চেয়েছে কেউ কোনোদিন?
কার্তিক : (দৃঢ়কণ্ঠে) না।

[মেয়েটা ফুটে উঠলো আলোয়]

সাতু : চাইলে কী করতেন?
কার্তিক : দিতাম না।
মেয়েটা : কেন দিতে না?
কার্তিক : খুনখারাবির মধ্যে আমি নেই।
সাতু : না না, খুনের কথা বলছি না শুধু। কেউ নিজের জন্যেই চাইলো?
কার্তিক : (একটু থেমে) তাহলেও দিতাম না।
মেয়েটা : না। দিতে না। কিন্তু তার বদলে কী দিতে? দিতে পারতে কিছু? পারতে?
শশী : ধরুন, তার যদি খুব দরকার থাকে? বেঁচে থাকার থেকে মরে যাওয়া তার পক্ষে যদি অনেক ভালো হয়?
কার্তিক : বেঁচে থাকাব চেয়ে মরে যাওয়া ভালো হয় না কখনো।
মেয়েটা : হয় না?
শশী : এটা কী বললেন কার্তিকবাবু?
কার্তিক : ঠিকই বলেছি। যা বিশ্বাস করি তাই বলেছি।
শশী : সে যদি এমন যন্ত্রণায়—
কার্তিক : হ্যাঁ, যন্ত্রণা ঘোচে। আমি বলছি—ভালো হওয়ার কথা! বেঁচে থাকার চেয়ে ভালো কিছু নেই।
শশী : মানলাম না।
কার্তিক : (হেসে) আপনাকে মানতে কে বলেছে? আমি যা জানি, তাই বললাম। আপনারা চিয়ার্স বলেন, আমি তারা তারা মা বলি—এই ব্যবস্থাই তো ভালো।
শশী : (অল্প উত্তেজিত) কিন্তু তাই বলে একজনের জীবন যদি প্রচণ্ড যন্ত্রণায় বিষময় হয়ে ওঠে—
কার্তিক : লোকের যন্ত্রণার ভার হালকা করার দায়িত্ব আমার উপর নেই।
মেয়েটা : আর যন্ত্রণা দেওয়া? মালতীর মতো যন্ত্রণা? তার দায়িত্ব নিতে চাওনি কোনোদিন?
শশী : দায়িত্ব ঠিক-করনেওয়ালা কে?
কার্তিক : শেষ পর্যন্ত নিজেই। তা ঠিক হোক আর ভুল হোক।
সাতু : আপনারা যে জীবন-দর্শন শুরু করে দিলেন দেখছি?
শশী : (হেসে) শ্মশান-মহিমা!
কার্তিক : (হেসে) তার উপর শ্মশানকালীর মন্ত্রঃপূত কারণবারির মহিমা। জীবন-দর্শন আসবে—এ আর আশ্চর্য কী?
সাতু : তা আসুক। একটু জ্ঞানলাভ করি। জীবনটা দৌড়োদৌড়ি করেই কেটে গেলো,

থেমে জীবনটাকে একটু নজব করে দেখবো—তার ফুরসতই পেলাম না।

কার্তিক : মরণ তো দেখেছেন?

সাতু : অ্যাঁ? মরণ তো হরদমই দেখছি চারদিকে।

কার্তিক : সেরকম দেখা নয়। যাকে বলে—হাড়ে হাড়ে দেখা।

মেয়েটা : বলো! বলো!

সাতু : (ইতস্তত করে) হ্যাঁ, তা দেখেছি বোধ হয়। অন্তত একবার দেখেছি।

কার্তিক : তখন জীবনটাকে দেখতে পাননি?

সাতু : (ধীরে ধীরে) হয়তো। আপনার কথাই হয়তো ঠিক। মরণ দেখলেই বোধ হয় জীবন দেখা সম্ভব।

মেয়েটা : জীবন। মবণ। কিন্তু মরণেও যদি জীবন না ফোটে? যদি না ফোটে? যদি মরণটা শুধু মরণই হয়?

সাতু : দেখে--ভালো লাগেনি।

কার্তিক : ভালো লাগবার কথা তো হচ্ছে না? দেখবার কথা হচ্ছে।

শশী : কেন, আপনি যে বললেন—বেঁচে থাকার চেয়ে ভালো কিছু নেই?

কার্তিক : হ্যাঁ বলেছি। এখনো বলছি।

শশী : উলটোপালটা কথা হয়ে যাচ্ছে না?

কার্তিক : না, উলটোপালটা কেন হবে? ভালো 'লাগা' আর ভালো 'হওয়া' কি এক জিনিস?

সাতু : না কার্তিকবাবু, আপনার জীবন-দর্শন আমার পক্ষে বড়ো শক্ত হয়ে যাচ্ছে।

কার্তিক : (হেসে) তবু তো আপনি জীবনটাকে অন্তত একবারও দর্শন করেছেন?

মেয়েটা : জীবন! জীবনটা কী? কেউ আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারে? পাগলা ঘোড়া? মারবো চাবুক ছুটবে ঘোড়া। ওরে বিবি সরে দাঁড়া, আসছে আমার পাগলা ঘোড়া। বিবি যদি না সরে? যদি সরে না দাঁড়ায়? ঘাড়ের উপর দিয়ে চলে যাবে?

সাতু : দর্শন করে শুধু এই মনে হয়েছে যে জীবনটার কোনো মাথামুণ্ডু হয় না।

মেয়েটা : পাগলা ঘোড়া! পাগলা ঘোড়া খেপেছে!

সাতু : জীবনটা শুধু মৃত্যুই আনতে পারে।

মেয়েটা : বন্দুক ছুড়ে মেরেছে!

সাতু : আর কোনো কাজের নয়।

কার্তিক : ওরে বাবা, ওই কাজটা কি কম কাজ হোলো?

মেয়েটা : অল রাইট, ভেরি গুড?

শশী : (বিরক্ত হয়ে) কার্তিকবাবু, আপনি বেশি খেয়ে ফেলেছেন। আজে বাজে বকছেন।

কার্তিক : আহা, বেশি খেলে যদি এমনি আজেবাজে বকা যায়, তাহলে—(গ্লাস তুলে) তারা তারা মা!

[দীর্ঘ এক চুমুক দিলো]

মেয়েটা : (কান্নাভরা গলায়) পাগলা ঘোড়া! একটু আমার দিকে এসো না? একটু ডেকে বলো না—ওরে বিবি সরে দাঁড়া! আমি কি বিবি নই? আমি কি বিবি হতে পারি না? আমি কি—আমি কি—ওই আগুনে জ্বলতে জ্বলতে বলতে পারবো না—পাগলা ঘোড়া—অল রাইট—ভেরি গুড?

[অন্ধকারে মিশে গেলো মেয়েটা। শেষ কথাগুলো অন্ধকারেই কান্নায় ভেঙে পড়লো।]

সাতু : (অল্প পরে) কী, সবাই হঠাৎ চুপ করে গেলেন কেন?

কার্তিক : ভাবছি।

সাতু : কী ভাবছেন? জীবন-মরণের কথা।

কার্তিক : হ্যাঁ-ও বটে, না-ও বটে।

সাতু : তার মানে?

কার্তিক : আপাতত এই মেয়েটার কথা ভাবছিলাম।

সাতু : এই মেয়ে—ও, এই মেয়েটা?

কার্তিক : হ্যাঁ।

সাতু : মেয়েটার গল্প শেষ অবধি আর শোনাই হচ্ছে না আমার।

কার্তিক : কদ্দুর শুনেছেন?

সাতু : তা-ও তো মনে নেই ঠিক। বাপের পক্ষাঘাত—এইটুকুই তো শুনেছি বোধ হয়।

কার্তিক : হ্যাঁ। পক্ষাঘাত আজ বছর চারেক। মেয়েটা শ্বশুরবাড়ি যাবার কিছুদিন পরেই এই হাল।

সাতু : (অবাক হয়ে) শ্বশুরবাড়ি? মেয়েটার বিয়ে হয়েছিলো নাকি?

কার্তিক : তা মন্ত্রপাঠ ইত্যাদি যথাবিধি হয়েছিলো।

সাতু : বিধবা?

কার্তিক : না! (নিরুত্তাপ ব্যঙ্গে) বিধবা কেন হবে? বালাই ষাট। সধবা!

সাতু : কিন্তু—সিঁদুর-টিঁদুর কিছু দেখলাম না তো? সধবা তো সিঁদুর লেপে একাকার করে দেয় দেখি—

কার্তিক : ওই হোলো। কে আর দেবে? আর দিয়েই বা কী হবে?

সাতু : স্বামী কোথায় ওর?

কার্তিক : স্বামী? হ্যাঁ, তা মন্ত্র যখন পড়া হয়েছে, স্বামী বই কী? এখন কোথায় আমি জানি না সাতুবাবু। কোনো উন্মাদ-আশ্রমেও থাকতে পারে। বাড়িতেও তালাবন্ধ থাকতে পারে। বড়ো বাড়ি, বিস্তর ঘর, অসুবিধে নেই।

সাতু : আই সি।

কার্তিক : বিয়ে দিলে ভালো হয়ে যাবে—এই নাকি জ্যোতিষী গুণে-গেঁথে বলেছিলো। ভালো জ্যোতিষী—পরিবারের বাঁধা মাইনের লোক। তা একমাত্র বিয়ের দিনটা আয়ত্তের মধ্যে ছিল, তারপরে নাকি তাকে আর মেয়েটা চোখেও দেখেনি শোনা যায়। ফুলশয্যাতেও না।

শশী : (হঠাৎ) আচ্ছা, সে জ্যোতিষীটার চাকরি আছে?

কার্তিক : আছে বোধ হয়। শুনেছি সে বলেছে—কন্যা অলক্ষণা তা কী করা যাবে? এইবার বোধ হয় সুলক্ষণা কন্যা খুঁজবে।

শশী : আপনি এতো খবর পান কোত্থেকে?

কার্তিক : আমাদের ডাক্তারখানায় যতো রোগী আসে, তাদের মধ্যে বাচালতা যোগটাই প্রবল বেশি।

সাতু : তারপর কী হোলো?

কার্তিক : বছর তিনেক শ্বশুরবাড়ির জেলখানায় বন্ধ থেকে একদিন রাত্তিরবেলা পালিয়ে এলো। শ্বশুরবাড়ির দেওয়া গয়না দিয়ে দরোয়ানকে হাত করেছিলো। সে-ই সব ব্যবস্থা করে পৌঁছে দিয়ে এখন রিটায়ার করে জমিজমা দেখছে। গয়না খুব কম ছিল না। যেগুলো দেয়নি, সেগুলোও নাকি গাঁয়ের কাছে এসে রাত্তিরবেলা কেড়ে নিয়ে গেছে। বকশিস আর কী?

সাতু : বাঃ! বাঃ! কাজের ছেলে! তারপর?

কার্তিক : এসে দেখে—বাপ শয্যাশায়ী, ঘরদোর পড়ে যাচ্ছে, খাওয়া যে জুটছে অ্যাট অল—সেটা কিছুটা মল্লিকবাবুর দয়ায়।

সাতু : ও, এইবার মল্লিকবাবুর প্রবেশ। সেই রহস্য।

কার্তিক : হ্যাঁ, সেই রহস্য। মল্লিক বুড়োকে জিইয়ে রেখেছিলো—যদি মেয়েটা ফেরে কোনোদিন। খরচ তো বেশি নয়। পুষিয়ে যায়।

[মেয়েটা ফিরে এসেছে]

সাতু : এইবার বুঝে গেছি, আর বেশি বলতে হবে না। তবে—মরলো কীসে? অ্যাবরশান নাকি?

[কার্তিক হঠাৎ কর্কশ কণ্ঠে হেসে উঠলো]

কার্তিক : তাহলেও ছিল ভালো। বুঝতাম একটা মানে দাঁড়ালো।

মেয়েটা : চুপ করো! চুপ করো চুপ করো চুপ করো!

সাতু : তার মানে?

কার্তিক : মল্লিকের সে ক্ষমতা গেছে। টাকা দিয়েও রাখতে পারেনি। ওর মেয়ে দরকার শুধু চটকাবার জন্যে!

মেয়েটা : (দু'হাতে কান চাপা দিয়ে) চুপ করো—ও—ও!

[হিমাদ্রি ফিরে এলো]

হিমাদ্রি : আর ঘণ্টাখানেক লাগবে বড়োজোর।

[কেউ কিছু বললো না। হিমাদ্রি বসলো।]

কার্তিক : তারা তারা মা!

মেয়েটা : আর ঘণ্টাখানেক। আর মাত্র এক ঘণ্টা। পাগলা ঘোড়া—তুমি একবারও আমার দিকে ফিরে তাকাবার সময় পেলে না? আমি কি মালতী নই? মিলি নই? লছমি নই?

[সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা আর্তস্বরে কেঁদে উঠলো। সাতু চমকে একেবারে লাফিয়ে উঠলো। গ্লাসের মদ চলকে পড়লো।]

সাতু : কে?
হিমাদ্রি : কুকুরটা! আবার ফিরে এসেছে।
সাতু : অ্যাঁ? ও হ্যাঁ—কুকুরটা। আবার—ফিরে এসেছে।
[সাতুর হাত কাঁপছে। মেয়েটা সাতুর দিকে তাকিয়ে আছে।]
মেয়েটা : (ফিসফিস করে) লছমি!
কার্তিক : (হেসে) কুকুরের ডাক আপনার ভয়ানক অপছন্দ দেখি?
সাতু : (লজ্জিত হেসে) না, ওই চিৎকারটা আমার—একেবারেই—
মেয়েটা : (ফিসফিস করে) লছমি।
[কপালে একবার হাত চালিয়ে সাতু বসলো। গ্লাসে মদ ঢাললো।]
সাতু : (হঠাৎ) কুকুরের মতো এমন নেমকহারাম জীব দু'টো নেই।
কার্তিক : সে কী? লোকে তো উলটো কথা বলে?
সাতু : লোকে ছাই জানে। একটা কুকুর দেখেছি—প্রায় আমাদের—মানে আমার আস্তানায় আসতো—ভাত দিতাম দু'বেলা—
মেয়েটা : তুমি দিতে? তুমি ভাত দিতে?
সাতু : মানে, ভাত টাত যা থাকতো দেওয়া হোতো—দু'বেলা—এমনি খেঁকি কুত্তা মশাই, জাত ফাত নেই—তবু একটা মায়া পড়ে গিছলো—
মেয়েটা : তোমার? তোমার মায়া পড়ে গিছলো?
সাতু : তা এমন নেমকহারাম মশাই—বছর দুই পরে যখন দেখা হোলো—চিনতেই পারলো না একেবারে! উলটে কামড়াতে এলো—
শশী : বাবা! কুকুরের সঙ্গে বছর দুই পরে দেখা হওয়া, তার আবার চিনতে পারা—
সাতু : (লজ্জিত হেসে) না, লোকে বলে তো—কুকুর চিনে রাখে অনেকদিন—
মেয়েটা : ঠিক চিনে রেখেছিলো তোমায়। ঠিক চিনেছিলো। চেনেনি?
সাতু : (গা ঝাড়া দিয়ে, কৃত্রিম স্ফূর্তির সুরে) কী, আর এক বাজি হবে নাকি টোয়েন্টি-নাইন?
শশী : নাঃ, তাস আর ভালো লাগছে না।
সাতু : তবে গল্প হোক।
মেয়েটা : হ্যাঁ হ্যাঁ তাই হোক।
সাতু : বেশ রসালো দেখে প্রেমের গল্প দু'একটা ছাড়ুন দেখি?
কার্তিক : প্রেমের গল্প কে ছাড়বে এখানে?
সাতু : হিমাদ্রিবাবু? আপনারই তো বয়স এখন।
হিমাদ্রি : বয়সে কী আসে যায়? শশীদা বললেন না?—বাঙালির ছেলের প্রেম করবার মুরোদই নেই!
শশী : তা তুমি না হয় আমার কথাটা মিথ্যেই প্রমাণ করে দাও।
হিমাদ্রি : তাই কি পারি? গুরুজন না?
শশী : ওরে আমার গুরু-ভক্তি রে!
হিমাদ্রি : তা ছাড়া কথাটা মিথ্যে তো নয়?

সাতু : আরে বাবা, না হয় বানিয়েই একটা গল্প বলুন না?

কার্তিক : (হঠাৎ) ও, বানিয়ে বলা চলবে? তাহলে তো আমিও চান্স নিতে পারি!

সাতু : নিন না চান্স! আমরা তো শুনতে প্রস্তুত।

কার্তিক : (একটু ভেবে) অনেকদিন আগে একটা গল্প শুনেছিলুম—যে বলেছিলো সে বানিয়ে বলেছিলো কি না জানি না। বললো তো সত্যি।

সাতু : আচ্ছা সত্যি মিথ্যে পরে ভাবা যাবে। আপনি বলুন তো?

মেয়েটা : তোমারও গল্প আছে? সত্যি? আমি জানি না তো? কেন জানি না বলতে পারো?

কার্তিক : গল্পটা শুনেছিলাম—এক মুচির কাছে।

সাতু : মুচি?

কার্তিক : হ্যাঁ। কেন, মুচির প্রেম করতে নেই?

সাতু : না না, তা কেন?

শশী : মুচির প্রেম তো আমাদের মিনমিনে ফ্যাকাশে ভদ্দরলোকি প্রেমের চেয়ে অনেক বেশি জমাটি হবার কথা।

কার্তিক : তা যদি ভেবে থাকেন, তবে আমার গল্পটা শুনলে নিরাশ হবেন।

সাতু : না না, বলুন বলুন।

কার্তিক মুচিটা একটা বড়ো বাড়ির দোরগোড়ায় বসে জুতো সেলাই করতো। বাড়িতে বহু লোকের যাতায়াত, ঢুকছে বেরুচ্ছে, জুতোও সারাচ্ছে, মুচি রোজ হরেক রকম মানুষ দেখতে পায়।

মেয়েটা : এ কি তোমার গল্প? এ কি তোমার গল্প?

কার্তিক : একটা ছোট মেয়ে প্রায়ই আসে যায়—এই দশ বারো বছরের হবে। জুতোও সারায় মাঝে মাঝে। দু'একটা কথাবার্তাও হয়। আবার চলে যায়। যতো মানুষ আসে তার মধ্যে এই মেয়েটাই যেন—মানে এই মেয়েটার জন্যেই যেন সে অপেক্ষা করে থাকে রোজ।

সাতু : দাঁড়ান দাঁড়ান, আপনার এই মুচির বয়স কতো?

কার্তিক : (হেসে) তা হয়েছে—বয়স হয়েছে। চল্লিশ পঞ্চাশ হবে।

শশী : ও বাবা—এ যে বাৎসল্য প্রেম?

কার্তিক : আরে প্রেম কিনা, তাই আগে ঠিক হোক, তারপর বাৎসল্য।

সাতু : বলুন, বলুন।

কার্তিক : এমনি দিন যায়। বছর যায়। মেয়েটা অনেকদিন পরে পরে হঠাৎ একদিন আসে। বেশির ভাগ দিন মুচিটাকে খেয়াল করে দেখেও না। মুচির ডেকে কথা বলতে ইচ্ছে করে—সাহস পায় না।

হিমাদ্রি : কেন, সাহস পায় না কেন?

কার্তিক : দিন যাচ্ছে, বছর যাচ্ছে, মেয়ের বয়সও তো বসে থাকছে না?

শশী : তাতে কথা বলতে বাধা কী? এতে কার কী মনে করবার আছে?

কার্তিক : ওই তো। ওইটাই তো আসল কথা। মনে করবার না থাকলেও মুচির সাহস হয়

না। তার মানেটা কী দাঁড়ালো?

হিমাদ্রি : অর্থাৎ আপনি বলতে চান, তার নিজের মনে—

কার্তিক : অ্যাই, এইটাই কথা! তার নিজের মনে কী আছে সেটা সে জানে। হাড়ে হাড়ে জানে। যতো দিন যাচ্ছে, বছর যাচ্ছে, ততো বেশি করে জানছে। চব্বিশ ঘণ্টা খালি ওই মেয়েটাই মাথায় ঘুরছে তার। স্বপনে জাগরণে, না কী বলে? তাই। আসলে আগে তার কিছুই ছিল না। বাপ মা, ঘর সংসার, বন্ধুবান্ধব—কিস্যু না। একেবারে ফাঁকা মন। এই মেয়েটা তাই ফাঁকা পেয়ে একেবারে সারা মন জুড়ে বসেছে।

সাতু : সর্বনাশ!

কার্তিক : সর্বনাশ বলে সর্বনাশ! বছরের পর বছর—ওই এক মেয়ে। অথচ কিছু হবার নেই। কথা বলারই জো নেই, তা হবার। কীরকম অবস্থাটা, বুঝতে পারছেন?

সাতু : তা সে জোর করে মনটা অন্যদিকে নেবার চেষ্টা করলো না কেন?

কার্তিক : বোকা, বোকা! ইচ্ছে করলে বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে হাল্লা করতে পারতো, ঢোল পিটতে পারতো, বে-পাড়ায় যেতে পারতো। তা সে কিছুই করলো না—শুধু ওই মেয়ের চিন্তায় বুঁদ হয়ে রইলো।

সাতু : কেন?

মেয়েটা : এ কার গল্প? এ তো আমি চিনতে পারছি না?

কার্তিক : কেন? সোজা ব্যাপার, যদিও বোঝা সহজ নয়। মেয়েটার চিন্তা তাকে কষ্ট দেয় ঠিকই, কিন্তু নিশ্চয়ই আরো কিছু দেয় যার দাম তার কাছে অনেকখানি।

মেয়েটা : মন ভরে দেয়, না? ওর ফাঁকা মনটা ভরে রাখে। আমি বুঝতে পারি। জানি না, কিন্তু বুঝতে পারি?

হিমাদ্রি: বুঝলাম।

কার্তিক : বুঝলে?

মেয়েটা : পশ্চিমের জানলায় আকাশের ওই আলো, ওই কনে-দেখা রঙ—কতো কষ্ট যে দিয়েছে, কতো—কতো কিছু পাবার ইচ্ছে যে—কিন্তু মন ভরে দেয়। ফাঁকা মন ভরে দেয়।

সাতু : তারপর?

কার্তিক : তারপর হঠাৎ একদিন মেয়েটার আসা বন্ধ হয়ে গেলো। মুচি কতোদিন অপেক্ষা করে থেকে থেকে সাবধানে খোঁজখবর নিলো। যা ভয় করেছিলো তাই।

শশী : মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে?

কার্তিক : হ্যাঁ। বাংলাদেশের সেই বস্তাপচা প্রেমের ট্র্যাজেডি।

হিমাদ্রি : শেষ হয়ে গেলো?

কার্তিক : না, আরো আছে। তবে সেটা সত্যি, না মুচির কল্পনা, জানি নে। মুচি বলে—মেয়েটা নাকি বিয়ে করে সুখী হয়নি। তার স্বামীর সঙ্গে তার না কি কোনো সম্পর্কই ঘটেনি।

সাতু : কেন?

কার্তিক : কে জানে? অন্য কোনো ব্যাপার ছিল নিশ্চয়ই! এরকম তো এদেশে আকছারই ঘটছে? এই মেয়েটার কথাই ধরুন না?

মেয়েটা : কিন্তু এ তো আমার গল্প নয়? আমি তা কারো ফাঁকা মন ভরিনি?

হিমাদ্রি : তারপর?

কার্তিক : তারপর ভালো মনে নেই—মেয়েটা বিধবা হোলো কি শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলো কি পালিয়ে এলো—অনেকদিন আগে শোনা তো? মোদ্দা কথা হোলো—বেশ ক'বছর পরে মুচির সঙ্গে তার আবার দেখা হোলো। দেখা হোলো মানে, মুচি তাকে দেখলো।

সাতু : এইবার জমে উঠেছে!

কার্তিক : (হেসে) না মশাই, এ জমে ওঠার গল্পই না। ওই দেখলোই, যেমন আগে দেখতো। শুধু টের পেলো যে এই ক'বছরে মেয়েটা তার মন থেকে তো যায়ইনি, বরং দ্বিগুণ পোক্ত হয়ে বসেছে।

[কার্তিক থামলো]

সাতু : কই বলুন?

কার্তিক : তারপর আর জানি নে ভাই, সে মুচির সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি।

হিমাদ্রি : বা বা বা, এইরকম জায়গায় শেষ করে দিলেন?

কার্তিক : হ্যাঁ, এ গল্পটা শুরু করাই ঠিক হয়নি। নেশার ঝোঁকে মনে হোলো—বেশ জমবে। তা দেখি কিছুই নেই গল্পটাতে!

মেয়েটা : কে বলে কিছু নেই? খুব ভালো গল্প। সুন্দর গল্প।

কার্তিক : (গ্লাস বাড়িয়ে) কই স্যার? তারা তারা মা?

[সাতু ঢেলে দিলো]

এতোক্ষণে নেশাটা একটু জমেছে মনে হচ্ছে।

সাতু : হ্যাঁ, আমারও।

[হিমাদ্রি উঠে দাঁড়ালো]

বেরুচ্ছেন নাকি?

হিমাদ্রি : না!

[জানলায় গিয়ে দাঁড়ালো]

মেয়েটা : মিলির কথা ভাবছো?

শশী : (হঠাৎ) কার্তিকদা বড়ো বাজে কথা বলেন।

[বোঝা যাচ্ছে, নেশা হলে শশী ঝগড়াটে হয়ে ওঠে। কার্তিক সাতুর দিকে চেয়ে চোখ টিপে হাসলো।]

কার্তিক : কোনটা বাজে কথা বললাম?

শশী : (গজ গজ করে) ফাঁকা মন ভরেছে! গুষ্ঠির পিণ্ডি করেছে।

কার্তিক : প্রেমের গল্প শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো আপনার?

শশী : প্রেমের গল্প? ওটা প্রেম?

কার্তিক : প্রেম তবে কী?

সাতু : সত্যি। প্রেম বস্তুটা কী?

মেয়েটা : (হিমাদ্রিকে) তুমি বলো না? মিলির কথা? বলো না ওদের?

হিমাদ্রি : (না ফিরে) প্রেম হচ্ছে এমন একটা বস্তু, যা আকাশ পাতাল ভাবাবে, ভোগাবে, কষ্ট দেবে, তারপর এমন সব উলটোপালটা কাজ করাবে যে সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

মেয়েটা : খালি জ্বলবে? জুড়োবে না?

[কার্তিক হ্যা হ্যা করে হেসে জড়িত কণ্ঠে বেসুরে গেয়ে উঠলো]

কার্তিক : আগে যদি জানতাম রে সই, প্রেমের এতো জ্বালা—

মেয়েটা : শুধু জ্বালা? শুধু জ্বালা? আর কিছু নেই?

[কেউ কথা বললো না। তিনজনে ঝিম মেরে বসে আছে। হিমাদ্রি হঠাৎ ফিরে এসে তার গ্লাসটা তুলে এক চুমুক খেলো। মুখ বিকৃত হয়ে উঠলো তার। অন্যরা খেয়াল করলো না।]

তুমি মদ খাচ্ছো। জীবনে প্রথম মদ খাচ্ছো তুমি আজ। মনে আছে? যেদিন তুমি প্রথম দেখলে, মিলি—

হিমাদ্রি : (বিহ্বল ভাবে) মিলি—

[মেয়েটা মিলি হয়ে দাঁড়ালো। হিমাদ্রি আস্তে আস্তে তার দিকে এগিয়ে এলো।]

হিমাদ্রি : মিলি!

মিলি : কী?

[হিমাদ্রি আরো কাছে এলো। মিলির মুখে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে কী যেন বুঝতে চাইলো। মিলির চোখে ভয়।]

কী হিমাদ্রি? কী?

হিমাদ্রি : তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

মিলি : বিপাশাদের বাড়ি। কেন?

হিমাদ্রি : এতো রাত হোলো?

মিলি : রাত? কতো রাত?

হিমাদ্রি : বা'রোটা বাজে। তোমার বাবা মা শুয়ে পড়েছেন সবাই।

মিলি : (কৃত্রিম স্বাভাবিকতায়) ও তাই নাকি? তা বেশ তো? মানে—আমি তো খেয়ে এসেছি। বলে রেখেছিলাম তো—দেরি হবে? বিপাশার জন্মদিনের পার্টি ছিল তো।

হিমাদ্রি : ও, পার্টি?

মিলি : (দুর্বল হেসে) পার্টি মানে, ওই আর কী, দু'একজন বন্ধুবান্ধব।—তুমি যে জেগে আছো এখনো?

[মিলি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কথা বলছে]

হিমাদ্রি : পড়ছিলাম।

মিলি : ও। আচ্ছা গুড নাইট, শুয়ে পড়ি— ভীষণ ঘুম পাচ্ছে—

[যেতে গেলো]

হিমাদ্রি : মিলি শোনো।

মিলি : (দাঁড়িয়ে, না ফিরে) কী?

হিমাদ্রি : এদিকে এসো না একটু?

[মিলি আস্তে আস্তে কাছে এলো]

কী হয়েছে বলো তো?

মিলি : কী হবে আবার?

হিমাদ্রি : বাড়ির কেউ জেগে নেই, জানো তো?

মিলি : হ্যাঁ, তো কী?

হিমাদ্রি : (অল্প হেসে) এ সময়ে এরকমভাবে আমাকে গুড নাইট বলে দৌড়ে পালাচ্ছো, এটা—একটু আশ্চর্য লাগছে।

মিলি : (মাথা নিচু করে) আমার ভীষণ টায়ার্ড লাগছে—আমি—

[হিমাদ্রি হঠাৎ দু'হাতে মিলির মুখ চেপে তুলে ধরলো। মিলি ছাড়িয়ে নেবার আগেই মুখ নিচু করে ঘ্রাণ নিলো দীর্ঘ নিশ্বাস টেনে। তারপব চমকে পিছিয়ে এলো এক পা। মিলির চোখে ভয়।]

হিমাদ্রি : মিলি! তুমি—তুমি—মদ খেয়েছো?

মিলি : কে বললে?

হিমাদ্রি : তাই ভয়ে পালাচ্ছিলে?

মিলি : হিমাদ্রি, আমি—পার্টির মধ্যে—সামান্য একটু না খেলে ভীষণ অভদ্রতা হোতো—

হিমাদ্রি : অভদ্রতা? মদ না খেলে অভদ্রতা?

মিলি : মদ নয়, হিমাদ্রি—একে মদ বলে না। দু'একটা ড্রিঙ্ক শুধু—বিপাশার অনারে—বিপাশা নইলে—

[হিমাদ্রি শুধু চেয়ে আছে। মিলি একটা অসহ্য ভয়ে অস্থির হয়ে আছে।]

হিমাদ্রি—আমি খেতে চাইনি--আমি অনেক আপত্তি করেছিলাম—ওরা জোর করে আমাকে—

হিমাদ্রি : জোর করে?

মিলি : প্রায় জোর করে—মানে না খেলে এতো অফেন্স নিতো—হিমাদ্রি! প্লিজ তুমি—

[হিমাদ্রি ফিরলো। মিলি জোর করে তাকে আবার ঘুরিয়ে মুখোমুখি করালো। দু'হাতে বাহু চেপে ধরে মিনতি করে চললো ছোট মেয়ের মতো।]

আমি আর কোনোদিন খাবো না—কক্ষনো খাবো না—গড-প্রমিস হিমাদ্রি—গড-প্রমিস (প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলো—সচেতন হয়ে চাপা গলায়) কক্ষনো—কোনোদিন খাবো না—প্লিজ হিমাদ্রি তুমি রাগ কোরো না—প্লিজ!

হিমাদ্রি : (শান্ত স্বরে) আমার রাগ করায় কী আসে যায় মিলি? তোমার সোসাইটিতে যা করা দরকার, আমার জন্যে তুমি কেন—

মিলি : (প্রায় আর্তস্বরে) হিমাদ্রি! ওরকম করে বোলো না। তুমি জানো—তুমি ওরকমভাবে কথা না বলে যদি আমার দু'গালে ঠাস ঠাস করে চড় মারো তো

আমি বেঁচে যাই—

হিমাদ্রি : (হঠাৎ প্রকৃত জিজ্ঞাসায়) কেন মিলি? কেন? তোমার মুখে এইরকম কথা শুনলে মনে হয় তুমি আমার সামান্য রাগ করাকেও যমের মতো ভয় করো, অথচ—

মিলি : তাই করি, তাই করি, সত্যি—

হিমাদ্রি : অথচ পার্টিতে, তোমার সোসাইটিতে, আমার কথা তোমার এক ফোঁটাও মনে থাকে না—

মিলি : কে বললো?

হিমাদ্রি : তখন আমার ভালো-লাগা খারাপ-লাগার এক কানাকাড়িও দাম দাও না তুমি—যেন আমার কোনো অস্তিত্বই নেই তোমার জীবনে—

মিলি : (হিমাদ্রির মুখ হাত চাপা দিয়ে) না, ও কথা বোলো না! তুমি জানো না তুমি আমার কাছে কী—তুমি বুঝতে পারছো না—তোমাকে চেনার পর এই এতোদিনের জীবন—এই টেনিস, সুইমিং, ড্রাইভিং, পার্টি-পিকনিকের জীবন— এসব—

হিমাদ্রি : কিন্তু এসবই তো তোমার চাই মিলি! তাই আজও পার্টিতে দিয়ে ড্রিঙ্ক না করে পারলে না—

মিলি : আমি তোমাকে যে কী করে বোঝাবো হিমাদ্রি—হিমাদ্রি, তুমি আমাকে সময় দাও—এ বোধ হয়—আমি জানি না—আমি আজ পারছি না—কাল বিকেলে তোমার সঙ্গে বেরুবো—লক্ষ্মীটি রাগ করে থেকো না—তখন—তখন বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করবো—যাবে তো? যাবে তো?

[হিমাদ্রি জবাব দিলো না]

বলো না? যাবে তো?

হিমাদ্রি : আচ্ছা যাবো।

মিলি : তুমি রাগ করে থেকো না, লক্ষ্মীটি। আমি ঘুমোতে পারবো না—তুমি যদি রাগ করে থাকো—কাল সারাদিন এক মুহূর্ত স্বস্তি পাবো না—বলো—

হিমাদ্রি : তুমিও আমাকে সময় দাও মিলি, আমি এতো সহজে বলতে পারবো না।

[আস্তে আস্তে হাত ছেড়ে দিলো মিলি]

মিলি : আচ্ছা। আচ্ছা। কাল যাবে তো—বিকেলে?

হিমাদ্রি : যাবো।

[মিলি হিমাদ্রির দিকে দু'হাত তুলে এগোতে গেলো, তারপর থেমে পেছন ফিরে ছুটে চলে গেলো।]

সাতু : (জড়িত কণ্ঠে) না, এই যে জ্বালা—(থেমে গেলো)

কার্তিক : (অপেক্ষা করে) কীসের জ্বালা?

সাতু : এই—আপনাদের এই প্রেমের।

কার্তিক : (আবার অপেক্ষা করে) হ্যাঁ, কী হয়েছে?

সাতু : এ জ্বালাটা আসছে কোত্থেকে?

শশী : আসছে, যারা প্রেম করছে তাদের মুখ্যুমি থেকে।

সাতু : (ভেবে) প্রেম কি তাহলে মুখ্যুরাই করে?

শশী : না। প্রেমে পড়লে মুখ্যু হয়ে যায়।

সাতু : (ভেবে) আই সি।

[হিমাদ্রি এর মধ্যে ফিরে তার গ্লাসটা তুলে খালি করেছে। আরো ঢেলেছে। গ্লাসের দিকে চেয়ে আছে সে।]

শশী : আপনি কচু সি।

সাতু : (ভেবে) কেন?

শশী : আপনি প্রেমে পড়েছেন কোনোদিন যে সি করবেন?

সাতু : (ভেবে) না, তা পড়িনি। (অল্প পরে) কিন্তু তবে লছমিটা কী ব্যাপার?

কার্তিক : লছমি?

শশী : লছমিটা আবার কে?

সাতু : একটা মেয়ে। (অল্প থেমে) মরে গেছে।

শশী : আপদ গেছে!

কার্তিক : আঃ, শশীবাবু!

[শশী জবাব দিলো না। সাতুও কিছু বললো না। হিমাদ্রি হঠাৎ খুক খুক করে হাসতে লাগলো নিজের মনে।]

তোমার আবার কী হোলো?

হিমাদ্রি : কীরকম—মদ খাচ্ছি দেখুন? নির্জলা মদ। কী এটা? হুইস্কি?

কার্তিক : হ্যাঁ।

হিমাদ্রি : আচ্ছা, মদ খেলে ক্ষতি কী?

কার্তিক : বেছে বেছে কথাটা আমাকেই জিজ্ঞেস করলে বাপ?

হিমাদ্রি : কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয় মদ খেলে?

শশী : মহাভারতের শুদ্ধতা বজায় রেখেই বা হবে কী?

[মেয়েটা আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে]

হিমাদ্রি : কিন্তু—বেশি খাওয়া উচিত না।

[হিমাদ্রির চোখ অনেক দূরে। আস্তে আস্তে গ্লাসটা নামিয়ে রাখলো সে।]

কার্তিক : কেন?

হিমাদ্রি : বেশি খেলে—হাঁটা উচিত।

শশী : হাঁটা?

মেয়েটা : শেষ দিনের কথা মনে পড়ছে? শেষ দিন?

হিমাদ্রি : গাড়ি চালানো উচিত না।

শশী : গাড়ি চালানো?

কার্তিক : ও, গাড়ি? তাহলে আমার কোনো সমস্যা নেই।

[নিশ্চিন্ত মনে চুমুক দিলো]

হিমাদ্রি : (বিড় বিড় করে) এ হয় না। এ হবে না।

[কেউ খেয়াল করলো না। মেয়েটা মিলি হয়ে বসলো শূন্য চোখে। হিমাদ্রি কাছে এলো।]

এ হয় না মিলি। এ হবে না। দু' বছর ধরে অনেকবার অনেকভাবে চেষ্টা করে দেখেছি—এ হবার নয়।

মিলি : (শূন্য কণ্ঠে) তুমি যে আমাকে একেবারে সহ্য করতে পারো না।

হিমাদ্রি : তা নয় মিলি, তুমি জানো তা নয়। আমি চেষ্টার ক্রটি করিনি—

মিলি : চেষ্টা? তুমি চেষ্টা করেছো আমাকে একেবারে ঢেলে সাজাতে। তুমি চেয়েছো আমি তোমার জগতে একেবারে মাপে মাপে মিলে যাই। এক চুল এদিক ওদিক হলে আমাকে দূর করে দিয়েছো—

হিমাদ্রি : মিলি!

মিলি : কুকুরের মতো দূর করে দিয়েছো। আমি কুকুরের মতো আবার তোমার কাছে ফিরে যাবার চেষ্টা করেছি—বারবার—ভিক্ষে করেছি—অথচ তুমি আমার জগৎটাকে একফোঁটা বোঝবার চেষ্টা করলে না।

হিমাদ্রি : করিনি?

মিলি : একফোঁটা সহ্য করলে না, ক্ষমা করলে না। কেন করবে? তুমি তো আমাকে ভালোবাসোনি কোনোদিন?

হিমাদ্রি : তুমি জানো এ কথা মিথ্যে। তোমার আমার জগতের এতো তফাৎ যে—

মিলি : জগতের তফাৎ। জগতের তফাৎ। তোমার কাছে তোমার জগৎটাই সব। আমি কিছু না। আমাকে তোমার কোনো দরকার নেই।

হিমাদ্রি : (অল্প থেমে) তুমি যখন বুঝবেই না, আমি যাই।

মিলি : (তড়িৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়িয়ে) কোথায় যাবে?

হিমাদ্রি : তুমি জানো না?

মিলি : না! যাবে না! যেতে পাবে না তুমি!

হিমাদ্রি : (হঠাৎ চটে) শুনুন মিস রায়। আপনার বাবার চাকরিতে আমি ইস্তফা দিয়েছি। আমার স্যুটকেস বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছে। আপনার সঙ্গে আর হয়তো দেখা হবে না। আপনাদের দয়ার জন্যে অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার।

[প্রত্যেকটি কথা মিলিকে যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন করে দিলো। হিমাদ্রি ফিরলো। মিলি দু'হাতে মাথা চেপে অল্প টলতে লাগলো। তারপর, হিমাদ্রি দু'পা যেতে, হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেলো।]

মিলি : হিমাদ্রি!

হিমাদ্রি : বলুন মিস রায়।

মিলি : (যন্ত্রণা চেপে) তুমি জানো—আমি তোমার বাড়ি যাবো! তুমি জানো আমি আবার—

হিমাদ্রি : কোনো লাভ হবে না। বারবার এ আর আমি পারছি না। এবার তাই মনস্থির করে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।

মিলি : (সভয়ে) তার মানে?

হিমাদ্রি : তার মানে, আমাদের বাড়িতে গেলে আমাকে পাবে না। আমি অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করেছি, এবং সে ঠিকানা তুমি খুঁজে পাবে না।

মিলি : সত্যি তুমি আমাকে জন্মের মতো দূর করে দিচ্ছো?

হিমাদ্রি : না। আমি জন্মের মতো দূর হয়ে যাচ্ছি?

মিলি : না। না। তোমার জীবন ঠিকই চলবে। তোমার জগৎ আছে।

হিমাদ্রি : তোমারও জগৎ রইলো।

মিলি : না। আমার জগৎ নেই আর। তোমার জগতে ষোলো আনা ঢুকতে পারিনি, কিন্তু আমারটা খুইয়েছি। কিন্তু তাতে তোমার কিছু আসে যায় না।

হিমাদ্রি : (অল্প থেমে) চলি।

মিলি : হিমাদ্রি! তোমার ঠিকানা দিয়ে যাও!

হিমাদ্রি : না।

মিলি : আমি যাবো না—আমি সম্পূর্ণ তোমার মনের মতো হতে না পারলে যাবো না—আমি কথা দিচ্ছি—তুমি ঠিকানাটা দিয়ে যাও শুধু—

হিমাদ্রি : না। চলি—

মিলি : হিমাদ্রি!

[হিমাদ্রি ফিরে তাকালো না]

(চাপা অর্ধ-উন্মত্ত স্বরে) তুমি ঠিকানা না দিয়ে যদি এ বাড়ি থেকে যাও, আমি হুইস্কি আনিয়ে খাবো—খাবো আর খাবো—যতোক্ষণ না জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাই—

হিমাদ্রি : কনগ্র্যাচুলেশনস মিস রায়। আপনার জগৎ অক্ষয় হোক।

[হিমাদ্রি দৃঢ় পায়ে চলে গেলো জানলায়। মিলি অন্ধকারে ঢেকে গেলো। জানলায় হিমাদ্রি ঘুরে দাঁড়ালো। তার চোখে একটা অর্ধ-উন্মত্ত বিভীষিকা। হঠাৎ এগিয়ে এসে দু'হাতে শশী আর সাতুর কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিতে লাগলো।]

সাতুবাবু? শশীদা? শুনুন? শুনুন? বেশি মদ খেয়ে কক্ষনো গাড়ি চালাবেন না! বেশি মদ খেয়ে—গাড়ি চালালে—জোরে চালাতে ইচ্ছে হবে—বেশি মদ খেলে তো—জ্ঞান থাকে না?—খুব জোরে—পঞ্চাশ মাইল—ষাট মাইল—পঁয়ষট্টি মাইল (হিমাদ্রি হাঁপাচ্ছে)—আর তারপর—তারপর—গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে—সমস্ত গাড়িটা থেঁতলে—সমস্ত শরীরটা—থেঁতলে—একেবারে—সে চেনা যায় না শশীদা—চেনা যায় না—উঃ! কেন—কেন—কেন আমি—

[ততোক্ষণে শশী আর সাতু উঠে হিমাদ্রিকে ধরেছে। কার্তিকও উঠে পড়েছে।]

সবাই : হিমাদ্রি। হিমাদ্রি। বোসো। কী হোলো? বোসো।

[ওদের কথা চাপা দিয়ে হিমাদ্রি চিৎকার করে চলেছে]

হিমাদ্রি : কেন—কেন আমি—কেন আমি—

শশী-কার্তিক : বোসো হিমাদ্রি! বোসো।

সাতু : এই নিন—খান এক ঢোক।

[সাতু প্রায় জোর করে হিমাদ্রিকে এক ঢোক খাইয়ে দিলো। হিমাদ্রি বিষম খেয়ে কাশতে লাগলো। তারপর হঠাৎ যেন শান্ত হয়ে গেলো।]

হিমাদ্রি : (মরা গলায়) ও অ্যাক্সিডেন্ট শশীদা। সুইসাইড নয়। সুইসাইড কেন হবে?

অ্যাক্সিডেন্ট। তাই না?

[কেউ জবাব দিলো না। হিমাদ্রি ঝিম মেরে বসে রইলো। শশী আর কার্তিক নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে বসলো। সাতু দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। মেয়েটা ফুটে উঠলো আলোয়।]

মেয়েটা : আমপাতা জোড়া জোড়া। মারবো চাবুক ছুটবে ঘোড়া। ওরে বিবি সরে দাঁড়া। আসছে আমার পাগলা ঘোড়া। পাগলা ঘোড়া—

[হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলো মেয়েটা]

পাগলা ঘোড়া—খেপেছে—পাগলা ঘোড়া—খেপেই আছে— সবসময়ে—

[সাতু হঠাৎ দরজার একটু বাইরে গিয়ে একটা ঢিল কুড়িয়ে ছুড়ে মারলো]

সাতু : স্ স্! যাঃ।

[কুকুরটা ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক করে দু'বার ডেকে উঠলো। যেন রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। সাতু এবার বড়ো ঢিল তুলে ছুড়লো। কুকুরটা ঘ্যাঁক করে আর একবার ডেকে থেমে গেলো। যেন সরে গেছে। সাতু হাত ঝাড়তে ঝাড়তে ভিতরে এলো।]

কার্তিক : কে?

মেয়েটা : ভুলুয়া।

সাতু : সেই কুকুরটা। ফের এসে বসেছে।

মেয়েটা : না না। এটা অন্য কুকুর। ভুলুয়া মরে গেছে ক—বে!

কার্তিক : মরুক গে!

সাতু : হ্যাঁ, মরুক গে।

মেয়েটা : মরবেই তো। লছমি মরে গেলে ভুলুয়া বেঁচে থাকতে পারে?

সাতু : জানেন, সেই কুকুরটাকে পুষবো ভেবেছিলাম—

কার্তিক : কোন কুকুরটাকে?

মেয়েটা : ভুলুয়া।

সাতু : ওই যে নেমকহারাম কুকুরটার কথা বলছিলাম না?

কার্তিক : ও হ্যাঁ!

শশী : যার সঙ্গে আপনার পুনর্মিলন হয়েছিলো দু'বছর পরে?

[সাতু স্বভাবসিদ্ধ অট্টহাস্য করলো না এবার]

সাতু : হ্যাঁ, বলতে পারেন। কতো ডাকলাম, তা বেটা কিছুতেই এলো না।

শশী : কোত্থেকে এলো না?

সাতু : অ্যাঁ?

শশী : মানে, কোথায় পুনর্মিলনটা হয়েছিলো জিজ্ঞেস করছিলাম।

সাতু : এমনি—রাস্তায়—

মেয়েটা : কী?

সাতু : না, রাস্তায় ঠিক নয়। (অল্প থেমে) শ্মশানে। এমনি একটা গেঁয়ো শ্মশানে, আসানসোল অঞ্চলে।

[সাতু ঘুরে জানলার কাছে গেলো। বাইরে চেয়ে রইলো। কার্তিক, শশী আর

হিমাদ্রি অন্ধকারে আবছা হয়ে আসছে। মেয়েটা ঝুঁকে সাতুর দিকে চেয়ে আছে।]

মেয়েটা : (ফিসফিস করে) লছমি। লছমি। লছমি।

সাতু : লছমি।

[মেয়েটা লছমি হয়ে দাঁড়ালো। সাতু ঘুরে এগিয়ে এলো তার কাছে।]

লছমি!

[লছমি হেসে উঠলো]

লছমি : তুমি আমাকে লছমি বলো কেন বাবুজি? আমার নাম তো লক্ষ্মী।

সাতু : তুই আমায় বাবুজি বলিস কেন? আমার নাম তো—

লছমি : ওরে বাস্‌রে, তোমার নাম ধরতে পারি নাকি আমি?

সাতু : (হেসে) কেন রে? আমি কি তোর সোয়ামি নাকি, যে নাম ধরতে পারবি না?

[লছমি অন্যদিকে ফিরে রইলো। তার মুখ যেন ভিতরের এক প্রশান্ত আনন্দে উজ্জ্বল। যেন 'সোয়ামি' কথাটা মনে মনে নাড়াচাড়া করছে।]

কী রে? বল?

[লছমি ধীরে ধীরে ফিরে তাকালো]

লছমি : না।

সাতু : তবে?

লছমি : তার থেকে অনেক বেশি।

সাতু : ওব্বাবা! স্বামীর থেকে অনেক বেশি—সেটা কী চিজ দাঁড়ালো?

লছমি : জানি না।

সাতু : তুই তো কিছুই জানিস না! সব কিছুতেই—জানি না।

লছমি : আমি যে লেখাপড়া শিখিনি বাবুজি।

সাতু : হ্যাঁঃ! লেখাপড়া শিখলেই তো লোকে সব জেনে বসে থাকে কিনা?

লছমি : জানবে না? বাঃ?

[সাতু রুমাল বার করে কপাল ঘাড় মুছলো]

সাতু : ঘণ্টা জানবে।

লছমি : (হাত বাড়িয়ে) দাও।

সাতু : কী?

লছমি : রুমালটা, কেচে দেবো।

সাতু : ফর্সা রুমাল, আজকেই দিলি তো? আবার কাচবি কী?

লছমি : দাও না, আমি ফর্সা রুমাল দিচ্ছি আর একটা।

সাতু : দেখ মাঠেঘাটে কাজ করি, অতো পরিষ্কার আমার সইবে না।

লছমি : (করুণভাবে) আমার ভালো লাগে যে?

সাতু : তুই আমার সর্বনাশ করছিস।

লছমি : (চমকে) আমি?

সাতু : একেবারে ননীগোপাল বানিয়ে তুলছিস আমাকে। একটা কাজ নিজের হাতে করতে দিস না।

লছমি : (নিশ্চিন্ত হয়ে) ও, এই?

[বাইরে কুকুরটা দু'বার ডাকলো]

সাতু : ওই তোর পোষ্য এসেছে। যা, খেতে দে, আর কী?

লছমি : (হেসে) তুমি ভুলুয়াকে দেখতে পারো না, না?

সাতু : (হেসে) দেখতে না পারলে রক্ষে আছে? সঙ্গে সঙ্গে তুই হয়তো আমাকে ছেড়ে চলে যাবি।

[লছমি যাবার জন্য ফিরেছিলো, চমকে ফিরে তাকালো]

লছমি : বাবুজি!

সাতু : কী হোলো?

[লছমি অল্পক্ষণ চেয়ে রইলো। তারপর একটু হাসলো।]

লছমি : তোমাকে ছেড়ে যাবো—মরলে। আর—তুমি তাড়িয়ে দিলে।

সাতু : কোনোটারই চান্স দেখছি না বিশেষ। দিব্যি তাগড়া আছিস, চট করে মরবি না। আর তোকে তাড়িয়ে দিলে আর কি আমার চলবে?

[লছমির মুখ একটা আশ্চর্য আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কুকুরটা আবার ডাকলো। লছমি ফিরে ছুটে চলে গেলো।]

লছমি : ভুলুয়া! ভুলু ভুলু ভুলুয়া!

[সাতু ফিরে আসছে। এদিকের আলো ফুটে উঠছে আস্তে আস্তে। হিমাদ্রি তার টুলে বসে তক্তাপোশের কানায় মাথা রেখে বোধ হয় ঘুমোচ্ছে।]

কার্তিক : তারা তারা মা!

শশী : ওঃ আপনার তারা-ভক্তির ঠেলায় অস্থির হয়ে উঠলাম!

কার্তিক : ভক্তি? ভক্তিটা কোথায় দেখলেন?

শশী : তবে অতো বার বার ডাকেন কেন?

কার্তিক : ও একটা হাঁক হিসেবে ডাকি। হাই তোলার মতো। মগজের বাষ্পটা বের করে দি।

শশী : দরকার কী বের করবার?

কার্তিক : সেফটি ভালভ। নইলে ফেটে যায় যদি?

[সাতু জানলায়]

শশী : ফাটলে ক্ষতি কী?

কার্তিক : সব বেরিয়ে ছত্রখান হয়ে পড়বে যে? হাটে হাঁড়ি ভাঙার মতো।

শশী : তাতেই বা ক্ষতি কী?

কার্তিক : আমার আর কী ক্ষতি? আপনারা পাঁচজন নিন্দেমন্দ করবেন, বলবেন—বুড়োর মগজে এতো বাজে গ্যাস জমে ছিল?

শশী : আপনি ফের বাজে বকছেন।

কার্তিক : তবে থাক, আর বকবো না। (অল্প থেমে সজোরে) তারা তারা মা!

[শশী বিরক্ত হয়ে গ্লাস তুলে এক ঢোক খেয়ে ঠক করে গ্লাসটা রাখলো]

সাতু : (ধীরে ধীরে) জানেন কার্তিকবাবু, আপনার ওই মুচিই সুখী লোক।

কার্তিক : শুনে সুখী হলাম। কিন্তু কারণটা কী?

সাতু : ও বেটা কিছুই পায়নি, তাই নিশ্চিন্ত মনে একটা জিনিস চেয়ে চেয়ে জীবনটা কাটিয়ে যাচ্ছে। কোনো গণ্ডগোল নেই।

কার্তিক : গণ্ডগোল তাহলে কীসে?

সাতু : পেলেই গণ্ডগোল। পেয়ে রাখতে তো আমরা কেউ জানি না? ছোট ছেলের খেলনার মতো ভেঙেচুরে ছত্রখান করি। তারপর আবাব ভেঙে গেলো বলে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদি।

[মেয়েটা আলোকিত হয়ে উঠেছে এর মধ্যে]

কার্তিক : কথাটা মন্দ বলেননি।

মেয়েটা : কিন্তু না ভাঙলে কি বোঝা যায়—কী পেয়েছিলাম? বোঝা যায়?

সাতু : আচ্ছা, আমরা এরকম করি কেন বলতে পারেন?

কার্তিক : কীরকম?

সাতু : যা করবো না ভাবি, যা করতে চাই না, ঠিক তাই করি। যা করলে নিজে মরি, অন্যে মরে—যা করলে সব ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে যায়, ঠিক তাই করে চলি!

মেয়েটা : (খিল খিল করে হেসে) পাগলা ঘোড়া—জানো না? খেপেই আছে। সব তছনছ করে দেয়! (হঠাৎ করুণস্বরে) আমাকেও এইরকম তছনছ করে দিলে না কেন পাগলা ঘোড়া? এমনি—এই লছমির মতো? মালতীর মতো? মিলির মতো? আমি কি শুধুই জ্বলবো? জুড়োবো না?

কার্তিক : মুচিই তাহলে সুখী বলছেন? কিছু পেলো না বলে?

[সাতু জবাব দিলো না। মেয়েটা লছমি হয়ে এগিয়ে এলো।]

লছমি : (চাপা গলায় ডেকে) বাবুজি! বাবুজি!

সাতু : কে?

লছমি : দরজা খোলো। আমি লছমি।

সাতু : লছমি! এতো রাতে তুই?

[লছমি জবাব দিলো না, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।]

আয়, ভিতরে আয়।

[লছমি এলো]

কী হয়েছে?

[লছমি চুপ]

বলবি তো?

লছমি : (ভাঙা অস্ফুট সুরে) আমি ওখানে থাকতে পারছি না বাবুজি।

সাতু : কেন, কী হয়েছে?

[লছমি জবাব দিলো না]

গিন্নি খারাপ ব্যবহার করে?

[লছমি শুধু মাথা নেড়ে জানালো—না]

তবে? কর্তা? কর্তা পেছনে লাগছে?

[লছমি এবারও মাথা নাড়লো]

তবে কী? আর কেউ আছে নাকি? চাকর-বাকর কেউ? বাইরের কেউ?

[লছমি প্রত্যেকবারই মাথা নেড়ে জানাচ্ছে—না]

(অধৈর্য স্বরে) তবে থাকতে পারবি না কেন?

লছমি : আমাকে তোমার কাছে থাকতে দাও বাবুজি।

সাতু : পারলে দিতাম না?

[লছমি চুপ]

বল? রাখতে পারলে এ ব্যবস্থা করতাম?

[লছমি চুপ]

শোন। একটু চেষ্টা কর। দেখেশুনে ভালো পরিবারে ব্যবস্থা করে দিয়েছি। ভালো করে কাজকর্ম কর, একটা পাকা আশ্রয় হবে। তুই তো কাজ করতে কোনোদিন ভয় পাস না?

লছমি : আমাকে তোমার কাজ করতে দাও বাবুজি!

সাতু : (বিরক্ত হয়ে) আবার সেই এক কথা। কতোবার বলবো তোকে—এভাবে তোকে কাছে রাখলে আমার কাজকর্ম সব ডুববে, একটা কনট্র্যাক্ট পাবো না এর পর। খাবো কী তখন? তোকেই বা খাওয়াবো কী?

[লছমি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলো]

(নরম স্বরে) শোন লছমি—

[লছমির কাঁধে হাত রাখতেই লছমি সাতুর পায়ের কাছে বসে পড়লো]

লছমি : আমাকে তোমার কাছে থাকতে দাও বাবুজি, আমি আড়ালে লুকিয়ে থাকবো, কেউ জানতে পারবে না—আমি—আমি তোমার কাছে যাবো না, তুমি ঘরে থাকলে ঘরে ঢুকবো না—আমাকে তুমি ছুঁয়ো না—কথা বোলো না— তবু—তবু—তোমার কাছে থাকতে দাও—তোমাব কাজ করতে দাও—আমি কাউকে জানতে দেবো না—

সাতু : তাই কি হয় নাকি? আমার তিনমহলা বাড়ি আছে যে তোকে লুকিয়ে রাখবো? তাঁবুতে, চালাঘরে—কোথায় লুকোবি তুই? যে দেখবে জিজ্ঞেস করবে—এটা কে?

লছমি : তোমার ঝি—বোলো তোমার ঝি—

সাতু : দেখ, এসব কথা হয়ে গেছে আগে। একা বেটাছেলে—তোর মতো ঝি রেখেছি—এই দেখলেই সবাই ডেকে কনট্র্যাক্ট দেবে?

লছমি : দেখবে না বাবুজি—কেউ দেখবে না—আমি ঠিক লুকিয়ে থাকবো—আমাকে তাড়িয়ে দিয়ো না বাবুজি—থাকতে দাও—তোমার কাছে থাকতে দাও—

[লছমি সাতুর দুই হাঁটু চেপে ধরে ঝাঁকানি দিচ্ছে। সাতু বিরক্ত হয়ে সরে গেলো। লছমি হুমড়ি খেয়ে পড়লো।]

সাতু : কী যে পাগলের মতো কথা বলিস, তার ঠিক নেই।

[লছমি পড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো। সাতু ফিরে এসে লছমিকে ধরে তুললো]
ওঠ। ওঠ লছমি। যা, বাড়ি যা।

লছমি : বাড়ি?

সাতু : ওইটাই তোর বাড়ি। ওরা খুব ভালো লোক। বড়োলোক। মাধববাবু বড়ো ঠিকেদার—একটা অবস্থাপন্ন সংসারের মধ্যে থাকবি, তোর ভালো হবে।

লছমি : ভালো?

সাতু : চেষ্টা কর—সব সয়ে যাবে। কাজে মন দে, ওদের জানবাব চেনবার চেষ্টা কর, ভুলুয়া রইলো তোর কাছে—ওকে নিয়েও সময় কাটবে, আস্তে আস্তে ভুলতে পারবি।

লছমি : ভুলতে?

সাতু : হ্যাঁ রে হ্যাঁ, ভুলতে। দুনিয়াতে অনেক কিছুই ভুলতে হয়, ভোলাও যায়।

লছমি : তুমি আমায় একেবারে ভুলে গেছো বাবুজি?

সাতু : আবার বাজে কথা বলে। যা। বাড়ি যা।

লছমি : তুমি আমায় বাঁচিয়েছিলে কেন বাবুজি? যেখানে ছিলাম সেখানেই মরতে দিলে না কেন বাবুজি?

সাতু : লছমি—

লছমি : বলো না বাবুজি? বলো না? গুণ্ডারা তো কতো মেয়েকে এমন চুরি করে আনে। কতো মেয়েকে কেনাবেচা করে—ব্যবসা করে। তুমি কেন আমাকে নিয়ে আসতে গেলে? তুমি কেন—

সাতু : লছমি!

লছমি : তুমি কেন ওদের সঙ্গে মারামারি করলে? তুমি কেন ছুরি দেখে ভয় পেলে না—জানের ভয় পেলে না—

সাতু : লছমি, এখন এসব কথা—

লছমি : বলো না? বলো না? আমার জন্যে? আমার জন্যে করেছো?

সাতু : যদি তাই করে থাকি—

লছমি : তবে আজ আবার তাড়িয়ে দিচ্ছো কেন বাবুজি?

সাতু : একে কি তাড়িয়ে দেওয়া বলে?

[লছমি চেয়ে রইলো শুধু]

যা। যা এখন। বাড়ি যা।

[লছমি আস্তে আস্তে ফিরে অন্ধের মতো পা ঘষে ঘষে চলে গেলো। সাতু তাকিয়ে রইলো যতোক্ষণ না অন্ধকারে মিশে গেলো সে।]

কার্তিক : (শূন্য গ্লাস ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে) বোতল কি খালি হয়ে গেলো বাবা?

[কেউ সাড়া দিলো না]

ও সাতুবাবু!

সাতু : (চমকে) অ্যাঁ?

কার্তিক : কোথায় আপনি?

সাতু : (এগিয়ে এসে) এই যে।

কার্তিক : বোতল কি শেষ?

সাতু : না। আছে।

[ঢেলে দিলো। নিজেও খেলো।]

শশীবাবু, আপনি তখন একটা প্রশ্ন করেছিলেন। আমি একটা করবো?

শশী : একশোবার করবেন। জবাব পাবেন না।

সাতু : কেন?

শশী : কোনো প্রশ্নেরই জবাব হয় না বলে।

কার্তিক : আপনি বলুন সাতুবাবু।

সাতু : মনে করুন—একটা—একটা দামি হিরে আপনি কুড়িয়ে পেলেন। নর্দমায় পড়ে ছিল হিরেটা। কুড়িয়ে এনে দেখলেন—অতো দামি হিরে রাখবার মতো আপনার জায়গা নেই। তাই সেটাকে—

কার্তিক : দামি বলে? না রাখতে সাহস হোলো না বলে?

সাতু : (একটু থেমে) আচ্ছা তাই! আপনি সেটা অন্য একজনের কাছে গচ্ছিত রাখলেন—যার রাখবার মতো জায়গা আছে, ঘরদোর আছে—

কার্তিক : গচ্ছিত রাখলেন?

সাতু : (থেমে) আচ্ছা, না হয় দিয়েই দিলেন। ভালোভাবে থাকবে ভেবে দিয়েই দিলেন।

কার্তিক : অর্থাৎ বিদায় করলেন।

সাতু : না!

কার্তিক : আচ্ছা আচ্ছা, দিয়েই দিলেন। বলুন।

সাতু : কিন্তু সে—সে তার অপব্যবহার করলো। নিজের স্বার্থের জন্যে সেটা নিয়ে ভেট দিলো একজনকে—এক বড়োকর্তাকে। আর সেই বড়োকর্তা—সেটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে—শেসে আবার সেই নর্দমাতেই— হিরেটা—

কার্তিক : মানুষকে মানুষই বলুন না সাতুবাবু—হিরে-টিরে কেন?

[সাতু চুপ করে রইলো]

প্রশ্নটা কী আপনার?

সাতু : কুড়িয়ে আনাটা ভুল হয়েছিলো? না অন্যকে দিয়ে দেওয়াটা?

কার্তিক : ভুল? মানুষ যা কিছু করে, সবই ভুল। তাই ভুল কথাটার মানেই নেই।

সাতু : তবে কী বলবো? দোষ? অপরাধ?

কার্তিক : নাঃ। ওসব একই ব্যাপার। তবে মানুষ যে মানুষ—সেইটাকে তার অপরাধ বলতে পারেন।

[মেয়েটা আবার আলোয়]

শশী : ফের বাজে কথা ধরেছেন কার্তিকবাবু।

কার্তিক : বাজে কথা? তবে—তারা তারা মা।

[সাতু কী ভাবতে ভাবতে দরজার কাছে গেছে। হঠাৎ ঝুঁকে দাঁড়ালো।]

সাতু : আ। আ! চুঃ চুঃ চুঃ! ভুলুয়া। ভুলুয়া! আমাকে চিনতে পারছিস না? আঃ! আঃ! চুঃ চুঃ!

মেয়েটা : ও তো আসবে না? কী করে আসবে? লছমি যে জ্বলছে। ওইখানে—জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। ও কেন আসবে?

সাতু : ভুলু! ভুলুয়া!

কার্তিক : এই চ্যালাকাঠ ছুড়ে মারছেন, এই আদর করে ডাকছেন--ব্যাপার কী সাতুবাবু?

[মেয়েটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। সাতু খাড়া হয়ে ফিরে দাঁড়ালো। তার চোখ দু'টো অদ্ভুতরকম জ্বলছে। মুখে একটা অপ্রকৃতিস্থ হাসি। হাসি নয়, যেন হাসিব মুখোশ আঁটা। হঠাৎ এগিয়ে এলো কার্তিকের কাছে। ঝুঁকে কার্তিকেব প্রায় মুখের কাছে মুখ নিয়ে ফ্যাসফেঁসে গলায় বলতে লাগলো।]

সাতু : কী ব্যাপার শুনবেন? ব্যাপারটা হয়েছে কী—আসানসোল অঞ্চলে এক শহরে একটা বিশেষ পাড়ায়, একটা বিশেষ বাড়ির একটা বিশেষ ঘরে—আমি একটা বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিলাম। ঠিক তখন পাশের ঘরটায়—একটা মেয়ে মরছিলো। যক্ষ্মায়—আর একটা বিশেষ রোগে। যখন গিয়ে দেখলাম—তখন—মবে গেছে। মরে না গেলে আর গিয়ে দেখতে যাবো কেন বলুন? মরতে থাকে তো অনেকেই—দেখতে গেলে চলে? নেহাত মরে গেছে বলেই—

[গ্লাসটা তুলে ঢক করে অনেকখানি খেলো। তারপর আগের মতোই ঝুঁকে বলতে লাগলো।]

দেখি কী—একটা বুড়ো নেড়িকুত্তা পাশটায় বসে আছে। কাউকে কাছে ঘেঁষতেই দেবে না! তা বললে কি চলে? পাঁচজনে মিলে কুকুরটাকে খেদিয়ে দিয়ে খাটিয়া ফাটিয়া এনে—বলহরি হরিবোল করে—এমনি একটা শ্মশানে এনে তাকে—

[আর এক ঢোক খেয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রাখলো]

কী জানি কেন—আমাকেই সবাই বললে মুখাগ্নি করতে। আমারও মনে হোলো—সেই ভালো। সেইটাই সবরকমে ভালো হবে। ঠিক হবে। কিন্তু ওই কুকুরটা—যেই আমি আগুন ছুঁইয়ে ফিরছি—অমনি—অমনি—

[দীর্ঘ আর্তস্বরে কুকুরটা কেঁদে উঠলো বাইরে। সাতু একটা উন্মত্ত চিৎকার করে এক লাফে বাইরে গিয়ে পড়লো। ঢিলের পর ঢিল তুলে ছুড়তে লাগলো আর চেঁচাতে লাগলো।]

গেট আউট! গেট আউট! গেট আউট—ইউ ব্লাডি শুয়ারকা বাচ্চা!

[হিমাদ্রি ধড়মড় করে উঠে বসলো। শশীও চমকে খাড়া হয়ে বসলো। কার্তিক একচুল নড়লো না।]

হিমাদ্রি : কে—কী—সাতুবাবু! (উঠে দাঁড়ালো)

কার্তিক : (হাত নেড়ে) বোসো বোসো—কিছু হয়নি।

[সাতু খানিকক্ষণ দরজায় দাঁড়িয়ে রইলো, বাইরের দিকে চেয়ে। তারপর দ্রুত চলে গেলো চিতার দিকে।]

হিমাদ্রি।

হিমাদ্রি : অ্যাঁ?

কার্তিক : একবার খুঁচিয়ে দিয়ে আসবে নাকি?

হিমাদ্রি : হ্যাঁ যাই।

কার্তিক : সাতুবাবুকেও নজর কোরো একবার।

হিমাদ্রি : আচ্ছা।

[দরজায় গেলো]

কার্তিক : তবে ঘাঁটিয়ো না।

[হিমাদ্রি ফিরে তাকালো। তারপর কিছু না বলে বেরিয়ে গেলো]

শশী : কী হয়েছে কী?

[মেয়েটা অন্ধকারে খিলখিল করে হেসে উঠলো। আলো জ্বলে উঠলো তার ওখানে।]

মেয়েটা : কী হয়েছে জানো না? জানো না কী হয়েছে? পাগলা ঘোড়া খেপেছে!

[হেসে যেন কুটি কুটি হয়ে পড়লো]

কার্তিক : কী আবার হবে? সব মানুষের যা হয়।

শশী : সব মানুষের কী হয়?

কার্তিক : খেপে মধ্যে মধ্যে।

শশী : (অল্প থেমে) আপনাকে তো খেপতে দেখি না?

কার্তিক : খেপবার মতো কোনো কিছু ঘটেনি বোধ হয় আমার জীবনে।

মেয়েটা : সত্যি? সত্যি বলছো? পাগলা ঘোড়া তোমাকে দেখেনি? তোমার দিকে যায়নি? আমারই মতো? সত্যি?

শশী : কেন ঘটেনি?

কার্তিক : অ্যাঁ?

শশী : ঘটলো না কেন?

কার্তিক : কী জানি?

মেয়েটা : কেন এমন হয় বলতে পারো? কেন এমন অবিচার? পাগলা ঘোড়াটা কি কানা? সবাইকে দেখতে পায় না? ও—বুঝেছি। চোখে ঠুলি দেওয়া, না? ঠুলি-ঢাকা চোখ!

শশী : আচ্ছা কার্তিক-দা?

কার্তিক : বলুন।

শশী : এ মেয়েটা মরলো কীসে?

মেয়েটা : কী হবে? কী হবে সে কথা দিয়ে?

কার্তিক : হার্টফেল। হার্টের রোগ।

শশী : হার্টের রোগ?

কার্তিক : অ্যানজাইনা পেক্টোরিস।

শশী : ও। (অল্প থেমে) সার্টিফিকেটে বুঝি তাই লিখেছে ডাক্তার?

কার্তিক : হ্যাঁ।

মেয়েটা : ও। (অল্প থেমে) তাই ভাবছি।
কার্তিক : অ্যাঁ?
শশী : বলছিলাম— ভাবছি।
কার্তিক : ও। (অল্প থেমে) তারা তারা মা! (এক চুমুক খেলো) কী ভাবছেন?
মেয়েটা : ভাবছি—মেয়েটা মরলো কীসে।
কার্তিক : ও।
মেয়েটা : কী আসে যায়? কী হবে জেনে? বাঁচলাম কীসে? বাঁচলাম কী নিয়ে—কী দিয়ে—কেউ বলে দিতে পারে?
শশী : আপনি জানেন?
কার্তিক : কী?
শশী : মরলো কীসে?
কার্তিক : হ্যাঁ জানি।
শশী : (অল্প থেমে) কীসে?
কার্তিক : দম বন্ধ হয়ে।

[মেয়েটা দু'হাত গলায় চেপে ধরলো]

শশী : (অল্প থেমে) গলায় দড়ি?
কার্তিক : হ্যাঁ।
শশী : আপনি জানলেন কী করে?
কার্তিক : ডাক্তার বলেছে।
শশী : ভাগ দেয়নি?
কার্তিক : দিয়েছিলো।
শশী : (অল্প থেমে) নেননি?
কার্তিক : (অল্প থেমে) না।
শশী : (অল্প থেমে) কেন?

[কার্তিক একটু হাসলো। তারপর গ্লাসটা তুলে নিলো।]

কার্তিক : তারা তারা ব্রহ্মময়ী মা!

[মেয়েটা হঠাৎ কার্তিকের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালো]

মেয়েটা : কী আছে তোমার ভিতরে? অতো ঠাণ্ডা থাকো কী করে তুমি? তোমার ভিতরটা জ্বলে না? পাগলা ঘোড়ার অবিচারে তোমার ভিতরটা জ্বল জ্বল করে জ্বলে না?
শশী : কার্তিক-দা!
কার্তিক : উঁ?
শশী : আমার নেশা হয়েছে।
কার্তিক : উত্তম কথা। (থেমে) কীসে বুঝলেন?
শশী : মেয়েটার জন্যে দুঃখ হচ্ছে।
মেয়েটা : দুঃখ? আমি মরেছি বলে?

[খিলখিল করে হেসে উঠলো]

কার্তিক : মেয়েটার কাছে সবই সমান। বাঁচা মরা—কী আসে যায়?

[কার্তিক উঠে দাঁড়ালো। আড়মোড়া ভাঙলো।]

তারা তারা।

শশী : মেয়েটা বাঁচতে চায়নি?

কার্তিক : কী করতে চাইবে? ও তো জানতো না?

শশী : কী জানতো না?

কার্তিক : বেঁচে কী লাভ তা তো জানতো না?

মেয়েটা : কী লাভ, বলো? কী লাভ?

[কার্তিক জানলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে]

শশী : মরতে চেয়েছিলো?

কার্তিক : তাও চেয়েছে মাঝে মাঝে।

শশী : যন্ত্রণায়?

কার্তিক : না। (অল্প থেমে হঠাৎ দৃঢ়স্বরে) না।

[মেয়েটা দু'পা এগিয়ে এলো। যেন কাতর অনুনয়ে কী চাইছে কার্তিকের কাছে।]

মেয়েটা : দেবেন না?

কার্তিক : না, দেবো না।

মেয়েটা : কেন দেবেন না?

কার্তিক : কেন দেবো?

মেয়েটা : বেঁচে থেকে আমার কী লাভ, বলুন?

কার্তিক : (অল্প থেমে) যন্ত্রণা কি অসহ্য হয়ে উঠেছে?

মেয়েটা : যন্ত্রণা? (একটু থেমে) না, যন্ত্রণা নয়। যন্ত্রণার জন্যে আসিনি।

কার্তিক : তবে?

[মেয়েটা চুপ। কার্তিকের দৃষ্টি তীব্র হয়ে উঠেছে। কী যেন খুঁজছে সে।]

তবে মরতে চাইছো কেন?

মেয়েটা : (ধীরে ধীরে) জানি না। বোঝাতে পারবো না আপনাকে। বেঁচে—কী হয়? মানুষ বাঁচতে চায় কেন? কী পায়?

কার্তিক : কিছুই পাওনি বলে মরতে চাইছো?

মেয়েটা : বোধ হয়।

কার্তিক : কী পেতে চাও?

মেয়েটা : তাও জানি না। চাই—এইটুকু জানি। পাই না—এইটুকু জানি। কী চাইতে হয়, কী পাবার আছে, তা তো জানলাম না কোনোদিন।

[কার্তিকের দু'হাত মুঠো হয়ে উঠেছে]

আপনি বলতে পারেন? কী পাবার আছে? কী পেলে বাঁচা যায়?

কার্তিক : তোমার কথা আমি জানি না। তবে অনেক মেয়ে বাঁচতে পারে যদি—(থেমে গেলো)

মেয়েটা : (উদ্গ্রীবভাবে) কী, কী—বলুন! অনেক মেয়ে কী পেলে বাঁচতে পারে?

কার্তিক : (অন্যদিকে ফিরে) আমি জানি না ঠিক: হয় তো—ভালোবাসা।

মেয়েটা : ভালোবাসা? (ভেবে) কিন্তু সে কেমন—(হঠাৎ) আচ্ছা, আপনার তো অনেক বয়স হয়েছে?

কার্তিক : তা হয়েছে।

মেয়েটা : অনেক দেখেছেন—আপনি বলতে পাবেন?

কার্তিক : কী?

মেয়েটা : আমার—আমার মতো মেয়ে—কোনোদিন কি পারবে?

কার্তিক : কী?

মেয়েটা : ভালোবাসা পেতে? ভালোবাসতে?

কার্তিক : (অল্প থেমে) বেঁচে থাকলে—সবই সম্ভব।

মেয়েটা : সত্যি? সত্যি বলছেন?

কার্তিক : কিন্তু তাতেও যন্ত্রণা কম নয়।

মেয়েটা : যন্ত্রণা আমি চাই! সত্যি বলছি—যন্ত্রণা আমি চাই! যন্ত্রণাও হয় না বলে—আপনার কাছে—বিষ চাইতে এসেছিলাম। আমি মরতে চাই না। আমি বাঁচতে চাই—যন্ত্রণা চাই! কিন্তু (আবার হতাশায়)—তা কি হবে কোনোদিন? হবে না। হবে না। আপনি আমাকে দিন, বিষ দিন।

কার্তিক : না।

মেয়েটা : আচ্ছা, দেবেন না। অন্য উপায় আছে।

[ফিরলো]

কার্তিক : শোনো!

[মেয়েটা ফিরে দাঁড়ালো]

মেয়েটা : কী?

কার্তিক : তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছো না?

মেয়েটা : আপনি জানবেন কী করে?

কার্তিক : তুমি আমাকে—আর একটু সময় দেবে?

মেয়েটা : আপনাকে? আপনাকে কীসের সময় দেবো?

কার্তিক : তোমাকে বোঝাবার। বিশ্বাস করাবার।

মেয়েটা : (আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে) হবে না।

কার্তিক : যদি না হয়, তুমি যা ইচ্ছে কোরো। যদি চাও, আমি বিষও দেবো।

মেয়েটা : দেবেন?

কার্তিক : হ্যাঁ দেবো। তুমি—সাতদিন সময় দাও। সাতদিন পরে—এইরকম সময়ে তুমি আবার এসো। সেদিন যদি তোমাকে বিশ্বাস করাতে না পারি—তবে—তুমি যা চাও দেবো।

মেয়েটা : ঠিক?

কার্তিক : ঠিক।

মেয়েটা : আচ্ছা। (তারপর) দেখি।

[চলে গেলো মেয়েটা। কার্তিক তাকিয়ে রইলো।]

শশী : তবে কীসে?

কার্তিক : অ্যাঁ?

শশী : যন্ত্রণায় নয়, তবে কীসে?

কার্তিক : বোধ হয়—বেঁচে থাকবার কোনো মানে খুঁজে পায়নি বলে। (অল্প থেমে) বোকা। জানতো না তো?

শশী : কী?

কার্তিক : বেঁচে থাকলে—সবই সম্ভব।

[মেয়েটা আলোয়]

মেয়েটা : কী সম্ভব? কী সম্ভব?

কার্তিক : আর ক'টা দিন যদি বেঁচে থাকতো,—

মেয়েটা : কী হোতো—আর ক'টা দিন বেঁচে থাকলে? কী বলতে তুমি আমাকে? ছাই বলতে! ছাই! ছাই!

কার্তিক : আর ক'টা দিন—

মেয়েটা : কী হোতো? আমাকে মালতী করে দিতে পারতে? মিলি? লছমি? ছাই! ছাই! তার চেয়ে এই ভালো। এই যে জ্বলছে! জ্বলুক। যতো পারে জ্বলুক!

শশী : কী হোতো—আর ক'টা দিন বাঁচলে?

কার্তিক : না—হয়তো কিছুই হোতো না। আবার হতেও পারতো। কে বলতে পারে?

মেয়েটা : আমি বলতে পারি। কিছুই হোতো না। অনেকদিন দেখেছি। অনে—ক দিন—

কার্তিক : একটা কথা মনে হয় শুধু।

শশী : কী কথা?

কার্তিক : ধরুন যদি—আমার গল্পের ওই মুচিটার মতো কোনো একজন—বুড়ো হোক, কানা হোক, খোঁড়া হোক—কোনো একজন—কোনো একজনের মন যদি ভরে থাকতো ওকে নিয়ে—দিনের পর দিন—বছরের পর বছর—

মেয়েটা : হয়নি হয়নি তা হয়নি—তা যদি হোতো—উঃ তা যদি হোতো—

কার্তিক : আর সে কথা যদি কোনোদিন জানতো মেয়েটা—তাহলেও কি মরতো এরকম ভাবে?

মেয়েটা : মরতো ? (হেসে উঠলো) জানো না? জা-নো না তুমি?

শশী : কে জানে? হয়তো আরো কষ্ট পেতো। তখন মরতো।

মেয়েটা : হ্যাঁ মরতো। মালতীর মতো। মিলি লছমির মতো। মরার মতো মরতো। বাঁচার মতো বেঁচে মরতো!

কার্তিক : কে জানে? হয়তো তাই। সব প্রশ্নের উত্তর যদি মানুষের জানা থাকতো—

শশী : (হেসে ওঠে) তবে মানুষ আর মানুষ থাকতো না।

মেয়েটা : পাগলা ঘোড়া—কেন সেরকম করলে না? কেন আমাকে দিয়ে কারো মন ভরালে না? কেন কাউকে দিয়ে আমার মন ভরালে না? কেন তোমার চোখে ঠুলি? কেন? কেন?

[হিমাদ্রি ফিরে এলো। পেছনে সাতু। এসেই তার গ্লাসটা খালি করলো।]

হিমাদ্রি : শেষ হয়ে এসেছে শশীদা।

মেয়েটা : (মরা গলায়) শেষ হয়ে এসেছে? হোক। শেষ হোক। শেষ হোক।

[মেয়েটা অন্ধকারে ডুবে গেলো]

কার্তিক : (বোতলটা তুলে) হ্যাঁ, বোতলটাও শেষ হয়ে এলো।

শশী : (উঠে) চলুন যাওয়া যাক।

কার্তিক : (বোতলটা দেখিয়ে) সাতুবাবু?

সাতু : নাঃ আর থাক।

কার্তিক : শশীবাবু?

শশী : না।

কার্তিক : হিমাদ্রি?

হিমাদ্রি : না। চলুন যাই।

[এরা তিনজন কোণ থেকে গামছা নিয়ে কোমরে বাঁধছে]

কার্তিক : তোমরা এগোও ভাই, আমি এইটুকু শেষ করে দিয়ে যাচ্ছি। বেশিক্ষণ লাগবে না।

শশী : (হেসে) কার্তিকবাবু শেষ না দেখে নড়ে না। চলুন সাতুবাবু।

[তিনজনে বেরিয়ে গেলো। কার্তিক হাতের গ্লাসটা শেষ করলো এক চুমুকে। বোতলটা ভালো করে দেখলো—কতোটা বাকি আছে। তারপর উঠে গিয়ে কলসি থেকে খানিকটা জল ভরলো গ্লাসে। গ্লাসটা তুলে দেখলো—যেন মেপে ভরছে। আর একটু ঢাললো। উঠে দাঁড়িয়ে সাবধানে খানিকটা ফেললো। তারপর বোতলের তলানি হুইস্কিটুকু গ্লাসের জলে মেশালো। মেয়েটা ফুটে উঠেছে আলোয়। বসে আছে সে। দেখছে কার্তিককে।]

মেয়েটা : কী করছো?

[কার্তিক ট্যাঁক থেকে সাবধানে একটা কাগজের পুরিয়া বার করলো। খুলে ভিতরের সাদা গুঁড়ো পদার্থটা সাবধানে গ্লাসে ঢাললো। তার প্রতিটি কাজ যেন আগে থেকে ঠিক করে রাখা।]

মেয়েটা : ও কী—ও কী করছো তুমি? কী করছো?

[কার্তিক মঞ্চের মাঝখানে, সামনের দিকে। গ্লাসটা তুলে চোখের সামনে ধরে আস্তে আস্তে নাড়ছে—যাতে গুঁড়োটা গুলে যায় অথচ পানীয় না চলকে পড়ে। তার মুখে একটা প্রশান্ত হাসি, যেন এইমাত্র ভালো একটা রসিকতা শুনেছে।]

কার্তিক: কার্তিক কম্পাউন্ডার শেষ না দেখে নড়ে না, না? শেষ হয়ে গেছে শশীবাবু। শেষ হোলো এইবার!

মেয়েটা : কী বলছো তুমি? কী বলছো?

কার্তিক : সাত বছর। সাত বছর মুঠিটা ভরিয়ে রেখেছিলো। সাত বছর। কার্তিক কম্পাউন্ডার! সাত বছর বসে থেকে তুমি সাতটি দিন সময় চেয়েছিলে। তাও পেলে না!

[মেয়েটা ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠলো]

মেয়েটা : কী? কী? কী বললে?

কার্তিক : যাক! শেষ দেখা হোলো। আর কিছু দেখবার নেই। খেল খতম।

মেয়েটা : তুমি—তুমি সাত বছর—আমাকে—আমার জন্যে—?

কার্তিক : (প্রশান্ত হাসিমুখ, গ্লাসটা তুলে) তারা তারা মা! চিয়ার্স!

মেয়েটা : (চিৎকার করে) না না না না!

[কার্তিক ঠোঁট অবধি এনে হঠাৎ থামলো। ঘাড় বাঁকিয়ে কী যেন শোনবার চেষ্টা করছে। কী যেন ভাবছে।]

মেয়েটা : (আর্ত চিৎকারে) নামিয়ে নিয়ে এসো! এখনো পুড়ে শেষ হয়নি—এখনো জ্বলছে—নামিয়ে নিয়ে এসো—পাগলা ঘোড়া! ফিরিয়ে নিয়ে এসো—আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো—পাগলা ঘোড়া—!

[অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে মেয়েটা]

পাগলা ঘোড়া! পাগলা ঘোড়া!

[অন্ধকারে ডুবে গেলো মেয়েটা। শুধু তার চিৎকারের রেশ—প্রতিধ্বনির মতো—পাগলা ঘোড়া—আ—আ! কার্তিক স্থির দেহে তখনো শুনছে মুখের কাছে উদ্যত গ্লাস ধরে।]

কার্তিক : (ধীরে ধীরে) বেঁচে থাকলে—সবই সম্ভব? সাত দিন সময় দিলো না। সাতটা দিন। আমি—আমিও—কী? তবে কি শেষ দেখা হয়নি এখনো? বেঁচে থাকলে সবই সম্ভব?

[কে জবাব দেবে? কার্তিক ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে এপাশ ওপাশ তাকিয়ে দেখলো, যেন কী একটা শুনছে। তারপর গ্লাসের দিকে তাকালো। একটা নিশ্বাস ফেললো।]

তারা তারা মা!

[আস্তে আস্তে গ্লাসের পানীয়টা মাটিতে ঢালতে লাগলো। পর্দা বন্ধ হয়ে গেলো আস্তে আস্তে। শেষ বিন্দুটুকু তখনো ঢালছে মাটিতে কার্তিক—আস্তে আস্তে—সাবধানে।]

এনুগু, নাইজেরিয়া
২০ জানুয়ারি থেকে ২৫ জানুয়ারি
১৯৬৭

সার্কাস

মুখবন্ধ

'সার্কাস' নানা কারণে অভিনয় করা হয়নি, প্রকাশ করতেও আমি চাইনি। পরে 'শেষ নেই' লেখা হয়েছে, সার্কাসের বিষয়বস্তুর অনেকটাই সেই নাটকে বলা হয়েছে, যদিও সম্পূর্ণ অন্য নাট্যশৈলীর মাধ্যমে।

প্রথম অঙ্ক

[কয়েকটা 'বাক্স' এদিকে ওদিকে, বসবার জন্য। একটা লম্বা প্ল্যাটফর্ম—খাটের আকারের। একটা টেবিল। কুমার বসে কাজ করছে। রত্না এলো।]

কুমার : কী ব্যাপার? তুমি?

রত্না : কেন, আসতে নেই?

কুমার : না না, কেন আসবে না? কিন্তু—কারণটা কী?

রত্না : কারণ একটা থাকতেই হবে? (কুমার চুপ) আমাকে দেখে খুশি হবে না জানতাম—

কুমার : আমার খুশি-অখুশিতে আজকাল আর তফাত নেই বিশেষ। (রত্না চুপ) কেমন আছো?

রত্না : তুমি কেমন আছো?

কুমার : (হেসে) প্রশ্নের উত্তরে পালটা প্রশ্ন?

রত্না : হ্যাঁ।

কুমার : বেঁচে আছি।

রত্না : সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

কুমার : দেখেই কি সবসময়ে বোঝা যায়?

রত্না : কী জানি? না বোধ হয়।

কুমার : তুমি কেমন আছো?

রত্না : আমি কেমন আছি তাতে তোমার কিছু আসে যায় আজকাল?

কুমার : (হেসে) 'আজকাল'?

রত্না : হ্যাঁ, আজকাল। একদিন খুবই আসতো যেতো জানি। আজ আমার জন্যে তোমার জীবনের ছকে এক চুল এদিক ওদিক হয় না।

কুমার : আমার জীবনের ছকটা কী?

রত্না : জানি না। শুধু জানি—সে ছকে আমার মতো মানুষের জায়গা নেই।

কুমার : কোন মানুষের জায়গা আছে?

রত্না : কোনো মানুষেরই নেই বোধ হয়। সব-মানুষকে নিয়ে তুমি এতো ব্যস্ত যে আলাদা আলাদা মানুষের কোনো দাম নেই তোমার কাছে।

কুমার : (একটু থেমে) এতোই যদি বুঝেছো তো বার বার আমার কাছে আসো কেন?

রত্না : কেন আসি, সে তুমি বুঝবে না।

কুমার : একদিন বলতে—আমি তোমাকে যতোটা বুঝি, আর কেউ কোনোদিন ততোটা বোঝেনি।

রত্না : হ্যাঁ, সত্যি কথা। একদিন নয়, আজও মধ্যে মধ্যে তাই মনে হয়। আমি মেলাতে

পারি না কুমারদা, সব গুলিয়ে যায় আমার। অনেকদিন আগে যখন আমি মরতে বসেছিলাম—

কুমার : ওসব পুরোনো কথা টেনে আনছো কেন?

রত্না : যেদিন মনে হয়েছিলো—আমার যা ছিল সব গেছে, কিচ্ছু বাকি নেই, সেদিন কোত্থেকে হাজির হলে তুমি—

[অন্ধকার হয়ে গেছে রত্নার কথার মধ্যে। তারপর একটা আলো পড়লো রত্নার উপর। স্থির হয়ে বসে আছে সে শূন্য চোখে তাকিয়ে। কুমার পিছনে এক কোণে, আধা-অন্ধকারে।]

কুমার : ওসব চিন্তা ছেড়ে দাও রত্না।

রত্না : (চমকে) কী চিন্তা?

কুমার : ওইসব অন্ধকার চিন্তা।

রত্না : আমার চিন্তা আপনি কী করে জানবেন?

কুমার : যা জানি, তাই যথেষ্ট।

রত্না : কী জানেন আপনি?

কুমার : আমি জানি—মরা খুব সোজা, বাঁচা অতো সহজ নয়।

রত্না : কী নিয়ে বাঁচবো আমি? কিছুই যে বাকি নেই আর।

কুমার : ওই একটা মানুষ না থাকলে কিছুই বাকি থাকে না তোমার?

রত্না : দেখছি তো—থাকে না।

কুমার : জোচ্চোর!

রত্না : কুমারদা!

কুমার : জোচ্চোর! ঠগ! ঠকিয়ে বেঁচেছো এতোদিন!

রত্না : কাকে ঠকিয়েছি?

কুমার : নিজেকে! একটা মানুষের খুঁটিতে নিজের জীবনটাকে ঝুলিয়ে রেখেছো পরগাছার মতো! ফাঁকি দিয়েছো জীবনকে! জীবন অতো সস্তা?

রত্না : আমি বুঝতে পারছি না কুমারদা—

কুমার : কোত্থেকে বুঝবে? সব জানা বোঝা তো বিসর্জন দিয়েছো ওই একটা মানুষের কোলে! আজ সে মানুষটা নেই, তাই আরো বড়ো জোচ্চুরি করে জীবনটাকে ফেলে পালাবার কথা ভাবছো! কাপুরুষ!

রত্না : চুপ করুন! আমি আর সহ্য করতে পারছি না—

কুমার : (হিংস্রভাবে ভেংচে) 'সহ্য করতে পারছি না'! ভালোবাসার খোলার আড়ালে এতোদিন লুকিয়ে ছিলে শামুকের মতো! আজ খোলাটা গেছে, আজ সহ্য করতে পারছো না!

রত্না : কুমারদা কুমারদা—সমস্ত দুনিয়ায় একমাত্র আপনি আমার কথা বোঝেন—

কুমার : কে কুমারদা? কে তোমার কুমারদা? বুঝে কী করবে সে? জীবনটাকে ফাঁকি দিয়ে বাঁচছিলে, আজ জীবনের মার খাচ্ছো। উলটে মারবার ক্ষমতা যদি না থাকে, কোন কুমারদা এসে রক্ষা করবে তোমাকে?

রত্না : আমি একা পারছি না কুমারদা—

কুমার : না পারো তো মরো গে যাও! তোমার মতো একটা জোচ্চোর কাপুরুষ দুনিয়ায় রইলো কি রইলো না, তাতে আমার কিছু যায় আসে না!

রত্না : (আর্ত চিৎকারে) কুমারদা!

[কুমার কাছে এসে রত্নার উপর ঝুঁকে দাঁড়ালো হিংস্র ভঙ্গীতে]

কুমার : জন্মেছো কী করতে? জন্মেছো কী করতে তুমি? দাম দিতে হবে না? হিসেব চোকাতে হবে না জীবনের সঙ্গে? অন্য মানুষ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে? তোমার দেনা অন্য মানুষ শুধবে? জোচ্চোর কোথাকার!

রত্না : (অস্ফুট স্বরে) কুমারদা—

[কুমার দুই বাহু ধরে হ্যাঁচকা টানে রত্নাকে দাঁড় করিয়ে দিলো]

কুমার : উঠে দাঁড়াও! তাকিয়ে দেখো! জীবনটাকে দেখো! মার খেতে শেখো, উলটে মারতে শেখো! তা যদি না পারো তো আমাকে মুখ দেখাতে এসো না জীবনে কোনোদিন!

[এক ধাক্কায় সামনের দিকে রত্নাকে ঠেলে দিয়ে কুমার সবেগে চলে গেলো। রত্না চেয়ে রইলো বিহ্বলভাবে সামনের দিকে। তারপর যেন আস্তে আস্তে খাড়া হয়ে উঠতে লাগলো। মুখের দুর্বল যন্ত্রণা যেন প্রতিরোধে কঠিন হয়ে উঠতে লাগলো। অন্ধকার হয়ে গেলো।]

রত্না : সেদিন কোত্থেকে এসে হাজির হলে তুমি, এক ধাক্কায় বার করে দিলে অচেনা দুনিয়ার মুখোমুখি করে!

[আলো। কুমার আর রত্না আগের জায়গায়।]

কুমার : তুমি মুখোমুখি হয়েছিলে। বাঁচতে আরম্ভ করেছিলে।

রত্না : জানি তুমি কী বলতে চাইছো। বাঁচতে 'আরম্ভ' করেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিনি—এই তো?

কুমার : আমি তা বলিনি—

রত্না : না বলোনি, কিন্তু তাই তোমার বক্তব্য। শামুকের খোলা আমার আবার দরকার হোলো, তোমাকে খোলা করতে চাইলাম আমি। এই তো? এই তো?

কুমার : (ধীরে ধীরে) তুমি আজ কেন এসেছো রত্না? (রত্না চুপ) কী চাও তুমি আমার কাছে?

রত্না : কিছু চাই না! তুমি তোমার কাজ নিয়ে থাকো!

[বেরিয়ে গেলো রত্না। কুমার বাধা দিলো না, ফিরে তাকালো না। একটা সিগারেট বের করলো। রত্না ফিরে এলো।]

একবার ফিরেও ডাকলে না?

[কুমার ফিরলো না, সিগারেটটা ধরালো। রত্না কাছে এলো।]

কুমার : (ধীরে ধীরে) কী চাও তুমি আমার কাছে?

রত্না : আমার কিছু টাকা দরকার, দিতে পারবে?

কুমার : কেন বাজে কথা বলছো?

রত্না : আর কী দিতে পারো তুমি আমায়? আমি বিপদে পড়লে টাকা দিতে পারো, অসুখ হলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারো, মরলে খাটিয়া কাঁধে নিতে পারো—

কুমার : কী হয়েছে তোমার রত্না?

[রত্না তক্ষুনি জবাব দিলো না। বসলো।]

রত্না : আমার শীত করছে।

কুমার : শীত করছে?

রত্না : হ্যাঁ। বড়ো একা লাগছে। আমার কেউ নেই।

কুমার : রত্না, তুমি কি আজ অভিযোগ জানাতে এসেছো?

রত্না : অভিযোগ? আমি কখনো কিছু দাবি করেছি তোমার কাছে? কোনো জোর করেছি কোনোদিন?

কুমার : না, করোনি, কিন্তু করলে ঠিকই করতে। তুমি বলো—আমি তোমাকে বাঁচিয়েছি একদিন। আমাকে তুমি কম বাঁচাওনি তার থেকে।

রত্না : এসব বাজে কথা—

কুমার : না। সত্যি কথা। একটা প্রচণ্ড ক্লান্তি, প্রচণ্ড শূন্যতার মুহূর্তে আমি আঁকড়ে ধরেছিলাম তোমার ভালোবাসাকে—

রত্না : কিন্তু আমি কিছুই দিতে পারিনি তোমাকে। আমিও তো শূন্য। তুমি যা চাও, আমি দেবো কী করে?

কুমার : আমি কী চাই?

রত্না : জানি না। শুধু এইটুকু জানি—তুমি এই দুনিয়াটাকে চাও না। অন্য কোনো দুনিয়া চাও। পাও না, হয়তো পাবেও না, তবু চাওয়া ছাড়ো না।

কুমার : চাওয়া ছেড়ে দিলে ভালো হোতো?

রত্না : (না শুনে) কিন্তু আমি তো এই দুনিয়ারই মানুষ। আমার ভালোবাসা তো এই দুনিয়ারই ভালোবাসা। সে নিয়ে তোমার কী হবে?

কুমার : চাওয়া ছেড়ে দিলে ভালো হোতো?

[রত্না কুমারের দিকে চেয়ে যেন প্রশ্নটা বুঝলো]

রত্না : না। এ চাওয়াটাই বোধ হয় তুমি। তুমি 'তুমি' বলেই আমি ছুটে ছুটে আসি। আবার 'তুমি' বলেই ধাক্কা খেয়ে ফিরে যাই।

কুমার : আমি কী?

রত্না : (হঠাৎ তীব্র প্রশ্নে) সত্যি, তুমি কী? বলতে পারো—তুমি কী? দুনিয়ার সবাই তো কিছু না কিছু নিয়ে মানিয়ে নিয়েছে, সন্ধি করেছে দুনিয়ার সঙ্গে। তুমি পারো না কেন?

কুমার : সবাই নয়। আরো কিছু আছে আমার মতো, যারা পারেনি সন্ধি করতে—

রত্না : কেন পারেনি তারা? কেন পারো না তুমি? তুমি—তোমরা—দুর ছাই! কী যা তা বকছি?—চলি।

কুমার : (নিজের মনে) আমাদের ইতিহাসেই গণ্ডগোল হয়ে গেছে। (রত্না দাঁড়িয়ে

গেলো) ভালোবাসতে আমরাও চেয়েছিলাম। ভালোবাসা এখনো আমাদের দরকার হয়। কিন্তু সবটা ভরে না।

রত্না : খুব সামান্যই ভরে।

কুমার : (হঠাৎ) তুমি কীসে এলে? বাসে?

রত্না : (অবাক হয়ে) হ্যাঁ। কেন?

কুমার : বাসস্টপ থেকে হেঁটে আসবার পথে কী দেখলে?

রত্না : কী দেখবো? যা দেখা যায় বরাবর?

কুমার : একটা ছোট্ট মাচায় বসে একজন পান বেচছে, তার নিচে ছোট্ট খুপরিতে বসে দু'জন বিড়ি পাকাচ্ছে। ফুটপাথে ফলওয়ালা, কাপড়ওয়ালা, জুতো-পালিশ, ভিখিরি, আবর্জনা আর ষাঁড়। মানুষ রাস্তায় হাঁটছে, গাড়ি হর্ন দিচ্ছে, রিকশাওয়ালা মোটা মোটা তিনজনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, ঠেলাওয়ালা—

রত্না : এসব কী বলছো?

কুমার : দেখেছো কি না বলো? বাসের হাতল ধরে মানুষ ঝুলছে, ভাঙা পুরোনো বাড়ির পাইপ ফেটে জল ছিটিয়ে পড়ছে রাস্তায়। একটা পকেটমার ধরা পড়েছে, আর যতো চেপে রাখা রাগ তাকে পিটিয়ে ঠান্ডা হতে চাইছে। ছেলেগুলো গলিতে ক্যাম্বিসের বল পিটছে, রকে বসে খিস্তি করছে, মেয়ে দেখলে শিস দিচ্ছে। বস্তির কলে বালতি নিয়ে ঝগড়া চলছে, বাচ্চারা নর্দমায় খেলছে, দশ বছরের ছেলে চায়ের দোকানে চোদ্দ ঘণ্টা খাটছে, আর খেতে পাচ্ছে না খেতে পাচ্ছে না কেউ খেতে পাচ্ছে না!

রত্না : বুঝলাম।

কুমার : কী বুঝলে?

রত্না : তাই তোমার শান্তি নেই।

কুমার : কচু বুঝেছো!

রত্না : বুঝিনি?

কুমার : এসব বদলে দেওয়া যায়, জানো? পথ আছে।

রত্না : পথ আছে?

কুমার : একদিন কাজ করতে পারছিলাম না। কাজ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তখন তোমার ভালোবাসাকে আঁকড়ে ধরেছিলাম। আমাকে খাড়া থাকতে সাহায্য করেছিলে তুমি সেদিন—

রত্না : এসব কথা শুনতে চাইনি আমি—

কুমার : কিন্তু একটা মানুষ আমাদের ইতিহাস বদলে দিতে পারে না। আমাদের চাওয়া বদলে দিতে পারে না!

রত্না : আমি কি বদলে দিতে চেয়েছি?

কুমার : না, চাওনি, কিন্তু—কী করে বোঝাবো তোমাকে? পথ আছে, পথ পাচ্ছি, হয়তো পেয়েও যাবো, কিন্তু—হবে না।

রত্না : আমি বুঝতে পারছি না।

কুমার : আমি এখন কী নিয়ে কাজ করছি জানো? ইনস্টিটিউটে? বাড়িতে?

রত্না : না।

কুমার : লাখ লাখ বেকার শহরে। কোটি কোটি খুদে চাষি, খেতমজুর গ্রামে। সবাই কাজ পেতে পারে, পেট ভরে খেতে পারে! আমি প্রমাণ করে দিতে পারি!

রত্না : কী বলছো তুমি?

কুমার : হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যি! কিন্তু হবে না। কতকগুলো লোকের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে হবে না! হবে না, কিন্তু আমরা কী কববো বলে দিতে পারো? ভালোবাসবো? মাথা খুঁড়ে মরবো? ঠ্যাঙ ছড়িয়ে বসে কাঁদবো?

রত্না : কুমারদা—

কুমার : না গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়বো?

রত্না : কুমারদা, আমি—

কুমার : কতো বয়স আমার জানো?

রত্না : জানি—

কুমার : আমরা সবাই জন্মেছিলাম—যখন শতাব্দীর বয়স কম ছিল, যখন শতাব্দী এতো বুড়ো হয়নি, যখন—যখন—

[থেমে গেলো। একরাশ ক্লান্তি।]

আজ সব ফ্যালারাম গড়াই!

রত্না : সে আবার কে?

[অন্ধকার হয়ে গেলো। ব্যান্ড বেজে উঠলো—সার্কাসের ব্যান্ড। আলো। কুমার রত্না নেই। কয়েকজন নানা সরঞ্জাম এনে মঞ্চে সার্কাসের একটা আভাস আনছে। ম্যানেজার ঢুকলো, হাতে চাবুক।]

ম্যানেজার: ফ্যালারাম! ফ্যালারাম কোথায়?

[সকলে ছুটোছুটি করে ডাকতে লাগলো]

সকলে : ফ্যালারাম! এই ফ্যালারাম? ফেলু! ফ্যালা! নেই স্যার! নেই স্যার!

ম্যানেজার : (হুংকারে) নেই মানে?

সকলে : মানে পাচ্ছি না স্যার! পাওয়া যাচ্ছে না স্যার!

ম্যানেজার : (হুংকারে) পেতেই হবে!

সকলে : ইয়েস স্যার!

[আবার ছুটোছুটি, ডাকাডাকি, প্রেক্ষাগৃহ-মঞ্চ ভরে]

ফ্যালারাম! ফেলু! ফেলুরাম! ফ্যালাই! ফেলুয়া! হেই ফেলু! ফেলিয়া হো! ফেলুদা! ফেলু বাবু! ফ্যালাইয়া হো!

[মঞ্চ খালি, ম্যানেজারও চলে গেছে। বাক্সগুলোর আড়াল থেকে সন্তর্পণে মাথা তুললো ফেলু, এদিক ওদিক দেখলো। ম্যানেজার এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। বেরোবার আগেই ম্যানেজারকে দেখতে পেয়ে ফিরে গেলো বাড়ানো ঠ্যাঙ, ডুব দিলো ফেলু বাক্সের আড়ালে।]

ম্যানেজার : ফ্যালারাম! (উত্তর নেই) ফ্যালারাম!

ফেলু : (আড়াল থেকে) নেই স্যার।
সকলে : (নেপথ্যে) নেই স্যার! নেই স্যার!
ম্যানেজার : চোপ!
সকলে : (নেপথ্যে) চোপ! এই চোপ! চোপ বলছি!
ফেলু : (আড়াল থেকে) চোপ!
ম্যানেজার : ফ্যালারাম!
ফেলু : চোপ!
ম্যানেজার : কী??
ফেলু : না স্যার!
ম্যানেজার : কী 'না'?
ফেলু : 'চোপ' না স্যার!
ম্যানেজার : তার মানে?
ফেলু : মানে—আমি 'চোপ' স্যার, আপনি না!
ম্যানেজার : বেরিয়ে এসো!
ফেলু : কে স্যার?
ম্যানেজার : তুমি।
ফেলু : আমি কে স্যার?
ম্যানেজার : তুমি ফ্যালারাম।
ফেলু : বোধ হয়—না স্যার।
ম্যানেজার : (হুংকারে) ফের বাজে কথা?
ফেলু : ইয়েস স্যার!
ম্যানেজার : কী বললে??
ফেলু : নো স্যার!
ম্যানেজার : তুমি বেরোবে কি না?
ফেলু : নো স্যার! মানে—ইয়েস স্যার!
ম্যানেজার : ওয়ান!
ফেলু : ইয়েস স্যার!
ম্যানেজার : টু!
ফেলু : (কাতরকণ্ঠে) ইয়েস স্যার!
ম্যানেজার : থ্রি!
ফেলু : (আর্তকণ্ঠে) ইয়েস স্যার!

[এক লাফে বেরিয়ে এলো, স্যালুট ঠুকলো, অ্যাটেনশান]

ম্যানেজার : শো আরম্ভ হয়ে গেছে, জানো?
ফেলু : না স্যার।
ম্যানেজার : (ধমকে) জানো না?
ফেলু : আর করবো না স্যার!

ম্যানেজার : কী করবে না?

ফেলু : আর জানবো না।

ম্যানেজার জানবে না মানে?

ফেলু : না স্যার। জানবো!

ম্যানেজার কী জানবে?

ফেলু : যা বলবেন স্যার।

ম্যানেজার কী বলেছি?

ফেলু : ওই—ইয়ে—

ম্যানেজার কী?

ফেলু : (কাতরকণ্ঠে) ভুলে গেছি স্যার!

ম্যানেজার গেট আউট!

ফেলু : ইয়েস স্যার।

[একদিকে হাঁটা লাগালো]

ম্যানেজার : ওদিকে কোথায় যাচ্ছো?

ফেলু : নো স্যার!

[উলটোদিকে হাঁটলো]

ম্যানেজার কী পেয়েছো কী এটা?

ফেলু : সার্কাস স্যার!

ম্যানেজার মনে থাকে না কেন?

ফেলু : আর করবো না স্যার!

ম্যানেজার কী করবে না?

ফেলু : আর মনে রাখবো না। না না! মানে—আর মনে—আর মনে রাখবো না 'না' স্যার!

ম্যানেজার : (গর্জে) শাট আপ!

ফেলু : (সমান চিৎকারে) ইয়েস স্যার!

ম্যানেজার : শুরু করো!

[ম্যানেজার বেরিয়ে গেলো। ব্যান্ড বেজে উঠলো—সার্কাসের ব্যান্ড। ফেলু বাক্সের আড়াল থেকে ক্লাউনের টুপি নিয়ে পরে ক্লাউনের ফাটা ডান্ডা নিয়ে একটা বাক্সের উপর লাফিয়ে উঠলো। ব্যান্ড থামলো।]

ফেলু : হুর্‌র্‌র্‌র্‌র্ হা! লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন! ওয়েলকাম টু দ্য গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস! আমি শ্রীফ্যালারাম গড়াই—গ্রেট ক্লাউন অফ দ্য গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস! বয়স চুয়াল্লিশ। বিশ্বাস হচ্ছে না? মাইরি বলছি স্যার—উনিশশো ছাব্বিশ সালে আমার জন্ম। আর এখন হোলো উনিশশো সত্তর। হিসেব করে নিন? চুয়াল্লিশ হোলো না? তবে? অকাট্য প্রমাণ—হুর্‌র্‌র্ হা!

[নেমে সামনে এলো]

জানেন, আমি একদিন ছোট ছিলাম। ছাত্র ছিলাম—কলেজের ছাত্র। সে-ই

উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে। চেহারাটা তখনো এইরকম বাঁদরের মতো ছিল, তবে বুড়ো বাঁদর নয়, তরুণ বাঁদর। পঁয়তাল্লিশ সাল মনে আছে আপনাদের? অনেকে বোধ হয় জন্মাননি, কিংবা জন্মালেও হামা দিতেন তখন। কতো সব ছেলে ছিল তখন—ভাস্কর, দিলীপ, ভানু, অজয়, ব্রতীন, বিশু। আর মেয়ে—মঞ্জু, মিনু, কাজল, সীমা। তারা সব কোথায়? সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। কেউ কেউ মরে গেছে, বাকি সব এখনো বেঁচে আছে। চাকরি করছে, সংসার করছে, ফ্যা ফ্যা করছে। আর আমি—শ্রীফ্যালারাম গড়াই—গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের ক্লাউন। হুর্‌র্‌র্—কে?

[একটা দল ঝাণ্ডা-পোস্টার নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে এলো। সামনে সমীর আর ভাস্কর। সমীর স্লোগান দিচ্ছে।]

সমীর : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ—

সকলে : ধ্বংস হোক!

সমীর : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ—

সকলে : ধ্বংস হোক!

সমীর : হিন্দু মুসলিম—

সকলে : এক হো!

সমীর : হিন্দু মুসলিম—

সকলে : এক হো!

[সমীর একটা বাক্সের উপর উঠে দাঁড়ালো। সবাই তাকে ঘিরে, ফেলুও।]

সমীর : বন্ধুগণ! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দিন শেষ হয়ে গেছে। ভারতবর্ষে তাদের এতোদিনকার ঘৃণ্য বিভেদনীতির মুখোশ খুলে গেছে। হিন্দু মুসলমান আজ এক হয়ে এক গলায় গর্জে উঠেছে—সাম্রাজ্যবাদ, ভারত ছাড়ো! ধর্মতলায় ছাত্রদের রক্তে, আরব সাগরে নৌবাহিনীর বিদ্রোহী নেতাদের রক্তে—সব বিভেদনীতি ধুয়ে মুছে গেছে, সব ঝাণ্ডা এক হয়ে গেছে। বুড়ো অথর্ব ব্রিটিশ সিংহ আজ সমুদ্রের ওপারে বসে থরথর করে কাঁপছে। বন্ধুগণ, ইনিয়ে বিনিয়ে বন্দেমাতরম বলার দিন পার হয়ে গেছে, আজ সারা ভারতবর্ষের শ্রমিক কিষাণ ছাত্র—তামাম জনসাধারণের একমাত্র স্লোগান—(চিৎকার করে) ইনকিলাব!

সকলে : জিন্দাবাদ!

সমীর : ইনকিলাব—

সকলে : জিন্দাবাদ!

[সমীর নেমে এলো। স্লোগান দিতে দিতে সবাই বেরিয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে।]

ফেলু : ভাস্কর!

[ভাস্কর দাঁড়িয়ে গেলো, কিন্তু ফিরলো না]

ভাস্কর : কী?

ফেলু : মঞ্জুর বাড়ি কতোদিন যাওনি?

ভাস্কর : অনেকদিন।

ফেলু : কেন? (জবাব নেই) কেন যাওনি?

[ভাস্করের মা এলো। ফেলু সরে গেলো।]

মা : ভাস্কর!

[ভাস্কর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে]

কোথায় যাচ্ছিস?

ভাস্কর : বেরোচ্ছি।

মা : সে তো দেখতেই পাচ্ছি। যাচ্ছিস কোথায়?

ভাস্কর : (দুর্বিনীত স্বরে) কেন?

মা : (স্তম্ভিত) কেন মানে? (ভাস্কর চুপ) এমন কোথায় যাচ্ছিস যা বলতে পারিস না?

ভাস্কর : এমনি বেরোচ্ছি।

মা : মঞ্জুদের বাড়ি?

[ভাস্কর গোঁজ হয়ে রইলো]

অতো ঘন ঘন ওদের বাড়িতে যাবার কী দরকার?

ভাস্কর : ঘন ঘন যাই না আমি।

মা : মঞ্জুর মা বললো—প্রায় রোজই যাস।

ভাস্কর : মিথ্যে কথা বলেছে।

মা : কী বললি?

ভাস্কর : রোজ মোটেই যাই না আমি।

মা : রোজ তো বলিনি? প্রায় রোজ।

ভাস্কর : প্রায় রোজও যাই না।

মা : এর আগে কবে গেছিলি? (ভাস্কর চুপ) বল?

ভাস্কর : পরশু।

মা : তবে?

ভাস্কর : তবে কী?

মা : তবে বললি কেন--ঘন ঘন যাস না?

ভাস্কর : তার আগে অনেকদিন যাইনি।

মা : কতোদিন?

ভাস্কর : (হঠাৎ চেঁচিয়ে) কী বলতে চাও তুমি? কী—কী করেছি আমি—কী হয়েছে গেলে?

মা : কী হয়েছে, তা যদি—

ভাস্কর : কার কী ক্ষতি করেছি আমি? কারো কোনো—

মা : পড়াশুনো তো চুলোয় দিয়েছো!

ভাস্কর : আমার পড়া আমি বুঝবো!

মা : বুঝলে তো বাঁচতাম। এদিকে তো সারাদিন দেশোদ্ধারে ব্যস্ত। রাস্তায় রাস্তায় চোঙা ফোঁকা আর চেল্লানো—

ভাস্কর : রকবাজি করার থেকে ভালো।

মা : (চটে) রকবাজি করতে বলেছি আমি তোকে? (ভাস্কর চুপ) দেশ স্বাধীন করবে! ইংরেজ তাড়াবে! বাপ-মার সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয় শেখেনি, সে নাকি—কোথায় যাচ্ছিস?

ভাস্কর : বেরোচ্ছি।

মা : দেখ, বড্ডো বাড়াবাড়ি হচ্ছে!

ভাস্কর : মঞ্জুদের বাড়ি যাচ্ছি না আমি, বলে দিযো তোমার মঞ্জুর মাকে!

মা : তবে যাচ্ছিস কোথায়?

ভাস্কর : চুলোয়!

মা : ভাস্কর!

[কিন্তু ভাস্কর বেরিয়ে গেছে। মা রুদ্ধবাক খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে চলে গেলো। আগের দলটা গাইতে গাইতে মঞ্চ পার হয়ে গেলো—'আগে চলো আগে চলো আগে চলো চলো চলো, এ দুন্দুভি বাজে, চলো চূর্ণ কবি জীর্ণ কারাগার' (সলিল চৌধুরীর গান)। সমীর ছিল দলে, ভাস্কর ডাকলো।]

ভাস্কর : সমীর।

সমীর : বল।

ভাস্কর : চা খাবি?

সমীর : খেলে হয়।

[দু'জনে বসলো। যেন চায়ের দোকান।]

বল।

ভাস্কর : কী বলবো?

সমীর : কাল যা বলছিলি।

ভাস্কর : সবই তো বলেছি, আবার কী শুনবি?

সমীর : আসল কথাটাই বলিসনি।

ভাস্কর : কী কথা?

সমীর : তুই কি মঞ্জুকে ভালোবাসিস?

ভাস্কর : ওরকম ভাবে ভেবে দেখিনি। ওই নাটক-নভেলে যেরকম ভালোবাসার কথা পড়ি, তার সঙ্গে মেলাতে পারি না।

সমীর : ওকে তো তোর ভাল লাগে?

ভাস্কর : তা না লাগলে আর ছুটে ছুটে যাই কেন?

সমীর : ওর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে?

ভাস্কর : ভীষণ।

সমীর : ছুঁতে ইচ্ছে করে?

ভাস্কর : (একটু থেমে) করে। কিন্তু ছুঁই না। মানে, ছোঁয়া বলতে তুই যা মিন করছিস, তা নয়।

সমীর : মানে—'বুলু' নয়?

ভাস্কর : না বুলু নয়।
সমীর : তফাত কোথায়?
ভাস্কর : অনেক তফাত। বুলুর সঙ্গে আমার—বন্ধুত্ব ছিল না। হয়নি কোনোদিন।
সমীর : সম্পর্ক তো ছিল?
ভাস্কর : ছিল। ছোঁয়ার সম্পর্ক শুধু।
সমীর : গল্পও কম করিসনি?
ভাস্কর : সে গল্পের কোনো মানে নেই। সে ওই—ওই ছোঁয়ার মতোই।
সমীর : মঞ্জুর সঙ্গে গল্পের মানে আছে?
ভাস্কর : আছে। আমার কাছে আছে।
সমীর : কী মানে?
ভাস্কর : জানি না। (হঠাৎ অধৈর্য) কী হবে আর ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে? ওদের বাড়ি তো যাবো না আর।
সমীর : এ আবার কবে ঠিক করলি?
ভাস্কর : আজ।
সমীর : কেন? মা বারণ করেছে?
ভাস্কর : তার জন্যে না।
সমীর : তবে?
ভাস্কর : ওদের বাড়িতে পছন্দ করছে না আমার যাওয়া।
সমীর : ওই হোলো। তোর মা না হয়ে মঞ্জুর মা।
ভাস্কর : তফাত আছে। যে বাড়িতে তোর যাওয়া পছন্দ করে না, সে বাড়িতে যেতে ইচ্ছে করবে তোর?
সমীর : সেটা নির্ভর করছে—মঞ্জুর বাড়ি যেতে তোর কতোটা ইচ্ছে করছে, তার ওপর।
ভাস্কর : চুলোয় যাক ইচ্ছে!

[উত্তেজিতভাবে উঠে পড়লো ভাস্কর]

ইচ্ছে! আমার সবচেয়ে বেশি কী ইচ্ছে করে জানিস? একটা লড়াই হোক! ব্রিটিশদের দেশ থেকে তাড়াবার একটা শেষ লড়াই! আমি বাড়িঘর কলেজ-পরীক্ষা মঞ্জুফঞ্জু সব ভুলে ঝাঁপিয়ে পড়ি—সে বাঁচি আর মরি!
সমীর : সে কি তোর একার ইচ্ছে?
ভাস্কর : হয় না কেন রে? হয় না কেন বলতে পারিস? এই কচুপোড়া অহিংসা নীতির জন্যে? এই বোগাস অহিংসা আর চরকা আর খদ্দর—
সমীর : হচ্ছিলো মঞ্জুর কথা, তুই—
ভাস্কর : না হচ্ছিলো না! কারো কথা হচ্ছিলো না! ওসব ভুলে গেছি আমি। ওর কাছে আমি আর যাবো না! কোনোদিন যাবো না!
সমীর : যাবি না?
ভাস্কর : না!
সমীর : যদি কোনোদিন শুনিস—(থেমে গেলো)

ভাস্কর : কী শুনি?

সমীর : শুনিস—ওর বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে বাড়ি থেকে?

[ভাস্কর কথা বললো না। বসলো। তারপর ঘড়ি দেখে উঠে পড়লো।]

ভাস্কর : চল, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

[সমীর উঠলো। দু'জনে এগোলো। সমীর বেরিয়ে গেলো, কিন্তু ভাস্কর দাঁড়িয়ে পড়লো। মঞ্জু এলো।]

মঞ্জু : ভাস্করদা!

ভাস্কর : (ফিরে) কে—মঞ্জু?

[এগিয়ে এলো। মঞ্জুর চেহারা দেখে থমকে দাঁড়ালো।]

কী হয়েছে তোমার মঞ্জু?

মঞ্জু : আমি—আমি রাজি হয়েছি।

ভাস্কর : (প্রবল প্রতিবাদে) না!

মঞ্জু : এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই ভাস্করদা।

ভাস্কর : আছে! তুমি 'না' বলে দাও।

মঞ্জু : অতো জোর আমার নেই ভাস্করদা।

ভাস্কর : আছে!

মঞ্জু : তুমি কী করে জানবে?

ভাস্কর : (জোর দিয়ে) আমি জানি।

মঞ্জু : না, জানো না। আমার জোর নেই। আমি আর সব্বাইকে 'না' বলতে পারি, বাবাকে পারবো না।

ভাস্কর : কেন পারবে না?

মঞ্জু : বাবার খুব কষ্ট হবে।

ভাস্কর : বাবার কষ্ট তুমি সহ্য করতে পারবে না?

মঞ্জু : না। বাবা সারাজীবন অনেক দুঃখ পেয়েছেন। আমি সে দুঃখ বাড়াতে পারবো না।

ভাস্কর : তোমার বাবা তোমার ভালো চান না?

মঞ্জু : চান। বাবাকে বললে বাবা এ বিয়ে হতে দেবেন না।

ভাস্কর : তবে?

মঞ্জু : দেবেন না বলেই কষ্ট পেতে হবে। বাড়ির সবাই বাবার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে।

ভাস্কর : আত্মত্যাগ?

মঞ্জু : একে আত্মত্যাগ বলে না ভাস্করদা—

ভাস্কর : তবে কী বলে? কর্তব্য? পবিত্র দায়িত্ব?

মঞ্জু : তুমি বুঝতে চাইছো না।

ভাস্কর : বুঝিয়ে দাও।

মঞ্জু : এ আত্মত্যাগ নয়। কর্তব্য দায়িত্ব কিছু না।

ভাস্কর : তবে কী?

মঞ্জু : দুর্বলতা। অন্যাকে কষ্ট দিতে, যে ভালোবাসে তাকে কষ্ট দিতে—অনেক জোর লাগে ভাস্করদা। সে জোর আমার নেই।

ভাস্কর : (একটু থেমে) আমাকে কষ্ট দিতে জোর লাগে না?

মঞ্জু : (সোজা চোখে চোখে তাকিয়ে) না।

ভাস্কর : (অন্যদিকে ফিরে) ও।

মঞ্জু : তোমার 'কাজ' আছে ভাস্করদা। অনেক বড়ো কাজ।

ভাস্কর : তোমার মৃত্যু বন্ধ করাটা আমার কাজ নয়?

মঞ্জু : ক'টা মৃত্যু বন্ধ করবে এরকম করে? একটাও কি পুরো বন্ধ করতে পারবে?

ভাস্কর : (হঠাৎ, যন্ত্রণায়) আমি কলেজ ছেড়ে দেবো মঞ্জু, চাকরি জোগাড় করবো একটা যেমন করে হোক—

মঞ্জু : আমি সে কথা বলিনি ভাস্করদা, ভুল মানে কোরো না। এরকম করে একা একা যদি খুচরো মৃত্যু বন্ধ করা যেতো, তবে তুমি কাজ করো কেন? সমাজকে ভেঙে ঢেলে সাজাবার দরকার কেন হয় তোমার?

ভাস্কর : মঞ্জু তুমি—

মঞ্জু : এ তোমারই কথা ভাস্করদা, তোমার কাছেই শিখেছি। আমি কতোটুকু বুঝি? (ভাস্কর চুপ) তুমি কাজ করো ভাস্করদা, আমার 'মৃত্যু'-র কথা ভেবে আরো বেশি করে কাজ করো। এমন একটা সমাজ তৈরি করো যাতে এমন মৃত্যু আর না ঘটে। (ভাস্কর চুপ) আমি যাই।

ভাস্কর : (চমকে) মঞ্জু!

মঞ্জু : (নিজেকে শক্ত করে) আর সময় নেই ভাস্করদা, আমি যাই।

[মঞ্জু চলে যাচ্ছে। ভাস্কর নড়তে পারলো না, কথা বলতে পারলো না, কিছু বলতে পারলো না, কিন্তু এক কোণে আধা-অন্ধকারে চুপ করে বসে থাকা ফেলু হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো।]

ফেলু : মঞ্জু দাঁড়াও!

[মঞ্জু দাঁড়ালো, কিন্তু ফিরলো না। ভাস্কর স্থির।]

মঞ্জু : কী?

ফেলু : তুমি 'না' বলো। বাবাকে বলে দাও—তুমি পারবে না!

মঞ্জু : তা হয় না ভাস্করদা, বাবা মরে যাবে।

ফেলু : হ্যাঁ পারবে!

মঞ্জু : না—না—পারবো না --

ফেলু : (মঞ্জুর কথার উপর?) হ্যাঁ! হ্যাঁ! পারবে!

মঞ্জু : না ভাস্করদা না—ওরকম করে বোলো না!

ফেলু : পারবে! পারতেই হবে! বাঁচতেই হবে!

মঞ্জু : না—না—

ফেলু : মরে গেলে চলবে না! মরে যেতে আমি দেবো না! তোমাকে অন্ধকারে মরে

যেতে আমি দেবো না!

[মঞ্জুর প্রতিরোধ ক্রমে দুর্বল হয়ে আসছে]

মঞ্জু : না—ভাস্করদা—না—

ফেলু : অন্ধকারে তোমাকে মরে যেতে আমি দেবো না!

[প্রচণ্ড শব্দে ব্যান্ড বেজে উঠলো। ফেলু ছিটকে সরে গেলো, মঞ্জু শক্ত হয়ে বেরিয়ে গেলো, ভাস্কব স্থির। বাজনা থেমে এলো। দলটা ঢুকলো স্লোগান দিতে দিতে, সামনে সমীর। ভাস্কর দলের পিছনে মিশে গেলো। ফেলুও। মঞ্চ পার হয়ে অন্যদিকে আসতেই বাইরে তীক্ষ্ণ হুইসলের আওয়াজ। দলটা থেমে গেলো, স্লোগানও থামলো। সবাই বাইরের দিকে তাকিয়ে, ওদিকে যেন মুখোমুখি পুলিশের কর্ডন। একটা উগ্র নীরবতা। তারপর সমীর গলা ফাটিয়ে স্লোগান দিলো।]

সমীর : সরিগলি সরকারকো!

সকলে : এক ধাক্কা আওর দো!

[সমীর এগোলো, দলটাও। সমীর এখন বাইরে, তার সঙ্গে ফেলু এবং আর কয়েকজন। বাকি এখনো দৃশ্যমান, তাদের মধ্যে ভাস্কর। আবার হুইসল।]

সমীর : (নেপথ্যে) সরিগলি সরকারকো—

সকলে : এক ধাক্কা আওর দো!

[নেপথ্যে অর্ডার—'ফায়ার'! গুলির শব্দ। দলের সবাই হুড়মুড় করে মঞ্চে ঢুকে পড়লো। সে ধাক্কায় ভাস্কর ছিটকে পড়লো মঞ্চের মাঝখানের দিকে। আবার গুলির শব্দ। সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাচ্ছে। ভাস্কর উঠে দাঁড়ালো। তাকিয়ে আছে।]

ভাস্কর : (ফিসফিস করে) সমীর। (জোরে) সমীর! (গলা ফাটানো চিৎকারে) সমীর!

[নেপথ্যে হুইসল—দূর থেকে]

(প্রচণ্ড ঘৃণায়) কুত্তা! কুত্তার বাচ্চা! কুত্তার বাচ্চা!

[চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে বেরিয়ে গেলো ভাস্কর, যেদিকে সমীর বেরিয়েছিলো। ব্যান্ড বেজে উঠলো, সুর—'কারার এই লৌহকপাট'। বাজনার সুরে গাইতে গাইতে ফেলু ঢুকলো।]

ফেলু : শিকল পূজার পাষাণবেদী—হুর র্ র্ র্ হা! উনিশশো পঁয়তাল্লিশ। উনিশশো পঁয়তাল্লিশে আমারও বয়স ছিল উনিশ। বিশ্বাস হচ্ছে না? তা যদি না হবে, তবে উনিশশো ছেচল্লিশে কুড়ি হোলো কী করে? বলুন? কী করে হোলো? হুঁ হুঁ বাবা, অকাট্য প্রমাণ—নো কাটাকাটি। সব কলেজে তখন—হোস্টেলে—দিলীপ, অজয়, আরো কতো ছেলে।

[এক একদল ছেলে ঢুকছে, বেরোচ্ছে। প্রত্যেকের হাতে ডাণ্ডা, হকিস্টিক ইত্যাদি। তাদের মধ্যে অজয় আর দিলীপ।]

অজয় : দিলীপ! এদিকে চলে আয়। এই জানলায়।

[দিলীপ এলো। ওদের কথাবার্তার মধ্যে অন্যরা মাঝে মাঝে ছায়ার মতো চলে যাবে এদিক ওদিক।]

বসে পড় এখানে, গ্যাঁজানো যাবে সারারাত।

দিলীপ : শশাঙ্কদাকে একবার—

অজয় : আমি বলে দেবো শশাঙ্ককে, তুই বোস না! (দিলীপ বসলো) ভাবনা হচ্ছে?

দিলীপ : কীসের?

অজয় : লিডারের হুকুম না নিয়ে বসে গেলি?

দিলীপ : (হেসে) আমার কী? আমি বলবো—অজয়দা সিনিয়র লোক, বসতে বললেন, আমি কী করবো?

অজয় : ও, এর বেলা সিনিয়র?

দিলীপ : কোনবেলা নয় শুনি? দাদা বলি, আপনি বলি—

অজয় : শালাও বলি।

দিলীপ : কবে শালা বললাম আপনাকে?

অজয় : বলেও কোনো লাভ নেই। আমার বোনের সঙ্গে বিয়ে দেবো না তোর।

দিলীপ : বোন থাকলে তো দেবেন?

অজয় : থাকলেও দিতাম না।

[দিলীপ হাসলো। সে অন্যমনস্ক।]

কী হয়েছে তোর বল দিকি?

দিলীপ : কী হবে আবার?

অজয় : গুল দিস না, বুঝলি? গুল দিস না! দাদাকে গুল দেওয়া মহাপাপ।

দিলীপ : (অল্প থেমে) ভালো লাগছে না। (অজয় কথা বললো না) এ কী হচ্ছে অজয়দা?

অজয় : জানি না। কী হবে এসব ভেবে? অন্য কথা বল।

দিলীপ : অন্য কী কথা?

অজয় : যা হোক। এই কচকচি তো সারাদিন হচ্ছে। তোকে ডেকে বসালাম কি সারারাত এইসব গ্যাঁজাতে? আর টপিক পেলি না?

দিলীপ : কী টপিক চান, বলুন।

অজয় : তোর মিনুর গল্প বল।

দিলীপ : মিনুর গল্প আর নতুন কী বলবার আছে? সবই তো বলেছি আপনাকে।

অজয় : আবার বল।

দিলীপ : তার চেয়ে আপনি বলুন না, আপনার গল্প?

অজয় : আমার? আমি কি তোর মতো কপাল করে জন্মেছি? চিরকাল মেয়েদের দূর থেকেই দেখলাম, ভাব করবার সুযোগ পেলাম না।

দিলীপ : ভাব করবার সুযোগ খুঁজেছেন কোনোদিন?

অজয় : নাঃ, উঠে পড়ে খোঁজা হয়নি। এখন মনে হচ্ছে—খুঁজলে হোতো। এইসব দেখে মনে হচ্ছে।

দিলীপ : আচ্ছা অজয়দা, আপনি তো ঢাকার ছেলে। এ জিনিস আপনি তো দেখেছেন?

অজয় : হ্যাঁ. দেখেছি।

দিলীপ : ছুরি মারতে দেখেছেন।

অজয় : দেখেছি। দু'বার।

দিলীপ : কী মনে হয়েছে?

অজয় : ঠিক বলতে পারবো না। (তারপর থেমে থেমে) এক বন্ধু একদিন রাত্রে এসেছিলো। তার রক্তমাখা জামা ধুয়েছি, রক্তমাখা ছুরি ধুয়েছি, লুকিয়ে রেখেছি। সে বন্ধু, তাকে বাঁচাতে হবে—এইটুকুই ভেবেছি তখন।

দিলীপ : আজ যদি আসে ওরকম কোনো বন্ধু?

অজয় : হয়তো ঠ্যাঙাবো। বেধড়ক ঠ্যাঙাবো। পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারবো না। (একটু থেমে) তুই হলে কী করতিস?

দিলীপ : জানি না। আমি ঠিক ও কথা ভাবছিলাম না এখন।

অজয় : কী ভাবছিলি?

দিলীপ : ভাবছিলাম—হোস্টেলের এতো ছেলে জানলায় জানলায় বসে সারারাত কী করছে?

অজয় : পাহারা দিচ্ছে।

দিলীপ : যেহেতু গুজব রটেছে আজ রাতে মুসলমানরা অ্যাটাক করবে।

অজয় : করতেও পারে।

দিলীপ : (যন্ত্রণায়) হ্যাঁ পারে। 'মুসলমানরা' অজয়দা—'হিন্দুদের'—অ্যাটাক করতেও পারে। ছুরি নিয়ে, লাঠি নিয়ে। তাই হিন্দুরা রাশিকৃত ইঁট রেখেছে ঘরে, বারান্দায়, সোডার বোতল রেখেছে, লোহার রড, ছুরি, হকিস্টিক, ভিজিলেন্স পার্টি করেছে, রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে—

[অজয় দিলীপের কাঁধে হাত রাখলো।]

অজয় : জানি দিলীপ।

[দিলীপ চুপ করলো, অজয় সিগারেট ধরালো]

ঢাকা শহরে দাদাদের চিঠিপত্র চালাচালি করতাম—হেঁটে, সাইকেলে। একবার শুধু দু'টো তাজা বোমা পৌঁছে দেবার ভার পেয়েছিলাম। তখন থেকে ভেবেছি—কবে এই বোমা নিজে ছোঁড়বার ভার পাবো। কবে জঙ্গলে রাইফেল নিয়ে শুয়ে সাদা কুত্তাদের টমিগানের মোকাবিলা করবো।

[দু'টো টান দিলো সিগারেটে]

হ্যাঁ দিলীপ। তোর মতো আমিও চাই অ্যাটাক হোক। ওই অন্ধকারের ওপাশ থেকে দুশমনের দল বেরিয়ে আসুক! (হঠাৎ টেবিলে ঘুসি মেরে তীব্রস্বরে) কিন্তু বাই গড! লুঙ্গি নয়, ব্রিটিশ ইউনিফর্ম!

[সিগারেটে টান দিলো আবার। তারপর একটু হাসলো।]

প্রায় মেরে এনেছিলাম রে দিলীপ। পাঁচ-সাতজনের হাতের বোমা পিস্তল নয়, নৌ-বিদ্রোহ, রশিদ আলি ডে—মনে হয়েছিলো আর বছর খানেকের মামলা। ফর্টি-সিক্স, কি বড়োজোর ফর্টি-সেভেন। এই শালার ষোলোই আগস্ট কী যে হয়ে গেলো!

দিলীপ : আচ্ছা অজয়দা, আপনি কল্পনা করতে পারেন?

অজয় : কী?

দিলীপ : দেশ স্বাধীন? ব্রিটিশ নেই?

[অজয় মুখ তুলে তাকালো। চোখে একটু স্বপ্ন, অনেকখানি হতাশা।]

অজয় : কী জানি? এখন তো পারছি না। (খানিকটা আপন মনে) বাবার জীবন তো কাটলো জেল খেটে আর চরকা কেটে। আমি—আমার ছোটবেলা কেটেছে বোমা-পিস্তলের স্বপ্ন দেখে, আর এখন—এখন—কী জানি? আমার জীবনও কেটে যাবে বোধ হয়। বাবার জেল ছিল. চবকা ছিল, আমার তাও থাকবে না। শালার মুসলমান!

[সিগারেটটা ফেলে পা দিয়ে হিংস্রভাবে ঘষতে লাগলো]

আর শালার হিন্দু!

[ছটফট করে ঘুরে এলো এক চক্কর]

ছেড়ে দে এসব কথা! অন্য গল্প কর।

দিলীপ : অন্য কী গল্প?

অজয় : ভালো ভালো গল্প। তোর প্রেমের গল্প।

দিলীপ : আমি কি প্রেম করি?

অজয় : বাংলাদেশে ওই প্রেম। কলেজ ঢুঁড়ে দেখ—কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ আছে, এমন ছেলে ক'টা খুঁজে পাবি?

দিলীপ : মিনুর কথা মাথায় আসছে না এখন।

অজয় : চেষ্টা কর আনতে।

দিলীপ : চেষ্টা করলেও হবে না। ওর কথা মাথায় আসে না আর।

ফেলু : (হঠাৎ চেঁচিয়ে) মিথ্যে কথা!

অজয় : কী?

ফেলু : মিনুর কথা মাথায় আসে আমার! রোজ আসে! সবসময়ে আসে! মিনুকে আমি ভীষণ ভালোবাসি অজয়দা, মিনুকে আমি চাই! ওকে না পেলে আমার চলবে না! ওকে না পেলে—ওকে না পেলে—স্বাধীনতারও কোনো মানে থাকে না আমার কাছে!

দিলীপ : (চিৎকার করে) না!

ফেলু : হ্যাঁ!

দিলীপ : না, কক্ষনো না! মিথ্যে কথা!

[এগিয়ে এলো সামনে, গলা ফাটিয়ে স্লোগান দিলো]

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ!

[কেউ সাড়া দিলো না। ফিসফিস করে দিলীপ নিজেই বললো—]

ধ্বংস হোক।

[বাইরে হঠাৎ প্রচণ্ড গোলমাল। হুড়মুড় করে অনেকে ঢুকে পড়লো হাতের অস্ত্র বাগিয়ে। উত্তেজনা, চিৎকার, দলপতির নির্দেশ। সবাই বেরিয়ে গেলো। অজয় ক্লান্তভাবে উঠলো।]

অজয় : চল দিলীপ।

[দু'জনে বেরিয়ে গেলো। ফেলু গেয়ে উঠলো।]

ফেলু : পহ্‌লে জো মুহব্বৎসে ইনকার কিয়া হোতা, পহ্‌লে জো মুহব্বৎসে—হুর্‌র্‌র্‌র্‌ হাঃ!

[বাইরের গোলমাল কম, যেন দূর থেকে]

উনিশশো ছেচল্লিশ কেটে যাচ্ছে, হিন্দু মুসলমান কেটে যাচ্ছে, পরস্পরকে কেটে যাচ্ছে। উনিশশো সাতচল্লিশ আসছে, বছর ঘুরে যাচ্ছে, কাটাকাটির বছর, অগাস্ট মাস আসছে, পনেরোই অগাস্ট—জয় হিন্দ!

[বাইরের গোলমাল থেমেছে, সেখান থেকে মিলিত কণ্ঠে সাড়া এলো।]

সকলে : (নেপথ্যে) জয় হিন্দ!

ফেলু : স্বাধীন ভারতকি—

সকলে : (নেপথ্যে) জয়!

ফেলু : আজাদ হিন্দ!

সকলে : (নেপথ্যে) জিন্দাবাদ!

ফেলু : কিন্তু কলকাতায় সেদিন আরো জোর এক আওয়াজ।

সকলে : (নেপথ্যে) হিন্দু মুসলিম—ভাই ভাই! হিন্দু মুসলিম—ভাই ভাই!

ফেলু : দাঙ্গা শেষ। এক বছরের কাটাকাটি খুনোখুনি শেষ। মুসলমান খুঁজে বেড়াচ্ছে হিন্দুকে কলকাতার রাস্তায়—জড়িয়ে ধরবে বলে। হিন্দু খুঁজে বেড়াচ্ছে মুসলমানকে—মুখে মিষ্টি গুঁজে দেবে বলে। সে এক মহোৎসব কলকাতায়—পনেরোই অগাস্ট, উনিশশো সাতচল্লিশ।

[দল বেঁধে ঢুকলো সবাই। তেরঙ্গা ঝাণ্ডা, সবুজ ঝাণ্ডা। স্লোগান—হিন্দু মুসলিম ভাই-ভাই. গান—সারে জঁহাসে আচ্ছা। চলে গেলো সবাই মঞ্চ পার হয়ে।]

হুর-র্‌-র্‌-র্‌ হাঃ! স্বাধীন ভারতকি জয়! কিন্তু ভাস্কর সমীর অজয় দিলীপ কোন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলো? (গেযে) মাউন্টব্যাটন সাহেব-ও। তোমার হাতের ব্যাটন কার হাতে দিয়া গেলা ও।

[দল বেঁধে ঢুকলো সবাই ধ্বনি দিতে দিতে]

সকলে : ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়—ভুলো মাৎ, ভুলো মাৎ।

[তারপর গান—'নাকের বগলে নরুণ পেলাম টাক ডুমাডুম ডুম, জান দিয়ে জানোয়ার পেলাম, লাগলো দেশে ধুম। সলিল চৌধুরীর গান।]

ইযে আজাদি ঝুটা হ্যায়—ভুলো মাৎ, ভুলো মাৎ! ইনকিলাব—জিন্দাবাদ! দুনিয়াকা মজদুর—এক হো! কালা কানুন—ধ্বংস হোক!

[চলে গেলো ওরা ধ্বনি দিতে দিতে। নেপথ্যে হুইসলের শব্দ, আরো স্লোগান, দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।]

ফেলু : কালা কানুন। প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন অ্যাক্ট। আজাদ সরকারে যাদের মন ভরেনি তাদের আজাদি ঘুচলো। তাদের পার্টি বে-আইনি হোলো, মাটির নিচে গেলো—আন্ডারগ্রাউন্ড। জেল, পুলিস, লাঠি। আটচল্লিশ, উনপঞ্চাশ—

[বাইরে স্লোগান, হুইসল, চিৎকার]

হুর্-র্-র্-র্ হাঃ! উনিশশো উনপঞ্চাশে আমার বয়স কতো ছিল বলুন তো? ভুলে গেছেন তো হিসেব? তেইশ। ভানুও তেইশ, অভীকও তেইশ। না, কে জানে বোধ হয় দু'এক বছর এদিক ওদিক হবে। কিন্তু সালটা পাকা উনপঞ্চাশ—এ আমি তামা তুলসি তেরঙ্গা ঝাণ্ডা ছুঁয়ে বলতে পারি।

[বাইরে এঞ্জিনের বাঁশি, ট্রেনের শব্দ]

(নকল করে)

কু-উ-উ-উ ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক্—

সকলে: (নেপথ্যে) ন-উই মার্চ—চাক্কা বান্ধ! ন-উই মার্চ চাক্কা বন্ধ!

[ট্রেনের আওয়াজ মিলিয়ে গেলো। ভানু আর অভীক এসে বসলো।]

অভীক : কতোক্ষণ সময় আছে তোর?

ভানু : (ঘড়ি দেখে) আছে খানিকক্ষণ। পাঁচটায় সিটি কলেজের হোস্টেলে যেতে হবে, কয়েকটা ছেলেকে মিট করবার কথা।

অভীক : তারপর?

ভানু : তারপর আর ফাঁক নেই, পরপর অ্যাপয়েন্টমেন্ট। রাত এগারোটার আগে ছুটি পাবো না।

অভীক : খুব খাটছিস?

ভানু : (হেসে) তা রেল-ফ্রন্টে তো খাটবার জন্যেই আসা।

অভীক : কী অবস্থা রে?

ভানু : (অল্প থেমে) ভালো না খুব।

অভীক : কেন?

ভানু : এখানে স্ট্রাইক হবে বলে মনে হচ্ছে না।

অভীক : সে কী রে?

ভানু : কাউকে বলিস না অভীক, এটা আমার ধারণা। আজ দু'মাস এই দু'টো রেল কলোনিতে ঘুরছি—মেরে কেটে জন পাঁচেকের সঙ্গে যোগাযোগ আমাদের।

অভীক . মোটে?

ভানু : তাদেরও একজন পার্টি মেম্বার। বাকি ক'জনের আজ অবধি এক বুলি।

অভীক : কী বুলি?

ভানু : সবাই যদি স্ট্রাইক করে, আমরাও করবো।

অভীক : সবাই? সবাই কারা?

ভানু : যাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ নেই—তারা। বুঝতেই পারছিস।

অভীক : তবে যে শুনি—?

ভানু : আমিও শুনি। সারা ভারত রেল-ধর্মঘট নাকি হচ্ছেই।

অভীক : হলে কিন্তু দারুণ ব্যাপার!

ভানু : হ্যাঁ। হলে।

অভীক : সাউথ ইন্ডিয়া রেলওয়েতে তো হবেই?

ভানু : ওইটাই ভরসা। এস-আই-আর-এ যদি গুরু হয়, তবে এখানে নাইন্থ মার্চ না হোক, দু'দিন পরেই স্ট্রাইক হবে।

অভীক : রেল স্ট্রাইক যদি হয়, তবে অল ইন্ডিয়া জেনারাল স্ট্রাইক অন্তত একদিনের জন্যে হবেই। আর তা হলেই—লড়ে যা ভানু!

ভানু : লড়তে ক্রুটি করছি না, কিন্তু গায়ের জোরে তো স্ট্রাইক করানো যায় না। তোদের অবস্থা কী?

অভীক : তৈরি আছে মোটামুটি। সবাই রেলের দিকে তাকিয়ে আছে।

ভানু : দেখি। লোকোশেডের ভেতরে একটা মিটিং করবার চেষ্টা করছি।

অভীক : ধরা পড়ে যাস না যেন!

ভানু : না, সাবধানে আছি। শ্যামবাজারের মেসটা ছাড়লাম তো ওইজন্যেই। ওটায় বোধ হয় নজর পড়ে গেছে, নবুটা কেয়ারলেস তো? ওর সঙ্গে থাকা—

অভীক : এখানে কেমন আছিস?

ভানু : (হেসে) আছি তো মহা আরামে! শুধু একটা পরিবারকে ঝুঁকির মধ্যে রেখেছি, এই যা।

অভীক : ওরা জানে সব?

বানু : নীলা জানে। আর সবাই সবটা না জানলেও বিপদটা জানে। তাতে আমার দাম যেন আরো বেড়ে গেছে।

অভীক : (হেসে) হিরো হয়ে গেছিস?

ভানু : (হেসে) খানিকটা তাই। যতোক্ষণ বাড়িতে থাকি, সবাই ফুর্তিতে থাকে; অথচ এই যে রোজ রাত এগারোটা বারোটায় ফিরি, যখন তখন ঢুকি বেরোই—কারো কোনো নালিশ নেই। তবে সেদিন খুব ঘাবড়ে গেছিলো।

অভীক : কোনদিন?

ভানু : ওই যেদিন নারকেলডাঙায় গুণ্ডারা প্রোসেশন ভাঙলো? সেদিন মাথায় একটা ইট লেগেছিলো—

অভীক : সে কী রে? জানি না তো?

ভানু : জানবি কোত্থেকে? আমার সঙ্গে তো তারপর তোর দেখাই হয়নি।

অভীক : কী হয়েছিলো?

ভানু : আরে রেলব্রিজে একটা এঞ্জিন দাঁড়িয়ে ছিলো। প্রোসেশনটা ব্রিজের তলায় ঢুকছে—মণ কয়েক কয়লা ফেললো ঝুপ করে। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি আমরা ক'জন, মানে ওদের টাইমিং-এর গণ্ডগোলে—

অভীক : তারপর?

ভানু : যা হয়। পেছনদিকে খানিক দূর দৌড়ে গেছি সবাই, আর ওরা ব্রিজের ওপর থেকে দনাদ্দন ইঁট মারছে। তারই একটা মাথার পেছনদিকটায়—এদিকে আবার ওদের একটা গ্যাং—ওঃ, খুব মারামারি হোলো সেদিন।

অভীক : হ্যাঁ, মারামারির কথাটা জানি, তুই জখম হয়েছিস জানতাম না।

ভানু : আরে দুর, জখম টখম না, সামান্য ফেটে গিয়েছিলো। তা বাড়ি এসেছি, সব

এতো নার্ভাস—মনে হচ্ছে চিৎকার শুরু করে দেবে। ছায়া-বউদি তো রক্ত দেখে ফিট পড়ার মতো অবস্থা। ভাবলাম—সেরেছে, বাইরে কোথাও ড্রেস করিয়ে এলেই হোতো। নীলাটা দেখলাম খুব শক্ত মেয়ে। সবাইকে ধমকে থামিয়ে ও-ই ধুয়ে টুয়ে—নীলাটা, বুঝলি, অনেক কিছু করতে পারতো। করার ইচ্ছেও রাখে, কিন্তু সুযোগ পাবে না বোধ হয় কোনোদিনই।

[অভীক সিগারেট বের করেছিলো, ভানুর দিকে এগিয়ে দিলো]

ভানু : না, তুই খা। আমার বিড়িটাই অভ্যেস হয়ে গেছে।

[বিড়ি বের করলো]

অভীক : তবে আমাকেও একটা দে।

[দু'জনে বিড়ি ধরালো]

সময় আজকাল একদম পাস না, না?

ভানু : কোত্থেকে পাবো? অথচ কাজ কিছু এগোচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না।

অভীক : অনেকদিন কাজলদের ওখানে যাসনি।

ভানু : (একটু শক্ত হয়ে) না, সময় পাইনি।

অভীক : কাজল তোর কথা বলছিলো।

ভানু : কী বলছিলো?

অভীক : বলছিলো—সময় পেলে যেন যাস একদিন।

ভানু : (অল্প থেমে) কেমন আছে কাজল?

অভীক : ভালোই আছে। (ভানু চুপ) আর কিছু জিজ্ঞেস করবি না?

ভানু : কী জিজ্ঞেস করবো?

অভীক : ভানু, আমার মনে হচ্ছে তুই একটা ভুল করছিস।

ভানু : (মনে মনে রুখে) কী ভুল?

অভীক : তুই ভাবছিস, কাজল—

ভানু : (বাধা দিয়ে) আমি কিচ্ছু ভাবছি না অভীক, ভুল ঠিক কিচ্ছু করছি না। আমি রেল করছি, দিনে আঠারো ঘণ্টা করে ছত্রিশ জায়গায় ঘুরছি—যাতে রেল স্ট্রাইক হয় হয়। আর কিচ্ছু জানি না আমি!

অভীক : ভানু, চটিস না—

ভানু : (চটে) কে চটছে? চটছে কে?

[অভীক চুপ করে গেলো। ভানু এক চক্কর ঘুরলো, বিড়িটা ফেললো, তারপর ঘুরে মুখোমুখি দাঁড়ালো।]

তুই রাজনীতি করিস কেন?

অভীক : সাত বছর পরে আজ হঠাৎ ও কথা কেন?

ভানু : বল না?

অভীক : তুই যে জন্যে করিস।

ভানু : জানি। সেইজন্যেই তো জিজ্ঞেস করছি। বল একবার—ঝালিয়ে নিই।

অভীক : করি—আমার নিজের স্বার্থে।

ভানু : ঠিক। শ্রমিক-কৃষকদের উপকার করবার জন্যে নয়। অন্য কারো দুঃখে বিগলিত হয়ে নয়। আমি দেখছি—এ সমাজে বাঁচা যায় না। চাপ—চারিদিকে চাপ! আমার নিজের চারিপাশ, আমার নিজের মানুষরা—এইসব মধ্যবিত্ত, তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মানুষরা—একরাশ অন্যায় অবিচার অত্যাচার চোখ বুজে মুখ বুজে সহ্য করছে, দরকার হলে অন্যায়গুলো নিজেরাই করছে—স্রেফ কতকগুলো তুচ্ছ নগণ্য স্বার্থসিদ্ধির জন্যে! এদের মধ্যে আমাকে বড়ো হতে হবে, চাকরি করতে হবে, ঘরসংসার করতে হবে, বুড়ো হতে হবে, মরে যেতে হবে! এই তো? এই তো ভবিষ্যৎ? যদি সমাজটা না পালটায়? যদি বিপ্লব না হয়?

অভীক : আচ্ছা, আমাকে হঠাৎ আজ এসব--

ভানু : (কর্ণপাত না করে) কোন গল্পটা জানিস না তুই? রমলার বিয়ে দিয়ে দিলো ঘাড় ধরে ওই ঘুষখোর গুণ্ডামার্কা পুলিস অফিসারটার সঙ্গে। আমাকে—আমি এ বাড়িতে আছি বলে আমার নিজের মায়ের কী প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা—পাচ্ছে নীলার সঙ্গে আমার কিছু একটা ঘটে যায়! আর কিছু না, তাহলে এমন সোনার চাঁদ ছেলের জন্যে জাতকুল মিলিয়ে তাঁর পছন্দমতো সোনার চাঁদ পাত্রী আনা যাবে না যে? সুলেখা—যার সঙ্গে এই সেদিনও তুই আমি কতো আড্ডা দিয়েছি, কতোরকম কথা বলেছি—বিয়ে করে কী প্রচণ্ড ভাল্‌গার হয়েছে জানিস?

অভীক : সে কী রে?

ভানু : হ্যাঁ, এই সেদিন হঠাৎ দেখা হোলো। বাপের বাড়ি এসেছিলো। দামি শাড়ি, এক-গা গয়না, কী বললো জানিস? কল্পনা কর?

অভীক : কী?

ভানু : বললো—ভানু, তোর সন্ধানে ভালো জমি আছে বালিগঞ্জের দিকে?

অভীক : যাঃ!

ভানু : 'যাঃ' নয়, সত্যি কথা বলছি।

অভীক : তোকে জিজ্ঞেস করলো? সুলেখা?

ভানু : এম.সি.ডি.পি.! তোতে আমাতে নাম দিয়েছিলাম, মনে নেই? মিডল ক্লাস ডিজেনারেটেড পার্ভার্টস—এম.সি.ডি.পি.! সুলেখাও।

অভীক : বুঝলাম। কিন্তু এখন হঠাৎ এতো খেপে গেলি কেন?

ভানু : অ্যাঁ?

অভীক : হচ্ছিলো কাজলের কথা, হঠাৎ তুই—

[ভানু কপালে হাত দিয়েছিলো, একটু টলে এসে বসলো]

কী হোলো? কী রে, শরীর খারাপ লাগছে নাকি?

ভানু : না—হ্যাঁ—মাথাটা একটু ঘুরে উঠলো হঠাৎ।

অভীক : বোস বোস, দাঁড়া জল আনি একটু—

ভানু : না না, জল লাগবে না—

অভীক : খেয়েছিস কিছু? নাকি খালি পেটেই আছিস?

ভানু : না, এই তো খেয়ে বেরোলাম। ও ঠিক আছে, রাত জাগা চলছে তো পরপর? তাই একটু—ঠিক আছে এখন।

অভীক : অতিরিক্ত খাটছিস তুই।

ভানু : (হেসে) তুই রেলফ্রন্টে থাকলে এর থেকে কম খাটতিস?

অভীক : কেমন বোধ করছিস এখন?

ভানু : ঠিক আছে, ঠিক আছে, ও কিছু না।

অভীক : (একটু থেমে) ভানু।

ভানু : কী?

অভীক : তোর সঙ্গে একটা কথা ছিল আমার।

[ভানু ঘড়ি দেখলো]

পাঁচটা বাজতে দেরি আছে এখনো।

ভানু : (শক্ত হয়ে) কী কথা!

অভীক : কাজলের কথা।

ভানু : (উঠে) কাজলের কথা আবার কী বলবার আছে?

অভীক : বোস না চুপ করে, উঠছিস কেন? মাথা ঘুরছে এদিকে!

ভানু : (বসে) না, বল।

অভীক : কাজলের সঙ্গে দেখা করবার সময় পাস না, বুঝলাম। কিন্তু—আর কিছুই কি হয়নি!

ভানু : কী হবে?

অভীক : সে তুই জানিস।

ভানু : আমি কিছু জানি না।

অভীক : আমাকেও বলবি না তুই?

[ভানু আবার উঠলো। একদিকে গেলো। তারপর ফিরলো।]

ভানু : দেখ অভীক, আমরা একসঙ্গে একটা স্বপ্ন দেখি। অনেকদিন ধরে।

অভীক : কম্যিউন?

ভানু : হ্যাঁ। কম্যিউন বলতে অনেক লোক অনেক কিছু বোঝে, কিন্তু আমরা বুঝি একটা সংসার, যেখানে তুই আমি সুবীর পানু একসঙ্গে আছি, কাজ করছি। যে যার ফ্রন্টে কাজ করছি। ফিরে আসছি, কথা বলছি, দিচ্ছি, নিচ্ছি। স্বপ্ন দেখি—কাজলও আসবে কম্যিউনে, আমাদের সকলের কাছে, কাজ করবে। এই সমাজের মধ্যেই ভবিষ্যৎ সমাজের একটা টুকরো।

অভীক : হ্যাঁ, কিন্তু যেহেতু কাজল মেয়ে এবং চারিপাশে এখনো এই সমাজটাই, তাই কাজলকে কম্যিউনে আনতে গেলে একটা বিবাহ দরকার।

ভানু: টোকেন ম্যারেজ।

অভীক : সে যাই হোক, বিবাহটা দরকার।

ভানু : কোনো একজনের সঙ্গে।

অভীক : তোর সঙ্গে।

ভানু : না। কোনো একজনের সঙ্গে—সে আমার সঙ্গেই হোক আর তোর সঙ্গেই হোক—

অভীক : আমার সঙ্গে হবাব প্রশ্নই উঠছে না!

ভানু : কেন?

অভীক : কাজল তোর বন্ধু!

ভানু : তোর বন্ধু নয়?

অভীক : আগে তোর বন্ধুই ছিল। আমার সঙ্গে ক'দিনের ভাব?

ভানু : এটা কীরকম যুক্তি হোলো।

অভীক : ভানু, তুই জানিস—আমাকে কোনো মেয়ে বেশিদিন সহ্য করতে পারে না—

ভানু : হ্যাঁ, ওরকম একটা ধারণা তোর আছে বটে।

অভীক : আমি—আই কান্ট লাভ! ভালোবাসতেই জানি না আমি! শিখিনি কোনোদিন—

ভানু : কথা হচ্ছিলো টোকেন ম্যারেজের—

অভীক : ভালোবাসার কথা একেবারেই ওঠে না বলতে চাস?

[ভানু উত্তর দিলো না]

দেখ, দু'বছর আগে কম্যিউনেব চিন্তা মাথায় উঠেছিলো। তারপর দু'টো বছরে বয়স বেড়েছে আমাদের। যতোই টোকেন বলি, বিয়ে জিনিসটার একটা ইমপ্লিকেশন আছে, একটা—একটা—

ভানু : (হঠাৎ) তাই যদি হয়, তবে আমাব ঘাড়ে চাপাতে চাইছিস কেন?

অভীক (স্তম্ভিত) ঘাড়ে চাপাতে চাইছি?

ভানু : তা ছাড়া কী? কাজলকেই ঠিক করতে দে না—কাকে বিয়ে করবে?

অভীক তোকে—অবভিয়াসলি!

ভানু : না!

[অভীক তাকিয়ে রইলো। ভানু মুখ ফিবিয়ে নিয়েছে।]

অভীক (ধীরে ধীবে) ঠিক এই ভয়টাই ছিল বলে কথা বলতে চাইছিলাম। তোর কি ধারণা হয়েছে—কাজল আমাকেই—?

ভানু : দোহাই তোর অভীক! নাইন্থ মার্চের পরে এ আলোচনাগুলো করা যায় না? ক'টা দিন আর বাকি?

ফেলু : (হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে) অভীক! আমি কম্যিউন চাই না!

অভীক কী?

[ভানু স্থির হয়ে বসে]

ফেলু : কম্যিউন আমি চেয়েছিলাম, কিন্তু যতো দিন যাচ্ছে বুঝতে পারছি—কম্যিউন আমার জন্যে নয়। আমার মতো মানুষের ঠাঁই নেই কম্যিউনে। কাজলকে আমি ভালোবাসি অভীক, একান্তভাবে ভালোবাসি! কাজলকে আমি একান্ত করে চাই, নিজস্ব করে চাই! আমি চাই—কাজল শুধু আমাকেই ভালোবাসুক, আর কাউকে নয়! আমার এ চিন্তা, এ চাহিদা কম্যিউন ভেঙে দেবে! তুই আমাকে

ঘেন্না করবি, পানু-সুবীর আমাকে দেখে হাসবে। কাজল—কাজল আমাকে মায়ার চোখে দেখবে—

ভানু : (চিৎকার করে) না!

অভীক : ভানু!

ভানু : কাজলকে আমি বিয়ে করবো না! কিছুতেই না!

[মাথা ঘুরে উঠলো আবার, অভীক ধরলো]

অভীক : কী হোলো? আবার মাথা ঘুরে উঠেছে তো?

ভানু : (দুর্বল সুরে) পাঁচটা বাজে, না?

অভীক : হ্যাঁ, কিন্তু—

ভানু : তুই আমাকে একটু সিটি কলেজ পর্যন্ত এগিয়ে দিবি?

অভীক : হ্যাঁ নিশ্চয়ই, কিন্তু—একটু বসে যা না?

ভানু : না, দেরি হয়ে যাবে, চল।

অভীক : চল তাহলে।

ভানু : ঠিক আছে ধরতে হবে না। ওই টিউওয়েলটার কাছে চল, একটু জল খেয়ে নেবো।

[দু'জনে বেরিয়ে গেলো। ফেলু বিকৃতস্বরে গান গাইতে গাইতে সামনের দিকে এলো।]

ফেলু : প্রেম নহে মোর মৃদু ফুলহার, দিলো সে দহনজ্বালা—হর্‌র্‌র্‌র্ হা! কতো মানুষ কতো পথে চলে গেলো, কতো মানুষ মরে হেজে গেলো, আমি শালা ক্লাউন হয়ে গেলাম। গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের ক্লাউন—হর্‌র্‌র্‌র্ হা! কিন্তু মাইরি বলছি স্যার, উনপঞ্চাশ সালে আমার বয়স ছিল তেইশ। ওই অভীক-ভানুর মতো। মার্চ মাসে পুরো তেইশও হয়নি, হোলো আরো চারমাস পরে। তদ্দিনে রেল ধর্মঘট, ভারত বনধ, বিপ্লব—কতো কী হয়ে যাবাব কথা। এক নতুন সমাজে অভীক, ভানু, কাজল, দিলীপ, অজয়, ভাস্কর, মঞ্জু, ফ্যালারাম গড়াই--হর্‌র্‌র্ হা!

কিন্তু হোলো না। রেল স্ট্রাইক হোলো না, কোথাও কিছু হোলো না। মাঝখান থেকে অভীক গেলো জেলে, আর ভানু, যার জেলে যাবার কথা ছিল অনেক বেশি, ভানু (হাসতে হাসতে) নাঃ, ভানু জেলে যায়নি, ভানু—মরুক গে। কী হবে ওসব কথায়? তার চেয়ে বরং বিশুকে ধরা যাক। আমাদের বিশ্বনাথ।

[বিশু এসেছে। শীর্ণ রুক্ষ চেহারা। ফেলু পিছন থেকে ডাকলো। তার দিকে না ফিরেই কথা বলবে বিশু।]

বিশু : কে? ফেলু?

ফেলু : হ্যাঁ, ফেলু ভাঁড়।

বিশু : ফেলু—ভাঁড়? সে আবার কী?

ফেলু : ও একটা নাম আমার। হবে, কিছুদিন পরে। দেরি আছে এখনো। এটা তো উনিশশো পঞ্চাশ, না?

বিশু : কী বকছো যা তা?

ফেলু : কিছু না। কী করছো আজকাল?

বিশু : চাকরি করছি, যেমন করছিলাম। আর সন্ধেবেলা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পড়ছি।

ফেলু : সে কী? অ্যাদ্দিন পরে ফের পড়াশুনো ধরলে?

বিশু : সন্ধেগুলো করবো কী?

ফেলু : কেন, পার্টি?

[বিশু একটু হাসলো শুধু, ক্লান্ত হাসি]

ও, তোমাকে তো সাসপেন্ড করে দিয়েছিলো, না?

বিশু : তাতে ঠেকাতো না। তারপরেও এক বছর তো সমানে টেনেছি।

ফেলু : বুঝলাম।

বিশু : কী বুঝলে?

ফেলু : যা বোঝবার। সীমার খবর কী?

বিশু : ভালোই। ওখানেই চাকরি করছে। অনেকদিন দেখা হয়নি আমার সঙ্গে।

ফেলু : শঙ্কর?

বিশু : এখনো জেলে। লম্বা একটা হাঙ্গার স্ট্রাইক গেলো ওদের।

ফেলু : এদিকে কোথায় এসেছিলে?

বিশু : (ক্লান্তভাবে) বিনোদদা ডেকে পাঠিয়েছেন। পার্টিনেতার হুকুম, না এলে নয়।

[বিনোদ এলো। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স।]

বিনোদ : কী ব্যাপার তোমার? কী সব শুনছি?

বিশু : কী শুনছেন?

বিনোদ : তুমি নাকি কাজকর্ম ছেড়ে দিয়েছো?

বিশু : আমি সন্ধেবেলার একটা কোর্সে ভর্তি হয়েছি। তাই ছুটি চেয়েছি।

বিনোদ : তুমি তো কোর্স নেবার জন্যে পার্টি থেকে ছুটি নেবার ছেলে নও?

বিশু : না, তা ছিলাম না বোধ হয়।

বিনোদ : কী হোলো কী? উৎসাহ পাও না? (বিশু চুপ) তোমার ওপর থেকে সাসপেনশন তো তুলে নেওয়া হয়েছে?

বিশু : হ্যাঁ।

বিনোদ : ট্রেড ইউনিয়নে কিছু নতুন সেল হচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম তোমাকে একটা সেলের সেক্রেটারি করে—

বিশু : আমার দ্বারা হবে না।

বিনোদ : কেন? (বিশু চুপ) আমাকে একথা বিশ্বাস করতে বোলো না যে তুমি জেল-পুলিসের ভয়ে কাজ বন্ধ করেছো? (বিশু শুধু হাসলো) তবে? কী হয়েছে খুলে বলো না?

বিশু : (অল্প অধৈর্যে) কী খুলে বলবো বিনোদদা? বলবার কিছু নেই। এ আমার একার হয়নি।

বিনোদ : হুঁ। র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইলের বেশ কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে লক্ষ করছি।

বিশু : শুধু র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইলের?

বিনোদ : তার মানে?

বিশু : না, ঠিকই বলেছেন। পবিবর্তন র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইলেরই হয়েছে; পার্টির ওপর মহল যেমন ছিলেন তেমনিই আছেন। সেটা আমরা দেখতে পেয়ে গেছি বলেই পরিবর্তন।

বিনোদ : কী বলতে চাও তুমি? (বিশু চুপ) দেখো বিশু, তুমি বোধ হয় জানো না, আমি জ্ঞান হয়ে অবধি রাজনীতির আওতায় আছি। প্রথমে কংগ্রেস, তারপর টেরোরিস্ট আন্দোলন, তারপরে লেবার পার্টি—

বিশু : জানি বিনোদদা, খবর রাখি। আমি আপনাকে কিছু বলিনি।

বিনোদ : তুমি পার্টি নেতৃত্ব সম্বন্ধে—

[হঠাৎ যেন বিশুর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলো]

বিশু : হ্যাঁ বলেছি! আপনার সম্বন্ধেও বলছি! আপনি সহ্য করেছেন ওসব। চোখ বন্ধ করে থেকেছেন।

বিনোদ : কী সব?

বিশু : কী সব? শুনবেন? ধাপ্পা! ভাঁওতা!

বিনোদ : বিশু!

বিশু : ভেবেছিলাম বলবো না, কিন্তু আপনি বলতে বাধ্য করছেন! আপনি জানেন—আমরা র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইল আপনাদের কতোটা শ্রদ্ধা করতাম? কতোখানি বিশ্বাস করতাম?

বিনোদ : এখন যে সে বিশ্বাস নেই, সেটা বোঝা যাচ্ছে।

বিশু : কী করে থাকবে? কতোদিন ধরে মনে প্রশ্ন উঠেছে—চাপা দিয়েছি। আর কেউ প্রশ্ন তুললে বুঝিয়েছি, ধমকেছি—

বিনোদ : কী প্রশ্ন?

বিশু : কী প্রশ্ন? শুনবেন? গতবছর পাঁচুই মার্চ রেল ফ্রন্টের কর্মীদের বলা হয়েছিলো—শেয়ালদায় পাঁচ হাজার মহিলার জমায়েত হবে, খিদিরপুর-মেটেবুরুজ থেকে বিশহাজার মজুর মিছিল করে আসবে, আরো বহু ছাত্র-শ্রমিক এসে যোগ দেবে। শেয়ালদা স্টেশন, বেলেঘাটা লোকো শেড-সব দখল করে সেইদিনই চাক্কা বনধ শুরু করে দিতে হবে, নউই মার্চ পর্যন্ত অপেক্ষা না করে—

বিনোদ : বিশু, এসব তুমি—

বিশু : টিম টিম করে জন পঞ্চাশেক মহিলা এসেছিলো। আর ওখানকার রেল-সেলের চার পাঁচজন। পুলিস ছিল কমপক্ষে এক হাজার। রাইফেল লাঠি জিপ ট্রাক ওয়্যারলেস ভ্যান সব কিছু। রেল ইনস্টিটিউটের কম্পাউন্ডে ইঁদুরের মতো জাঁতাকলে ফেলে পিটিয়ে শেষ করে দিতো, তুলে নিয়ে যেতো সব কটাকে। রেল-সেলের নেতা বুদ্ধি করে লাইনের ওপর দিয়ে মিছিল নিয়ে গেছে ঠিক সময়ে পাঁচিল-ঘেরা ইনস্টিটিউট কম্পাউন্ড থেকে বেরিয়ে, বেলেঘাটা

লোকোশেডে মিটিং করেছে যা কোনোদিন করা যায়নি আগে, পুলিসকে বোকা বানিয়েছে। তার জন্যে প্রচণ্ড সমালোচনা করলেন আপনারা। কী? না, সে ভীতু, মিলিট্যান্ট অ্যাকশন নেয়নি!

বিনোদ : বিশু তুমি—

বিশু : আপনারা সব জানতেন! আপনারা কেউ বোকা না! আপনারা খুব ভালো করে জানতেন--বিশ হাজার শ্রমিক আসবে না, রেলস্ট্রাইক হবে না, কোথাও কিছু নেই—

বিনোদ : এ সমস্ত বাজে কথা!

বিশু : শুধু কি এই? তার পরে? দিনের পর দিন ছোট ছোট মিটিং, ছোট ছোট প্রসেশন। শ্রমিক নেই, কৃষক নেই—বিপ্লব করতে হবে আমাদের! পুলিস ঝেঁটিয়ে তুলে নিয়ে গেছে, র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইলের সেরা সেরা ছেলেগুলোকে ধরে জেলে পুরেছে—শঙ্কর, বিকাশ—আরো কতো! অমানুষিক ঠেঙিয়েছে! আর জেলে—জেলের ভেতরে বিপ্লব! তাদের বলেছেন—বাইরে বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে, তোমরা ভেতরে লড়ো! এটা ধাপ্পা নয়! তারা হাঙ্গার স্ট্রাইক করেছে, খালি হাতে মারামারি করেছে, নিজেদের ঘরে আগুন পর্যন্ত লাগিয়েছে!

বিনোদ : বিশু—

বিশু : আর নেতারা? নেতারা আন্ডারগ্রাউন্ডে সায়েবপাড়ার ফ্ল্যাটে বসে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছেন! এমন নেতার কথাও জানি যারা নিজেদের ব্যক্তিগত আরাম আর সুখসুবিধের জন্যে--

বিনোদ : (চেঁচিয়ে) খুব হয়েছে! আর আমি শুনতে চাই না!

[বিশু থামলো]

তোমার সাসপেনশন তুলে নেওয়া হয়েছে, আসলে তোমাকে এক্সপেল করে দেওয়া উচিত ছিল।

বিশু : প্লিজ বিনোদদা! পার্টি থেকে রিজাইন করা যায় না, যদি বলেন আমি এই মুহূর্তে লিখে দিচ্ছি—আই বেগ টু বি এক্সপেলড!

বিনোদ : আই সি। তুমি ডেসপারেট।

বিশু : ডেসপারেট? ডেসপারেশনের আপনি কী বুঝবেন বিনোদদা?

বিনোদ : (একটু থেমে, সম্পূর্ণ শান্ত স্বরে) বিশু, তুমি আমার সঙ্গে একটু ঠান্ডা মাথায় কথা বলবে?

বিশু : (সন্দিগ্ধ) কেন?

বিনোদ : তোমার সব সমালোচনা আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু বিশ্বাস করো—পুরো লিডারশিপ ওরকম নয়।

বিশু : জানি—নয়। আপনি ওরকম নন। আপনি সাহেবপাড়ার ফ্ল্যাটে থাকেননি, থেকেছেন চটকলের কুলিধাওড়ায়—যেখানকার বেস আপনারই তৈরি। আরো অনেকে ওরকম নয়। আপনাদের আমরা কী বলি জানেন? পিসিমা।

বিনোদ : পিসিমা?

বিশু : স্নেহশীলা বিধবা পিসিমা। সারাজীবন রাজনীতি করেছেন, এইটাই এখন ঘরসংসার। কোথায় যাবেন আর এ বয়সে? তাই সব দেখেও চোখ বন্ধ করে পড়ে আছেন, সংসারের কাঠামোটা জোড়াতাড়া দিয়ে—

বিনোদ : আর কতো অপমান তুমি আমাকে করবে বিশু?

বিশু : ঠিক যতোখানি শ্রদ্ধা আপনাদের আগে করেছি, ততোটা। এ আপনাদের পাওনা বিনোদদা।

বিনোদ : (অল্প থেমে) এতোই যদি বুঝেছো, তবে এ সময়ে পার্টি ছেড়ে যাচ্ছো কেন? তোমরা বাইরে গেলেই কি এসব শোধরাবে? তার চেয়ে ভেতরে থেকে আমাদের তাড়িয়ে তোমরা হাল ধরো না?

বিশু : তা কি ভাবিনি ভেবেছেন? কিন্তু—হবে না। (একটু থেমে, খানিকটা আপন মনে) চিরকাল ধরে রেখেছি—পার্টি না থাকলে হয় গাঁজা খেতে হবে, না হয় সুইসাইড করতে হবে। পার্টি ছেড়েছি আজ ছ'মাস, এখনো সুইসাইড করিনি, গাঁজাও ধরিনি। শুধু সন্ধেগুলোর ফাঁক ভরাতে পড়াশুনো শুরু করেছি। আশ্চর্য, বাবার পয়সায় যদ্দিন পড়লাম—কোনো ইন্টারেস্টই পেলাম না, অথচ এখন প্রচণ্ড ভালো লাগছে কোর্সটা। প্রশ্ন করে করে প্রফেসরকে অতিষ্ঠ করে তুলছি, লাইব্রেরি থেকে বইয়ের পর বই নিয়ে পড়ছি। পরীক্ষা নিয়ে ডিগ্রি নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই—শুধু জানতে ইচ্ছে করছে। পড়তে ইচ্ছে করছে। এটা কি গাঁজা? বিনোদদা, এটা কি গাঁজা?

বিনোদ তুমি পড়ে যাও।

বিশু : কিন্তু তারপর? আর দেড়বছর পরে কোর্সটা শেষ হয়ে যাবে, তারপর?

বিনোদ : জানি না। হয়তো আর একটা কোর্স করবে। না হয় অন্য কাজ খুঁজে পাবে।

বিশু : (খানিকটা বিহ্বলভাবে) অন্য কোনো কাজ?

বিনোদ : হ্যাঁ বিশু। কাজ ছাড়া তো বাঁচবে না তুমি? বাঁচবার তাগিদে কিছু একটা খুঁজে নেবেই। সবসময়ে। আমি চলি, বিশু।

বিশু : বিনোদদা আমি—আমি আপনাকে—

বিনোদ : (কড়াস্বরে) ক্ষমা চেয়ো না বিশু। রাগটাকে বাঁচিয়ে রাখো যতোদিন পারো। ও রাগ যেদিন মরবে, তুমিও মরবে। (দু'পা এগিয়ে, অর্ধেক ফিরে) বোধ হয়—ভারতবর্ষও মরবে।

[বিনোদ চলে গেলো। ফেলু কাছে এলো।]

ফেলু : কী ভাবছো বিশু?

বিশু : আমি মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করছি।

ফেলু : কী সিদ্ধান্ত?

বিশু : শুধু পড়াশুনোয় আমার চলবে না। আমার আরো—বন্ধন চাই। খুঁটি চাই।

ফেলু : বিয়ে করবে?

বিশু : হ্যাঁ।

ফেলু : সীমাকে?

বিশু : (চমকে) সীমা?

[সীমা এলো। বিশু তার কাছে গেলো। ফেলু সরে গেছে।]

সীমা : অনেকদিন পরে এলে।

বিশু : সীমা, তোমাকে একটা কথা জানাতে এলাম।

সীমা : কী?

বিশু : আমি কমলাকে বিয়ে করবো ঠিক করেছি।

সীমা : (বিস্মিত) কমলাকে?

বিশু : হ্যাঁ। কমলাকে।

সীমা : (একটু থেমে) এর কি খুব দরকার আছে?

বিশু : (জোর দিয়ে) হ্যাঁ, আছে। (সীমা চুপ) তুমি কিছু বলবে না?

ফেলু : (দাঁতের ফাঁকে, তীব্রস্বরে) বারণ করো! বারণ করো সীমা, বারণ করো!

সীমা : আর ক'টা দিন অপেক্ষা করা যায় না?

বিশু : কতোদিন?

সীমা : শঙ্কর জেল থেকে বেরোনো পর্যন্ত—

বিশু : (জোর দিয়ে) না। শঙ্করের এতে কিছু বলবার নেই।

সীমা : (আহত) নেই?

বিশু : না, নেই। আমি খুব ভালো করে ভেবে দেখেছি।

ফেলু : (আগের মতো) বারণ করো সীমা! তুমি বারণ করো! তোমার কথা শুনবে!

বিশু : তুমি কী বলবে বলো।

সীমা : (অন্যদিকে ফিরে) তুমি ভালো করে ভেবে দেখেছো বলছো; আমার আর কী বলবার থাকতে পারে?

ফেলু : সীমা, সীমা, এ কী করছো সীমা! এ কী করছো!

বিশু : কিছু বলবার নেই?

ফেলু : সীমা!

সীমা : কমলা তোমাকে অনেক ভালোবাসে, আমি জানি।

বিশু : অনেক বললে কিছুই বলা হয় না।

সীমা : তুমিও কমলাকে ভালোবাসো?

বিশু : (জোর দিয়ে) হ্যাঁ। আমিও কমলাকে ভালোবাসি।

ফেলু : (চিৎকার করে) না!

সীমা : কী বললে?

[বিশু স্থির]

ফেলু : কমলাকে আমি ভালোবাসি না, কমলার ভালোবাসাকে ভালোবাসি। কমলার 'ভালোবাসা'র প্রেমে পড়েছি আমি।

সীমা : (ফিসফিস করে) বিশু!

ফেলু : হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি! অনেক অনে-ক দিন ধরে একটা স্বপ্ন দেখেছি আমি। শুনবে? শুনবে?

সীমা : কী স্বপ্ন?

ফেলু : একটা মেয়ে—যার কেউ নেই, কিচ্ছু নেই—সে আমাকে ভালোবেসেছে। তার কেউ নেই কিচ্ছু নেই, তাই শুধু আমাকে ভালোবেসেছে। একমাত্র আমাকে, আর কাউকে না!

সীমা : (স্বপ্নাবিষ্টের মতো) কিন্তু তুমি তো আমাকে ভালোবাসো।

ফেলু : হ্যাঁ বাসি। কতোটা ভালোবাসি সে তুমি ধারণাও করতে পারবে না।

সীমা : তাহলে?

ফেলু : তোমার শঙ্কর আছে।

সীমা : তুমিও আছো।

ফেলু : জানি। কিন্তু শঙ্করও আছে। তাই আমার স্বপ্ন মিললো না। এই স্বপ্নটাকে আমি দিনের পর দিন টুঁটি টিপে মেরে ফেলতে চেয়েছি, কিন্তু মরেনি, মরছে না, কিছুতেই মরছে না। আমি কী করবো বলে দিতে পারো সীমা?

সীমা : আর ক'টা দিন অপেক্ষা করো বিশু!

ফেলু : করতে পারতাম—যদি কাজ থাকতো। বহুদিন অপেক্ষা করেছি, আরো করতাম—যদি কাজ থাকতো। হয়তো একদিন—হয়তো একদিন ওই সর্বনাশা স্বপ্নটাকে গলা টিপে শেষ করে দিয়ে তোমার কাছে—তোমাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারতাম। আস্ত মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পারতাম।

সীমা : আর ক'টা দিন বিশু—

ফেলু : আমার সব শেষ হয়ে গেছে সীমা! গত বছর নউই মার্চ আমার সব শেষ হয়ে গেছে! তারপর এক বছর লড়েছি, আর পারছি না! পড়া নিয়েও পারছি না। ওই সর্বনাশা স্বপ্ন এখন আমার ভাসবার একমাত্র কুটো।

সীমা : (সম্মোহিতের মতো) বিশু, আমি যদি—

ফেলু : (উদ্‌গ্রীবভাবে) হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো বলো!

সীমা : (কষ্টে) আমি যদি শঙ্করকে—

ফেলু : (উগ্র আশায়) হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো—

বিশু : (চিৎকার করে) সীমা!

[ফেলু ছিটকে সরে গেলো। সীমা যেন ঘুম ভেঙে উঠলো।]

সীমা : (স্বাভাবিক কণ্ঠে) কী বলছো?

বিশু : তাহলে তোমার কোনো আপত্তি নেই?

সীমা : তুমি যখন সবদিক ভালো করে ভেবে দেখেছো, আমি আর আপত্তি কী করে করি বিশু?

[প্রচণ্ড শব্দে ব্যান্ড বেজে উঠলো। ফেলু দু'হাতে কান চেপে ধরলো, মুখে যন্ত্রণা। বিশু সীমা যন্ত্রের মতো দু'দিকে বেরিয়ে গেলো। ব্যান্ড থামলো, ফেলু হাত নামালো, তার মুখের যন্ত্রণা ক্লাউনের অর্থহীন হাসিতে পরিণত হোলো।]

ফেলু : হুররর্‌র্‌ হাঃ! উনিশশো পঞ্চাশ বিশু, তারপর বিশ বছর কেটে গেছে। তুমি এখন কোথায়? কী করছো? স্বপ্ন মিটেছে? কাজ পেয়েছো? পাওনি? বেকার?

এই সার্কাস পার্টিতে চলে এসো ভাই, ক্লাউন বনে যাও আমার মতো—হুরর্‌র্‌র হাঃ!

ব্রতীন : (নেপথ্যে) সরোজ! সরোজ!

ফেলু : এই আর একজন বাকি আছে। লেডিজ্ অ্যান্ড জেন্টল্‌মেন! এইটাই বোধ হয় সার্কাসের শেষ খেলা!

[ব্রতীন এলো]

ব্রতীন : সরোজ!

[সরোজ এলো]

সরোজ : কে? ব্রতীন? তুই কোত্থেকে, এতো রাত্রে?

ব্রতীন : আজ রাতটা থাকতে দিবি?

সরোজ : থাকবি, তার কী? কিন্তু কোত্থেকে উদয় হলি এতোদিন পরে?

ব্রতীন : একটু বেশি নেশা হয়ে গেছে রে। আজ আর বাড়ি ফেরা ঠিক হবে না।

সরোজ : বোস। খেয়েছিস কিছু?

ব্রতীন : অ্যাঃ! একেবারে মাতৃমূর্তি ধরলি যে? 'খেয়েছিস কিছু'?

সরোজ : (হেসে) বুঝলাম, কিছু খাবি না! বোস।

ব্রতীন : (না বসে) তোর সঙ্গে বহুদিন দেখা হয়নি, না?

সরোজ : না এলে আর কী করে দেখা হবে?

ব্রতীন : তুই কতো যাস!

সরোজ : যাবো, তোকে পাওয়া যায় বাড়িতে কোনোদিন?

ব্রতীন : তা অবশ্য ঠিক। আমি যে কখন কোথায় থাকি—

সরোজ : কফি খাবি?

ব্রতীন : কফি? পয়সার নেশাটা ছোটাতে না পারলে স্বস্তি হচ্ছে না, না?

সরোজ : আচ্ছা আচ্ছা, খাস না। বোস।

[ব্রতীন একটা বোতল বার করলো কাঁধের ব্যাগ থেকে]

ব্রতীন : তুই একটু বাংলা খাবি? এক নম্বর?

সরোজ : না, তুই খা।

ব্রতীন : কেন অমন করছিস বাবা? এই বয়সে আমিও তোকে বখাতে পারবো না, তুইও আমাকে শোধরাতে পারবি না, ভয়টা কীসের?

সরোজ : ঠিক আছে, খাবো এখন।

ব্রতীন : গেলাস নিয়ে আয় দু'টো।

[সরোজ দু'টো গ্লাস নিয়ে এলো। ব্রতীন ঢাললো।]

সরোজ : নতুন লিখছিস কিছু?

ব্রতীন: নাঃ! ওসব ছেড়ে দিয়েছি।

সরোজ : ছেড়ে দিয়েছি মানে?

ব্রতীন : কী হবে লিখে?

সরোজ : আই সি।

ব্রতীন : কী 'সি' করলি?

সরোজ : নামডাক হয়ে গেছে, প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক—এখন ভয় হচ্ছে এস্ট্যাব্‌লিশমেন্টে না ঢুকে যাস। তাই তো?

[ব্রতীন হা হা করে হেসে উঠলো]

ব্রতীন : ভালো বের করেছিস! তোর অ্যানলিসিসগুলো চিরকাল—(হঠাৎ গম্ভীর হয়ে) না রে, তা নয়।

সরোজ : তবে কী?

ব্রতীন : তুই খাচ্ছিস না কেন?

সরোজ : এই তো খাচ্ছি।

[চুমুক দিলো গ্লাসে]

ব্রতীন : লেখবার আর কিছু খুঁজে পাই না।

সরোজ : তুই যে একটা নাটকের থিম শুনিয়েছিলি আমাকে, মনে আছে?

ব্রতীন : সেই—গড়ের মাঠে বসে?

সরোজ : হ্যাঁ।

ব্রতীন : ওসব থিম এখন বববাদ হয়ে গেছে।

সরোজ : কেন?

ব্রতীন : তোকে শুনিয়েছিলাম কম-সে-কম এক বছর আগে। সেদিন আর আজকের দিন কি এক? (সরোজ চুপ) কী—বল? এক?

সরোজ : তুই-আমি সেকথা বলি কী করে? অনেকের কাছে হয়তো কিছুই তফাত নেই।

ব্রতীন : নাঃ, অনেকের কাছে কিছুই তফাত নেই। এই 'অনেক' নিয়ে কারবার করতে করতে 'অনেক'-এর কাছ থেকে যে কতোদূর সরে এলাম—(হঠাৎ) আচ্ছা, তুই চিনিস? এই 'অনেক'কে? তুই তো ট্রেড ইউনিয়ন করিস?

সরোজ : করতাম। এখন করি না।

ব্রতীন : একদম ছেড়ে দিয়েছিস?

সরোজ : একদম।

ব্রতীন : কেন?

সরোজ : কে জানে? বোধ হয় ওই 'অনেক'-কে চেনা হয়নি বলে। আমাদের বলা হোতো—স্ট্রাইক করাও, আমরাও ওই এক উদ্দেশ্য নিয়ে লড়ে যেতাম। ভাবতাম এরা বোকা, বোঝে না, বুঝিয়ে দিলেই স্ট্রাইক করবে, করতে করতে দুনিয়ার মজদুর এক হয়ে—বিপ্লব।

ব্রতীন : হ্যাঁ, বিপ্লবের মাহেন্দ্রক্ষণ—নউই মার্চ উনিশশো উনপঞ্চাশ। কী করছিস তাহলে আজকাল?

সরোজ : চাকরি।

ব্রতীন : সে তো চিরকালই করতিস। সন্ধেগুলো কী করিস?

সরোজ : (একটু থেমে) থিয়েটার।

থিয়েটার? গণনাট্য?

সরোজ : না। এমনি থিয়েটার। একটা কিছুতে নিজেকে লাগিয়ে রাখা আর কী?

ব্রতীন : কাজ হচ্ছে?

সরোজ : বেঁচে তো আছি।

[ব্রতীন এক চুমুক খেয়ে পায়চারি শুরু করলো]

ব্রতীন : বেঁচে আছিস না? আচ্ছা, আমি কি বেঁচে আছি?

সরোজ : তুই তো লিখতে পারিস?

ব্রতীন : লিখতে পারি? কী? কী লিখছি? কী লিখবো? কী জানি আমি?

সরোজ : অন্যদের থেকে কম কী জানিস?

ব্রতীন : ঘণ্টা জানি! যা জানি, সব ফোক্কা!

[একটু লম্বা চুমুক দিলো]

সরোজ : অতো খাস না রে।

ব্রতীন : কেন? মাতাল হয়ে যাবো? কী আসে যায়? (সরোজ কথা বললো না) এই এক মারাত্মক প্রশ্ন—কী আসে যায়? শালা যত্তোই চেষ্টা করি, প্রশ্নটাকে কিছুতেই চাপা দিতে পারি না। এই সেদিনও এতো বেশি আসতো-যেতো। আচ্ছা, আমরা 'বিশ্বাস' করতাম, না রে? ভগবানে বিশ্বাসের মতো? ভগবান—দেবতা, গণদেবতা! সেই যে একটা ইয়া লম্বা কবিতা লিখেছিলাম, শুনিয়েছি তোকে?

সরোজ : কোনটা?

ব্রতীন : খুব বাহারে নাম দিয়েছিলাম—চিরমানব। (হাসতে হাসতে) বুঝলি? চিরমানব!

সরোজ : না শোনাসনি। মনে আছে তোর?

ব্রতীন : নাঃ, ওসব আর—কী যেন আরম্ভটা? দাঁড়া—

[মনে করে করে, একটু থেমে থেমে বলতে আরম্ভ করলো]

জ্বলন্ত-অঙ্গার-আত্মা ছদ্মভস্মমাখা
কুণ্ডলী ধোঁয়ায় ঢাকা রশ্মি-অংগীকার
অমৃতের অধিকার নির্বিচারে দিয়েছো বিলিয়ে
কণ্ঠে বিষ নিয়ে।
যাদের করেছো সৃষ্টি অন্যমনে খেলার ভঙ্গীতে—এই আমরা, বুঝলি না?
অসম্বৃতে তাদেরই চরণে
মেলেছো জটার রাশি বুদ্ধিনাশী নেশা-বিস্মরণে।

তারপর কী যেন? হ্যাঁ—

তুমি নির্বিরোধ,
অজ্ঞানের ভাণ্ডে ঢলা প্রশান্ত নির্বোধ
জড়তা পাষাণ—
নিঃশেষে করেছো দান বিভবের রাশি,
কাঁচের রঙিনে তৃপ্ত বালকের হাসি

নির্বুদ্ধি দু'চোখে ভরে পড়ে আছো বিগলিতপ্রাণ
প্রকাণ্ড অনড় দেহ মুহ্যমান শিথিল সন্ন্যাসী।

মহাদেব, বুঝলি? গণ-মহাদেব। যতো সব সেকেলে ইমেজ! আমরাও তো সেকেলে হয়ে গেছি, না? ওল্ড ফুলস!

সরোজ : আর মনে নেই?

ব্রতীন : খাপছাড়া খাপছাড়া মনে পড়বে বোধহয়।—

আমি বুদ্ধিমান,
তোমার শক্তির খনি-খোঁড়া
ধাতুব নির্জীব পিণ্ডে কালো পোড়া কৃপাণের শান।
মূর্ত আমি তোমার নিশ্বাসে,
তোমার সর্বস্ব লুঠে দীপ্ত আমি জ্বলন্ত প্রকাশে,
জ্ঞানের ঐশ্বর্যে ক্ষিপ্ত স্পর্ধা অহংকারে
তোমাকে করেছি ভৃত্য মননের সদম্ভ প্রহারে।
হে দানব ক্রীতদাস,
যুগে যুগে আমার নির্দেশে
আমার সম্ভোগবস্তু আহরণে নিমেষে নিমেষে
অবিশ্রাম তোমার প্রয়াস।
তোমার জিজ্ঞাসা শান্ত আমার কৌশলে,
তোমার—তোমার—

ধ্যাত্তেরি, ভুলে গেছি। একদম শেষটা মনে আছে শুধু।

সরোজ : তাই বল।

ব্রতীন : হে মহাদানব!
অভিশাপক্লিষ্ট আত্মা হে চিরমানব!
আর কতোদিনে
জাগরণে নেবে চিনে আঁধার-পাষাণ-ভাঙা পথ?
প্রশ্নের সপ্তাশ্ববাহী আগুনের রথ
কতোদিনে সূর্য হবে পূর্বাচলে আলোকসম্পাতে?
আমি নিঃস্ব প্রভুত্বের ভারে,
আমি রিক্ত, তাই
তোমার বিদ্রোহধারে খণ্ডে খণ্ডে ছিন্ন হতে চাই!
আমার লুপ্তিতে মুক্ত সুপ্তিভাঙা অন্ধ ক্রীতদাস,
আমাকে দেবে কি ফিরে—নবজন্মে নতুন নিশ্বাস?

[হঠাৎ হাসতে শুরু করলো। নেশার হাসি।]

নবজন্মে নতুন নিশ্বাস। উবিশ্‌শালা! লবোজন্মে লতুন লিশ্বাস! আরো সব কতো ভালো ভালো কবিতা লিখেছিলাম। সেকেলে সব কবিতা—সেকালে লিখেছিলাম তো? সেই যে—দরিদ্র শতক!—

আমি নিঃস্ব শতাব্দীর বার্ধক্যসন্তান
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্রে দারিদ্র্যের খুঁজি অবসান।

সরোজ : তারপর?

ব্রতীন : কী তারপর?

সরোজ : কবিতার বাকিটা বল?

ব্রতীন : আর নেই। ও দু'টো শেষ লাইন। কী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াই করলাম মাইরি। কবিতার অন্ত্যেষ্টি, কী বলিস? এর থেকে চাঁদ-ফুল-পাখির কবিতা লিখলে কাজ দিতো। কিম্বা ভালোবাসার কবিতা।

সরোজ : ভালোবাসার কবিতা লিখিসনি কখনো?

ব্রতীন : (তাচ্ছিল্যে) লিখেছি। ভালোবাসা বাদ দিয়ে কি কেউ বড়ো হয়েছে?

সরোজ : কী লিখেছিস, শোনা!

ব্রতীন : (ঈষৎ জড়িতকণ্ঠে) কেন? কী হবে শুনে?

সরোজ : শোনা না!

ব্রতীন : তুই ভালো টালো বাসছিস নাকি ইদানীং?

সরোজ : না। তুই বাসছিস?

ব্রতীন : (অন্যমনস্কভাবে) মেয়েরা খুব ভালোবাসতে পারে, জানিস? একেবারে বোকার মতো ভালোবাসে। কাকে ভালোবাসছে, কেন ভালোবাসছে—কিস্যু বোঝে না। হাঁদা তো? জাত হাঁদা। হাঁদা বাই কাস্ট ক্রীড অ্যান্ড রিলিজিয়ন। (হঠাৎ ধমকে) চুপ করে আছিস কেন? হাঁ করে কী গিলছিস? (সরোজ হাসলো) শালা ভাবছিস—মাতাল হয়ে পেটের কথা সব ভ্যার ভ্যার করে বলে দেবো? (এক চুমুক খেলো) হাস শালা হাস! হেসে নে, আর করবিই বা কী? হাসি ছাড়া আর আছে কী? আমাদের?

[থামলো। আবার অন্যমনস্ক। তারপর আপনমনে শুরু করলো।]

গলাটেপা নিঃঝুম এ ঘরে,
ওপাশটা কোলাহলে আর্ত,
পাতা তো ঝরেই পড়ে, মুখ-বুজে ফুল খায় মার তো।
বসে-থাকা কড়ানীলে সাদা মেঘ কখন যে ভাসবে,
কবে তুমি আসবে?
সূর্যের চোখ রাঙা পাহারায়,
চারিপাশ শাসানো দিগন্ত,
কাকেই বা বলা যায় বুক-চাপা কথা অফুরন্ত?
জ্বালাধরা ভারি আলো হালকা ছায়াতে কবে ভাসবে,
কবে তুমি কবে তুমি আসবে?
এ আকাশ থমথমে গম্ভীর,
এ বাতাস নিশ্বাস-বন্ধ,
রোদ্দুরে ঘামা ভিড় অসংখ্য নিজতায় অন্ধ।

তবুও স্বপ্ন দেখি ফিরে এসে তুমি ভালোবাসবে,
কবে তুমি কবে কবে কবে তুমি আসবে?

[একটু চুপ করে থেকে ব্রতীন আবার হাসতে শুরু করলো]

হাঁদা, হাঁদা! মেয়েটাকে বললাম—হাঁদামি কোরো না! আমরা সব খতম! সব আতশবাজির পোড়া কাঠি! ঢুকলো তার মোটা মাথায়? (ধমকে) ফের চুপ করে আছিস?

সরোজ : আরো বল।

ব্রতীন কী বলবো?

সরোজ : ওই হাঁদা মেয়েটার কথা।

ব্রতীন : কী বলবো? পালিয়ে এসেছি।

সরোজ : কেন?

ব্রতীন : সরে পড়েছি। কেটে পড়েছি।

সরোজ : কেন?

ব্রতীন : অনেক কিছু পেয়েছিলাম কিন্তু মেয়েটার কাছ থেকে, জানিস? ও জানে না, জানবেও না। কিন্তু—প্রচুর—প্রচুর পেয়েছি। পেয়েই বা কী হোলো কচুপোড়া? আর ক'দিন বাঁচলাম, এই যা।

সরোজ : ব্রতীন—

ব্রতীন : (হঠাৎ) আমরা একেবারে খতম, না রে সরোজ? একেবারে আউট, না? রিজেক্ট মাল?

সরোজ : জানি না। তুই—

ব্রতীন : উই রিগ্রেট টু স্টেট দ্যাট ইয়োর একজিস্ট্যান্স ইজ নো লঙ্গার রিকোয়ার্ড—

সরোজ : ব্রতীন--

ব্রতীন : সারা দুনিয়া আমাদের রিজেক্ট করেছে, না? সমস্ত পৃথিবী?

সরোজ : ব্রতীন, শোন—

ব্রতীন : (চেঁচিয়ে)

সমস্ত পৃথিবী হেসে উঠে বললো—
তোমাকে বুঝলাম না।
সমস্ত পৃথিবী!

(গলা নামিয়ে)

একটা বোবা যন্ত্রণা—
আমি এই।
আমি নেই, কিন্তু আমি এই
—এর বেশি কী বলতে পারি?
তবু বুঝবে না,
তবু হেসে উঠবে
সমস্ত পৃথিবী!

অথচ প্রত্যেকটা,
একটা একটা করে প্রত্যেকটা শিকড় উপড়ে
কে আমাকে ভাসালো?
কে আমাকে বিচ্ছিন্ন করলো
বিক্ষিপ্ত করলো
সুখদুঃখের জমি থেকে?
কে আমার পরিচয় লুপ্ত করলো
বাস্তব প্রতিদিনে?
এই পৃথিবী!
যে পৃথিবী আজ হেসে উঠছে,
হেসে বলছে
কী করে বুঝবো তোমাকে?
তুমি যে নেই।

[ব্রতীনের গ্লাস খালি, বোতলে মুখ দিয়ে খেলো]

চুলোয় যাক! কবিতা তোমায় এবার দিলাম ছুটি। সুকান্ত বলেছিলো, না? ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি। আচ্ছা, আমাদের কীসের ক্ষুধা বলতে পারিস? আমরা তো বরাবর খেতে পেয়েছি, আজও পাচ্ছি। তবে কীসের ক্ষুধায় আমরা অ্যাদ্দিন ধরে--মরুক গে।

[বোতলটা তুলে শেষ বিন্দুটুকু গলায় ঢাললো। একটু অবাক হয়ে খালি বোতলটা উপুড় করে দেখলো।]

যাঃ! শেষ হয়ে গেলো!

[ব্রতীন টেবিলে মাথা রাখলো। শূন্য বোতলটা অনড় হাতে ঝুলে রইলো।]

ফেলু : না! সব শেষ হয়নি।

সরোজ : (ব্রতীনের উপর ঝুঁকে) ব্রতীন, কিছু বলছিস?

ফেলু : সবটা এখনো শেষ হয়নি বোধ হয়।
সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে অন্ধ চোখ মেলে আছি আমি,
নীরবে পাঁচিল গাঁথে মায়ের বধির ঘরামি।

সরোজ : ব্রতীন! চল শুতে চল। আয়।

[প্রায় নির্জীব ব্রতীনকে তুলে নিয়ে চলে গেলো। নেপথ্যে খুব মৃদুস্বরে গান—ও আলোর পথযাত্রী, এ যে রাত্রি, এখানে থেমো না (সলিল চৌধুরীর গান]

ফেলু : তবুও আকাশে আজো নিভু নিভু অগণিত তারা অবাধ্য আশায় জ্বালে দিবসের স্তিমিত ইশারা। অবাধ্য আশায় জ্বালে—হুর্‌র্‌র্‌র্ হাঃ!

[বাইরে থেকে ম্যানেজারের হাঁক]

ম্যানেজার : (নেপথ্যে) ফ্যালারাম!

ফেলু : হুর্‌র্‌র্‌র্ হাঃ!

ম্যানেজার : (নেপথ্যে) ফ্যালারাম!

ফেলু : (চেঁচিয়ে) ইয়েস স্যার!
ম্যানেজার (নেপথ্যে) খেলা কদ্দূর?
ফেলু : বাঘ-সিংগির খেলা শেষ হয়ে গেছে স্যার।
ম্যানেজার (নেপথ্যে) এখন কী আছে?
ফেলু : বোধ হয় শেয়াল সাপ এইসব।
ম্যানেজার (নেপথ্যে) বাঘ সিংগি কিচ্ছু বাকি নেই?
ফেলু : দেখছি না স্যার। থাকলেও আফিং খেয়ে ঝিমোচ্ছে।
ম্যানেজার (নেপথ্যে) ওরই মধ্যে তাজা দু'একটা পাও তো তাই দেখিয়ে খেল খতম করে দাও।
ফেলু : যথা আজ্ঞা স্যার।
ম্যানেজার (নেপথ্যে) কী বললে?
ফেলু : 'যথা আজ্ঞা' বললাম স্যার!
ম্যানেজার (নেপথ্যে) ওটা ভালো কথা না খারাপ কথা?
ফেলু : খুব ভালো কথা স্যার। ওর মানে—'যো হুকুম' স্যার।
ম্যানেজার (নেপথ্যে) ঠিক আছে, চালিয়ে যাও।

[ফেলু তড়াং করে একটা টুলে লাফিয়ে উঠলো। গান ধরলো।]

ও-ও-ও-ও মুঝে কিসিসে প্যার হো গয়া!
প্যার হো গয়া, দিল বেকরার হো গয়া!
ও-ও-ও-ও

[অন্ধকার হয়ে গেছে এর মধ্যে। অন্ধকারে ফেলুর গলা]

হুর্‌র্‌র্‌ হাঃ!

[ব্যান্ড বাজলো। খানিক পরে আলো জ্বললো। ফেলু নেই। কুমার বসে কী সব লিখছে। বই ঘাঁটছে। রত্না এলো।]

রত্না : কুমারদা! সত্যি?
কুমার : কী সত্যি?
রত্না : তুমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছো?
কুমার : ছেড়ে ঠিক দিইনি। ছাড়িয়ে দিয়েছে।
রত্না : কী বলছো তুমি? ছাড়িয়ে দেবে কেন?
কুমার : ইনস্টিটিউটের ডায়রেক্টরের কথা শুনিনি।
রত্না : কী কথা?
কুমার : ডায়রেক্টর বলছিলো—আমি যা করছি তা ছেড়ে দিয়ে ব্যাঙ্কের মূলধন নিয়ে একটা কেতাবি গবেষণা করতে।
রত্না : কেন?
কুমার : আমার কাজে বিপদের গন্ধ পেয়েছেন তিনি। বুদ্ধিমান লোক তো? পণ্ডিত লোক।
রত্না : বিপদ কীসের?

কুমার : আমার যুক্তি না মানা মুশকিল। মানলে বহু অক্ষমতা স্বীকার করতে হয়. অনেক ভুল মেনে নিতে হয়, অনেক কিছু অদলবদল করতে হয়।

রত্না : তাতে ক্ষতি কী?

কুমার : ক্ষতি আছে রত্না। স্বার্থের ক্ষতি। বেশ কিছু লোক আছে, যাদের স্বার্থ—দুনিয়াটা যেমন আছে তেমনি রেখে দেওয়া। বদলালেই তাদের বিপদ।

রত্না : ওই ব্যাঙ্কের মূলধন নিয়ে কাজ করতে করতে তোমার নিজের কাজ চালিয়ে যেতে পারতে না?

কুমার : না। আমার অনেক সময় দরকার, মন দেওয়া দরকার।

রত্না : কোনোমতেই কি—

কুমার : (হেসে) রত্না, আমার রেজিগনেশন অ্যাক্সেপ্টেড হয়ে গেছে।

রত্না : (একটু থেমে) চাকরি খুঁজছো?

কুমার : না। চাকরি করে এ কাজ হবে না।

রত্না : তবে কী করবে?

কুমার : টিউশ্যন পেয়েছি একটা, আরো দু'একটা পেয়ে যাবো। আমার বেশি টাকা লাগে না।

রত্না : কুমারদা।

কুমার : কী?

রত্না : আমার হাজার দুয়েক টাকা জমেছে—

কুমার : (হেসে) আজ তাহলে আমার টাকা চাইবার পালা?

রত্না : আমি জানি—তুমি আমাকে দেখতে পারো না—

কুমার : এ আবার কীরকম কথা?

রত্না : কিন্তু আমি—আমি—

কুমার : (হঠাৎ) রত্না, আমি কী নিয়ে এতোদিন কাজ করছি, তুমি জানো?

রত্না : না। খানিকটা শুনেছি, বুঝতে পারিনি।

কুমার : বোঝা দরকার মনে করোনি, তাই বোঝোনি।

রত্না : কক্ষনো না!

কুমার : ভেবে দেখো। তুমি আমাকে নিয়ে মাথা ঘামিয়েছো বরাবর। আমার কাজ নিয়ে নয়।

রত্না : বোঝা দরকার মনে করিনি?—কী জানি? হয় তো তাই। বুঝিয়ে দেবে?

কুমার : এখন বোঝা দরকার মনে করছো?

রত্না : হ্যাঁ। নইলে তোমাকে কোনোদিন বুঝতে পারবো না।

কুমার : তাতে ক্ষতি কী?

রত্না : সেটা আবার তুমি বুঝবে না। তুমি বোঝাও।

কুমার : কী বোঝাবো?

রত্না : তুমি বলেছিলে—এই লাখ লাখ বেকারকে কাজ জোগানো যায়। কী করে?

কুমার : ইওরোপ আমেরিকায় কী করে জোগায়?

রত্না : তাদের লোক কম—

কুমার : আচ্ছা, লোক বেশি কম পরে হিসেব হবে। যা লোক আছে, তার বেশির ভাগ কোথায় কাজ করে ওসব দেশে?

রত্না : কলকারখানায়।

কুমার : আমাদের তা করে না কেন?

রত্না : আমাদের অতো কলকারখানা নেই—

কুমার : কে বললো?

রতনা : এ তো সবাই জানে?

কুমার : ভুল জানে! একথা সত্যি ছিল বিশ বছর আগে। কলকারখানা যথেষ্ট আছে আজ, কিন্তু উৎপাদন যা হতে পারে তার তিন ভাগের এক ভাগ হয়। আরো কম।

রত্না : কীরকম?

কুমার : দিনে তিন শিফট কাজ না হয়ে এক শিফট হয়। দিনের ষোলো ঘণ্টা যন্ত্র বেকার।

রত্না : তার মানে—দিনে তিন শিফট চললে—

কুমার : এই কলকারখানাতেই তিন গুণ উৎপাদন, তিন গুণ লোকের চাকরি।

রত্না : কিন্তু—

কুমার : 'কিন্তু' পরে হবে। আগে বলো—পুঁজি নেই, মেশিন নেই, লোক বেশি—এ কথাগুলো কি সত্যি?

রত্না : এখন তো মনে হচ্ছে, সত্যি নয়।

কুমার : ভেবে দেখো একবার। তিনগুণ কাজ হলে শহরের সব বেকার চাকরি পাবার পরও চাকরি খালি থাকবে।

রত্না : কী বলছো তুমি?

কুমার : ঠিকই বলছি। (কাগজ চাপড়ে) অঙ্ক আছে এখানে। সেই চাকরি নিতে লোক আসবে গ্রাম থেকে—উপোসি চাষি, খেতমজুর।

রত্না : কিন্তু—

কুমার : হ্যাঁ, এইবার নিয়ে এসো তোমার 'কিন্তু'।

রত্না : আমি বলছিলাম—

কুমার : তুমি বলছিলে—তিন শিফট কাজে তিনগুণ মাল পয়দা হবে, অতো মাল কিনবে কে? এই তো?

রত্না : কী করে জানলে?

কুমার : আর কী প্রশ্ন থাকতে পারে? এইটাই তো একমাত্র প্রশ্ন!

রত্না : বোকার মতো বললাম?

কুমার : নিশ্চয়ই না! প্রশ্ন না করাটাই তো বোকামি! বাজার নেই বলে আজ এক শিফটও চালু রাখতে পারছে না বহু কারখানা, এক এক করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, লক আউট হচ্ছে—

রত্না : তাহলে?

কুমার : তাহলে একমাত্র উপায় হোলো বাজার খুঁজে বের করা।

রত্না : কোথায়? বিদেশে?

কুমার : না। এই দেশেই।

রত্না : এদেশে বাজার থাকলে আর—

কুমার : বাজার নেই। বাজার তৈরি করে নিতে হবে।

রত্না : কোথায়?

কুমার : গ্রামে।

রত্না : কুমারদা, আমার বুদ্ধিশুদ্ধি কম, হেঁয়ালি না করে খুলে বলো।

কুমার : আমাদের দেশে প্রচুর মানুষ—তুমিই বলছিলে। তাদের বেশির ভাগ কোথায় থাকে?

রত্না : গ্রামে।

কুমার : কী করে?

রত্না : চাষবাস করে—

কুমার : আর উপোস করে। কমপক্ষে তিরিশ কোটি মানুষ। নিজের দেশের ভেতর এতো বড়ো বাজার ক'টা দেশে আছে?

রত্না : কী বলছো যা তা? উপোস করে যারা, তারা কারখানার মাল কিনবে? চাল কেনবার পয়সা নেই—

কুমার : কেন নেই?

রত্না : অ্যাঁ?

কুমার : কেন নেই? চাষির হাতে খেতমজুরের হাতে পয়সা কেন নেই?

রত্না : কেন তা কী করে বলবো? নেই জানি—

কুমার : (হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে) নেই জানি! ব্যস হয়ে গেলো! সব প্রশ্ন খতম! তবে আর কী—মেনে নাও সব কিছু! ওই উপোস, ওই বস্তি, সকালবেলার ওই চিৎকার --বাসি রুটি পাই মা!

রত্না : আমি কি তাই বলেছি?

কুমার : হ্যাঁ তুমি তাই বলেছো! তোমরা সবাই তাই বলে চলেছো! নেই জানি, নেই জানি, এমনি হয়—জানি! এমনি চিরকাল চলবে—জানি! কিচ্ছু বদলাবে না—জানি!

রত্না : কুমারদা—

কুমার : বুঝতে চাও না কেন—প্রশ্ন না করলে উত্তর মেলে না! জানি বলে মেনে নিলে কিছুই বদলায় না!

রত্না : আমি তো বলছি—বুঝিয়ে দাও।

কুমার : সামান্যই বলছি, শুধু একটা দিক। পশ্চিমবঙ্গের কৃষিতে গত ন' দশ বছরে উৎপাদন কিচ্ছু বাড়েনি, তবু—নিছক দাম বাড়ার কারণে—কৃষি থেকে পাওয়া আয় বেড়েছে—কতো জানো? সাতশো ছিয়াশি কোটি টাকা।

রত্না : কী করে হোলো?

কুমার : স্রেফ খাদ্যের ফাটকাবাজি। ক'টা লোকের হতে জমা হোলো এই আয়? সেই কয়েকটা লোকের স্বার্থ—উৎপাদন বাড়ানো নয়, বরং উৎপাদন কম রেখে খাদ্যের দাম বাড়ানো, যাতে ওই ফাটকাবাজি চলতে পারে। এই বাড়তি টাকা তারা ঢেলেছে জমির ওপর বাজারের ওপর আরো দখল আনতে, উৎপাদন বাড়াতে নয়।

রত্না : তাহলে, তুমি বলছো, চাষির হাতে যদি জমি যায়—

কুমার : চাষির স্বার্থ হবে উৎপাদন বাড়ানো। সে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিয়ে নলকূপ বসাবে, সার কিনবে, উচ্চফলনশীল শস্যের চাষ করবে, তাতে তার হাতে পয়সা আসবে। এক চাষের জায়গায় তিন চাষ হবে, খেতমজুর সারাবছর কাজ পাবে, তার হাতেও পয়সা আসতে শুরু করবে। তার মানে মাল কেনার ক্ষমতা। এই তো বাজার! এ বাজার পেলে কলকারখানাগুলোর দু'শিফট তিন শিফট চালু করতে বাধা কীসের?

রত্না : তিন শিফ্‌ট মানে তিনগুণ লোক চাকরি—

কুমার : তিন গুণ লোক চাকরি পাবে, তাদের হাতে পয়সা আসবে, তারাও মাল কিনবে, বাজার আরো বাড়বে। এদিকে আয় বাড়লে সঞ্চয় বাড়বে তার মানে পুঁজি, তার মানে কলকারখানা আরো বাড়বে, আরো লোক চাকরি পাবে, গাঁয়ের লোক শহরে এসে চাকরি করবে, তাতে জমির ওপর চাপ কমবে, চাষির হাতে আরো বেশি জমি যাবে, আরো বেশি আয়—

রত্না : উঃ কুমারদা, আমার মাথা ঘুরছে!

কুমার : (উত্তেজিত চিৎকারে) ঘুরবেই তো! এ চাকা ঘুরতে শুরু করলে এইভাবেই ঘুরবে! Poverty in plenty রত্না, প্রাচুর্যের মধ্যে বসে আছি আমরা চরম দারিদ্র্যে, আর বলে চলেছি—নেই জানি নেই জানি নেই জানি!

রত্না : (চিৎকার করে) এতোই যদি সহজ তবে হচ্ছে না কেন?

কুমার : এই তো! এই তো প্রশ্ন করতে শুরু করেছো! হচ্ছে না কেন? খুঁজে বের করো—কেন হচ্ছে না, কার স্বার্থের জন্যে হচ্ছে না!

রত্না : তুমি খুঁজে পেয়েছো?

কুমার : পুরো পাইনি, পাচ্ছি। আরো পাবো। পেয়ে কিচ্ছু হবে না হয়তো! সবাই শুনবে, তাদের মাথা ঘুরবে, তারপর বলবে—অসম্ভব, এ হয় না! কেন হয় না প্রশ্ন করলে বলবে—হবার হলে হচ্ছে না কেন? (আবার উত্তেজিত) আপনি আপনি হবে? জানবো না, বুঝতে চাইবো না, প্রশ্ন করবো না, কুটোটি নাড়বো না—আপনি আপনি হবে?

রত্না : আমাকে বকে কী হবে কুমারদা? আমি কী করতে পারি?

কুমার : নাঃ! তুমি শুধু ভালোবাসতে পারো! ভালোবাসা চাইতে পারো!

রত্না : কুমারদা!

কুমার : তুমি বাড়ি যাও রত্না! আমার কিছু দেবার নেই। আমার ভালোবাসা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

[কুমার সবেগে বেরিয়ে গেলো]

রত্না : কুমারদা! কুমারদা!

[বলতে বলতে রত্না বেরিয়ে গেলো। ফেলু পা টিপে টিপে এলো, দর্শকদের দিকে চেয়ে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে ইশারা করলো। ম্যানেজার এলো।]

ম্যানেজাব : ফ্যালারাম!

ফেলু : শ্ শ্ শ্ শ্।

ম্যানেজার কী হোলো?

ফেলু · (চাপা গলায়) পেয়েছি স্যার।

ম্যানেজার কী পেয়েছো?

ফেলু : একটা বুড়ো বাঘ।

ম্যানেজার খেলা দেখাতে পারবে?

ফেলু : জানি না স্যার। তার আগেই না মরে যায়।

ম্যানেজার কী খেলা?

ফেলু · ঠিক বুঝছি না স্যার। চাকার খেলা মনে হচ্ছে।

ম্যানেজার চাকার কী খেলা?

ফেলু : মনে হচ্ছে--একটা চাকা ঘুববে। প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর জোবে, তারপর বনবন বনবন করে ঘুরবে! তখন রঙের খেলা—লাল নীল সোনা রঙ—আলোর খেলা—আলোয় সব কিছু বদলে যাবে--ঝলমল করে উঠবে—

ম্যানেজার : কী বাজে বকছো?

ফেলু : হ্যাঁ স্যার, মাইরি বলছি! যদি চাকাটা ঘোরে।

ম্যানেজার : ওসব জানি না। পাঁচ মিনিট সময় দিলাম, যা করতে পারো করো।

ফেলু : যথা আজ্ঞা স্যার।

ম্যানেজার · কী বললে? ও হ্যাঁ—যথা আজ্ঞা, ঠিক আছে।

[ম্যানেজার চলে গেলো। ফেলু এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, কান পেতে কিছু শোনবার চেষ্টা করছে। অন্ধকার হয়ে গেলো ধীরে ধীবে। সার্কাসের ব্যান্ড—ধীর লয়ে। আলো জ্বলতে দেখা গেলো রাশিকৃত বই কাগজ নিয়ে কুমার কাজ করছে। কাজ করছে আর কাশছে। উঠে জল আনতে গিয়ে মাথাটা ঘুরে গেলো। কোনোমতে এসে বসলো। রত্না এলো।]

রত্না : কুমারদা!

কুমার : (চমকে) কে?—রত্না?

রত্না : চিনতে পেরেছো তাহলে?

কুমার : তুমি—তুমি আমার ঠিকানা পেলে কী করে?

রত্না : তোমার অসুখ?

কুমার : কে বললো?

[আবার কাশির দমক। রত্না কুমারের কপালে হাত রাখলো।]

রত্না : জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে!

কুমার : হ্যাঁ, জ্বরটা ছাড়ছে না ক'দিন ধরে—

রত্না : কতোদিন ধরে?

কুমার : মাঝে মাঝে হয়। ও কিছু না। জানো রত্না, চাকাটা ঘোরানো যায়।

রত্না : চাকা?

কুমার : ভুলে গেছো? সেই যে বক্তৃতা দিয়েছিলাম, মনে নেই? চাষির হাতে কী করে পয়সা—

রত্না : কুমারদা, তুমি শুয়ে পড়ো—

কুমার : শোবো, আগে শোনো—

রত্না : না, এসো।

[রত্না কুমারকে শুইয়ে দিলো। কুমার কাশলো, তারপর ঝিম মেরে পড়ে রইলো।]

কী খেয়েছো আজ? (জবাব নেই) খেয়েছো কিছু?

কুমার : জমির মালিকানা ব্যবস্থায় একটা আমূল পরিবর্তন যদি—

রত্না : কুমারদা, একটু চুপ করে থাকো—

কুমার : —ঘটানো যায় তাহলে জমির মালিক, খাদ্যের ব্যবসাদার আর সুদখোর মহাজন—এই যে ত্র্যহস্পর্শ যোগ, সেটাকে—

রত্না : কুমারদা—

কুমার : সেটাকে ভাঙা যায় অনেকটা। চাষির হাতে জমি গেলেই কিন্তু সবটা হোলো না রত্না। তার সঙ্গে সঙ্গে—

রত্না : কুমারদা, চুপ করে শোও, লক্ষ্মীটি—

কুমার : তার সঙ্গে সঙ্গে চাই আধুনিক চাষের সরঞ্জাম—সার, বীজ, পোকামারা ওষুধ, নলকূপ—সব কিন্তু ব্যাঙ্কের টাকা ধার করে হতে পারে, এবং সে টাকা শোধ দিতে কোনো অসুবিধে নেই—

রত্না : কুমাবদা, কথা শুনবে না!

কুমার : করা যায় রত্না, করা যায়—

[জোর করে উঠে বসলো]

যদি ঠিকমতো—

[কাশতে শুরু করলো]

রত্না : কুমারদা! কুমারদা!

[কুমাব ঢলে পড়লো। রত্না রুমাল ভিজিয়ে এনে কুমারের মুখ মুছিয়ে দিলো, কপালে রাখলো।]

কুমার : রত্না?

রত্না : বলো।

কুমার : আমার শীত করছে রত্না।

[রত্না চাদর চাপা দিয়ে দিলো।]

আমার একা লাগছে।

[রত্না দাঁতে ঠোঁট চেপে বসে রইলো কুমারের হাতটা হাতে নিয়ে]

আমার—অনেকদিন ধরে একা লাগছে। তুমি এতোদিন কোথায় ছিলে রত্না?

রত্না : মরেছিলাম।

[রত্না উঠে পড়লো]

কুমার : কোথায় যাচ্ছো?

রত্না : তুমি শুয়ে থাকো। আমি আসছি এক্ষুনি।

কুমার : কোথায় যাবে?

রত্না : ডাক্তার ডেকে আনি।

কুমার : ডাক্তার দেখে গেছে কাল। তুমি যেয়ো না, বোসো।

রত্না : (ফিরে এসে) কী বলেছে ডাক্তার?

কুমার : জানো রত্না, এ এক আজব চাকা। প্রাইমারি সেক্টরের সমস্যা সমাধান করলে সেকেন্ডারি সেক্টরের সমস্যা ঢোকে। আবার সেকেন্ডারি—

রত্না : কুমারদা প্লিজ, একটু চুপ করে থাকো। পরে শুনবো।

কুমার : পরে শুনবে?

রত্না : হ্যাঁ, পরে শুনবো। একটু পরে।

[কুমার চুপ করলো। রত্না আবাব রুমাল ভেজাতে গেলো।]

কুমার : তুমি চলে যাবে রত্না?

[রত্না ফিবে এসে বসলো, কপালে ভেজা রুমাল রাখলো। কুমার তার মুখ দেখতে পাচ্ছে না।]

হ্যাঁ, যেতে তো হবেই।

[রত্না আঁচলটা দাঁতে কামড়ে ধরলো।]

আর একটুক্ষণ থাকবে?

রত্না : (কোনোরকমে) থাকবো।

কুমার : (অল্প পরে) আমি ভালোবাসতে শিখলাম না কোনোদিন।

রত্না : না। শুধু শেখালে।

কুমার : তার মানে?

রত্না : কিছু না। এখনো শীত করছে?

কুমার : না।

রত্না : কিছু খাবে?

কুমার : না। (একটু থেমে) তুমি আর একটুক্ষণ থাকবে?

রত্না : আরো অনেকক্ষণ থাকবো।

কুমার : (অল্প পরে) চাকাটা কিন্তু ঘোরানো যায় রত্না। আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলবো। তুমি বোঝাবে? যতো লোককে পাবো?

রত্না : চেষ্টা করবো।

কুমার : যাকে পারো। অনেক লোককে বোঝাতে হবে—অনেক লোককে—

(কুমার আবার কাশতে শুরু করলো। আলো নিভে গেলো আস্তে আস্তে। আলো জ্বলতে দেখা গেলো, ফেলু একা দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে।)

ম্যানেজার : (নেপথ্যে) ফ্যালারাম!

[ফেলু ক্লান্তভাবে মুখ তুললো। ম্যানেজার এলো।]

ফ্যালারাম!

ফেলু : (ক্লান্তস্বরে) ইয়েস স্যার।

ম্যানেজার : খতম হোলো—খেল?

ফেলু : এ খেল খতম হবার নয় স্যার।

ম্যানেজার : কেন, কী হয়েছে?

ফেলু : চাকাটা ঘুরছে না।

ম্যানেজার : চাকার খেলা এখনো বাকি আছে নাকি?

ফেলু : হ্যাঁ স্যাব।

ম্যানেজার : ঘোরাও ঘোরাও, চটপট করো!

ফেলু : আমাদের দ্বারা হবে না স্যার। নতুন খেলোয়াড় চাই। বাচ্চা খেলোয়াড়।

ম্যানেজার : তবে চুলোয় যাও!

ফেলু : ইয়েস স্যার।

[ম্যানেজার রেগে বেরিয়ে গেলো]

(ক্লান্তস্বরে) হুর্‌র্‌র্‌র্ হাঃ।

[উঠে চলে যাচ্ছে, রত্না আর মন্টু এলো। মন্টুর বয়স সতেরো-আঠেরো। ওরা হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছে। ফেলু দাঁড়িয়ে গেলো, ঘাপটি মেরে শুনতে লাগলো]

মন্টু : অসম্ভব!

রত্না : অসম্ভব নয়, ভেবে দেখ! এক শিফটের জায়গায় তিন শিফট কাজ হলে তিনগুণ লোক চাকরি পাবে না?

মন্টু : আর মালগুলো কিনবে কে? বাজার কোথায়? রিসেশন কি এমনি এমনি হয়েছে?

রত্না : বাজার আছে মন্টু, বাজার আছে। মানে, এখন নেই, কিন্তু তৈরি করা যায়। শোন, আমি চেষ্টা করছি বোঝাতে। তুই তো ইকনমিক্স পড়িস, তুই ঠিক বুঝতে পারবি—আমার চেয়ে ভালো বুঝবি তুই। শোন, তিরিশ কোটির ওপর মানুষ গ্রামে থাকে, চাষবাস করে, ঠিক কিনা?—

[কথা বলতে বলতে ওরা বেরিয়ে গেলো। ফেলু হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে উঠলো।]

ফেলু : হুর্‌র্‌র্‌র্ হাঃ! লড়ে যা বাচ্চা, লড়ে যা! চাক্কা ঘুরিয়ে দে! আমাদের দ্বারা হোলো না রে, তোরা ঘুরিয়ে দে বাচ্চা—বন্ বন্ বন্ বন্! হুর্‌র্‌র্‌র্ হাঃ! হাঃ! হাঃ!

[অন্ধকার]

১৯৬৯